একটা ঘোষণায় লিখেছিলাম 'মূর্খে রচিল গীত না-জানি মাহাত্ম্য'—সেটাই বজায় রইলো আজও।

ঋণ কার কাছে নেই? বাহুল্য বোধে ঋণ স্বীকারে বিরত থাকলাম। পূর্ববর্তী আলোচকদের জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম।

রবীন্দ্রনাথ অব্দি বাংলা গদ্যপদ্যর যতখানি যা আলোচনা হয়েছে খুবই দুঃখের যে রবীন্দ্র-পরবর্তী তিরিশ বছরের লেখালেখির বেলায় ঠিক ততখানিই জুটেছে উদাসীন উপেক্ষা ও মর্মান্তিক নীরবতা। সামগ্রিক ভাবে বাংলা গদ্যপদ্যর পূর্ণাঙ্গ কোনো আলোচনা হয়েছে বলে জানা নেই। এ প্রয়াস আমার নিজের কাছেই দুঃসাহস।

সেতুবন্ধে রাম নামেরই জয়ধ্বনি, আন্দোলনে দলনেতার। কিন্তু কাঠবিড়ালীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। এ গ্রন্থের নামাবলী বিদগ্ধ ব্যক্তির বিরক্তির কারণ হলেও আমি নাচার। ন্যূনতম গুরুত্বের কবি-কথাসাহিত্যিকদেরও আমি গদ্যপদ্য আন্দোলনের অপরিহার্য শক্তি হিসেবে গ্রহণ করেছি এবং যথাযোগ্য মর্যাদা দেবার চেষ্টা করেছি।

ত্রুটি নিশ্চয়ই আছে। সহৃদয় পাঠকদেরও অসীম ক্ষমা-ক্ষমতা আছে। সেই ভরসাতেই ভয়ে ভয়ে বলা, কারুর সামান্যতম প্রয়োজনেও যদি এ গ্রন্থ কোনো ভূমিকা নিতে পারে নিজেকে কৃতার্থ মনে করবো। আশাকরি ত্রুটি সংশোধন করে আরো সঠিক ভাবে আলোচনার জন্যে এর পর সুতীক্ষ্ণ মেধার অভাব হবে না।

যে বিপুল ঝুঁকি, অপরিসীম দরদ এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠা নিয়ে 'অধুনা'র বন্ধুরা বইটি করেছেন তা শুধু তাঁরাই পারেন এবং তাঁরাই করেছেন।

সত্য গুহ

অশোকনগর

এ বই বের করে অধুনা-র আমরা নিজেদের ধন্য মনে করছি

মাসিক লিটল ম্যাগাজিন 'গল্পকবিতা'য় ১৯৬৭-৬৮তে ধারাবাহিক প্রকাশিত

'স্থানকালপাত্র ও গত কয়েক বছরের গদ্যপদ্য আন্দোলনের দলিল'

রচনার সংশোধিত ও সু-পরিবর্ধিত অবয়ব এই বইটি

পরম্পরা

নির্দেশিকা

একালের গদ্যপদ্য আন্দোলনের দলিল

নান্দীমুখ

ভুতুড়ি-সার কাঁঠালেরও আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন ক্রেতাবিজয় মহাকাব্য হয়ে মুনিমানুষের মতিভ্রম ঘটায়। ক্রেতারাও কিল খেয়ে কিল চুরি করতে বাধ্য হয় এবং দক্ষ বেনিয়ার পুঁজি দানবীয় মূর্ত্তি ধারণ করে। কোনটা বিষ—কোনটা সামাজিক শত্রুতা, অর্থনীতি শাস্ত্রের তা দেখার নয়। দেখেও না। মুনাফা যাতে যত বেশী, উৎপাদকরা তাই-ই বেশী বেশী উৎপাদন করবে। এটাই বেনিয়া শাস্ত্রের ধর্ম।

ক্রেতাদেরও একটা ধর্ম আছে এবং তা তার মর্জি—তার রুচি। কিন্তু বর্তমান সময়ে সে মর্জি বা রুচির বিশেষ কোন গুরুত্ব নেই। কেননা, সব ব্যাপারটাই বৃহৎ পুঁজির মালিকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এখন সব কিছুই লার্জস্কেল প্রোডাকশন- ব্যবসা মানেই মনোপলি। এবং পরিবর্তহীন দ্রব্যের বাজারে একচেটিয়া পুঁজির কারবারীই অধীশ্বর।

সাম্প্রতিক সাহিত্যটাও একটা খুব লাভজনক ব্যবসা। এর বাজার আছে। একচেটিয়া কারবারী আছে—আছে কারখানা, শ্রমিক, মায় কমপিউটার লেখকও যাঁরা বছরে ছোট বড় মিলিয়ে ত্রিশ বত্রিশখানা উপন্যাসই লেখেন। এখানেও সব কিছু বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার নীতিমাফিক। ফলে, বেনিয়া-মালিকানা বাজারে কৃত্রিম চাহিদা সৃষ্টি করে এমন সব ভুষিমাল ক্রেতাদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে যে, ঢাকে এবং হাঁকে ক্রেতারা তা ভোগ করে দুর্ভোগের জন্যে কপাল চাপড়াচ্ছে। কিন্তু উপায় কি! পরিবর্তন নেই। বাধ্য হয়েই রুচি করতে হয়েছে বাজারে চালু ঘোরতর 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে', 'পরম অবতারদের (গালগপ্পো) জীবনীতে', বা 'রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজে'। অধুনা বাজার ছাপিয়ে দেখা দিয়েছে রমরমে 'যৌন কিস্‌সা'। বলাবাহুল্য এটা সাহিত্যের বড় বাজার। এখানে সবই 'রেডিমেড'। সাধারণ ক্রেতা এখানে জুতো পায়ে একটু ছোট কি বড় হলে যেমন গা করে না, তেমনি বেস্ট সেলার মার্কা বইগুলো সাহিত্য হোলো কি হোলো না, তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। কিন্তু সত্যিকারের সাহিত্য-

পাঠকের উনিশ বিশেই খুঁত-খুঁতানির অন্ত থাকে না। তা ছাড়া সাহিত্য, যা জীবনের সহিত বর্তমান, সেখানে তারা কোনরকম ফক্কিবাজিই বরদাস্ত করতে রাজী নয়। সব কিছুই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জীবনের সঙ্গে—আপন অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে–মিলিয়ে দেখতে চায়। সে চায় সত্যবস্তু। ওজন করে নেবার সময় সে কখনোই জবজবে ভিজে পাট নিতে প্রস্তুত নয়। আর সেই জন্যেই সাম্প্রতিক সময়ে পত্র পত্রিকাগুলোর মধ্যে সাহিত্যনামধেয় যেসব বস্তু উড়ে ফিরছে তাদের চেহারাচরিত্রটা একটু নির্মমভাবেই যাচাই করে নিতে চায় সে।

অতি ওজনের শোভনসুন্দর প্রচ্ছদের কোন বই ওলটালেই অধুনা যে কোন হাফ অক্ষুরে পাঠকেরও চোখে পড়ে বেপরোয়া ভাবে উপস্থাপিত মাত্রাছাড়া ক্লেদ, কলতানি, পাপ, হতাশা, ব্যর্থতা, ধর্ষণ, খুন ও আত্মহত্যার ভয়ঙ্কর বীভৎসা। কুচ্ছিৎ শব্দবিন্যাসে অত্যন্ত কদাকার করে দেখানো সামাজিক অস্তিত্ব এবং অভিশপ্ত জীবন। জীবনের তাবৎ ক্রিয়াশীল শক্তি যৌনতৎপরতায় কেন্দ্রিত। আর তা দেখে স্বাভাবিকভাবেই সুস্থ পাঠক সমাজ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। নিউজপ্রিণ্ট ভরা নৈরাজ্যের ও রিরংসার পরিচয়ে আতঙ্কিত পাঠকের মনে ধারণা জন্মেছে মানুষ নরকে বুঝি এক ঋতু নয়, সংখ্যাগণনাহীন অতীত থেকে অধুনা অব্দি সে নরকেই টিকে আছে—দীর্ঘ পথ পরিক্রমার পর আজ সে এক অতল খাদের কিনারে এসে কেবলই টাল সামলাচ্ছে– তার 'পা থেকে মাথা অব্দি টলমল করে'।

সত্যিই তো, সাদা চোখে দেখতে গেলে সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য অর্থাৎ ১৯৪৭ সাল থেকে সুরু করে ১৯৬৯ পর্যন্ত স্বাধীনতার পরবর্তী কালের সাহিত্য যা বাজারে চালু আছে অন্তত বেনিয়াবান্ধব পত্রিকা ও সাহিত্যপত্রগুলো যা পরিবেশন করে চলেছে—তাতে নরকের তাবৎ নোঙরা এবং আবর্জনাকেই ব্যবসায়ী নিয়ন্ত্রিত লেখক কবিরা সাহিত্যের মশলা হিসেবে কাজে লাগাতে বেপরোয়া বলে মনে হওয়া অমূলক নয়। সম্পূর্ণ সাহিত্যিক কাজকারবার গুলোকেই উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং কোন এনিমি অব দা পিপল জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেককে অন্যখাতে বইয়ে দেবার চেষ্টা করছে বলে ভাবা স্বাভাবিক। স্পষ্টতই মনে হতে পারে যে, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবনে যে অনিশ্চিতি দেখা দিয়েছে এবং মানুষের মধ্যে যে রাজনৈতিক এবং যৌন-সন্ত্রাস, দায়িত্ববোধহীনতা ও সর্বাত্মক বিনষ্টির প্রবণতা দেখা দিয়েছে, তাকেই

এক শ্রেণীর পত্রিকা ব্যবসায়ী মুনাফা লোটার মওকা হিসেবে বেছে নিয়েছে এবং সেই ভিত্তিতে তথাকথিত বাজারে নামওয়ালা সাহিত্যিকদের অর্থের বিনিময়ে কাজে লাগাচ্ছে।

প্রমাণ দূর নয়। ফি বছর পুজো মৌসুমী সাহিত্যের শরৎকাল কেটে গেলেই আজকের বাংলা সাহিত্য পাঠকের মনে এ আশঙ্কা বদ্ধমূল হয়ে ওঠেই যে, পরবর্তী শরৎকালে এর চেয়েও হিংস্র ও ভয়াবহ শ্বাপদের মুখব্যাদানকেই চিত্রিত করে সাহিত্যিক সমাজ মানুষের রসবোধ ও জীবনানুভূতির সূক্ষ্ম ভিত্তিকে তছনছ করে দেবে—উপস্থিত করবে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে একপেশে অপব্যাখ্যা, যা জীবন সমালোচনা নয়, জীবন যন্ত্রণায় দগ্ধ অভিজ্ঞতার পাণ্ডুলিপিও নয়। সেগুলোর মধ্যে সম্ভবতঃ আরো ঘৃণ্যভাবে দেখা দেবে উদ্দেশ্যহীন নৈরাজ্যের হল্লা, পাশবিকতাসর্বস্ব যৌনাকাঙ্ক্ষার কাৎরানি কি গোঙানির রাত ভরে বৃষ্টি ও কুকুরের মৈথুন শীৎকারের পাতক স্বীকারোক্তি। উন্মুখ পাঠক নিউজপ্রিন্টে ছাপা উপন্যাসটি খুলতে না খুলতেই উচ্চারণ করবে 'হয়ে গেলো'। এর পরেই সেই 'হয়ে গেলো'র আগে পরের কাণ্ড কারখানার অতি বিস্তৃত ফেনিল বিবরণ। উপন্যাস।

বাংলাদেশে আজ দিবালোকের মতোই স্পষ্ট যে, চৈত্র বৈশাখ শেষ হতে না হতেই বড়সড় সাহিত্য-ব্যবসায়ীদের কাছে বড় এবং বিকট বাজারে পত্রপত্রিকার নির্দেশ ও দাদনের মোটা রকম একটা কিস্তির টাকা চলে যায়। আর পাঠকসাধারণ যাতে টাকনা দিয়ে গরমসরম তেলেভাজার মতন আস্বাদন করতে পারেন, এ রকম কান-গরম-করা সাহিত্য সৃষ্টির জন্যে স্বনাম-ধন্য সাহিত্যিকরা আদাজল খেয়ে অত্যন্ত বেহায়ার মতো 'বিবর' 'স্বীকারোক্তি' 'প্রজাপতি' 'পাতক' 'পাতাল থেকে আলাপ' 'রাত ভরে বৃষ্টি' 'কুমারীর মৃত্যু' 'বেশ্যার মৃত্যু' এবং 'কবির মৃত্যু' সব শেষ করার পর বিশ্বের নির্বিশেষ সমস্ত কিছুর হত্যা পরিকল্পনায় লিপ্ত হয়ে পড়েন। সাধারণ পাঠক সমাজ অসহায় হয়েই সম্ভবতঃ সমস্ত শুভবুদ্ধির ভ্রূণহত্যার আইন পাশ করেছে—যেমন ক্ষুধা প্রতিরোধের জন্যে অনুন্নত দেশের অর্থনীতি লোকসভাকে বাধ্য করেছে ম্যালথাস তত্ত্বকে সোনার জলে ছাপিয়ে ক্ষুৎকাতর জনসাধারণকে প্রলুব্ধ করতে।

সাহিত্যের নামে বাজার ছেয়ে গেছে পার্ভার্টেড সেক্স স্টেটমেন্টে। পর্ণোগ্রাফি নয়—সেগুলো বয়স্ক নারীপুরুষের কাছে এক ধরনের চুটকির রস যোগান দেয়। এ সব লেখকদের তা লেখার মুরোদ নেই, থাকলেও সাহিত্যিক

নামটুকু বজায় রাখার জন্যে লিখতে সাহস করেন না। তাদের লেখার সামনে পাঠক হিসেবে উপস্থিত থাকে বালকবালিকারা অথবা বিচারক্ষমতাহীন বই পড়তে জানা অর্ধশিক্ষিত জনতা। এস্টাব্লিশমেন্টের দৌলতে এই সব কেচ্ছাই সাহিত্য হিসেবে প্রচার লাভ করছে। লক্ষ্যনীয় যে, মূলধন নিয়োগ করে কোন ব্যবসায়ীই স্বল্প লাভে সন্তুষ্ট নয়। তাই কোন বইয়ের কাটতি কম দেখলে ধুরন্ধর পুস্তক ব্যবসায়ী ভাড়াটে পাঠক লাগিয়ে নিজেই সে বইয়ের নামে অশ্লীলতার অভিযোগে মামলা রুজু করে এসে পাঠকের স্বাভাবিক কৌতূহলবৃত্তিতে সুড়সুড়ি দিয়ে এক রাতের মধ্যেই আর এক সংস্করণ তৈরী করে এবং শর্বরী শেষে ১৬০০ কপি বই বিক্রী হয়ে যাবার বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে পরবর্তী সংস্করণের জন্যে পাঠক ডাকে। এই সব কিতাবের থেকেই সিনেমা কোম্পানীগুলো আবার গাত্রচর্মআকর্ষণী বস্তু বাছাই করে দায়িত্বহীন তৎপরতায় ভূরিভূরি কালো টাকা সাদা করে নিতে চড়া চেহারার নায়িকার বিজ্ঞাপন লটকাচ্ছে। মহাসমারোহে কেটে যাচ্ছে শত শত রজনী। মোটকথা, গত কয়েক বছরের শরৎকাল বাংলাদেশের সাহিত্য পাঠকদের কাছে শরৎকাল সম্পর্কেই একটা এ্যালার্জি সৃষ্টি করেছে।

অতএব, একথা না বললেও চলে যে, সাম্প্রতিক সাহিত্যক্ষেত্রে আজ যে নৈরাজ্য দেখা দিয়েছে, তা সচেতন স্বার্থবুদ্ধিরই সৃষ্টি। বেনিয়াবুদ্ধিই অত্যন্ত ন্যক্কারজনক ভাবে 'বৃহদায়তন পাঠক সমাজের পকেট কাটার' জন্যে প্রতিষ্ঠিত স্থায়নীতি বহির্গত পথ ধরে কুৎসিত আবর্জনায় সমাজচৈতন্যকে প্যারালাইজড্ করে দেবার ষড়যন্ত্র করেছে—যেমন পচা নর্দ্দমার জলকে 'ডিস্টিল্ড ওয়াটার' বলে চালাতে বা সর্ষের তেলে মারাত্মক শেয়ালকাঁটার বিষ ভেজাল দিয়ে মুনাফা করতে কসুর করছে না মুনাফাখোর নিত্যবস্তুর ব্যবসায়ীরা।

কিন্তু বাংলাদেশে সম্প্রতি যা কিছু লেখালেখি হচ্ছে সবই কি যৌন বা সিনেমা পত্রিকা বা তার স্বগোত্রীয় সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলোর ভালো কাটতির জন্যে নিছক জৈবিক আনন্দের উত্তেজক মাদকরস ঠাসা ছাপার হরফ? সবই কি অন্তঃসারশূন্য এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক ও অপ্রাপ্তমনস্কদের দিকে তাকিয়ে লেখা যৌনকেন্দ্রিকতা এবং নৈরাজ্যের সাহিত্য? বাজার-বিকাশ বইপত্রের বেশীর ভাগ তা-ই হলেও, কোন সুস্থ পাঠকই এ রকম নেতিরোগে ভুগছে না। ভুগছে না, ভোগার কারণ নেই বলেই। সাম্প্রতিক সাহিত্য সম্পর্কে রায় দেবার আগে অবশ্যই বুঝে নিতে হবে সাহিত্য কোনটা।

অঢেল বাজারে কিস্‌সা আর সাহিত্যের মধ্যে ব্যবধান আসমান জমিনের। বেস্ট সেলারগুলো গোগ্রাসে গিলে 'কিচ্ছু হচ্ছে না' বলে রায় দেওয়াটা নিবুর্দ্ধিতা। ও সব লেখায় সবই থাকে, সাহিত্য থাকে না। একটা চোস্ত ফরমুলায় ফেলে কতকগুলো ঘটনা একটা 'নাম'এর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া। ওর থেকে কোন আবেদনই প্রত্যাশা করা যায় না। অনেকটা ধর্মমঙ্গলের 'লাউসেন' নামের সঙ্গে যেমন কতকগুলো কার্যকারণহীন ঘটনাকে সেঁটে দেয়া হয়েছে মঙ্গলকাব্যের ফরমুলায় ফেলে, 'মহাজনী' লেখাগুলোও তেমনি। ওগুলোর মধ্যে সাহিত্য খুঁজতে যাওয়া যেমন বাতুলতা তেমনি সাহিত্যপাঠে বীতশ্রদ্ধ হওয়াও চোরের ওপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়ার মতো হাস্যকর। সাহিত্য পেতে হলে অবশ্যই বেমক্কা ভাবে প্রকাশিত তরুণ লেখকদের মুখপত্র লিটল ম্যাগাজিনগুলো খুঁজে পেতে পড়তে হবে। সেগুলোর মধ্যেই প্রকাশিত রয়েছে সাম্প্রতিক সাহিত্য। তরুণ সাহিত্যিক কবিদের যে সব রচনা স্বাধীনতা পরবর্তী কালে অজস্র নামের চটিচটি পত্রিকাগুলোতে বা সংকলনে প্রকাশিত হয়েছে তা বিশ্বের যে কোন দেশের সাহিত্যের থেকে ন্যূন তো নয়ই, বরং কোথাও কোথাও উন্নতমানের। এসব গদ্যপদ্যর মধ্যে দেশ ও জাতির সার্বিক মানসিকতার পরিচয় তো আছেই, আছে রূপে রসে আলাদা একটা নতুনতর কলা বিন্যাসও।

মনে রাখতে হবে, সাম্প্রতিক সাহিত্য পরীক্ষানিরীক্ষার সাহিত্য। মুঠো করে বিবাহের উপহার হিসেবে নিয়ে যাবার মতো কোন গ্রন্থই তরুণ লেখক কবিরা রচনা করেন নি রচনা করেন নি বিশ্ববিদ্যালয়ে সটীক উদ্ধৃতি দিয়ে লেখাটার আদ্যশ্রাদ্ধ করার জন্যেও। তাঁদের এ সব লেখার আবেদন সরাসরি ধীমান ও অনুভূতিপ্রবণ পাঠকের অস্তিত্বের কাছে। তরুণ সাহিত্যিক কবিদের রচনায় জীবনের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা, রক্তাক্ত আর্তনাদ, বেঁচে থাকা ও ভালোবাসার তীব্র আকাঙ্খা ও তাজা হৃদয়ানুভূতি এমন সরাসরি ও প্রবল ভাবে উপস্থিত যে, যাঁরা ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না বলে ভান করেন বা যা আছে তাই নিয়েই প্রসন্ন এবং যাঁদের 'রবি' ছাড়া গীত নেই, তাঁদের তা ভয়ের হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষেই এসব রচনা ফুল বিছানায় চিৎ হয়ে পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ার জন্যে নয়। এগুলো পাঠককে ঘা দিয়ে প্রতি মুহূর্তের জন্যে সচেতন রাখে এবং তাকে জগতের সঙ্গে মিলিয়ে নতুন করে আবিষ্কারের জন্যে রক্তাক্ত ও ঘর্মাক্ত হতে সাধ জাগিয়ে দেয়। একথা প্রত্যয়ের সঙ্গে বলা যায় যে,

তরুণ সাহিত্যিকদের লেখাগুলো দ্বন্দ্বমূলক ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের ধারায় স্থানকালপাত্রের যথার্থ পরিচয় বহন করে নিয়ে এসে বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম মানবিক অস্তিত্বের মূল্য তুলে ধরেছে— উপহার দিয়েছে তাজা জীবনাভিজ্ঞতার স্বাদ। আর এটা করার জন্যেই স্বাধীনতা লাভের পর থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে তাঁদের দ্বিমুখী আন্দোলন চালিয়ে আসতে হয়েছে। একদিকে তাঁরা নিজেরা লিখে প্রমাণ করেছেন, যতবড় নামওয়ালা লেখকই লিখুন না কেন, বাজার-বিলাস রচনাগুলো সাহিত্য নয়; অন্যদিকে গোটা সমাজ কাঠামোর বিরুদ্ধে আপোষহীন বিদ্রোহ ঘোষণা করে সভ্যনামিক মুখোস ফাটিয়ে বের করে এনেছেন আদত মানুষটাকে। উনবিংশ শতকে ইয়ং বেঙ্গলরা তেমনি মধ্যযুগীয় পাঁশুটে সাহিত্যরীতিকে স্পর্দ্ধার সঙ্গে অস্বীকার করে সাহিত্যচরিত্রই পালটে দেখিয়েছিলেন তাঁদের সৃষ্টি স্বতন্ত্র এবং বিদ্রোহী সত্তা দেবতার কব্জা ছুটিয়ে উদ্ধার করে এনেছিলো মানুষকে। বলাবাহুল্য, এ জন্যে তাঁদেরও মুখোমুখী হতে হয়েছিলো তোফা থাকা সামাজিক প্রতিরোধের। দেবতাকে খুইয়ে সমাজ তবু উচ্ছন্নে যায় নি।

নতুন কিছু হলেই তা সবাইকে সচকিত করে তোলে। পুরোনোটার সঙ্গে মেলে না বলেই তার সম্পর্কে অভিযোগই জেগে ওঠে প্রথমে। তারিফ করতে ইচ্ছা জাগে না সহজে। এটাই সাধারণধর্ম। সাম্প্রতিক সাহিত্য সম্পর্কেও অভিযোগ অনেক এবং তা থাকাই স্বাভাবিক। তাই এ সাহিত্য সম্পর্কে সাধারণ পাঠকদের মধ্যে কিংবদন্তীর মতো উড়ে ফিরছে যে, এ সব লেখালেখির মধ্যে মানুষের প্রিমিটিভ ভ্যালুর স্বীকৃতি নেই; এ সব ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত নয়; এ সাহিত্য সার্বজনীন অভীপ্সার মূর্তি দিতে পারছে না; এঁদের সাহিত্যে উপস্থাপিত বিষয়গুলোর অভিজ্ঞতা সত্য নয়; এদেশের মাটিতে তার শিকড় নেই, ও-সব বিদেশী কাগুজে ফুল; সাম্প্রতিক বাংলাসাহিত্য অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক; এ সব রচনা অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়ায় এক ধরনের দুর্বোধ্য সাংকেতিক ভাষায় রচিত এবং এর ত্রিং রং রাং একশ্রেণীর সাহিত্যিক গোষ্ঠীর গুহ্য মন্ত্র সাধারণ পাঠকের কাছে যা অর্থহীন; এ সাহিত্যের মধ্যে যৌন সন্ত্রাস, অশ্লীল অবক্ষয়ের শ্রাব আর নৈরাজ্য—এ সাহিত্য একদল অপরিণামদর্শী যুবকের অবিমৃষ্যকারিতা। কিছুই হচ্ছে না। ক্রুদ্ধ-ক্ষুধার্ত-নৈরাজ্য ইতি সাম্প্রতিক সাহিত্য।

অনেক অভিযোগের উত্তর আছেই আবার অনেক অভিযোগকে তর্কের খাতিরে হয়তো স্বীকার করেও নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু 'কিছুই হচ্ছে না'

এ কথা এখন বাতুলেও স্বীকার করে না। তবু এ ধরনের কথা বলা হয়েছে—বলা হচ্ছে। একটা সময় গেছে যখন এই তরুণ সাহিত্য আন্দোলনকে স্রেফ চেপে দেবার চেষ্টা হয়েছে। সমালোচকরা যেমন এ সব লেখা সম্পর্কে টু টা রা' করেন নি, তেমনি এস্টাব্লিশমেণ্ট নিজেদের মুনাফা বাঁচাতে গিয়ে সাহিত্য ক্ষেত্রে স্বাভাবিক যে আন্দোলন গড়ে উঠেছে তাকে সচেতন ভাবে নস্যাৎ করে দেবার চেষ্টা করেছে, এর ওপর প্রচুর নিন্দাবাদ বর্ষণ করেছে এবং তরুণ লেখকদের 'দোল সংখ্যায়' ছাপার কালিতে লাঞ্ছিত করেছে। কিন্তু কিছুতেই যখন আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করতে পারে নি, তখন অন্যতর কৌশল গ্রহণ করেছে। এস্টাব্লিশমেণ্ট যখনই দেখেছে, এই সাহিত্য আন্দোলনের মধ্যে থেকে সত্যিকারের ক্ষমতাসম্পন্ন কিছু কবি ও গল্পকার আত্মপ্রকাশ করেছেন, তখনই আন্দোলন ভেঙে দেবার জন্যে সেই সব লেখকদের কিনে নেবার চেষ্টা করেছে। একদিকে এ যেমন তার সক্রিয় বিরোধিতা, অন্যদিকে পরোক্ষ ভাবেও তরুণ সাহিত্য আন্দোলনের পিঠে ছুরি বসাতে কোন দিক থেকেই কসুর করে নি সে। প্রত্যেক সজাগ পাঠকের চোখে ধরা পড়েছে যে, কয়েক বছর ধরেই নাম ডাকওয়ালা কবি সাহিত্যিকদের অবক্ষয়িত, ক্লেদাক্ত ও বিকৃত যৌনজীবন-সর্বস্ব উৎকট সিরিজের ঘৃণ্য গল্পপদ্যকে সালঙ্কারে উপস্থাপিত করার পাশা-পাশি তরুণদের রচনাও এস্টাব্লিশমেণ্টের কাগজে প্রকাশ করা হচ্ছে। এ প্রকাশের মধ্যে দোষের কিছু নেই বলে মনে হতে পারে। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই সব রচনা এমন কায়দায় উপস্থিত করা হয়েছে যে, তার মধ্যে থেকে তরুণ কবি সাহিত্যিকের রচনার অকিঞ্চিৎকরতা প্রমাণের প্রয়াস স্পষ্টতই ধরা পড়ে যায়। এটা আর কিছুই নয়—আন্দোলনকারী সাহিত্যিকদের দলপতি বলে মনে করা কবি বা গল্পকারকে একটু খাতির করে তার মুখ বন্ধ করে দেবার চেষ্টা যেমন এর মধ্যে থেকেছে, তেমনি থেকেছে 'ছেপে তো দেখলাম, কিন্তু কী লিখেছে' এমনি একটা মনোভাব। যার ফলে 'প্রচারপিয়াসী অর্থলিপ্সু' অনেক ক্ষমতাবান কবি গল্পকারকে বেনিয়াদের অক্টোপাস শক্তি শুধু যে মর্জিমাফিক চালিয়েছে তাই নয়, তাদের দিয়ে 'ক্রীড়া জগতের' 'সাধারণ জ্ঞানের' ও 'সিনেমা জগতের' ফিচার লিখিয়ে সাহিত্যিক ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত শুষে নিয়েছে। নেতা বিগড়ে যাবার ফলে সাহিত্য অন্দোলন কখনো সাময়িক ভাবে মার খেয়েছে ঠিকই কিন্তু পরক্ষণেই তা অন্য শক্ত হাতের মদৎ পেয়েছে। এস্টাব্লিশমেণ্টের কর্তারা বইপাড়ার বড় রাস্তায় 'নীললোহিত' 'রূপচাঁদ পক্ষী'র খেয়োখেয়ির তামাসা

দেখতে দেখতেই কব্জা করতে-না-পারা ক্রুদ্ধ ক্ষুধার্ত সাহিত্যধারার পাশে নষ্ট এবং ভেজাল খাদ্য কাঁচের আড়ালে দাঁড় করিয়ে এটা-সেটা পুরস্কারবিজয়ী লেখকদের দিয়ে নিজেদের ইচ্ছামত সাক্ষীর বুলি কইয়ে নিয়েছে। একদা সত্যিকারের সাহিত্যের জন্যে প্রাণপাত করা যুবকও এস্টাব্লিশমেণ্টের নির্দেশে কোন কোন বয়স্ক লেখকের অপদার্থ রচনার পক্ষে জনসভা করে বেরিয়েছেন।

এস্টাব্লিশমেণ্ট না হয় অর্থসর্বস্ব চিন্তার জন্যেই তরুণ সাহিত্য আন্দোলনের পক্ষপাতী নয়! কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে নামী এবং প্রতিষ্ঠিত কবি লেখকরা কেন একবার তেড়ে বিরোধিতা করে আবার ঘাড় গুঁজে তরুণ সম্প্রদায়ের সেই সব রচনার সূত্রগুলোকে 'পাঠসংকলনের অর্থ পুস্তক' করতে বেসামাল হয়ে পড়লেন? উত্তর খুবই সহজ। নাক সিঁটকে এবং উপহাস করে যখন তাঁরা দেখছেন 'ঝাঁপি দিয়ে ঢাকলাম—কড়ি দিয়ে কিনলাম' করে যুগের স্রোতকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না, তাঁদের স্বার্থবুদ্ধি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। আর যতই তরুণ সাহিত্যিকদের রচনার তীব্রতা অনুভব করেছেন, ততই নিজেদের ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে তরুণদের ওপর এক হাত টেক্কা নেবার ঝোঁকে নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি শক্তি ও সহায় এ সমস্ত কিছু প্রয়োগ করে বোঝাতে চেয়েছেন যে, এ সময়ের কথাও তাঁরাই তরুণদের থেকে ভালো করে এবং সাহসের সঙ্গে বলতে পারেন। ফলে, কোথাও তা হয়ে পড়েছে পানসে গল্পোর অতিকায় দস্তাবেজ, কোথাও সস্তা দার্শনিকতায় হাস্যকর, কোথাও বা জোলো সমাজ সমালোচনায় কদর্য। তাঁদের এ অপপ্রয়াস যেমন হয়ে উঠেছে অশ্লীল, তেমনি চূড়ান্ত ভাবে তাঁদের নিজেদেরই ব্যর্থতার সাক্ষী।

আপাতদৃষ্টিতে তরুণ সাহিত্যের মধ্যে যে সব বস্তুর দিশা মেলে সে সব মাল মশলাই হয়তো এস্টাব্লিশমেণ্ট কথিত 'ল্যাণ্ডমার্ক'গুলোর মধ্যে দেখা যেতে পারে। ঐ সব গ্রন্থের লেখকরা যা বলেন, তার সবই হয়তো পাঠকের কাছে সমাজের একালীন স্বরূপ বলেও মনে হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু তরুণ সাহিত্যের পাশে রেখে পড়লেই ও সবের অসারতা এবং ফাঁকিবাজি ধরা পড়ে যায়। সচেতন পাঠক লেখকের সত্যকার প্রেরণার অভাবটি দেখেই তাঁর রচনা অশ্লীল বলে সাব্যস্ত করে। পড়তে গিয়ে তার গা ঘিনঘিন করে ওঠে। স্পষ্টতঃ মনে হয়, এ সব রচনায় লেখক ডেলিবারেটলি অশ্লীলতা আমদানি করেছেন। কিন্তু তরুণ সাহিত্যিক-কবিদের রচনাগুলোকে মনে হয় পাঠকের নিজেরই অন্তর-বাহিরের দুর্মর চেতনার স্রোত। এখানে কোন কিছুই

পরিত্যাজ্য নয়, বাড়তি নয় ; বাড়াবাড়ি মনে হলে ভুল হবে।

বিষয়টা বিশ্লেষণযোগ্য। তরুণ কবি সাহিত্যিকরা নিজেদের বিশিষ্ট সাহিত্যদৃষ্টিটি আবিষ্কারের জন্যে যখন কোন আন্দোলন গড়ে তোলেন, তার মধ্যে কিছুটা যৌবনোচিত বাড়াবাড়ি থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু সে যৌবনোচ্ছ্বাস এমন একটা সৃষ্টি প্রেরণার তাগিদের থেকে ঘটে যায় যে, শেষ অব্দি তা থেকেই লেখকের বিশিষ্ট জগৎ ও জীবনজিজ্ঞাসা এবং সাহিত্য দৃষ্টি আত্মপ্রকাশ করে। এ ক্ষেত্রে তিনি যদি প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যরুচি ও আদর্শকে চূড়ান্ত ভাবে আঘাতও না করেন, তার মধ্যে কোন ব্যবসায়ী স্বার্থ কাজ করে না। এক্ষেত্রে যেটা কাজ করে, তা হচ্ছে, নিজেকে পুড়িয়ে খাঁটি সোনার মতো বাস্তব অভিজ্ঞতার নির্যাস বের করে আনার—সত্যকে উদঘাটিত করার তাগিদ। তিনি যেমন ডেলিবারেটলি কদর্য কিছু উপস্থিত করেন না, তেমনি হৃদয় না পেলে 'লিঙ্গ প্রহার করে'[১] ; হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছানো যায় কিনা দেখতেও দ্বিধা করেন না। নগ্ন সত্যকে জামা কাপড় পরিয়ে উপস্থিত করে কিম্বা পাঠকের যৌন চেতনায় সুড়সুড়ি দিয়ে অধিক অর্থ ফলানোর সমস্যা নয়. তাঁর সমস্যা নতুন সৃষ্টির সমস্যা, 'বিজনের রক্ত-মাংস'র[২] সমস্যা, 'অভিরামের চলা ফেরা'র[৩] সমস্যা, অস্তিত্বের স্বাধীন উন্মোচনের সমস্যা। তাঁর সেই সমস্যা জেগেছে 'কালবেলায়'[৪] যেখানে তাঁর আত্মা ডানা কাটা 'জটায়ু'[৫]। স্বাভাবিক ভাবেই সমাজসংস্কার ও প্রতিষ্ঠিত ধ্যানধারণার সঙ্গে তাঁর বিরোধ এবং আন্দোলন। এ আন্দোল[illegible] জন্যে কোন বড় কাগজই মুখপত্রের ভূমিকা নেয় না। তাই তাঁর পক্ষে জানা অসম্ভব তাঁর সৃষ্টি বৃহৎ পাঠকসমাজের মধ্যে আদৌ কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে কিনা। অথচ তিনি খুব দৃঢ়তার সঙ্গেই জানেন যে, তাঁর অভিজ্ঞতার সত্য মানুষের মৌলিক সত্তারই একটা দিকের উদ্ধার এবং তারই জন্যে তা পাঠককে ঘা দেবেই। ফলে, সত্য প্রকাশের তাগিদে হয় তাঁকে মুখপত্র প্রকাশ করে নিতে হয় নতুবা বন্ধুবান্ধবের মরিয়া হয়ে চালানো ক্ষুদে এবং অনিয়মিত প্রকাশের সংকলনগুলোর আশ্রয় নিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে, নিয়মিত প্রকাশের গ্যারান্টিহীন এই সব ক্ষুদে পত্রিকা ও সংকলনগুলোর অতি সচেতন পাঠকদের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ায় যাচাই হয়ে যায় তরুণতর লেখক কবিদের অর্জিত অভিজ্ঞতার গভীরতা, সততা ও কার্যকারিতা।

১ শক্তি চট্টোপাধ্যায়, ২ সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, ৩ বাসুদেব দাশগুপ্ত, ৪ নবেন গঙ্গোপাধ্যায়, ৫ দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই ক্ষুদে মুখপত্র অর্থাৎ লিটল ম্যাগাজিনগুলো একদিকে যেমন তরুণ লেখক কবিদের ফতোয়া এবং পরীক্ষানিরীক্ষার ক্ষেত্র—তরুণ চিন্তার সমস্ত রকম ঝক্কি যেমন তারা বহন করে, তেমনি তুলে ধরে একটা সময়ের তাজা ও গতিশীল সাহিত্য। প্রগতির চিহ্ন এখানেই। বাংলা দেশেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। এমনি হাজারো মুখপত্র সংকলনে তরুণ লেখক কবিরা নিজেদের অস্তিত্ব ঠিকরে তুলে উপস্থিত করেছেন স্বকীয় আবিষ্কারের ভাষাময় স্বরূপ। এর মধ্যে কোথাও স্বেচ্ছাকৃত নৈরাজ্য ও কদর্য অশ্লীলতা সৃষ্টির স্বাক্ষর নেই। কিন্তু বয়স্ক লেখক কবিদের পাঠক পাওয়া, কাগজ পাওয়া বা অর্থখ্যাতি পাওয়া কোনোটারই সমস্যা না থাকায় নিজেদের অন্তঃসারশূন্য লেখাগুলো নিয়ে সদম্ভে বাজার মাৎ করছেন এবং তারই জন্যে আসলের মূল্য দাবী করছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট বক্তব্য এই যে, ও সব ভুষিমালকে সাহিত্যের মর্যাদা দিয়ে বাংলা সাহিত্যকে জগতের সামনে খাটো করে দেখানোর যৌক্তিকতা আছে কি? কী বস্তুসত্যে, কী রূপকর্মে আর কীই বা কমিউ-নিকেশনের নতুন ভাষা উদ্ভাবনে বাংলা সাহিত্য অতি সাম্প্রতিক কালে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মূর্ত্তি ধারণ করেছে এবং তা এই বুদ্ধিপ্রখর, যুগঅভিজ্ঞতার ধারক ও তীক্ষ্ণ অনুভূতিপ্রবণ তরুণদের হাতেই। তবে সাম্প্রতিক কবি সাহিত্যিকদের বিচ্ছিন্নভাবে বিচারে হয়তো মাত্র কোনো এক জনের রচনাকেই যুগের প্রতিনিধিস্থানীয় সাহিত্য বলা যায় না। কেননা, এটা প্রায় সব সাহিত্যিক কবির নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যগুলো গড়ে তোলার সময়—রচনাভঙ্গি ও জীবনদৃষ্টির বিশিষ্টতা আবিষ্কারের কাল। তাই বিচ্ছিন্নভাবে কোন কবি বা গদ্যকারের সম্পর্কে আলোচনা না করে সমষ্টির সাহিত্য পরিচয় দেওয়াই সঙ্গত। এবং এই অতি সাম্প্রতিক সাহিত্যকে 'যৌথ সাহিত্য' নামে অভিহিত করা বাঞ্ছনীয়।

আগেই বলা হয়েছে, এ 'যৌথ সাহিত্যের' বয়স বিশ বছর। সমগ্র বিশ বছরের স্থানকালপাত্র র চিত্রচরিত্র ও মানস মেধার পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত করে না দেখলে এর যথার্থ উপলব্ধি অসম্ভব। কাল পরিধিকে সংক্ষিপ্ত ও সীমিত করে নিয়ে খণ্ড খণ্ড করে বিচার করার চেষ্টা করলে অনিবার্য ভাবেই এই নতুন সাহিত্যকে ঐতিহ্যছিন্ন উটকো মনে করার বিপদ থেকে যায়। বিশ বছরের সাহিত্য বটে, কিন্তু মনে রাখতে হবে সাম্প্রতিক সাহিত্যটা আদৌ উটকো বা ইতিহাস বিচ্ছিন্ন নয়। এ সাহিত্যসৃষ্টি পূর্বসূরী কবি সাহিত্যিকদের স্মৃতিসংস্কারের দুর্বলতাগুলোকে ধ্বংস করে তার যা কিছু ভালো তা গ্রহণ

করে যে নতুন সৃষ্টি তাকেও আবার ধ্বংস করে স্বকীয় অভিজ্ঞতায় প্রোজ্জ্বল এবং জীবন্ত কথামালা রচনার আন্দোলনজাত রক্ত-স্বাক্ষর। যুগপরিবেশ এই সময়ের তরুণদের বিপন্ন একা করে দিলেও, মানসিকতায় পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের দুরতিক্রম্য বিরোধ থাকা সত্ত্বেও জীবন জগত ও সাহিত্যের বিশিষ্ট দর্শন উপলব্ধির জন্যে এই সব অতি তরুণ লেখক কবিরা গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে খানিকটা দিশাহারা উন্মত্ততায় অযাত্রার কণ্টকাকীর্ণ পথে ছুটেই বলিষ্ঠ কালির দাগে রচনা করেছেন সমবেত বিদ্রোহের ভাষা। প্রচলিত নিয়ম ও ভাষাদর্শের বিরুদ্ধে তাঁদের জেহাদ, প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার ভণ্ডামির বিরুদ্ধে নিরবছিন্ন ভাবে ক্রুদ্ধ আক্রমণ চালিয়ে মানুষের আদত পরিচয়টিকে সাহিত্যে উপস্থিত করতে চেয়েছেন এই সব তরুণ কবি সাহিত্যিকরা। এ সাহিত্যের নায়ক তাঁরা নিজেরাই—নিজেরা, কেননা, নিজেরাই বাস্তব ক্ষেত্রে সভ্যতার মার খেয়ে রক্তাক্ত। জন্মকে এঁদের মনে হয়েছে এক জেল থেকে অন্য জেলে স্থানান্তরীকরণ মাত্র এবং তাঁরা এখানে কেবল 'ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী', অত্যাচারিত, অবহেলিত এবং চলমান সভ্যতার চাকায় নিষ্পেষিত। তাই তাঁদের সাহিত্যও হয়ে উঠেছে বিষণ্ণ আর রক্তমাংসের জীবন চিবিয়ে যেটুকু নিখাদ অভিজ্ঞতা এবং হৃদয় যন্ত্রণার অনুভূতি, তারই সত্য উন্মোচন। এ সাহিত্য ব্যক্তি-অস্তিত্বকে বিশ্ব-অস্তিত্বের মধ্যে উপলব্ধি করার শিল্পসংগ্রামের ফলশ্রুতি।

কিন্তু এই সত্য স্বরূপকে উপলব্ধি না করে একদিকে এস্টাব্লিশমেন্ট ও তার অর্থপুষ্ট জেঁকে বসা লেখকগোষ্ঠী যেমন তরুণ সাহিত্যকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করেছে, তেমনি প্রগতিশীল মহলও—বিশেষ করে 'বিপ্লবী শ্লোগানকে' জীবনবাদী রচনা বিচারের মানদণ্ড ধরে অপ্রস্তুত পরিবেশে বিপ্লবের আতসবাজি পোড়াতে নেমেছেন যে সব হাল আমলের তথাকথিত কমিউনিস্ট ইন্টেলেকচুয়াল তাঁরা—অন্য সব সাহিত্য শিল্পের সঙ্গে কেবল-অঙ্কুরিত এই সাহিত্য চেতনাকে অপরিণামদর্শী যুবকদের দুর্বুদ্ধি বলে উপেক্ষা করেছে। সাহিত্য-সমালোচকরাও প্রথম দিকে বিস্ময়কর ভাবে নীরব থেকে অতি সাম্প্রতিক এই 'যৌথ সাহিত্য' প্রচেষ্টাকে যেমন অস্বীকার করেছেন, তেমনি ইদানীং তাকে 'না ঘরকা না ঘাটকা রাগী ছোকরাদের পত্রপুষ্পহীন কাণ্ড-মোটা আগাছা' হিসেবে প্রমাণের জন্যে 'দশক'এর সাহিত্য শিরোনামায় ছিটে ফোঁটা প্রবন্ধ ফেঁদেছেন। কিন্তু, যাঁরা একটু মনোযোগ দিয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে এই বিশবছরের সাহিত্যকে যুক্ত করে দেখবার চেষ্টা করছেন, তাঁরা

এর শক্তিভিত্তিকে অস্বীকার করার কথা ভাবতে পারেন না। বস্তুতই, স্বাধীনতা পরবর্তীকালের এই 'যৌথ সাহিত্য'র মধ্যে তরুণ সাহিত্যিকদের এমন একটা বলিষ্ঠ মানসিকতা ধরা পড়েছে যে, তা সাম্প্রতিক বিশ্বের নামজাদা সাহিত্যস্রষ্টাদের সঙ্গে তুলনীয়। এ সময়ের সাহিত্যে এমন কিছু মৌলিক বোধ এবং কমিউনিকেশনের এমন একটা ভাষাভঙ্গিমা ও কলারীতির আবিষ্কার দেখা গেছে, যা আগে কখনো দেখা যায় নি। তবে, দশক এর মাপকাঠিতে কোন 'একক' কবি সাহিত্যিকের সমগ্র সাহিত্যস্বরূপ ও তাৎপর্য উপলব্ধির চেষ্টা ব্যর্থতারই নামান্তর হবে।

আমরা দেখেছি যে, সাম্প্রতিক সাহিত্যটা কোন রকম উটকো ব্যাপার নয়—এর পেছনে একটা দ্বন্দ্বমূলক ঐতিহাসিক স্রোত বর্তমান। তাই সুবিধার খাতিরেও আমি সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রে 'দশক' গণনা করতে অনিচ্ছুক। নানা দিক থেকেই এ পদ্ধতি যেমন অবৈজ্ঞানিক তেমনি অসঙ্গত সরলীকরণ। প্রথমতঃ, কোন লেখকই একটা মাত্র 'দশক'এর কালসীমায় আবদ্ধ নন। কোন একটা বিশেষ সময়ে তাঁর রচনার বিশেষ গুণগুলো প্রকাশ পেলেও, তা পূর্বপূর্ব সময়খণ্ডগুলো থেকে অর্জিত এবং পরবর্তী সময়খণ্ডগুলোতে ব্যাপ্ত। এ ক্ষেত্রে যাঁর কাব্যসাহিত্যে বারবার ঋতু এবং রীতি বদল ঘটেছে, সেই মহান কবি ও সাহিত্য স্রষ্টার বিভিন্ন পর্বের সৃষ্টি থেকেই নজির তুলে দেখানো যায় যে, শিল্পী জীবনের প্রারম্ভিক পর্বে অর্জিত গুণগুলোই কখনো সুপ্ত কখনো প্রকাশ্য ভাবে বিভিন্ন পাত্রে বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। প্রাজ্ঞ দার্শনিক কবি বিষ্ণু দে'র অতীত ও বর্তমানের উষর জমিতে অনায়াস বিচরণ ১৯৬৭-৬৮র কবিতাতেও বর্তমান। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জনপদাবলীর অনুষ্টুপ ছন্দে ও মুখের কথার ঝরঝরে ভাষায় চিত্রকল্প রচনার বৈশিষ্ট্যটি 'পদাতিক'-এ যেমন ছিল 'কাল মধুমাস'এও তেমনি অনিবার্য ভাবে উপস্থিত। আর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষয়িষ্ণু জমিদারতন্ত্রচিত্রন যেমন পরবর্তী কালে ক্ষয়িষ্ণু খৃষ্টান সমাজচিত্রনে রূপান্তর লাভ করেছে, তেমনিই সমরেশ বসুর 'ত্রিধারা' ও অন্যান্য উপন্যাসের এ্যাডভেঞ্চারিষ্ট নায়কটি শারদীয়া পত্রিকাগুলোয় উপস্থাপিত সুখদ উপন্যাস সমূহের উত্তমপুরুষটি হয়ে দেখা দিয়েছে মাত্র। দ্বিতীয়তঃ, 'দশক'ওয়ারী সাহিত্য বিচারের নামে একটা সুবিধাবাদী সরল নীতি নিলে লেখকের ওপর বেশ কিছু অবিচারের আশঙ্কাও থেকে যায়। প্রায় ক্ষেত্রেই লেখক সম্পর্কে সঠিক আলোচনাটা উহ্য থাকে।

তা ছাড়া, স্থানকালপাত্র-র সঙ্গে বিচারে লেখকের শিল্পচেতনা, সৌন্দর্য সাধনা এবং ব্যক্তিত্বও যে অঙ্গাঙ্গী ভাবে যুক্ত একথাটা ভুলে গিয়ে তাঁর সৃষ্টিকে—বিশ্বের প্রতি তাঁর দর্শনভঙ্গিকে খণ্ডিত করে দেখবার প্রবণতাই সমালোচকের মধ্যে প্রকট হয়ে পড়ে।

সাহিত্যালোচনায় তাই 'সময়-খণ্ড' নয়, 'সময় সমগ্র'কেই প্রথমে তুলে ধরা বাঞ্ছনীয়। দেখতে হবে, আধুনিকতার বিশেষ লক্ষণগুলো কোন্ পরিস্থিতিতে সাহিত্যে প্রকটিত হয়েছে। এখানে বলা খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, বিংশ-শতাব্দী অঙ্ক গুণে-গুণে চললেও, এ সময়ে মানুষের মানস মেধার জগৎ দ্রুত এবং অতিদ্রুত উড়ন্ত ঘোড়ার মতো দাপিয়ে ঝাপিয়ে 'জ্যামিতিক গুনোত্তর' বেগে এগিয়ে চলেছে, বাঁক ফিরেছে এবং যেতে যেতে কোনো 'মায়া'-র অপেক্ষা না রেখেই ফেলে যাচ্ছে তার কীর্তি—তার সাহিত্য। এই সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে থেকেই প্রতিদিন প্রকাশ পাচ্ছে স্থানকালপাত্র-র বিশেষ বিশেষ চারিত্র-বৈশিষ্ট্য, নতুন নতুন সামাজিক ও আত্মিক সমস্যা; ধরা পড়ছে বিজ্ঞানের অকল্পনীয় আবিষ্কারের সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের প্রায় অপ্রতিরোধ্য মানস সংঘাত। জানা না জানার সীমা যত ধ্বসে পড়ছে, মানুষের অন্য কোন অবলম্বন বা আঁকড়ে ধরার মতো কিছু না থাকার জন্যে অসহায়ত্বও তত বেড়ে যাচ্ছে। সমষ্টিগতভাবে বিশ্বমানবের বিজয় বৈজয়ন্তী, কিন্তু ব্যক্তি মানুষ চূড়ান্ত অসহায়। শামুকের মতো নিজের খোল থেকে বেরিয়ে সে যখন আকাশের ওপরে আকাশ দেখছে—দেখছে মহাকাশও ক্রমশ একস্প্যাণ্ড করছে, গ্রহ-নক্ষত্র লাল আলো পেছনে ঠেলে ঠেলে কেঁপে কেঁপে অন্য মহাকাশে উধাও হচ্ছে, তখন এই পৃথিবীর অজস্র সংকীর্ণতা, অন্ধ সংস্কার, যুদ্ধ আর স্বার্থে স্বার্থে হানাহানি দেখে নিজের আন্তর বিবরে প্রবেশ করেও সে স্বস্তি পাচ্ছে না। সমস্ত কিছুর সঙ্গে তার বিরোধ—এমনকি বিরোধ প্রতিমুহূর্তের ব্যবধানে নিজের সঙ্গেও। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অকল্পনীয় দান আর সভ্যতার আব্রুহীন পৈশাচিকতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিশ্বের তরুণ বিবেক ক্ষতবিক্ষত—রক্তাক্ত। সমস্ত কিছু ভেঙেচুরে নতুন বাসযোগ্য পৃথিবী গঠনের দুরন্ত কামনা বিংশ শতকের মধ্যঅঙ্কে তাকে বিদ্রোহী করেছে যেমন, তেমনি নিজের সে বিদ্রোহের সার্থকতাহীনতার বোধ তাকে হতাশ করেছে; ব্যর্থতামগ্নতা তাকে আত্মহত্যায় উৎসাহী করেছে। স্বাভাবিক ভাবেই তাই লেখালেখির মধ্যে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ বিতর্কে ক্ষয়-অবক্ষয়যুক্ত বাস্তব জগতের পরিচয়সহ দুর্নিবার মননশীলতায় ও তীক্ষ্ণ সমা-

লোচনায় ব্যক্তিমানুষের চেতন, অর্ধচেতন ও অবচেতনার অখণ্ড অভিব্যক্তি স্রোত কখনো ক্রুদ্ধভাবে, কখনো নিরক্ত আবেগে নিস্পৃহ ভঙ্গিতে কখনো বা কুয়াশাক্রান্ত ক্লান্তিতে ব্যক্ত হয়েছে। এ্যাংরী, হাংরী, বিট ইত্যাদি যে জেনা-রেশনের বলেই আখ্যা দেওয়া হোক না কেন, জীবন চিবিয়েএ সময়ের সাহিত্যিক কবিরা যে অভিজ্ঞতা ও আন্তরযন্ত্রণা সাহিত্যে উপস্থিত করেছেন, তার মধ্যেই ধরা পড়েছে বর্তমান সময়ের মৌল প্রকৃতিটি। এর মধ্যেই মূর্ত হয়ে উঠেছে সর্ববিশ্বাসহারা ব্যক্তিমানুষটির আন্তরদ্বন্দ্ব-জর্জর ট্র্যাজিক অস্তিত্ব ও হাহাকার। অনিবার্য ভাবে বাংলাদেশের সাহিত্যেও উপস্থিত হয়েছে সেই 'ক্ষ্যাপা' মানুষটি যে 'এই ক্ষণটুকু হোক সেই চিরকাল'কে মূল মন্ত্র করে ধর্ষণে খুনে আত্মহত্যায় 'বেঁচে যে আছে' শুধু এইটুকু বুঝতেই ক্রিয়াশীল।

নিখুঁত ভাবে কার্যকারণ স্যূত্রে যাঁরা বিশ্বঘটনা প্রবাহকে লক্ষ্য করেছেন, তাঁরাই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন যে, সাম্প্রতিক সময় এবং পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্ব বজায় রাখার সংগ্রাম চূড়ান্ত আকার ধারণ করেছে। চারদিকে প্রত্যক্ষ দুঃস্বপ্ন। যার ফলে বাস্তব জীবনে উপরিতল মূল্য অর্থাৎ 'ফেস ভ্যালু' অন্তরঙ্গতল মূল্য অর্থাৎ 'ইনট্রেন্‌জিক ভ্যালু'র চেয়ে অধিকতর মর্যাদা ও স্বীকৃতি পাচ্ছে। এই উপরিতল মূল্যবোধই জীবনে নেশার যোগান দিতে না পেরে ব্যক্তি মানুষকে চূড়ান্ত অতৃপ্ত করেছে এবং সমস্তক্ষণ সোনার হরিণের পিছনে ছুটিয়ে তার জীবনময় একটা জ্বালা ও অবসাদ রুয়ে দিয়ে তার গোটা অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলেছে। আর এই স্যূত্রেই এসেছে এ্যালকহল বা নিজেকে ধর্ষণের নেশা। ভাঙন, পতন, অবিশ্বাস, অভাব, হত্যা ও আত্মহত্যার বারবেলায় যাত্রা করে অন্ধকারে নিজের চেতনা ও অনুভূতিকেই নিষ্ঠুর ভাবে বলাৎকার করছে এ অঙ্কের মানুষ। তার আনন্দ কেন্দ্রিত হয়েছে যৌনে। আনুগত্য কারো বা ঈশ্বরে। আর এই চেহারাকেই তরুণ সাহিত্যিক কবিসমাজ বিনা দ্বিধায় কোন রকম সুগার কোটিং না দিয়েই পরি-বেশন করেছেন নিজ নিজ রচনার মধ্যে। এঁরা জীবন সংগ্রামকে সাহিত্য সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করে শতাব্দী সভ্যতার মারের মুখে দাঁড়িয়ে সংঘবদ্ধ হতে চেয়েছেন, আমূল বিনষ্টির হাত থেকে রক্ষা পেতে চেয়েছেন আর নেতিনেতি করতে করতেও ইতিবাচক জীবন বোধের অতিবিস্তারিত ভূমি প্রস্তুত করেছেন।

এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, এই বিশ বছরের 'যৌথ সাহিত্য'

পরিবেশ সচেতন, যুক্তি প্রখর, তীক্ষ্ণ অনুভূতিপ্রবণ যুগ তারুণ্যের সাহিত্যই শুধু নয়, এ সাম্প্রতিক সময়ের মহাভারত। এর যেমন একটা দার্শনিক ভিত্তি আছে, আছে ঐতিহাসিক উপাদান, জাতীয় চরিত্রচিত্রর সমগ্র স্বরূপ, তেমনি তাকে সমগ্রতা দেবার সক্রিয় বীরপনাও পরিশীলিত হাতের স্বাক্ষর বহন করেছে। তবে এ সময়ে যাঁরা লিখছেন, তাঁরা সবাই সমান কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন না। বলা বাহুল্য, অনেকেই এখানে সেতুবন্ধের কাঠবিড়ালীর ভূমিকা নিয়েছেন। কিন্তু এ সাহিত্যের যা ধাঁচ তাতে তাঁদের সেই সামান্য ভূমিকাটিকেও অস্বীকার করার উপায় নেই। অস্বীকার করেওনা কেউ। এঁদের যৌথ ভূমিকার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে রেখেও কোন কবি বা গল্পকারকেই উপেক্ষা করার কথা চিন্তা করা যায় না। তবে কোন একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এ যৌথ সাহিত্যের কোন একজন লেখক বা কবিকে সমানদের মধ্যে প্রধান বা প্রাইমা ইন্টার প্যারিস বলা যেতে পারে। এবং তাঁদের সম্পর্কে একটু দীর্ঘ আলোচনাও হতে পারে। কিন্তু কাউকেই একচ্ছত্র কবি বা সার্বভৌম সাহিত্যিক বলা যাবে না। কেননা কেউই তা নন। তবে বছরে আটদশখানা উপন্যাস, একগাদা কবিতা, কয়েক ডজন গল্প প্রবন্ধ ও গাদাগাদা ফিচার লিখিয়ে কমপিউটার প্রতিভার কথা আলাদা।

ইদানীং এই সমষ্টির হাতে গড়া যৌথ সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করার জন্যে কিছু কিছু সমালোচক উৎসাহী হয়েছেন। এঁদের প্রায় সকলেই নিজেরা গল্পকার বা কবি। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, তাঁদের নিজেদের রচনা সম্পর্কেও কোন সুস্থ ধারণা আছে বলে সে সব আলোচনা পড়ে মনে হয় না। তাঁদের ধারণায় আসেনি যে তাঁদের নিজেদের রচনাসহ যে যৌথ সাহিত্য বিশ বছরে দেখা দিয়েছে তা উপরে কথিত এ শতাব্দী-সভ্যতার দ্রুত পটপরিবর্তনের ফল এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত। তাঁরা যদি গভীর মনোযোগের সঙ্গে স্থানকালপাত্র বিচার করে এ সময়ের বিশ্বপটভূমিকে অনুধাবন করতেন, তবে দেখতে পেতেন এ সাহিত্যের পেছনে তা একটা মহা-কাব্যের পটভূমি রূপেই উপস্থিত। প্রাচীন রোমীয় এবং ভারতবর্ষীয় মহা-কাব্যের জগতে ব্যক্তির কতটুকুই বা উত্থান পতন আলোড়ন ছিলো—কতটুকুই বা আবিষ্কার ও সর্বগ্রাসী যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ছিলো ইলিয়াড অডেসী বা রামায়ণ মহাভারতের কবিদের? কল্পনার কতটুকু সূত্রই বা জনমানস থেকে সেই সব মহাকবিরা পেয়েছিলেন? আজকের দিনে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, বায়োলজিকাল

সায়েন্স এবং বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার নিত্য আবিষ্কৃত সত্য, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ড মুহূর্তে মুহূর্তে পার্থিব জীবনের প্রতিষ্ঠিত চিন্তাধারাকে সমূলে উৎপাটিত করে কল্পনার ক্ষেত্রকে যেমন কল্পনাতীত ভাবে প্রসারিত করে দিচ্ছে, তেমনি দু দুটো বিশ্বযুদ্ধের বিধ্বংসী পাণ্ডুলিপি বুকে করে ভয়ে শাদা হয়ে যাওয়া মানুষের সত্তাকে অথর্ব করে দিচ্ছে মারাত্মক সব মারণাস্ত্রে সজ্জিত ক্রণিক স্নায়ুযুদ্ধ এবং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা। এই নিদারুণ অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই প্রাচীন মহাকবিদের চেতনায় দাগ কাটে নি। কিন্তু এসময়ে আণবিক বোমা এবং তার জীবভ্রূণ তথা পৃথিবীর প্রাণাঙ্কুর মাত্রকেই নিশ্চিহ্ন করে দেবার শক্তিকে মুঠো ভরে নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধদানবদের যে হুঙ্কার, তাতে শিল্পী আত্মা বর্তমান এবং আগামী মানুষের হয়ে বলে উঠেছে 'না, সাম্রাজ্যবাদী ঘাতকরা কখনোই যেন প্রতিষ্ঠা পায় না'। এবং এই বোধ-এই সর্বমানবিক কল্যান বোধ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উৎসর্গ'।

'উৎসর্গ' হয়েছে। তবে তাকে প্রাচীন আলঙ্কারিকদের সংজ্ঞানুসারে মহাকাব্য বলা যাবে না। কিন্তু আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়েই যে আজ বাংলাদেশের তরুণ লেখক দুঃসাহসিক রচনার প্রয়াস পেয়েছেন তাকে ছোট করে দেখা সম্ভব নয়। তবে, বর্তমান মহাকাব্যিক কাল-লক্ষণকে সম্পূর্ণ আত্মস্থ করে তরুণদের কেউ যে জাত মহাকাব্য রচনা করতে পারেন নি তাতে কোনো সন্দেহ নেই এবং তা তাঁদের কাছে দাবী করাও বৃথা। আর শুধু বাংলা দেশ কেন, বিশ্বের কোথাও এই সাম্প্রতিক কালে এমন কিছু রচিত হয়েছে বলে জানা নেই। দুরন্ত প্রতিভা থাকলেও সময়ের ও পরিবেশের ভয়ঙ্কর অস্থিরতা কোনো বোধকেই থিতোতে দেয় নি কবি সাহিত্যিকদের চেতনায়। একদিকে সামগ্রিক এই অস্থিরতা যেমন চকিত উদ্দীপনা দিয়েছে, তেমনি ভাঙা মূল্যবোধ দিয়েছে সীমাহীন অবসাদ ও সব কিছুর প্রতি অনীহা। তারই জন্যে সম্ভবতঃ একদল সমসাময়িক সমালোচকের কাছে এঁদের চকিত প্রবেশকে অতর্কিত আক্রমণ বলে মনে হয়ে থাকবে। দশ বছরের মধ্যে এঁদেরকে অনিয়ন্ত্রিত ভাষা ভঙ্গিমা ও তার বিদ্রোহী এ্যাটিচিউড দেখিয়ে অলক্ষ্যে বেপাত্তা হয়ে যেতে দেখে তাঁদের মনে হয়ে থাকবে যে সবই বিশৃঙ্খলা এবং ফুরিয়ে যাওয়া তুবড়ির ফেটে পড়ার আর্তনাদ। আবার কোনো কোনো সমালোচক অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ক্রুদ্ধ দশকের সাহিত্যের পরিচয় নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সত্যের ধার দিয়েও যান নি।

অন্যদিকে লিটল ম্যাগাজিনগুলোতে বিভিন্ন সাহিত্যাদর্শগত গোষ্ঠির সমালোচকরা 'পরস্পর চুল ছাঁটাই সমিতি' গড়ে একে অন্যের সাহিত্য কীর্তির পরিচয় তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। ফলে, কেউ চমকে, কেউ ব্যঙ্গে, কেউ ছন্দে, কেউ লিরিকে-পয়ারে, কেউ প্রতীক-চিত্রকল্পে, কেউ আশায়, কেউ হতাশায়, কেউ চাষীমজুরের রুটির আন্দোলনের পোস্টার বাক্যে, কেউ অতিবাস্তবে কেউ অবাস্তবে—স্বপ্নে, ফ্যান্টাসিতে, কেউ ক্লান্তিতে, কেউ অতীত স্মৃতির রোমন্থনে, কেউবা ইজম্-এর প্রয়োজনে প্রচুর ঢাক ও হাঁক দিয়েছেন গোষ্ঠির লেখকের পেছনে। টোটালিটিতে কি দাঁড়িয়েছে তা দেখার প্রয়োজন বোধ করেন নি তাঁরা। তাই সমালোচকদের কাছ থেকে সাধারণ পাঠকরাও একটা বড় রকম 'ফাঁকি'ই পেয়ে এসেছেন। পাঁচ অন্ধ মিলে স্ব-কপোল কল্পিত উপমায় হাতি সম্পর্কিত জ্ঞানের পরিচয় দেবার মতো করে সাহিত্য বুঝিয়েছেন তাঁদের।

মোটকথা হচ্ছে এই যে, অতি আধুনিক সাহিত্য সমালোচনায় সমালোচকদের দৃষ্টি প্রায় সব ক্ষেত্রেই অস্বচ্ছতা এবং সংকীর্ণতার পরিচয় দিয়েছে। কোনো কোনো কবিতার বা গদ্য রচনার ক্ষুদে অংশ নিজের মনোমত দেখলেই তার পেছনে তুমুল সাধুবাদ দিয়ে ফেলেন সমালোচক। সমগ্রকে দেখার মানসিকতা কারুর নেই বললেই চলে। এ কথা অস্বীকার করার নয় যে, একটা শব্দ-প্রতীক ও চিত্রকল্পের ওপর বা সংলাপের একটা বিশেষ প্রয়োগের ওপরই এক একটা যুগলক্ষণ ছাপ রেখে যেতে পারে, কিন্তু মনে রাখতে হবে তা অংশই। বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন শুনতে ভালো লাগলেও ছেঁদো কথা ছাড়া কিছু নয়। বাগাড়ম্বর করে এ সময়ের সাহিত্য সমালোচনামূলক যে সব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তা যেমন হাস্যকর, অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট—তেমন তা প্রায় সব ক্ষেত্রেই একদেশদর্শিতার পরিচায়ক, এমনকি তা অপমানকর ভাবে তরুণ সাহিত্যকে লাঞ্ছিত করার নিদর্শন। অথচ একদা বাংলা সাহিত্যে একটু আধটু নিরপেক্ষ সমালোচনা এবং সমালোচনার বৈজ্ঞানিক পথ উদ্ভাবনের চেষ্টা হয়েছিলো। মোহিতলাল মজুমদার, বুদ্ধদেব বসু, গোপাল হালদার প্রমুখ গুণী সমালোচকরা একদিন এ ব্যাপারে খুবই সক্রিয় ছিলেন। মোহিতলাল মজুমদার পরলোকগত, গোপাল হালদার সম্ভবত খোঁজখবর করে হালফিলের সাহিত্য পড়ে উঠতে পারছেন না বলেই আলোচনা সমালোচনায় নিরস্ত, আর বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও কল্লোল কালের কিছু লেখকের

লেখার রেখাচিত্র দিয়ে সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কবিদের সম্পর্কে আলোচনা সমাপ্ত (?) করে নিজেকেই সম্ভবতঃ তাঁর নিজের কালের এবং উত্তরস্যূরীদের সময়ের শ্রেষ্ঠ কবি ও গল্পকার বলে ঘোষণা (?) দিয়ে এন্তার লিখে যাচ্ছেন—ডাইনে বাঁয়ে কি লেখা হচ্ছে দেখছেন না ; যাদের কৃপা করে দেখছেন তাদের ছিটেফোঁটা আশীর্বাদ দিয়ে 'দেশে' করে খাবার পথ করে দিচ্ছেন। ফলে সমালোচনাটা বস্তুতই হয়ে দাঁড়িয়েছে পক্ষপাতদুষ্ট, তোষামোদ প্রবণ, আত্মসন্তুষ্ট এবং গোঁজামিল দিয়ে প্রকাণ্ড পাণ্ডিত্যকে উপস্থিত করার নামান্তর। ঐ সব প্রবন্ধ সমালোচনার ওকালতিতে কিছু কিছু পানসে কাব্যের কবি কিছুদূর ওঠবার 'মই' এবং রহস্যরোমাঞ্চ ও গোলগাল গল্প উপন্যাসের লেখক তার বইয়ের প্রকাশক পেলেও তা যেমন বিশ বছরের এই যৌথ সাহিত্য সম্পর্কে পাঠকদের কিছুমাত্র ধারণা দিতে পারে নি তেমনি পাঠক সৃষ্টিতেও কোনো রকম সাহায্য করে নি। পরন্তু, সাহিত্য সম্পর্কে তা একটা বিকৃত বিপরীত চিত্রই উপস্থিত করেছে পাঠকদের কাছে। আমি এ গ্রন্থে ঐতিহ্যসূত্রে গ্রথিত গোটা সমাজের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের নির্যাসিত শক্তি ও সাম্প্রতিক মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি এই যৌথ সাহিত্যের একটা সামগ্রিক পরিচয়ই তুলে ধরতে ইচ্ছুক।

বলাবাহুল্য, সাধ্যমত নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে এ সময়ের সব ক্যাম্পের লেখকদের লেখাই এ বইয়ে আলোচিত হবে। বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী, শুদ্ধ শিল্পে বিশ্বাসীদের সাহিত্যের পাশেই সমান গুরুত্ব দিয়ে আলোচিত হবে এ্যাংরি ও হাংরী জেনারেশনের সাহিত্য। সচেতন ভাবে কাউকে বাদ দিয়ে এতকাল সাহিত্য-আলোচনার নামে যে প্রহসন চলেছে এবং উৎকট ভাবে অসার-বস্তুকে সাহিত্য নামে উপস্থিত করার যে চেষ্টা চলেছে, তা থেকে উদ্ধার করে একাল-সাহিত্যের সত্য মূর্তিটি যথার্থ প্রকাশ করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করবো। কাউকেই ফেলে দেবার বা মাথায় তোলার অধিকার আমাদের নেই—এ সত্যই হবে আমার গাইড লাইন।

দেশ কালক্রম : ১

[সাহিত্যে এস্টাব্লিশমেণ্টের ভূমিকা --ফিউডাল এস্টাব্লিশমেণ্টের যুগ—কবি ও কাব্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক - আধুনিক এস্টাব্লিশমেণ্টের উদ্ভব ও ফিউডাল এস্টাব্লিশমেণ্টের সঙ্গে তার পার্থক্য কোলকাতা ও আধুনিক এস্টাব্লিশমেণ্ট— সাহিত্যের ক্রমবিকাশ এস্টাব্লিশমেণ্ট বিরোধী আন্দোলনের ক্রমবিকাশ—আধুনিক সাহিত্য আন্দোলন এবং আধুনিক এস্টাব্লিশমেণ্টের গঠনমূলক কার্যক্রম —স্বাধীনতাপূর্ব সময়ে ধনতান্ত্রিক এস্টাব্লিশমেণ্টের বর্ণচোরা দিক—উত্তর-স্বাধীনতাকালে এস্টাব্লিশমেণ্টের একচেটিয়া পুঁজির কারবারী হিসেবে পরিণতি —সাহিত্যে তার প্রতিক্রিয়াশীল কার্যক্রম তরুণ সাহিত্য আন্দোলনের কণ্ঠরোধের জন্যে ও জনজীবনে বিকৃতি ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্যে এস্টাব্লিশমেণ্টের বেআব্রু কর্মতৎপরতা —নতুন সাহিত্যের দর্পিত প্রতিবাদ।]

লৌকিক সাহিত্যের কথা বাদ দিলেও, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের সম্পর্কে কিছু বলতে গেলেই রাজসভা তথা সামন্ত প্রভুদের বৈঠকখানাগুলো অনিবার্য ভাবেই এসে পড়ে। এই ফিউডাল এস্টাব্লিশমেণ্টগুলোর আলোচনা ছাড়া প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা শুধু অসম্পূর্ণ ই নয়, অর্থহীন। কেননা, সাহিত্য চর্চার পরিবেশ হিসেবে তাদের যেমন গুরুত্ব কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা দেবার জন্যে, তেমনি সাহিত্যের রসরুচি তৈরীর ব্যাপারেও। আধুনিক সাহিত্য যেহেতু অনেকখানিই এস্টাব্লিশমেণ্ট নির্ভর, এখানে তাই এস্টাব্লিশমেণ্টের স্বরূপ ও চারিত্র্য লক্ষণের ক্রমবিকাশের বিশদ একটা পরিচয় নেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তবে মনে রাখতে হবে স্বরূপ ও চারিত্র্য লক্ষণের দিক থেকে ফিউডাল এস্টাব্লিশমেণ্ট ও আধুনিক মুনাফাত্মা এস্টাব্লিশমেণ্টের মধ্যে ফারাক আসমান জমিনের এবং মৌলিক। সাধারণ দৃষ্টিতেই স্পষ্ট হয় যে, কাব্যরসাস্বাদন ছাড়া কবি ও কাব্য সম্পর্কে প্রাচীন সামন্ত পৃষ্ঠপোষকদের উৎসাহের মধ্যে অন্য কোনো ব্যবসায়ী মনোবৃত্তিই কাজ করে নি। যদি কোনো স্বার্থবুদ্ধি এর মধ্যে কাজ করে থাকে,

তবে তা সম্পূর্ণ অবস্তুগত। কবিদের কাছে সামন্ত প্রভু বা রাজার দাবী কেবল এই ছিলো যে কবির পৃষ্ঠপোষকের 'নাম', 'দানধ্যানের কথা' অথবা তিনি যে শুধুই অত্যাচারী শাসক ছিলেন না, 'প্রজারঞ্জক', 'জ্ঞানী', 'গুণী' এবং 'উচ্চাঙ্গের সমঝদার'ও ছিলেন, সে কথাটি যেন কবির কাব্যে বর্ণিত হয়ে তাঁকে অমর করে রাখে। শুধুই অমরত্বের স্বার্থ। এবং প্রাচীন কবিরাও প্রায় কেউই তা থেকে তাঁদের বঞ্চিত করেন নি, বরং একটু অতি উৎসাহের সঙ্গেই নিজ নিজ কাব্যে পৃষ্ঠপোষকদের অতুল কীর্তির কথা প্রচার করেছেন।

এখানে বিনা ব্যাখ্যাতেই লক্ষ্মণ সেনের রাজসভা, কীর্তি সিংহের রাজসভা, হুসেন শাহের রাজদরবার, কৃত্তিবাসের গৌড়েশ্বর গণেশ (?)-এর রাজদরবার, বাঁকুড়া রায়ের রাজসভা, আরাকান সভা, কামরূপের রাজসভা, কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের রাজসভা, ত্রিপুরার রাজসভা এমনি ছোট বড় হিন্দু মুসলমান রাজা বা সামন্ত প্রভুর পৃষ্ঠপোষকতার উল্লেখ কেবল পুরোনো বাংলার বিখ্যাত বিখ্যাত কবিরাই করে যান নি, কবিদের সাহিত্য আলোচনায় সর্বজনমান্য সমালোচকরাও শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন, বিচার বিশ্লেষণ করেছেন এবং কবিদের মানস-প্রবণতা গঠনে এই এস্টাব্লিশমেন্টগুলো কীভাবে কাজ করেছে তা খতিয়ে দেখে তাঁদের কাব্যপরিচয় উপস্থিত করেছেন।

এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য যে, উপরোক্ত ফিউডাল পেট্রনরা কবিদের স্বস্তি দিয়েছেন, আর্থিক দুশ্চিন্তা দূর করেছেন এবং নানা দিক থেকে সহায়তা দিয়ে সাহিত্য করার পূর্ণ সুযোগ করে দিয়েছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পেট্রনদের উৎসাহ ও প্রেরণা কবিপ্রতিভা বিকাশের যেমন সুযোগ দিয়েছে, তেমনি তাঁদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব কবিদের কাব্য প্রচারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। স্বয়ং কৃত্তিবাস 'যথা যাই তথা গৌরব মাত্র সার' বলে একটা বিদ্রোহী ভঙ্গি উপস্থিত করে রাজ-অর্থ ও উপঢৌকনের প্রতি বিরূপ মনোভাবের নজির সৃষ্টি করলেও রাজা তথা সামন্ত এস্টাব্লিশমেন্টের স্বীকৃতি তাঁরও প্রয়োজন হয়েছিলো। এবং তাই ই তাঁকে 'রামায়ণ' রচনা করার জন্যে মৌলিক প্রেরণা জুগিয়েছিলো বললে অত্যুক্তি হবে না। কৃত্তিবাসের বর্ণনাতেই তথাকথিত গৌড়েশ্বরের রাজ-সভার একটা পবিত্র পবিত্র চেহারা এবং ধর্মভাব ফুটে উঠেছে। এ থেকেই বোঝা যায়, 'ফুলিয়া পণ্ডিত' তাঁর মধ্যে নিজ কবিস্বভাবের একটা স্পষ্ট যোগাযোগ অনুভব করেছিলেন। আর্থিক দিক থেকেও তিনি কিছু না কিছু আনুকূল্য পেয়েছিলেনই। কবি না বললেও, রাজার প্রতি কৃত্তিবাসের এ্যাটিচিউডের

সূত্রে আমরা গৌড়েশ্বরের (?) দানশীলতার প্রতি কটাক্ষপাত করতে অনিচ্ছুক। ফিউডাল পেট্রনরা গুণীজন সম্বর্ধনার ব্যাপারে যে অকাতরে অর্থব্যয় করতেন, তার সাক্ষ্যের অভাব নেই। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম তো মুক্তকণ্ঠেই নিজের জীবন-যাপনের দুরবস্থার বিশদ চিত্র এঁকে 'সুধন্য বাঁকুড়া রায়'এর কীর্তন করেছেন। আলাওলেব 'দারা সিকান্দার নামা' কিসের সাক্ষী তা নতুন করে জানানোর নয়। আর রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র খুব বেশি দূরকালের নন। তিনি যে কতদূর রাজ-ছায়াতলে বসে কী স্বস্তিতে একই সঙ্গে 'অন্নদামঙ্গল' ও 'বিদ্যাসুন্দর' রচনা করে-ছেন তা-ও বিস্তারিত বলার অপেক্ষা রাখে না। সবচেয়ে বড় কথা, ঊনবিংশ শতকের বিদ্রোহী এবং যুগস্রষ্টা কবি ও নাট্যকার মধুসূদন সাহিত্য করার জন্যে জয়দেব, বিদ্যাপতি, কৃত্তিবাস, রামপ্রসাদ সেন, ভারতচন্দ্র প্রমুখ কবিদের আর্থিক দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি ও স্বস্তিকে ঈর্ষা করেই সম্ভবত একটা রাজসভাকবি হতে আকুল হয়েছিলেন এবং তাঁকে একটা রাজসভা জুটিয়ে দেবার জন্যে বন্ধুবান্ধবকে অনুরোধ করেছিলেন। গিয়েছিলেন পঞ্চকোটের রাজসভায়।

কিন্তু ঊনবিংশ শতক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রের যুগ। চিন্তা ভাবনায় মুক্তি আনার জন্যে ব্যাপক আন্দোলনেব যুগ হিসেবেই এ সময় চিহ্নিত। ফলে, চূড়ান্ত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রের প্রতীক মধুসূদনের পক্ষে বোধমুক্তির এই আসন্নসম্ভব সময়ে ফিউডাল প্রভুর মর্জি মেনে চলা যে একেবারেই অসম্ভব, তা বলা বাহুল্য। বস্তুত দর্পিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের জন্যেই মধুসূদন পঞ্চকোট রাজসভায় খুব বেশিদিন টিকতে পারেন নি। পঞ্চকোট থেকে বিদায় বিষয়ক সনেটে 'সেই রাজকুল লক্ষ্মী দাসে দেখা দিলা শোভি সে আসন' বলা সত্ত্বেও, তাঁর প্রসাদে কবির 'ভাঙা গড়' গড়ার ইচ্ছা যে আদৌ পূরণ হয় নি বা আর্থিক দুশ্চিন্তা কিছুমাত্র দূর হয় নি, সে কথাটাই কান্নাভারাক্রান্ত শব্দে প্রকাশ পেয়েছে। মৃত্যুর মুখোমুখি সময়ে মধুসূদন উত্তর-পাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের আনুকূল্য পেলেও, তা শুধু উল্লেখের জন্যেই উল্লেখ করা যায়। মাইকেল জীবনের কিছু মাত্রাধিক চাহিদার কাছে তা কিছুই নয়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বা তারপরে তেমন কোনো তাৎপর্যপূর্ণ পেট্রনের সাক্ষাৎ মেলে না।

আসলে, উনিশ শতকের গোড়াতেই সাহিত্য-ব্যাপারে রাজা, মহারাজা সামন্ত প্রভুদের যুগ ও পেট্রনের ভূমিকা শেষ হয়ে গেছে। এ সময় থেকেই শুরু হয়েছে নতুন যুগের প্রকাশক পাঠকের কাল। আগে অঙ্গভঙ্গি, নৃত্য, সুর এবং কবির (প্রায় ক্ষেত্রে নিজেই গায়েন) নিজ আবেগ প্রকাশের বিশিষ্টতার মধ্যে

থেকে শ্রোতার সঙ্গে কবির যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ ছিলো, তা এ শতকে মুদ্রাযন্ত্র ও প্রকাশনা সংস্থার কল্যাণে দূর হয়ে গেলো। ইংরেজ আমলে শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে থেকে যেমন আধুনিক যুগের শুরু হয়েছে, তেমনি সাহিত্যের জন্যেও নতুনতর পেট্রনের আবির্ভাব ঘটেছে। এ যুগ নতুন ধনিক-বণিক শ্রেণীর ও মধ্যবিত্ত মসীজীবীদের। মূলগত দিক থেকেই আধুনিক এস্টাব্লিশমেন্ট ও রাজা মহারাজা সামন্তপ্রভুদের পৃষ্ঠপোষকতার চরিত্র চেহারা আলাদা। তবে উনিশ শতকেই সাহিত্য নিয়ে বেনিয়াবুদ্ধি লাভজনক ব্যবসা ফাঁদে নি। বিত্তাসাগরের বইয়ের দোকান এবং প্রকাশনা সংস্থা স্থাপন করা তাঁর হিউম্যানিষ্টের কর্মপ্রেরণার মূল উৎসেরই বাস্তব প্রকাশমাত্র ; কোনো ব্যবসায়ী মনোবৃত্তির পরিচায়ক না হয়ে বিত্তাসাগরের সেই কাজ হয়েছে সাহিত্যিকের কল্যাণমূলক।

রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতার উল্লেখ এখানে নানা কারণেই। প্রথমত বলা যায়, বাংলা সৎসাহিত্য গোড়া থেকেই বিশেষ বিশেষ রাজধানীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এবং রাজধানী ও রাজার রুচি-আচার ও জীবনকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করে কবিরা নাগর জীবনের চাহিদানুযায়ী সৃষ্টি করেছেন সাহিত্য। বিভিন্ন রাজার ও তাঁদের পারিষদদের মনোরঞ্জনের জন্যে তৈরী হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্য রুচি। দ্বিতীয়ত বলতে হয়, স্বস্তির জন্যে, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ লাভের জন্যে কবিকে তাঁর পেট্রনের কাছে অনেকখানি স্বাধীনতা বলি দিতে হয়েছে। পেট্রনের মর্জি মেটানোর জন্যে একটা সচেতন প্রবণতায় কিম্বা পেট্রনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চাপে বিশেষ ধরণের সাহিত্য সৃষ্টির মনোভাবও দেখা দিয়েছে কবিদের মধ্যে। ফলে, ল্যাণ্ডমার্ক সৃষ্টিকারী কবিরাও কিছুটা তোষামোদের সাহিত্য রচনা করেছেন। তৃতীয়ত, রাজশিরোপা ও উপাধি পাবার ফলে পাঠক শ্রোতাদের মধ্যে কবির প্রচার তরান্বিত হয়েছে এবং সামাজিকদের কবি সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও উৎসাহ বেড়ে গেছে। আর এটা যে হোতোই তার প্রমাণ খুব একটা দূর নয়। এ কথা বললে কি খুব অন্যায় হবে যে, নোবেল পুরস্কার রবীন্দ্রনাথকে তাঁর দেশবাসীর কাছে পরিচিত করিয়েছে? আর সাম্প্রতিক কালে আকাদেমী পুরস্কার প্রাপ্ত গত্তকার-কবিদের দিকে তাকিয়েও উপরোক্ত কথার সত্যতা সম্পর্কে সম্ভবত কারুরই সন্দেহ জাগবে না। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সাগর থেকে ফেরা' আকাদেমী পুরস্কার পাবার পর কত দ্রুত এবং কতবার পুনর্মুদ্রণ লাভ করেছিলো তা অনেকেই জানেন।

তবে একটা কথা এ প্রসঙ্গে না বলে নিলে নয়। প্রাচীন কবিদের অনেকেই পেট্রন পেয়েছিলেন এ কথা যেমন ঠিক, তেমনি একথাও সত্য যে, কোনোরকম পেট্রন বা ফিউডাল এস্টাব্লিশমেন্টের আনুকূল্য পান নি এমন কবি আখ্যান-কাররাও প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন সমান। এর কারণও অবশ্য ছিলো। আদিমধ্য-যুগীয় সাহিত্য পরিমণ্ডলে লেখক ও সহৃদয় সামাজিকদের মধ্যে সম্পর্ক ছিলো সরাসরি। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নাচগানের মাধ্যমে শ্রোতাদের সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সৃষ্টি সে সময় অসম্ভব ছিলো না। তা ছাড়া 'বাইশা' জাতীয় সংকলন গড়ে বিভিন্ন অঞ্চলে গানের আসর বসিয়ে গায়েনরা ব্যবসার ভিত্তিতে কবিদের সাধারণের কাছে সরাসরি পরিচিত করাতে পারতো। কিন্তু আধুনিক যুগে মুদ্রাযন্ত্রের মালিক ও প্রকাশক এক সঙ্গে অনেকগুলো বই ছেপে দিয়ে এবং বই-বেনেরা ক্রেতাদের কাছে বইগুলো অনায়াসলভ্য করে শ্রোতার বদলে নতুন এক পাঠক সমাজ তৈরী করেছে। কবি ও পাঠকের দূরত্বের ফলে বই এখন বহুলাংশে বিজ্ঞাপন-নির্ভর হয়েছে। সওদাগরী বুদ্ধি লেখক ও পাঠকের মাঝখানকার 'ফাঁক'টুকু পুরোপুরি আত্মস্বার্থে কাজে লাগাতে সচেষ্ট হয়েছে। বাংলাদেশে জাঁকিয়ে বসেছে নতুনতর এস্টাব্লিশমেন্ট এবং গড়ে উঠেছে বই বা লেখকের মেধা নিয়ে একচেটিয়া কারবার। শিক্ষিত আধাশিক্ষিত জনতার রুচি-চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে ব্যবসা ফেঁদেছে ঢালাও অ-সাহিত্যের। আবার লেখককে দিয়ে বিকৃত রুচির বই লিখিয়ে সমাজমানসকে অসুস্থ খাদে বইয়ে দেবার জন্যে এই একচেটিয়া মালিকানার এস্টাব্লিশমেন্টগুলো সচেতন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। টিকে থাকার জন্যে বলিষ্ঠ লেখক কবিদেরও এখন আর এস্টাব্লিশমেন্টের হাঁড়িকাঠে গলা না বাড়িয়ে দিয়ে সাহিত্য করার উপায় নেই। লেখাকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করতে হলে একচেটিয়া মুনাফাবাজ এস্টাব্লিশমেন্টের খপ্পরে পড়তে হচ্ছেই লেখক-কবিদের। এখন এই এস্টাব্লিশ-মেন্টগুলোই সাহিত্য রসরুচির নির্মাতা এবং নিয়ামক। এদের রাজ্য না থাকলেও একটা রাজধানী শহর আছে, পেছনে আছে পুঁজিবাদী রাজনীতি।

এ যেমন এস্টাব্লিশমেন্টের এক ধারা, তেমনি আরো একটা ধারা রয়েছে সেই প্রাচীন কাল থেকেই। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিত্ববান পুরুষও এক একটা এস্টাব্লিশ-মেন্টের কাজই করেছেন অর্থ-সম্পর্ক-শূন্য দিক থেকে। তাঁরা সহায়তা দিয়েছেন এবং প্রভাবিত করেছেন মূলত কবির মেধাকে এবং তাঁর সৃষ্টি প্রচারে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সাংঘাতিক প্রভাব বিস্তারী ব্যক্তিত্ব তো এক একটা

যুগকেই নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্য তত্ত্ব মুক্ত হয়ে সাহিত্য করা যেমন অষ্টাদশ উনবিংশ শতকের লেখকদের পক্ষেও কষ্টকর হয়েছিলো, তেমনি রবীন্দ্রপ্রভাব কাটিয়ে সাবালকত্ব অর্জন করতে হিমসিম খেতে হয়েছে 'কল্লোল' যুগের কবি-লেখকদের আর এখনো অতি-তরুণ লেখকদের প্রতিভার রক্তপাত ঘটাতে হচ্ছে পাঠকের রবীন্দ্রসংস্কারাচ্ছন্ন রুচি কাটিয়ে নিজেদের এতটুকু প্রতিষ্ঠা পেতে। এ যেমন এক দিক, অন্য দিকে, ঐ সব উঁচু ব্যক্তিত্ববানদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রশংসা লেখকদের সম্পর্কে পাঠকের উৎসাহ সৃষ্টি করেছে অনেকখানি। ফলে, কবি লেখকদের প্রচারে তাঁরা যথেষ্ট সহায়কও হয়েছেন। সাম্প্রতিক কালে শ্রীচৈতন্য কি রবীন্দ্রনাথের মতো অত বড় ব্যক্তিত্ববান কেউ না থাকলেও, নানা দিকে কিছু কিছু ক্ষমতাবান পুরুষ অংশত এমনি এস্টাব্লিশমেণ্টের ভূমিকা পালন করছেন। এ ব্যাপারে বুদ্ধদেব বসুর নাম করলে খুব একটা অযৌক্তিক হবে না। 'কবিতা ভবনে' আশ্রয় এবং প্রশ্রয় পেয়ে বেশ কিছু আধুনিক কবি লেখকই অল্প আয়াসে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছেন। অতি-সম্প্রতি রাজনৈতিক দলগুলোও এস্টাব্লিশমেণ্টের ভূমিকা পালন করছে একই রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী লেখকদের ব্যাপারে।

এস্টাব্লিশমেণ্টের মোটামুটি পরিচয় নিতে গিয়ে দেখা গেলো যে, আধুনিক এস্টাব্লিশমেণ্টের রাজ্য নেই কিন্তু একটা রাজধানী শহর আছে এবং বিশেষ বিশেষ শ্রেণী স্বার্থের রাজনীতিও আছে। মনে রাখতে হবে, এ যুগের সমস্ত সাহিত্যিক তৎপরতাই মূলত এই রাজধানী শহরকে কেন্দ্র করে। উনিশ শতক থেকেই কাব্যসাহিত্য চর্চার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে ভারতে ইংরেজ বাহাদুরের তৎকালীন রাজধানী কোলকাতা এবং উপরাজধানী ঢাকা। ফলে, সাহিত্যও হয়ে পড়েছে পুরোপুরি এই দুই শহর কেন্দ্রিক, মুখ্যত কোলকাতাকেন্দ্রিক। বস্তুত, প্রচারের জন্যে বহুল প্রচারিত পত্রিকা, রচনা প্রকাশের জন্যে প্রকাশন সংস্থা বই ব্যবসার জন্যে অর্থলগ্নিদার এবং নতুন সৃষ্ট মসীজীবী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী তথা পাঠক শ্রেণী সবই প্রায় সম্পূর্ণ ভাবেই সীমাস্বর্গ করে তুলেছে কোলকাতা ও ঢাকাকে সাহিত্যিক কবিদের কাছে। ফলে, কোলকাতা-ঢাকাতেই আধুনিক সাহিত্যস্থানিকতার সৃষ্টি হয়েছে। আর ভারতে ইংরেজ শাসনের কেন্দ্রস্থল কোলকাতাকেই যেহেতু আধুনিক ভারতের প্রাথমিক পর্বের তাবৎ সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্র হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিলো, সেগুলোর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক-সূত্রে জড়িত থাকার জন্যে তুলকালাম

সাহিত্য আন্দোলনও দাপিয়ে উঠেছিলো শহর কোলকাতাতেই। আধুনিক শহর কোলকাতায় তাই রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ঈশ্বর গুপ্ত, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র নবীনচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ মুখ্য গদ্যকার কবিরা প্রায় সবাই ই বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা বহিরাগত। শেঠদের হাট কোলকাতা সুদূর বিদেশীদের হাতে যেমন বাংলার রাজধানী হয়ে উঠেছে, তেমনি বাংলারই দূর দূর থেকে কেউ চাকরীর প্রয়োজনে, কেউ শিক্ষার প্রয়োজনে, কেউ বা ব্যবসার প্রয়োজনে কোলকাতায় এসে তাকে সীমাস্বর্গের সাংস্কৃতিক ইন্দ্রাণী করে তুলেছে। বাস্তবিক পক্ষে, কোলকাতায় বহিরাগত বাঙালীই জাতীয় উত্থানের প্রয়োজনে, নব যুগ মানুষের আত্মিক ও ব্যবহারিক প্রয়োজনে, সামগ্রিক ভাবে মধ্যযুগ থেকে মানুষকে উদ্ধার করার ও আধুনিক জীবনের ভাবাকাশ সৃষ্টি করার তাগিদে দুরন্ত আন্দোলন গড়ে তোলার উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছে কোলকাতাকেই। পরবর্তী কালে এই রাজধানী শহরেই গঠনমূলক নতুন নতুন সংস্করণ দেখা দিয়েছে মাত্র, কখনোই সক্রিয় ভাবে বিকেন্দ্রীকরণের চেষ্টা হয়নি। সময়ের পরিবর্তনে আন্দোলনের চরিত্র পালটালেও তার কোলকাতাকেন্দ্রিকতা অটুটই থেকেছে এবং কোলকাতাই হয়ে উঠেছে সাহিত্য-সংস্কৃতির বাংলাদেশ।

স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে, এ কোলকাতার স্বরূপ কি এবং কিই বা তার চেহারা-চরিত্র ? আধুনিক সাহিত্যের পরিচয় নিতে তা জানার প্রয়োজনীয়তাও আছে। কেননা, এই রাজধানী শহর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে। বস্তুত, শানেই জন্ম হয়েছে আধুনিক সাহিত্যের। ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিলে জানা যায়, একদা বসতিহীন কয়েকটি চালা নিয়ে গড়া হাট ইংরেজের প্রয়োজনে হয়ে উঠেছে রাজধানী শহর। কাঠামোতে এর শক্ত ঢালাই। সরকারী অফিস, আমলাদের কোয়ার্টার, সৈন্য আর পুলিশ ব্যারাক, সওদাগরী অফিস, চাকুরেদের মেস, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, ছাত্রাবাস, শুঁড়িখানা আর বেশ্যাবাড়িই তার মৌলিক ঐশ্বর্য। শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে কোলকাতার যে ছবি দিয়েছেন, তাতে প্রায় সর্বত্রই দেখা গেছে, লেখা-পড়া করতে এসে গ্রামের বিত্তবানদের ছেলেরা মেসবাড়িতে বাস করছে এবং মদবেশ্যা চর্চা করে বয়ে গেছে। সরকারী সওদাগরী কর্মচারীদেরও কোলকাতা বাস কালে জীবনযাপনের ধরণ অন্যরকম হবার কথা নয়। একটু ভাবাবেগশূন্য দৃষ্টিতে তাকালেই দেখা যায় যে এই কোলকাতা মূলত পুরুষের শহর। এখানে

বৌ মেয়ে নেই মা নেই, যন্ত্রের মতো দৈহিক ক্ষুধা মেটানোর জন্যে বেশ্যা আছে। ঘর নেই, উদরপূর্তি ও মধ্যরাত কাবার করে উচ্ছন্ন চৈতন্য নিয়ে এক-জোখা খাটে কোনোমতে রাত কাটানোর জন্যে মেসবাড়ি আছে, আছে হোটেল রেস্তোরাঁ। সমাজ নেই, এ শহরেরই ফলন ব্রাহ্মসমাজ আছে। স্নেহ মমতা যন্ত্রের কাছে আশা করা যায় না, শাসকযন্ত্রের উৎপন্ন নিষ্ঠুরতার এলাকা কোলকাতায় তা নেই-ও। বেশ্যার কাছে প্রেম পাওয়া দূরাশা, ব্রাহ্মসমাজের শিকড় শানের মধ্যে গেঁড়ে বসতে পারে নি। স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল পর্যন্ত যে মুষ্টিমেয় গেরস্ত কোলকাতায় বসবাস করেছে, তাদের অতিবড় অংশটাই বাড়িওলা (উঠতি ধনী ইংরেজদের দেওয়ান বা বড় জমিদার এবং রাজা রায়-বাহাদুরদের অবশ্যই ধরা হচ্ছে না)। এরা কোনো দিনই কোনো ঝুট ঝামেলায় থাকে নি। এ সময়ের সামাজিক ও সাহিত্যিক আন্দোলনেও এরা একেবারেই উপেক্ষিত বা অনুপস্থিত। কোলকাতা তাই বহিরাগত পুরুষদেরই কোলকাতা হয়ে থেকেছে দীর্ঘদিন।

একজন মোটামুটি শিক্ষিত যুবক এই কোলকাতা থেকে কেরানীগিরী বা সরকারী চাকরী করে সামান্যই আয় করতে পারে। বেঁচে থাকার প্রয়োজনের তুলনায় তা কিছুই না। এই শিক্ষিত শ্রেণীর যে অংশ আবার সরস্বতীর আরাধনা ধরেছেন তাঁদের অলক্ষ্মীকেই অর্ধাঙ্গিনী করে জীবন কাটানো ছাড়া গতি নেই। বিশ শতকে নজরুল পাবলিশারের কাছ থেকে কী পেয়েছেন, তার সাক্ষী ইতিহাস। এ যুগের প্রতিভার শহীদ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বুকের রক্ত ফ্যাকাসে করে দিয়েছে আর্থিক দুরবস্থাই। আর সাম্প্রতিক কালে প্রায় কোনো লেখক-কবিই সোনার চামচে মুখে করে জন্মান নি বলে জীবন চিবিয়ে খেয়ে সাহিত্য করতে গিয়ে বেশিদিন স্বাধীন-স্বতন্ত্র-প্রতিভা বজায় রাখতে পারেন না। বেকারত্ব অথবা স্কুলের শিক্ষকতা নতুবা যে কোনো ধরণের একটা ন্যূনতম আয়ের পথ বেছে নিয়ে কিছুদিন লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনের লেখক হয়ে থেকে প্রায় সবাই-ই গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিচ্ছেন। কিছু কিছু লেখক অবশ্য এরই মধ্যে বাংলা সাহিত্যের সত্যিকারের রূপটা স্পষ্ট করে তুলতে পারছেনও। তবে বাজার ভরা এখন এস্টাব্লিশমেন্ট প্রচারিত অ-পুস্তকই (নো-বুক) তথাকথিত ল্যাণ্ডমার্ক সাহিত্য পুস্তক।

বর্তমান বাংলা সাহিত্য এক কথায় লাভজনক অর্থনৈতিক পণ্য এবং আধু-নিক এস্টাব্লিশমেন্টের মূল কথা মুনাফা এবং শহরকেন্দ্রিকতা। কালে কালে

তার মুনাফার ক্ষুধা এমন চড়ে উঠেছে যে, কল্যাণ বোধের শেষ সলতেটি পর্যন্ত সে নিভিয়ে দিয়ে চারদিকে শুধু অন্ধকার আর নিজের পর্দাহীন চোখের তারা জ্বেলে রেখেছে। নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যে যে কোনো অবস্থায় সে ন্যায় নীতি বিসর্জন (যে ন্যায় নীতি সে নিজেই একদা তার শ্রেণীস্বার্থে গড়েছিলো এবং সমাজের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলো) দিতে পরোয়া করে না। যে কোনো মিথ্যাকে বারবার প্রচার করে বা বাঘা বাঘা লেখকদের দিয়ে বলিয়ে সত্য হিসেবে উপস্থিত করতে চাইছে হিটলারী তত্ত্বের নিয়মে এবং কিছু কিছু কৃতকার্যও হচ্ছে। একই পাতার এপিঠে ওপিঠে ইতরতর যৌন আক্রমণ ও চে গুয়েভারার গেরিলা যুদ্ধ একই উদ্দেশ্যে সাজিয়ে ইনকামট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া কালো টাকায় সিন্দুক ভরছে। এ জন্যে এস্টাব্লিশমেন্টের অনুশোচনা আশা করা মূর্খতা। সাহিত্যে যাদের 'মনোপলি মানি' খাটে তারা যে নিজেদের স্বার্থে জেনারেশনের পর জেনারেশন নষ্ট করে দিতে বিবেকের দংশন অনুভব করে না, তা বলাই বাহুল্য। আবালবৃদ্ধবনিতার স্নায়ুবিকৃতি ঘটানোর জন্যে আধুনিক এস্টাব্লিশমেন্ট মানুষের মনুষ্যত্বটুকু বিয়োগ দিয়ে নারীধর্ষণ ও দেশ ধর্ষণের নায়ক সজীব যন্ত্রকেই সাহিত্যের চরিত্র করে উপস্থিত করছে। তাই-ই এস্টাব্লিশমেন্টের কাছে নাকি জীবনসংগ্রাম। বিপন্ন অস্তিত্ব নিয়ে নাভিশ্বাস ওঠা সাধারণ পাঠকের এই চোরা শত্রুতা ধরার ক্ষমতা থাকলেও সত্যের মতো মিথ্যাকে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। ছাপার অক্ষরে লেখা কোনো বিষয় কতজন অতিশিক্ষিত পাঠকের কাছেই-বা বাংলা তথা ভারতে সত্য নয় ?

মোট কথা আধুনিক এস্টাব্লিশমেন্টের কাছে সাহিত্যটা বড় কথা নয়। চরিত্রে সে ফিউডাল এস্টাব্লিশমেন্ট থেকে একেবারেই আলাদা। ফিউডাল এস্টাব্লিশমেন্টের মধ্যে একটা গ্রামীনরূপ, সহজ সরলতা এবং উদারতার ব্যাপার ছিলো। অন্যান্য দিকে সামন্তপ্রভুর শোষণের সঙ্গে যেমন কিছুটা দরদও ছিলো, তেমনি সাহিত্যের ব্যাপারেও ছিলো একটা সাধারণ রসবোধ। বড় কবিকে সভাসদ করে নিজের মর্যাদার দিকটা উঁচিয়ে তুলতে গিয়ে একটা আত্মিক বন্ধনও তাঁরা সৃষ্টি করতেন। চাষীকে রক্ষা না-করে যেমন সমূলে শোষণও করেন নি, কবিকেও দেশজাতি ঐতিহ্যচ্যুত করে এনে কেবলমাত্র নিজের আমোদ প্রমোদের জন্যেই সাহিত্য করতে বাধ্য করেন নি। কিন্তু আধুনিক এস্টাব্লিশমেন্টের সে বালাই নেই। এখানে লেখক পাঠকের সঙ্গে এস্টাব্লিশ-মেন্টের সম্পর্ক কেবলমাত্র ব্যবসায়ী সম্পর্ক। একটা যান্ত্রিক যোগাযোগই মাত্র

তাদের মধ্যে অবশিষ্ট। লেখক থেকে পাঠক এখন যোজন যোজন দূর। একে অন্যের থেকে সম্পূর্ণই বিচ্ছিন্ন। লেখকের আজ আর তার পাঠকের কাছে কোনো বিষয়ে জবাবদিহি করার দায় নেই। লেখক কোলকাতায় আর পাঠক হয়তো কোনো গহন গ্রামে। এস্টাব্লিশমেন্টের পাসপোর্ট পেয়ে যে সাহিত্য তার কাছে পৌঁছোয় সে-সাহিত্য—তার বিষয়বস্তু—প্রায় সবক্ষেত্রেই পাঠকের অভিজ্ঞতার বাইরেকার। এবং সে জন্যেই পাঠকের কাছে আজকের সাহিত্য দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছে। বস্তুত, এই দুর্বোধ্যতা বিচ্ছিন্নতা রোগেরই বাস্তব প্রকাশ। কবি সাহিত্যিককে একদিকে যেমন গ্রাস করছে এস্টাব্লিশমেন্ট, তেমনি তার মানস ও অনুভূতিকে হাঙরের মতো গিলে ফেলেছে কোলকাতা। আজকের সাহিত্য কোলকাতার কূপমণ্ডুক মানসিকতার সাহিত্য।

কোলকাতা মূলত যে সাহিত্য দিয়েছে তার একটা বড় অংশই খবরের কাগজের সাহিত্য। ইতিহাস যাদের মেজর লেখক হিসেবে চিহ্নিত করেছে অবশ্যই তাঁরা কেউ দেশকালের সীমায় আবদ্ধ নন। কোলকাতায় বসেই লিখুন আর কামাখ্যায় বসেই লিখুন, লেখকের উপলব্ধির সত্য অপ্রতিরোধ্য। ভার্সাই নদী ও কপোতাক্ষ লেখকের রক্তের নালীতে একটি নদীরই দুই নাম; উর্বশী আর ভিক্টোরিয়া ওকোম্পো একই আত্মার লীলাসঙ্গিনী; সব নদী—এমন কি আকাশ গঙ্গাও অনন্ত সময়-পুরুষের কাছে ধান সিড়ি; পুতুল নাচের ইতিকথা আর শহরবাসের ইতিকথা একই মানসিক অস্তিত্বের অবস্থানে; জীবনের সব গানই কোলকাতা থেকে সাঁওতাল পরগনা অব্দি টপ্পাঠুংরি। কেবল কোলকাতা এবং কোলকাতার মধ্যবিত্ত জীবনের কথা যাঁরা সাম্প্রতিকপূর্ব কালে বলেছেন, তাঁদের ক্ষমতা ও দক্ষতা থাকলেও, যান্ত্রিক জীবনের যে সীমাবদ্ধতা, তা-ই তাঁদের সাহিত্যকে সীমাবদ্ধ করেছে এবং গোটা বাংলাদেশের হয়ে উঠতে দেয় নি। ফলে, স্বাভাবিক ভাবেই তা কোলকাতার সাহিত্য হয়ে উঠেছে।

এ প্রসঙ্গেই বলে রাখা ভাল যে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ একই সংগে এস্টাব্লিশমেন্টের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ক্রমবিকাশ। কোলকাত্তাই আধুনিক এস্টাব্লিশমেন্টের যেমন যেমন বিকাশ ঘটেছে বা হাত বদল ও চেহারা বদল হয়েছে, সাহিত্যও তার সঙ্গে পা মেপে মেপে এগিয়ে এসেছে, আন্দোলন করেছে। উনিশ শতকের রেনেসাঁস ফিউডাল এস্টাব্লিশমেন্টের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের পেছনে কাজ করেছে মানুষকে মানুষ হিসেবে উদ্ধার করার ভয়ঙ্কর তাগিদ। তখন নবজাগ্রত এস্টাব্লিশমেন্টেরও খুবই প্রগতি-

শীল এবং কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের সক্রিয় ভূমিকা ছিলো এবং তার জন্যে সে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছিলো। রেনেসাঁস-এর মধ্যে থেকে পাওয়া মানবিকতাবোধকে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে, নারীমুক্তিকে, স্বাধীনতাস্পৃহাকে কেন্দ্র করে কোলকাতায় যে তরুণের অভিযান, সাহিত্যেও তার নির্যাসিত শক্তি প্রকাশিত হয়েছে। সাহিত্যে দেখা দিয়েছে হিউম্যানিজম, পেট্রিয়টিজম-এর আন্দোলন, কূপমণ্ডুক সমাজ ভেঙে সংস্কার-আন্দোলন, দেবতার খোলস ফাটিয়ে মানবমুক্তির আন্দোলন আধুনিক মনন ও সৃজনের আন্দোলনের মধ্যে যে বীরপনা সেই বীর পটভূমিতেই তৈরী হয়েছে উনিশ শতকের 'মেঘনাদ বধ কাব্য'; নারীমুক্তি এবং নারীর স্বাধীন ও স্বতন্ত্র আইডেন্টিটি লাভের জন্যে আন্দোলনকে কেন্দ্র করে 'বীরাঙ্গনা কাব্য'। এই পটভূমিতেই জাতির মধ্যে অঙ্কুরিত হয়েছে তীব্র আদর্শবাদ। আর রেনেসাঁসকালীন সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যেই যেহেতু একটা অভূতপূর্ব মানসদ্বন্দ্ব ছিলো, সেই মানসদ্বন্দ্বের ফসল হিসেবেই জন্ম নিয়েছে 'কমলাকান্তের দপ্তর'—বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। মোট কথা, রঙ্গলাল, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, সর্বোপরি রেনোসাঁসের সমস্ত রকম সুযোগগুলো একটি মাত্র যে মানুষের মধ্যে কার্যকরী হতে পেরেছে, সেই হিউম্যানিষ্ট বিদ্যাসাগরের সাহিত্য সৃষ্টির পেছনে সরাসরি ভাবেই রেনোসাঁস এবং প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে নতুন সময়ের ধনিক বণিক পেট্রনদের সায় ছিলো এবং তা বাংলাসাহিত্যের চেহারা পালটে দিয়েছে। সাহিত্যে দেখা দিয়েছে নতুন -ূন ঝোঁক বা প্রবণতা। আর রোমান্টিক গীতিকবিতার প্রথম স্রষ্টা বিহারীলাল, তীব্র ব্যঙ্গের কষাঘাতে সময়মানুষের চরিত্র উদঘাটক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ফ্যান্টাসির মাধ্যমে যুগমানুষের স্বরূপ উপস্থাপক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ লেখক-কবিরা সবাই মিলে অন্তরে বাহিরে যে মৌলিক মানুষ তার উন্মোচন ঘটালেন। সাহিত্য যেমন সমষ্টির কথা বললো তেমনি উপস্থিত করলো নিভৃত একাকীত্বের ব্যক্তিমানুষটিকে।

এর পরেই বলতে হয় কোলকাতা শহরে প্রতিষ্ঠিত নতুন ধনিক-বণিক সমাজের কাছে ঐ সময়েই কিন্তু ধরা পড়ে গেছে যে, ইংরেজ সরকার এবং বেনিয়া প্রভুত্ব তাদের প্রবল শত্রু। সে বোধ তাদের নিজেদের স্বার্থের খাতিরেই জাতিকে সংগঠিত করতে চেয়েছে এবং ইংরেজের কলোনীকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত করার কোনো স্বপ্ন তখন না থাকলেও, মোটামুটি নিজেদের বণিকস্বার্থ

ও কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখার মতো কিছুটা মুক্তির রাজ্যে পরিণত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে। তার ফলে, দেশীয় এস্টাব্লিশমেন্টের মধ্যে নতুন সব রকম আন্দোলনকে মদৎ দেবার স্বাভাবিক সৎবৃত্তি কাজ করেছে। হরিশ-চন্দ্রের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অগ্নিস্বাক্ষর দিয়েছে, এবং অল্প পরে 'অমৃত বাজার পত্রিকা' স্বাধীনতাবোধের অপরাজেয় বাহনে পরিণত হয়েছে। 'সংবাদ প্রভাকর' 'বঙ্গদর্শন' 'তত্ত্ববোধিনী'র ভূমিকা সাহিত্য ও সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে কতদূর, তা সবিশেষ বলার অপেক্ষা রাখে না। এক কথায়, সে সময়ের পত্রপত্রিকাগুলো ইংরেজ প্রভু ও তার স্থানীয় এস্টাব্লিশমেন্টের বিরুদ্ধে একদিকে 'মহারানীর জয়' দিয়ে যেমন কালি ছুঁড়েছে, তেমনি ফিউডাল সমাজ ও তার এস্টাব্লিশমেন্টের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাত হেনেছে। মনে রাঁখতে হবেই যে, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন এই নবোদ্ভূত দেশীয় ধনিক শ্রেণীর হাতেই সংগঠিত হয়েছে যে আন্দোলনের পরিণতি ১৯৪৭ সালে।

ইংরেজ শাসকের রাজধানী শহর কোলকাতা এবং তাকে কেন্দ্র করে আধুনিক মানুষের জাগরণে প্রধান উপাদান হিসেবে কাজ করেছে ইংরেজী শিক্ষার মধ্যে থেকে পাওয়া পাশ্চাত্য ভাবধারা। ইংরেজী বিদ্যালয়ে পাঠ নেবার সূত্রে সেদিনের কোলকাতায় মানস মেধার জগৎটা স্বাভাবিক ভাবেই ইউরোপীয় ছাঁচে ঢালাই হয়েছিলো। ভারতীয় আধুনিকতার (যার উৎস কোলকাতাই) গুরু হেনরি ডিরোজিও-র প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ তরুণ সমাজ ইউরোপ থেকে আমদানী করা আধুনিকতার মূলমন্ত্রকে আত্মসাৎ করে সমাজ জীবনে এবং সাহিত্যে তার প্রয়োগ ঘটাতে বদ্ধপরিকর হয়েছে। প্রথম দিকে যদিও নবাবিষ্কৃত যুক্তি মুক্তি-বুদ্ধিবাদিতার স্পর্শে উদ্ভাসিত যুবসম্প্রদায় দেশীয় শিক্ষা সংস্কৃতির তাবৎ কিছুকে অস্বীকার করে খানিকটা কালাপাহাড়ী এ্যাটিচিউড নিয়েছে, তবু তা ছিলো বাংলা দেশে তীব্র গতিবেগজাত প্রগতিশীল আন্দোলন। আর মধ্যযুগ থেকে মুক্তি প্রয়াসে যেহেতু সমাজ জীবনের সর্বস্তরে সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে, কাম্য হয়ে উঠেছে হিউম্যানিজম এর প্রতিষ্ঠা, সাহিত্যে তার প্রত্যক্ষ প্রতিফলন ঘটেছে স্বাভাবিক ভাবেই। এ যুগের প্রথম প্রগতিশীল আন্দোলন হিউম্যানিজম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এবং তার ভিত্তিমূলে কঠিন উপাদান হিসেবে কাজ করেছে ইউরোপীয় হিউম্যানিজম্-এর আদর্শটাই। পরবর্তীকালে প্রাচ্য বোধ-বিদ্যার ছোপ দিয়ে মানবিকতাবাদকে যতই ভারতীয় বস্তু করার চেষ্টা হোক না কেন, প্রকৃতিতে তার বিশেষ কোনো রকমফের দেখা যায় নি। সাহিত্যের বেলাতেও না।

ইউরোপে হিউম্যানিষ্ট আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে এবং ফরাসী বিপ্লবের গণতান্ত্রিক চেতনার প্রত্যক্ষ প্রভাবে সাহিত্য ক্ষেত্রে সত্যিকারের বৈপ্লবিক আন্দোলন শুরু হয়েছিলো রোমান্টিসিজম, লিরিসিজম প্রতিষ্ঠার জন্যে। সাহিত্যের এ লক্ষণগুলো বস্তুত হিউম্যানিজম ও ডেমোক্রেসির স্পিরিট থেকেই জন্ম নিয়েছে ইউরোপ খণ্ডে। বাংলাদেশেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। একেবারে সরাসরিই বাংলা গীতিকবিতার মূল ধারাটাকে নতুন রোমান্টিক লিরিকে পরিণতি দেবার ব্যাপারে শেলী, কীটস, বায়রন প্রমুখ ইংরেজ রোমান্টিক কবিরা মডেল হিসেবে কাজ করেছেন বললে অত্যুক্তি হবে না।

একথা কেউই সম্ভবত অস্বীকার করেন না যে, উনিশ শতকের হিউ-ম্যানিজম, পেট্রিয়টিজম, ন্যাশনালিজম, ইন্টারন্যাশনালিজম-এর বোধ এবং নতুনতর চিন্তা ও আদর্শের স্পিরিটটি সেদিন কোলকাতার ধনী পরিবার-গুলোতে—বিশেষ করে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে তুমুল আলোড়ন তুলেছিলো এবং ঠাকুর বাড়িতেই আধুনিকযুগের স্পিরিটটি প্রত্যক্ষ মূর্তি পেয়েছিলো। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িই হয়ে উঠেছিলো আধুনিক যুগচেতনা, সাহিত্যাদর্শ ও শিল্পরুচির কর্ষণভূমি। আর জ্যোতিরীন্দ্রনাথ তার জীবন্ত অভি-ব্যক্তি। একদিকে দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরীন্দ্রনাথের সহৃদয় অনুপ্রেরণা, অন্যদিকে ঠাকুরবাড়ির সাহিত্য পত্রিকার আনুকূল্য রোমান্টিক গীতিকবিতার উদ্গাতা বিহারীলালকে খুবই উদ্দীপ্ত করেছিলো। বিহারীলালের 'সাধের আসন' তো ঠাকুরবাড়িরই 'আসন' পেয়ে কবিহৃদয় থেকে উৎসারিত। আর 'কাহারে ধেয়াই দেবী, সে তো আমি জানি না' বাক্যটিতেই তাঁর রোমান্টিক হৃদয়ার্তির রক্তাক্ত বেদনা অনিবার্য ভাবে আপ্লুত হয়ে ঠাকুরবাড়ির বৌ কাদম্বিনী দেবীর প্রতি উৎসর্গীত হয়েছিলো। এই সূত্রেই বলা যায়, একদিকে প্রবল আবেগ আলো-ড়নের প্রস্তুত পটভূমি, অন্যদিকে বিহারীলালের প্রত্যক্ষ প্রভাবই রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক চিন্তালোকের ও কাব্যচেতনার সুদৃঢ় ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। আধুনিক এস্টাব্লিশমেন্টের কাছে সেদিন যেমন একদিকে উদারনৈতিক চিন্তা-ধারা, সংস্কারহীন ঐতিহ্যপ্রীতি, স্বাধীনতার স্পৃহা ও জাতীয়তাবাদের শ্লোগান বৈদেশিক শাসনের দমনপীড়নের বিরুদ্ধে সংহতির প্রয়োজনে অনিবার্য হয়ে উঠেছিলো, তেমনি অপর-আধিপত্য থেকে মুক্ত হয়ে নিজের ব্যবসায়িক সুযোগ বৃদ্ধির তাগিদও স্বাভাবিক ভাবে তাকে সাবালকত্ব অর্জনের জন্যে দ্রুত জাতীয় চরিত্র নিতে তৎপর করেছে। অবশ্য নানা সূত্রে দেশীয় এস্টাব্লিশমেন্টগুলোর সঙ্গে পাশ্চাত্য

এস্টাব্লিশমেন্টগুলোর গাঁটছড়া বাঁধাই ছিলো। তাই যখন প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের কালে ইংরেজ এস্টাব্লিশমেন্ট যুদ্ধকে মহান বলে প্রচার করতে নেমেছে, দেশীয় এস্টাব্লিশমেন্টগুলোরও প্রচার-যন্ত্রে তা প্রতিধ্বনিত হয়েছে। রিউপার্ট ব্রুকের কণ্ঠস্বর শোনা গেছে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আবার তারই কণ্ঠে শোনা গেছে 'স্প্রিং অফেনসিভ'-এর কবি উইলফ্রেড ওয়েনের কণ্ঠস্বরও। যুদ্ধের কল্যাণকারিতা সম্পর্কে একই রকম জিজ্ঞাসা জেগেছে 'ঝড়ের খেয়া'-য়। যেহেতু দেশীয় এস্টা-ব্লিশমেন্টগুলো তখনো জানতো ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের ভাগ্যের সঙ্গেই ভারত-বর্ষের উত্থান-পতন মঙ্গল-অমঙ্গল জড়িত, তারা খুব বড় রকমের কোন ঝুঁকি নিয়ে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হতে চায় নি ; কিছুটা তাল মিলিয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে আপন লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। পাশ্চাত্য দেশে যখন 'ফাঁপা মানুষ নষ্ট জমিতে' বিচরণশীল কোলকাতায় তখন খাদিগ্রামোদ্যোগে ক্রমমুক্তির মৌতাত এবং দেশীয় ধনীরা তার পৃষ্ঠপোষক। কেননা, তাদের স্বার্থে স্বদেশী শিল্পের শ্লোগানটি তখন খুবই জরুরী। সাহিত্যও বহুলাংশে এই স্বাদেশিকতার উৎসাহেই উৎসাহিত হয়েছে।

এই সব মিলিয়ে দেখা যায় যে সরকারী আনুকূল্যের জন্যে বিদেশী এস্টাব্লিশমেন্টগুলোর এদেশে যে সব সুযোগ সুবিধা ছিল তার অভাবে দেশীয় এস্টাব্লিশমেন্টের জাতীয় আন্দোলনই ভিত্তি হলেও, চরিত্রগত দিক থেকে তার আত্মীয়তা বিদেশী ধনতান্ত্রিক এস্টাব্লিশমেন্টের সঙ্গেই। এর ফলে, স্বাধীনতা আন্দোলনের বুর্জোয়া নেতাদের মধ্যে যে দোদুল্যমানতা ও সংশয় কাজ করেছে, আপোষ আলোচনার ভিত্তিতে বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতা লাভের যে ঝোঁক দেখা দিয়েছে, বুর্জোয়া এস্টাব্লিশমেন্ট তারই প্রচারক হয়েছে। সামগ্রিক ভাবে বাঙালীর তথা ভারতবাসীর স্বাধীনতার জন্যে যে দুর্মর আবেগ, তাকে বুর্জোয়া জাতীয় নেতারা যেমন আমল দেন নি, সাহিত্যের এস্টাব্লিশমেন্টগুলোও তাকে সচেতনভাবে দূরে সরিয়ে রেখেছে। জাতীয় মুক্তিস্পৃহার অতিভাবাবেগের তবকে মোড়া জাতীয় নেতৃত্ব ও দেশীয় এস্টাব্লিশমেন্টের স্বরূপ সেদিন বুঝতে পারা যায় নি, তার আদত চেহারাটা ধরা পড়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু আগে। রবীন্দ্র-ভাব-পরিমণ্ডলের বিরুদ্ধে তরুণ লেখক-কবিদের তীব্র আক্র-মণের ফলে রবীন্দ্রনাথের ঔপনিষদিক আনন্দ-অন্তরাল-প্রতিমার বাস্তব রূপটা যেমন প্রকাশিত হয়ে পড়লো, তেমনি অর্থমন্দা, নতুন যুদ্ধসম্ভাবনা, বেকারত্ব, জাতীয় হতাশা ও বিপন্নতা বোধ থেকে জাত সমষ্টি-চেতনা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের

পতাকা ওড়াতে চাইলো সাম্রাজ্যবাদী শাসকের বিরুদ্ধে এবং ফেঁসে যেতে থাকলো দেশীয় এস্টাব্লিশমেন্টের মুখোশও। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেশীয় এস্টাব্লিশ-মেন্টের প্রত্যক্ষ অস্তিত্বকে সাধারণ মানুষের কাছে দুর্ভাবনার বিষয় করে তুলেছে। তবে স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত দেশীয় এস্টাব্লিশমেন্টগুলো যদিও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের দোহাই দিয়ে (আধা ধনতান্ত্রিক আধা সামন্ততান্ত্রিক চেহারা বজায় রেখেই) জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণা প্রচারের উৎস হিসেবে নিজেদের উপস্থিত করতে পেরেছে, স্বাধীনতা লাভের পরে সে খোলস সম্পূর্ণ ই ধ্বসে পড়েছে—প্রকাশিত হয়েছে তার সাম্রাজ্যবাদী চিন্তা-চরিত্রের সঙ্গে গোত্রগত সুদৃঢ় আত্মীয়তা। সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, ধর্মীয় অন্ধতা প্রচার ও প্রগতিশীল চিন্তাধারার বিরোধিতা করার শক্তিশালী যন্ত্র হয়েই সাম্প্রতিক কালের এস্টাব্লিশমেণ্ট দাঁড়িয়ে আছে ন্যায়নীতিহীন স্বর্ণতৃষা ও একচেটিয়া আধিপত্য নিয়ে।

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক এস্টাব্লিশমেন্টের রূপরেখা টানতে গিয়ে এই কথা স্পষ্ট ধরা পড়ে যে, স্বাধীনতার আগে প্রকাশ্যে তার চেহারা সাম্প্রতিক কালের চেহারার মতো ন্যক্কারজনক ছিলো না। তার ভূমিকা ছিলো তুলসী বনের চিতাবাঘের মতো। আধুনিক শিল্পসাহিত্যের পেট্রন হিসেবে তার উপস্থিতির মধ্যে ব্যবসায়ী স্বার্থবুদ্ধিরই দূরদর্শিতা কার্যকরী হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের আগে বড় বড় পত্রিকার মালিকদের মধ্যে ব্যবসাগত বিরোধ থাকলেও সবাইকেই একই পর্যায় দেশোদ্ধারের কীর্তন এবং গান্ধীবাদের সুসমাচার প্রচার করতে হয়েছে। স্বাধীনতার পর বড় পত্রিকার মালিকরা সরকার পক্ষের তথা কংগ্রেস দলের প্রচার মাধ্যম হয়ে একদিকে যেমন সমস্ত দিক থেকে প্রতারিত বিক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষকে ধাপ্পা দিতে সোচ্চার হয়েছে, তেমনি আপন অস্তিত্বের মুখোমুখি হয়ে অতি-তরুণ সাহিত্যিক সমাজ স্বাধীন ভাবে যখনই প্রথাবিরুদ্ধ শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য রচনার আন্দোলন করেছে, তার সচেতন বিরোধিতাও করেছে। শোষণ শাসন অত্যাচার, নিপীড়ন এবং ক্ষুধার বিরুদ্ধে মরিয়া হয়ে ওঠা সমস্ত রকম সংগ্রামী চেতনাকে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থে অথর্ব করে দিয়ে বিকৃতির খাতে বইয়ে দেবার চেষ্টা করেছে রাখাঢাকি না মেনেই। ১৯৬০ থেকে ১৯৬৯ এই দশ বছর ধরে বুর্জোয়া এস্টাব্লিশমেণ্টগুলোর ভূমিকা স্পষ্টই জাতির মানস বিকৃতি ঘটানোর চেষ্টায় সমাজদ্রোহিতায় উস্কানি দেবার। অত্যন্ত পরিকল্পিত ভাবে এরা জাতির চৈতন্যকে অন্য সব দিক থেকে সরিয়ে এনে যৌনে কেন্দ্রিত করতে চেষ্টা করেছে এবং লেখকদের কাছে 'একটি অশ্লীল গল্প পাঠাবেন' বলে সম্পাদকীয়

দপ্তর থেকে চিঠি পাঠিয়েছে। নানা ভাবে রোধ করতে চেষ্টা করেছে জীবন সংগ্রামে পরাজিত হতে নারাজ বিদ্রোহী সত্তার সত্যিকারের মূর্তি রচনার প্রয়াসকে। তবে, এ এস্টাব্লিশমেণ্টগুলোর মধ্যেও পারস্পরিক বিরোধ তীব্র। একচেটিয়া পুঁজিপতি এবং তাদের কাছে ব্যবসায় মারখাওয়া ধনিক শ্রেণীর মধ্যে যে বিরোধ, পত্রিকা মালিক গোষ্ঠির মধ্যেও সেই একই বিবোধ। তবে মুনাফা শিকারের কৌশলে এরা একই 'চেম্বার অব কমার্সে'র' অন্তর্ভুক্ত।

বস্তুত, স্বাধীনতা লাভের পরে জাতীয় ধনিক শ্রেণীর উত্থানে এবং মনো-পলিস্টিক অর্থনীতি গড়ে ওঠার ফলে ভারতীয় এস্টাব্লিশমেণ্টের কব্জা সুদৃঢ় হয়েছে এবং তার চেহারা চরিত্রও আমুল পরিবর্তিত হয়েছে। একচেটিয়া পুঁজির মালিকরা কোলকাতার পত্রপত্রিকার জন্যেও বিরাট অঙ্কের পুঁজি লগ্নি করে একচেটিয়া কারবারের পত্তনি দিয়েছে, নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে গোটা সাহিত্যিক সমাজকেই। এখন থেকে সাহিত্য নামধেয় অবস্তুগুলো বহু প্রচারের সুযোগ পেয়ে বহুতর পাঠকের দরজায় দিনে, সপ্তাহে, মাসে মাসে নিত্য-কর্ম-পদ্ধতির নিয়মে উপস্থিত হচ্ছে, আর এর মধ্যে থেকে এস্টাব্লিশমেণ্টের মর্জিই উৎকট ভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। এস্টাব্লিশমেণ্টের সুতোয় নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে সাধারণ পাঠকের রুচি। আর এ জন্যে হাতে ভাষা থাকা ক্ষমতাশালী লেখক কবিদের তারা যেমন কিনে নিয়েছে; তেমনি কোনো বিশেষ একজনকে শিরোপা কিম্বা মুদ্রা সহ তুমুল প্রচারের সুযোগ দিয়েছে আর দরকার মিটে গেলে চিবোনো আখের ছিবড়ের মতো ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে এবং দিচ্ছে। মোটামুটি ভাবে এ-ই এস্টাব্লিশমেণ্টের ক্রম ইতিহাসের আধুনিক পরিণতি এবং এস্টাব্লিশমেণ্টের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে আসা ক্রমাগ্রসর বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যের জন্যে আন্দোলনের ইতিহাস। সাম্প্রতিক কালে তরুণ লেখকদের আন্দোলন এই অতিকায় এস্টাব্লিশমেণ্টেরই বিরুদ্ধে। সাহিত্যেরও স্পষ্ট দু'ধারা : এস্টাব্লিশমেণ্টের সাহিত্য এবং এস্টাব্লিশমেণ্ট বিরোধী সাহিত্য।

এস্টাব্লিশমেণ্টের সাহিত্য মানে অ-পুস্তক নিয়ে ঢালাও ব্যবসা। আর তাকে সাহিত্য হিসেবে ফতোয়া দেওয়ায় সত্যিকারের সাহিত্য গড়ে ওঠার যে প্রতিবন্ধকতা তার বিরুদ্ধে কব্জি কষার জন্যেই ঐতিহ্যসূত্রে আন্দোলন শুরু করেছেন এস্টাব্লিশমেণ্ট বিরোধী তরুণ কবি সাহিত্যিকরা। ভাব ভাষা ছন্দ বিষয় ও আঙ্গিক নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠির তরফ থেকে আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে এবং হচ্ছে। সাহিত্য ক্ষেত্রে রোমাণ্টিসিজিম, সিম্বলিজম, সুররিয়ালিজম প্রভৃতি

নিয়ে আগে যেমন পূর্বসূরী কবি সাহিত্যিকরা বিপ্লব এনেছেন, সাম্প্রতিক কালের তরুণদের আন্দোলন কেবল লেখা ছাপানোর সুযোগ পাওয়া এবং অর্থনৈতিক সমস্যা মেটানোর আন্দোলন না হয়ে বাংলা সাহিত্যে সত্যিকারের বিপ্লব ঘটিয়ে নতুন কিছু সৃষ্টির বিদ্রোহী তৎপরতা। 'কৃত্তিবাস' ও 'ছোট গল্প নতুন রীতি'র আন্দোলনের ফলেই গদ্যপদ্যের পুরোনো ছাঁচটা ভেঙে গেলো। কিন্তু দ্রুত পরিবর্তিত সময়ে এক ঢেউকে ভেঙে অন্য ঢেউ আসতে দেরী হয় না। 'কৃত্তিবাস' ও 'ছোট গল্প নতুন রীতি'র আন্দোলনের পর এসেছে 'হাংরি জেনারেশন' এবং শাস্ত্র বিরোধী লেখালেখির 'শ্রুতি' ও 'এই দশক' বা 'স্বরান্তর'-এর আন্দোলন। তবে 'হাংরি জেনারেশন' আন্দোলনটাই এদের মধ্যে পুলিশী তৎপরতার ফলে সাধারণ মানুষের কাছে নামমাত্র একটু বেশি পরিচিত। এ আন্দোলনের প্রচার পাবার অন্য কারণও অবশ্য আছে। সাহিত্য সম্পর্কিত এই আন্দোলন সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই বড় ও বহুল প্রচারিত পত্রিকাগুলো তরুণ লেখকদের লেখালেখিকে অশ্লীল এবং ব্যভিচারী রচনা বলে আখ্যা দিয়ে আক্রমণ করে তাদের ভিটেয় পুলিশ চড়ায় এবং পুলিশী তৎপরতার ফলাও প্রচার করে। লোকে তাদের রচনা বড় একটা পড়ে নি ; কেবল 'ইসলাম বিপন্ন' গোছের রেওয়াজেই সামাল সামাল রব তুলে হাংরি জেনারেশনের দাঁত থেকে সাহিত্য সরস্বতীর অতিশুদ্ধ ক্ষীণ সতীত্বকে রক্ষা করতে পুলিশ আদালত করেছে। বাংলা দেশে, সর্বপ্রথম, সাহিত্য করার জন্যে মলয় রায়চৌধুরী দণ্ডিত হয়েছেন এবং অন্যান্য কয়েকজন হাজত বাস করেছেন।

এস্টাব্লিশমেন্ট এবং এস্টাব্লিশড্ লেখকরা যা-ই বলুক, এ আন্দোলন রক্ত-মাংসঅস্থিমেধা দিয়ে অর্জিত অভিজ্ঞতায় এক জীবন্ত সাহিত্য গড়ার আন্দোলন। 'কৃত্তিবাস' 'ছোট গল্প নতুন রীতি' আন্দোলনেরই পরবর্তী তরঙ্গ। এই সব তরুণ লেখক কবিরা বুঝেছেন যে, ক্ষুৎকাতর দেশে যদি কোনো আন্দোলন গড়ে তুলতেই হয়, তবে তা অবশ্যই ক্ষুধা সম্পর্কিত আন্দোলন হওয়া প্রয়োজন। কেননা, তাঁরা ক্ষুধার্ত এবং দেশবাসী বিদেশী সাহিত্যের দরজায় ভিক্ষুক। তারই জন্যে ক্ষুধার্ত আন্দোলন। আর আজো 'অলীক কু নাট্যরঙ্গে' মজে থাকা দেশের চৈতন্য হয় না, এক বিকেলেই ক্ষুধা সম্পর্কিত আন্দোলনে কোলকাতার রাজপথে আশিটা তাজা লাশ পড়ে গেলেও। বারুদগন্ধী রক্ত-গঙ্গায় সূর্যের আত্মহত্যার ঘটনা থেকে অন্ধকারে বিচরণশীল দেবতার মুখোশ পরা 'শিশুদের' মুখোশ ফাঁসিয়ে আসল চেহারাটা প্রকাশ করে দেবার বৈপ্লবিক

কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গেই অস্তিত্বের মুখোমুখি হয়ে ধ্বংসকালীন সময়াতিক্রমের মন্ত্রোচ্চারণ করে যাচ্ছেন তরুণ সাহিত্যিক সমাজ। আর বাংলা দেশে সাম্প্রতিক কালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠিতে বিভক্ত সাহিত্যিকদের বিভিন্ন ধারাগুলোকে একই পাত্রে পরিবেশনের ঝুঁকি নিতে এগিয়ে এসেছেন এস্টাব্লিশমেণ্ট বিরোধী দু' একটি দায়িত্বশীল সংগঠন। পাঠকের বিচার বুদ্ধিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখে সাহিত্য বিচারের ভার তাঁরা পাঠকের ওপরই ছেড়ে দিয়েছেন। পরস্পর বিরোধী স্বর—কমিউনিস্ট এবং হাংরী, শাস্ত্রীয় এবং শাস্ত্র বিরোধী, ক্রুদ্ধ এবং শুদ্ধ শিল্পবাদী, শ্লীল এবং অশ্লীল লেখা গায়ে গায়ে ছাপিয়ে তাঁরা বাংলা দেশে জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির সম্ভাবনাকে তরান্বিত করার চেষ্টা করছেন। অদূর ভবিষ্যতে বাংলা সাহিত্য তার সত্যিকারের চেহারা যে বলিষ্ঠতার সঙ্গে উপস্থিত করবেই তার স্পষ্ট ইঙ্গিত ধরা পড়ছে একত্রিত ভাবে সাহিত্যের ট্রেণ্ডগুলোর দিকে তাকিয়েই। যে কেউ 'গল্পকবিতা' নামের খুদে মাসিক পত্রিকাটির দিকে সামান্য মনোযোগ দিয়েছেন, তাঁরই এ সম্পর্কে ধারণা অস্পষ্ট থাকার কথা নয়।

দেশ কালক্রম ঃ ২

[সাম্প্রতিক সাহিত্যের ভূমিকা—আধুনিকতা ও রেনেসাঁস—সাম্প্রতিক সাহিত্যের সঙ্গে তার যোগাযোগ—সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্থান কাল পাত্র--সাম্প্রতিক সাহিত্য অবিশ্বাসের ও অস্বীকৃতির সাহিত্য।]

অতি সাম্প্রতিক কবি-গল্পকারদের রচনাকে চলতি কথায় আধুনিক সাহিত্য বলা হয়ে থাকে। ঠিক এমনিই সম্ভবত দশম-একাদশ শতকে চর্যাপদকে বা প্রথম কবিতা বলে জানা বাংলাভাষার গীতিকাগুলোকেও আধুনিক বলে অভিহিত করা হোতো। স্বভাবতই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জন্মলগ্ন কোনো সংখ্যাসীমায় চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। সন তারিখের জাবদা খাতার 'হিসাব মিলিয়ে' সাহিত্যের পরিচয় নিতে যাওয়া আর জেনে শুনে অন্ধকারে সেঁধিয়ে পড়া একই কথা। কিছু কিছু লক্ষণ মিলিয়ে আগের যুগের সাহিত্যের সঙ্গে নতুন সময়ের লেখালেখির পার্থক্য দেখে এবং জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কোনো বিশেষ সময়ের মানুষের সামগ্রিক এ্যাটিচিউডের দিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা নতুন লেখালেখিকে আধুনিক সাহিত্য বলে থাকি। এ দিক থেকে বিচারে অতি-সাম্প্রতিক সাহিত্য যদি ক্রুদ্ধ হয়, ক্ষুধার্ত হয় বা ধ্বংসকালীনও হয়, তবু তার উৎস স্থানকালপাত্র'র সার্বিক সত্য। সমসাময়িক মানুষের জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বিশিষ্ট অভিব্যক্তিই সে সাহিত্য। এবং সে অভিবাক্তিও এসেছে এ সময়ের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায় পরিণতি হিসেবেই।

সাহিত্য বিচারে সমাজ-রাষ্ট্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের পরিচয় তুলে ধরার কোনো প্রয়োজন না থাকলেও, ঐতিহাসিক সূত্রে বড় বড় ঘটনাগুলো গেঁথে এনে দেখানো দরকার যে, অধুনা যে নতুন সুরের সাহিত্য দেখা দিয়েছে তা যেমন উটকো নয়, তেমনি স্থানকালপাত্র'র এই বিশিষ্ট পটভূমিতে সাহিত্য যা হয়েছে, তার ঠিক এমনটি হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিলো না। আসলে

আধুনিক সাহিত্য পরিবর্তিত সময়ের নতুন চেতনায় পুরোনো মূল্যবোধকে চূর্ণ করে নতুন ভাবে জগৎ ও জীবনকে অভিনব শিল্পকাঠামোর মধ্যে উপস্থাপনের নামান্তর মাত্র। গ্রহণ বর্জন এবং নির্মাণের সুতীব্র আগ্রহে স্থানে ও কালে বিধৃত জগৎ ও জীবন সমস্যা যখন তীক্ষ্ণ চেতনা ও জিজ্ঞাসায় অন্যতর মোড় নেয় ভাষার মাধ্যমে, তখনই তা আধুনিক সাহিত্য নামে অভিহিত হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, অতি সাম্প্রতিক সাহিত্য নতুন চেহারার, নতুন সুরের ও নতুনতর মোড় নেবার সাহিত্য। কালের দিক থেকে একে স্বাধীনতা লাভের পরের এবং ভাবের দিক থেকে আন্তর্জাতিক মানুষের চূড়ান্ত বিপন্নতা বোধ ও তা থেকে উত্তরণ প্রয়াসে আপোষহীন বিদ্রোহের, সন্ত্রাসের, পথসন্ধানের অস্থিরতার, অতলস্পর্শী অবক্ষয় নিরোধের তৎপরতার, পরাজয়মন্যতার, বিষণ্নতার, তান্ত্রিক-সুলভ বিচ্ছিন্ন একাকিত্বের ও ব্যক্তির আইডেন্টিটি অন্বেষার সাহিত্য বলে গ্রহণ করা চলে। নানা দিক থেকে নানা ট্রেণ্ড বা মানসিকতার ঝোঁক এসে জীবনে যেমন, সাহিত্যেও তেমনি এক অবিভাজ্য জটিলতার মূর্তি উপস্থিত করছে। এ যেন একই কাঠামোয় লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক গণেশ দুর্গা অসুর সিংহ কলাবৌ র সমাহার ; অথচ কোনো একটি মানসিকতাকে সমগ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখাও অসম্ভব। সামগ্রিক ভাবে বলতে হয় যে, সাম্প্রতিক সাহিত্য মেধা ও বোধে অসীম শক্তিধর মানুষের সীমাহীন সৃজন ক্ষমতার ফসল। এ সাহিত্য বিংশ শতকীয় ব্যক্তি মানুষের আত্মিক সমস্যা আবিষ্কারের প্রচেষ্টা ও তার অনিবার্য ব্যর্থতার নৈরাশ্যবোধে যেমন চিহ্নিত, তেমনি এ যুগের শ্রেষ্ঠতম আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের সূত্রে সংঘবদ্ধ মানুষের অভাবনীয় জয়াশা-অঙ্কিত। নির্জন নিঃসহায় একাকিত্বে আপন অস্তিত্বের মুখোমুখি হওয়া এবং বহুর মধ্যে একের উপলব্ধি—এই পরস্পরবিরোধী দুটি ঝোঁকই মূলত আধুনিকতম সাহিত্যে সহাবস্থান করছে।

বলতে দ্বিধা নেই যে, আধুনিক সাহিত্যের অবয়ব গঠনে অতি সাম্প্রতিক সাহিত্য আন্দোলনগুলো কোনো না কোনো ভাবে এ্যাংরি ইয়ংম্যান, বিট জেনারেশন এবং বিশ্বের বিভিন্ন অংশে দাপিয়ে ওঠা বিপ্লবী চেতনার সাহিত্য আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত। আর বাংলা তথা ভারতের সামগ্রিক সামাজিক রাজনৈতিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বৈপ্লবিক চেতনা স্পন্দনের চেয়ে পশ্চিমী অবক্ষয় থেকে উৎপন্ন সাহিত্য আন্দোলনেরই প্রভাব অনিবার্য হয়ে দেখা দিয়েছে বেশি পরিমাণে। তাই বলে হালফিলের সাহিত্যকে

বিজাতীয় ভাবধারার বলে নস্যাৎ করা যেমন বাতুলতা, তেমনি বাতুলতা এর মধ্যে নৈষ্ঠিক বঙ্গত্ব খুঁজতে যাওয়া। একটু নজর করলেই দেখা যাবে যে, নতুন সাহিত্যের মেজাজ ফুটিয়ে তুলতে তরুণ কবি ও কথা সাহিত্যিকরা একদিকে- যেমন অ্যাপোলীনেয়ার, বোদলেয়ার, ডষ্টয়ভ্স্কি, কাফকা, কামিংস, জেমস জয়েস, টমাস মান, এলিয়ট, সাত্রে´, কাম্যু, জঁা জেনে, গিনসবার্গ, ইয়েভতুসেঙ্কো প্রমুখ লেখক কবিদের মর্জি, ভাব, বিষয়, চিন্তা, আঙ্গিক অনুসরণ করেছেন, তেমনি অপরদিকে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও জীবনানন্দের কাছে মুখ্যত ঋণী থেকেও স্ব-মানসিকতার অনুকূল রচনা ঘেঁটে রসদ সংগ্রহের জন্যে বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ চৌম্বক প্রতিভার কাছে তো ছুটে গেছেনই, এমনকি ভবানী-চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, ধুর্জ্জটি-প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি পূর্বসূরীদের কাছেও। কিন্তু যা সৃষ্টি হয়েছে তার স্বাদ সম্পূর্ণ ই আলাদা—জাতীয় জীবন চেতনা রসে জারিত সময়-মানুষের অস্থি মাংস রক্ত মেধা ও হৃদয়ের অভিব্যক্তি।

এই যে আলাদা সাহিত্য, এরও একটা উৎস আছে--ঐতিহাসিক ক্রম-বিবর্তন আছে। এই ক্রমবিবর্তনের ধারা ধরে এগোতে পারলেই এর স্বরূপটি স্পষ্ট করে পাওয়া যেতে পারে। অতি সংক্ষেপ করে এনে যে কাল-পরিধি ও ভাবের গণ্ডীতে অতি সাম্প্রতিক সাহিত্যকে দেখা যাচ্ছে, তা আধুনিক সাহিত্যের মোহনার দিকটি মাত্র। আধুনিকতার লক্ষণাক্রান্ত পশ্চাৎভূমিটি বহুদূরকাল ব্যাপ্ত। আমরা সময় এবং ঘটনার দিক থেকে বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতার উৎস হিসেবে উনিশ শতকের রেনেসাঁস ও তার ঘটনাগত ফলশ্রুতিকেই গ্রহণ করতে চাই। বলতে চাই, রেনেসাঁস থেকে শুরু করে বেশ কয়েকবার বাঁক ফিরে আধুনিকতার মূল স্রোত আজ একটা গুণগত পরিবর্তন লাভ করতে যাচ্ছে। তাই এ সময়ের সাহিত্য বুঝতে রেনেসাঁসের স্বরূপ এবং তাৎপর্যকে—বিশেষ করে সাহিত্য শিল্পে রেনেসাঁসের কী ফলশ্রুতি ঘটেছিল তার অনুধাবন প্রয়োজন। এখানে সুস্পষ্টভাবে বলা যেতে পারে যে, বাংলা দেশ রেনেসাঁসের আন্দোলনে যে-আবেগ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো, সে আবেগকে সে পূর্ণতা দিতে পারে নি। রেনেসাঁসের মৌল শক্তিকে ধারণ করে সে যদি তা কার্যকরী করতে পারতো, তবে বাঙালি যেমন একটা নির্দিষ্ট জাতীয় চরিত্র পেতো, তার সাহিত্যও তেমনি অনিবার্য ভাবে জাতীয় অভীপ্সার মূর্তি উপস্থিত করে জাতীয় সাহিত্যের মর্যাদায় উন্নীত হতে পারতো। কিন্তু তা হয় নি।

অধুনা-সাহিত্যের পশ্চাৎপটের আলোচনায় দেখা যাবে যে, দেশকালপাত্রের রূপগত চেহারার কিছু কিছু পরিবর্তন চোখে পড়লেও সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পটভূমিটি চরিত্রের দিক থেকে অবিকল রেনেসাঁসের সময়কার মতোই থেকে গেছে। আজও ব্যক্তির স্বতন্ত্র কোন আইডেন্টিটি দুর্লভ। ব্যক্তির স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তির স্বীকৃতি থাকলেও কোনো গুরুত্ব নেই। সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক জীবন সম্পূর্ণ অনিশ্চিত, প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ এবং নিরাপত্তা-হীন। এই চূড়ান্ত বৈজ্ঞানিক যুগেও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কাছে মানুষের অসহায় অবস্থা ও পরাজয় নিত্যনৈমিত্তিক। সংগ্রামী চেতনা কখনো কখনো হাউইয়ের মতো জ্বলে উঠলেও অধিকাংশের কাছে তা জব্দ—পরাজিতমন্যতাকে দেওয়া হয়েছে নিঃসংকোচ স্বীকৃতি। সাধারণ মানুষ এখনো যেন বুঝে আছে, যা কিছু ঘটছে এর পিছনে তার কোনো হাত নেই—একে রোধ করাও তার পক্ষে অসম্ভব। নৈরাশ্য ও অবসাদের মধ্যে যা আছে তাই নিয়েই একটা 'তোফা' থাকার নিষ্প্রাণ মনোবৃত্তি ব্যক্তি-মানুষকে নিজের প্রাণের বিবরে সেঁধিয়ে পড়তে বাধ্য করেছে। জীবনের সব ক্ষেত্রে আশাহত হওয়ার পরিণামে বৃহত্তর সমাজ-মানস যেমন আচ্ছন্ন, তেমনি আত্মগ্লানিতেও অভিশপ্ত হয়ে পড়েছে। একটা অতি অথর্ব রাষ্ট্রীয় আদর্শ, আর আধা ধনতান্ত্রিক ও আধা সামন্ততান্ত্রিক চরিত্র ও তার ক্ষমাহীন প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপ, তার পরিকল্পিত বিশ্বাসঘাতকতা ও ন্যায়নীতিহীন শোষণ ও শাসনের প্রশ্রয় এবং তার প্রগতিশীল জীবন চেতনা ও সৃষ্টিধর্মের মূলে কুঠরাঘাত করার নিষ্ঠুর স্বৈরাচারের সামনে সাধারণ মানুষের শুধু টিঁকে থাকার জৈবিক অবস্থাটিই অবশিষ্ট রয়েছে।

সাদা কথায়, তথাকথিত স্বাধীনতার সাইনবোর্ডের অন্তরালে গণতন্ত্রের পোষাকে নির্লজ্জ স্বৈরতন্ত্র, সামাজিক পঙ্গুত্ব ও বন্ধ্যা নাগরিকত্ব, সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, জাতীয় সংহতিহীনতা এবং অত্যাচারের ভয়াবহ মুখব্যাদানকেই প্রত্যক্ষ করা গেছে। স্বাধীনতার কল্যাণে নবোদ্ভূত ধনিক শ্রেণী ও বিশেষ এক ধরণের সুবিধাভোগী শ্রেণীর নগণ্য সংখ্যক মানুষ ছাড়া আপামর জন-সাধারণের অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও নরক যন্ত্রণা, শহরবাসী হঠাৎ-অভিজাতদের বেলেল্লাপনা, সেই বেশ্যাবাড়ী, রজনী উতলা করা মদ ও মেয়েমানুষ, ঘটা করে মেয়েছেলের ফ্যাসান প্যারেড্ দেখা, মাহেশের রথের মেলার বদলে যে-কোনো দেবতার বারোয়ারী পূজা, ঝুমুর আখড়াই কবির লড়াই বদলে উৎকট হিন্দী চীৎকারের জলসা ও 'দিল কা চোর ঔর ভ্যাট সিক্সটি নাইন' মার্কা সিনেমা,

বিধবার দেহসমস্যা ও বালিকার গর্ভসমস্যা, বটতলার বইয়ের বদলে সিনেমা ও যৌন পত্রিকা, বাস্তব জীবনের সঙ্গে যোগাযোগ শূন্য শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সেই শিক্ষার সূত্রেই বিশ্ববিদ্যা ও বোধের সঙ্গে সংযুক্তি, জ্ঞানবিজ্ঞানের নতুন আলোকের স্পর্শ ও বর্তমান যুগের প্রগতিশীল রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা, সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদের আদর্শের প্রতি টান, সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে আত্মিক যোগাযোগ, মুক্তি ও স্বাধীনতাকামী সংগ্রামরত দেশের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি ও সক্রিয় সাহায্য ঈপ্সা, আন্তর্জাতিক সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় ও তার থেকে রসদ সংগ্রহের প্রবণতা, ধর্মীয় দলাদলির বদলে রাজনৈতিক দলাদলি প্রভৃতি মিলে যে পটভূমি রচিত হয়েছে, একটু খতিয়ে দেখলেই তাকে উনিশ শতকের রেনে-সাঁসের পটভূমি বলে মনে হবে। এবং রেনেসাঁসের পটভূমিতে ইয়ং বেঙ্গলদের যে উত্থান ও বিদ্রোহ, অতি আধুনিক কবিসাহিত্যিক ও তরুণ সম্প্রদায়ের বিদ্রোহকে তারই নবরূপ বললে অত্যুক্তি হবে না। অবশ্যই তা প্রকারে আলাদা। ধাতুতে নতুন। এদের এ বিদ্রোহকে নিজেদের অসহায়তা ও আত্মবঞ্চনার বিরুদ্ধে সচেতন আত্মানুসন্ধানের বিদ্রোহ বলেই অভিহিত করতে চাই। বলতে চাই, এ বিদ্রোহ তোফামনস্কতার বিরুদ্ধে আঘাত হেনে, জগৎ ও জীবন পরিবেশের স্বরূপ উদঘাটন করে, সমস্ত প্রতিবন্ধকতা ফাটিয়ে এই ধ্বংস-কালীন সময়ে নতুন সৃষ্টির প্রেরণাজাত ক্ষুধার্ত বিপ্লব। এ ক্ষুধা শিল্পের ক্ষুধা, যে শিল্পের উৎস আপন রক্তমাংস অস্তিত্বের মধ্যে। সমাজের অবরুদ্ধ অগ্রগতি ও উন্নতির বিরুদ্ধে অতি-আধুনিক সাহিত্যের দ্বিধাহীন জেহাদ।

উনিশ শতকের তরুণ বিবেক সেদিন এমনি একটা পটভূমিকেই সমূলে উৎপাটন করে নতুন ভূমি তৈরী করতে চেয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালের পর ইংরেজ শাসক নেই কিন্তু পুরোনো ব্যবস্থার ভূতটা জনসাধারণের ঘাড় থেকে নামে নি। দেশীয় শাসকগোষ্ঠি এবং তাদের রাজনৈতিক দলভুক্তরা জনতাকে নিজেদের পক্ষে ভোট আদায়ের ঘুঁটি করে রাখতে চেয়েছে, জাহির করতে চেয়েছে নিজেদের প্রতাপ প্রতিপত্তি। আর জনতাও একরকম অভ্যাস বশতই তাদের অনুকম্পা লাভ করার জন্যে স্কুলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন থেকে শুরু করে বারোয়ারী পুজোর দ্বারোদঘাটন—এমন কি ছেলেমেয়েদের বিয়েতে আশীর্বাদ করাবার জন্যেও অর্থ উড়িয়ে জাঁকজমকের সঙ্গে তাদের ডেকে এনেছে। এই সব রাজকীয় স্বদেশীয়রা সহায় থাকার জন্যে একদলের যেমন লাইসেন্স, পারমিট, কন্‌ট্রাক্টরী জুটেছে, তেমনি জাল জুয়াচুরী, ঘুষ, ভেজাল, প্রবঞ্চনা উৎকট ভাবে

বেড়ে গেছে এবং এগুলি সামাজিক 'চল' হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ সবের মধ্যে দিয়ে ধনী হওয়ায় লজ্জা বা সংকোচের কিছু আছে বলেই কেউ মনে করে না। বরং এই ধনীরাই সমাজে প্রতিপত্তিশালী—সামাজিক সম্মান এদেরই। পোষাক পরিচ্ছদ, আদবকায়দা, চালচলন, কথাবার্তা সমস্ত কিছুই এই হঠাৎ-অভিজাতদের আলাদা এবং এদের ঘরের থেকেই বেরিয়ে আসছে মূর্তিমান 'বয়ে যাওয়া সন্তান' এবং অবক্ষয়ের ধারা।

স্বাধীনতা-উত্তর কালে স্বাদেশিক নেতারা এবং সরকারী রাজনৈতিক দলের সভ্য সমর্থক এবং বুদ্ধিজীবী মহল কোনো সুস্থ সামঞ্জস্যপূর্ণ সবল জাতীয়ভাব ও জীবনাদর্শের ছবি তুলে ধরতে পারেন নি। বিরোধী গোষ্ঠির রাজনীতি-বিদরাও স্বাধীনতা লাভের ঠিক পরে পরেই রণদিভে ও রবীন্দ্রগুপ্তের অস্বীকারের রাজনীতি, সাহিত্যনীতি ও সমাজনীতি গ্রহণ করে পূর্ব ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। এই অস্বীকৃতি বহুদিনের সঞ্চিত মোহের ওপর নির্মম আঘাত হানতে পারলেও সাধারণ মানুষের সামনে কোনো নব্য আদর্শ স্থাপন করতে পারে নি। কিন্তু তরুণ বিবেক মেধায় ও মননে বা আবেগে ও গতিশক্তিতে আন্তর্জাতিক মানুষ ও তার সংস্কৃতির সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যাওয়ায় স্ব-অস্তিত্বের মুখোমুখী হয়ে স্বাধীন শক্তি ও সত্তার পরিচয় পেয়েছে এবং কূপমণ্ডুকতা ও জগদ্দল বাঁধন কাটিয়ে নিজের আইডেন্টিটি উপস্থিত করতে বদ্ধপরিকর হয়েছে। কিন্তু তার আবেগ অনিবার্য প্রতিকূল আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ভয়ঙ্কর আবর্তই সৃষ্টি করেছে শুধু। নির্জীব না হয়ে পড়ার জন্যে, বেঁচে যে আছে তার প্রমাণ পাবার জন্যে এবং ন্যায়নীতি সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠিত বিধি নিষেধের বিরুদ্ধে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে নিজেদের স্বাধীনতাকে প্রত্যক্ষ করার জন্যে আজকের লেখক আত্মাহুতি দিয়েছেন মদে, স্বেচ্ছাচারী যৌনজীবনে এবং তথাকথিত শুচিতার বিপরীত ভূগোলবৃত্তে। চীৎকার করে বলেন "ভালোবাসা পেলে আমি কেন আর পায়সান্ন খাব / যা খায় গরীবে তাই খাব বহু দিন যত্ন করে।" আর তার পরেই ঐ একই কবিতায় শক্তি চট্টোপাধ্যায় যুক্ত করেছেন, "উল্লুক আমায় বলবে প্রসন্নতা পিয়াসী ভিখারী / চোয়ালে থাপ্পর যদি কম হয় লাথি মারব পোঁদে"। সমসাময়িক জীবনযাত্রাপ্রণালী ও সভ্যতার প্রতি চূড়ান্ত অস্বীকৃতির আড়ালে তরুণ সম্প্রদায়ের মনে একটা গাঢ় বেদনাও যে লুকোনো ছিলো তা উদ্ধৃত কবিতার চরণকটিতে নিখুঁত ভাবেই ধরা পড়েছে। সামাজিক আত্ম-সন্তুষ্টির বিরুদ্ধে তরুণ বিবেকের অশ্রদ্ধা একটা সংস্কারহীন বিদ্রোহী ভাষায়

সুতীব্র শব্দবিস্ফোরণে প্রকাশ করে জীবনের গভীরতর বোধ ও বেদনাকে নগ্ন ভাবে উপস্থিত করেছে। এ বেদনা যে কত গভীর, তরুণ চিন্তা যে কতদূর অতলস্পর্শী তার পরিচয় সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের 'সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বী'তে।

****চামেলি এখন হাসিমারায়। রিণার বিয়ে হয়েছে কাছেই, ভবানীপুরে। সে আমাকে বলেছিল, 'কেন যাব আমি তোমার সঙ্গে! তুমি কবি নও, অথচ তুমি রোজ দাড়ি কামাও না। সুপুরুষ নও, তবু দামী সুট পরো না। তুমি কোনোদিন মোটরগাড়ি কিনবে না। তুমি কুৎসিত নও যে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারব না। আমি রূপসী ; তোমার পাশাপাশি আমি চৌরিঙ্গী দিয়ে হেঁটে যাব কি করে?' আমি তাকে বলে যেতে দিয়েছি। 'আমরা যে ভীড়ে হারিয়ে গেছি রিণা,' বাধা দিয়ে তাকে আমি বলিনি...বলিনি যে, 'সঙ্গম বিনা আমাদের কারুরই আর ঘুম আসে না।' 'কারুরই মুখোশ কোনোদিন তার মুখের মাংস হয়ে যায় না ভাই', এই কথা বলে দিব্যকান্তির চোখের সামনে কোনোদিন আমার মুখোশ টান মেরে খুলে ফেলে বলিনি, 'এই দ্যাখো প্রমাণ।' তার দু'আঙুলে চেপে ধরা জাহাজ, গম্বুজ, শাদা শাদা ঘর ও ক্যানারি পাখি আঁকা পেন্সিলটার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছি দেখে মণিময় বলেছিল, 'ছেলেবেলায় আমাদের এই রকম পেন্সিল ছিল, না?' বলে সে হেসেছিল। হাসি দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল তার কিছুই মনে পড়েনি, তবু সে বলছে, বিস্মৃতির পবিত্রতা সে কলঙ্কিত করেছে। টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে প্রকাণ্ড টেবিলটা পার হয়ে আমি অর মুখে হাত চাপা দিইনি যখন সে তার [illegible] ও বলেছিল— 'কোথায় গেল সেই সব দিন।' 'হায়'! সে আরও বলেছিল। আমি তাকে বারণ করিনি। নৃপেন্দ্রকে বলিনি, 'নইলে বাঁচার কোনো মানে হয় না বলে তোমাকে তো একটা কিছু ভেবে নিতেই হবে নৃপেন, তাই তুমি মনে করেছিলে তুমি সৎ ও সঠিক, নিজের চরিত্রে কোনো গ্রেটনেস নেই বলে, মহত্বটাকে নিজের চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত করে নেবে বলে মনগড়া প্রোজেকশানকে তুমি তোমার চরিত্র বলে ভাবতে সুরু করলে।' সকলে বলল, 'হিপহিপ', 'হুররা' বলে তুমি সংঘে যোগ দিলে। অফিসফেরৎ নরনারীর নীরব ও নতমুখ শবানুগমন ব্যালকনি বা ফুটপাথে দাঁড়িয়ে তুমি দেখলে না, তোমার বন্ধুরা এল সারিবদ্ধভাবে, কেউ একা এল না। তোমরা আলাদা শোভাযাত্রা বের করলে। মদ খাওয়া উচিত নয় মনে করেছিলে বলে তুমি চা খেয়ে গেলে, প্রেম করা উচিত মনে করলে বলে প্রেম করলে, বেশ্যাপটিতে যাওয়া উচিত নয়, গেলে না। মহিলাকে কি তুমি ঘৃণা

করে দেখেছিলে নৃপেন, গণিকাকে তুমি কখনও চাঁদ দেখাওনি। তুমি মনে করেছ তুমি এটা বিশ্বাস করো না, ওটা কর। মনে করেছ বলে বিশ্বাস করেছ, তবে তো কোনো কিছুই তুমি প্রকৃত-বিশ্বাস করোনি নৃপেন? উনিশ শতক পর্যন্ত মানুষের ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল; ঈশ্বর যে নেই একথা এখন নাবালক সাবালক সকলেই জানে। তবু কেন তুমি এই ভুল করলে? ..'মৃত্যুর পর যেমন স্ট্যাচু তুমি চাও, কেন তুমি সেই রকম মুখ তৈরী করছ?'****

গোটা উদ্ধৃতিটির মধ্যে স্পষ্টতই দেখা যায় সমকালীন তরুণ শহরবাসীর ভয়াবহ বেদনা ও সামাজিক অবস্থার প্রতি একটা পরোক্ষ প্রতিবাদের ছাপ এবং অভিমান, ক্লান্তি এবং নিরাসক্তি দানা বেঁধে উঠেছে। বিদ্রোহ এখানে বাইরে থেকে নয়—একেবারে মজ্জা থেকে উঠে আসা ধারালো বোধ দিয়ে পুরোনো মূল্যবোধকে ধ্বসিয়ে দেবার জন্যে ব্যক্তিসত্তার বিদ্রোহ। জগৎ ও জীবনকে চারতল (ফোর ডায়মেনশন) থেকে দেখে নিখুঁত বাক্যে উপস্থাপন করার জন্যে চিন্তা এখানে বহু অভিজ্ঞ পক্ককেশ বৃদ্ধের। তরুণের অস্তিত্বের উপলব্ধিতে জীবন সম্পর্কে যে মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার গভীর-খাত-রেখা ধরা পড়েছে, তাই দিয়েই গঠিত জগৎ ও জীবন সম্পর্কে লেখকের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি বা জীবনবোধ প্রতিষ্ঠার জন্যেই যে এই বেদনাবহ চিন্তাস্রোতের উপস্থাপনা, তা বলাই বাহুল্য।

একটু গভীর তল্লাসী চালিয়ে রেনেসাঁসের সময়কার সাহিত্যমর্জির সঙ্গে সাম্প্রতিক কালের সাহিত্যমর্জির আত্মিক যোগাযোগের সূত্রটি আবিষ্কার করা খুব একটা কঠিন ব্যাপার নয়। উনিশ শতকের রেনেসাঁসের সময়টি যেমন বিক্ষুব্ধ তেমনি জটিল। বিস্তৃত বিবরণ উপস্থিত না করেও বলা যেতে পারে যে, সে সময়ের বিভিন্ন বিরোধী ভাবের যে দুরন্ত আবর্ত—যে আঘাত সংঘাত সমস্যার বিস্ফোরণ, তা স্বাধীনতা-উত্তর কালের বাংলাদেশ তথা ভারতের ভাবসংঘাত-সমস্যার মতোই, হয়তো কিছু কম। সেদিন সমস্ত জীবনমানসপরিবেশের দুর্বার তীব্রতাকে একমাত্র মাইকেল মধুসূদন ছাড়া আর কোনো কবিসাহিত্যিকের পক্ষেই ধারণ করে সার্থক ভাবে রূপায়িত করা সম্ভব হয় নি। কোথাও কোথাও বলা হয়েছে যে, মধুসূদন রেনেসাঁসের প্রবল শক্তিটি ধারণ করে তার জীবন্ত অভিপ্রায়টি উপস্থিত করতে পারলেও সমাজ মানসে সেদিন যে বিরোধ সংঘর্ষ উপস্থিত হয়েছিলো, তিনি নাকি তার কোনো সমাধান দেখাতে পারেন নি। কথাটিকে কতদূর অস্বীকার করা হবে সে প্রশ্নে না গিয়েও বলা যায় যে, মধুসূদন যদি তথাকথিত সমাধান উপস্থিত করতে না পেরে থাকেন, তার জন্যে তাঁকে

দায়ী করা চলে না— তার জন্যে প্রায় সম্পূর্ণ ভাবেই দায়ী উনিশ শতকের অর্ধ-সমাপ্ত রেনেসাঁস নিজেই। রেনেসাঁসের আন্দোলন যদি লক্ষ্যে পৌঁছোনোর আগেই থেমে না যেতো বা তার বৈশিষ্ট্যগুলো যদি অস্ফুট অবস্থাতেই শুকিয়ে না যেতো আমরা মধুসূদনের প্রতিভার আলোকেই, তাঁর বিদ্রোহী মশালেই, মানবিকতার বাঁধন ছেঁড়া পেশল উত্থানকে প্রত্যক্ষ করতে পারতাম—দেখতে পেতাম বিরোধ সংঘাতের মধ্যে থেকে দৃপ্ত স্বরূপে প্রকাশিত সম্পূর্ণ জাতীয় মানুষটিকে। তবু, সেদিন মধ্যযুগীয় অবক্ষয়, কৃত্রিমতা, সমসাময়িক শোষণ ও সর্বব্যাপ্ত পঙ্কিলতার মধ্যে যেটুকু উত্থান শক্তির বীজ পাওয়া গিয়েছিলো— ইংরেজ শাসকের শোষণ, পরাধীনতার যন্ত্রণা, নীচুতম মানের শিক্ষা, জীবনের সর্বস্তরে নীচতা, স্বার্থপরতা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন আচার সর্বস্বতার মধ্যে যতটুকু শক্তিস্পন্দন অনুভূত হয়েছিলো তাই দিয়ে মধুসূদন কেবল রাবণবিলাপের মহাধ্বনিই পরিবেশন করেন নি, মানবতার ও সর্বস্তরে জীবনের মুক্তির ভাষাও নির্মাণ করেছেন। কিন্তু, যতখানি প্রত্যাশা সময়ের, মধুসূদনের দেবার ক্ষমতা থাকলেও রেনেসাঁস তার রসদ জোগায় নি।

তবু এই মূল উদ্দেশ্য-ব্যর্থ-হয়ে-যাওয়া অর্ধসমাপ্ত রেনেসাঁসের দানেই গঠিত হয়েছে আধুনিক বাঙালী মানস ও তার সাহিত্য চেতনা এবং ঐ আলোড়ন বিলোড়নের বিভিন্নমুখী উৎস থেকে শক্তি সংগ্রহ করে সৃষ্টি হয়েছে উনিশ শতকের সাহিত্য। রামমোহন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখের ব্রাহ্মসমাজের সংস্কার আন্দোলন; হেনরি ডিরোজিও, রেভা[illegible] ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক প্রমুখের আপোষহীন সমাজবিদ্রোহের আন্দোলন; রাধাকান্ত দেব, মতিলাল শীল, রামকমল সেন প্রমুখের সংরক্ষণ-মূলক চিন্তাধারা এবং রেনেসাঁসের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি সম্পূর্ণ-মানুষ বিদ্যাসাগরের প্রখর মানবতাবাদী আন্দোলনের তাবৎ স্রোত জট পাকিয়ে সেদিন যে সমাজ মানস তৈরী করেছিলো মধুসূদনের ব্যক্তিগত জীবন সেই আবর্তে পড়ে তলিয়ে গেলেও কবি মধুসূদন সেই পরস্পর বিরোধী ভাবধারাগুলোকে তাঁর কাব্য, মহা-কাব্য, নাটক, প্রহসন ও খণ্ডকবিতাগুলোর মধ্যে বলিষ্ঠতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর মৃত্যুবোধ ও বিয়োগান্ত পরিণতির সৃষ্টিসমূহ ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রের মিলনমধুর শুভ পরিণতি দেখানোর নির্দেশকে অস্বীকার করে আধুনিক যুগ মানুষ ও বোধের প্রজন্মকে প্রত্যক্ষ করে তুলেছে। মধুসূদনের মধ্যে যেমন রেনেসাঁসের অস্বীকারের ধর্ম কাজ করেছে, বঙ্কিমচন্দ্রে তা হয় নি। তাঁর সাহিত্য

সৃষ্টিতে রেনেসাঁস কালের পরস্পর বিপরীতধর্মী ভাবধারাগুলোর একটা সমন্বয়ী রূপের প্রকাশ দেখা গেছে। বঙ্কিমচন্দ্র সমন্বয়বাদে বিশ্বাসী হলেও, সমসাময়িক মানসিকতা, সাহিত্য সংস্কৃতির ধরণ এবং সমসাময়িক জীবনাদর্শ ও ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে তাঁর একটা মৌলিক বিরোধ ছিলো প্রথম থেকেই। ঐ বিরোধ শেষ অব্দি তাঁর নিজের সঙ্গে নিজের চূড়ান্ত বিরোধে পরিণতি লাভ করে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনকে যেমন বিবেকের স্তরে উন্নীত করেছে, তেমনি সেই বিরোধের ফলশ্রুতিতেই দেখা দিয়েছে তাঁর শ্রেষ্ঠতম সাহিত্য কীর্তি 'কমলাকান্তের দপ্তর'। এক 'কমলাকান্তের দপ্তর' বিশ্লেষণ করলেই আধুনিক সাহিত্যের মূল ঝোঁকগুলোর অঙ্কুর খুঁজে পাওয়া যাবে ; এমনকি সাম্প্রতিক কালের সাহিত্য চিন্তারও বহু উৎস 'কমলাকান্তের দপ্তর'ই।

এখন রেনেসাঁসের মূল বৈশিষ্ট্য এবং সামগ্রিক চরিত্রটিকে এ প্রসঙ্গে কয়েক কথায় বলে নিলে বাংলা সাহিত্যে তার কি দান তা যেমন দেখা যাবে, তেমনি বোঝা যাবে কেন বাংলা সাহিত্য জাতীয় সাহিত্যের মর্যাদায় উন্নীত হতে পারে নি --হয়ে থেকেছে কেবল কোলকাতার সাহিত্য। রেনেসাঁসের প্রথম ও প্রধান ঝোঁকেই বাঙালী মনীষা দেবতা থেকে মানুষকে খসিয়ে এনে মানবিক মূল্যবোধ ও মানবিক বিষয়ের ওপর জোর দিতে শিখিয়েছে---তার শক্তি উৎসাহেই তরুণ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে গণ বিচরণের প্রয়াস দেখা দিয়েছিলো, সৃষ্টি হয়েছিলো আশা উদ্দীপনার এবং প্রকাশ ঘটেছিলো গুরুবাদিতা বর্জিত মুক্তি, বুদ্ধি ও যুক্তির চর্চাজাত সাহিত্য। জীবনের অপরিসীম উত্থান তাগিদে একদিকে যেমন শিল্প সাহিত্যে দেবতার স্থানচ্যুতি ঘটিয়ে মানুষকে বসতি দেওয়া হয়েছে, মানুষের মুখের ভাষাকে তার কামনাবাসনাসাধ ও দুঃখজ্বালাযন্ত্রণা প্রকাশের মাধ্যম মনে করে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে মাতৃভাষার ; অন্য দিকে তেমনি মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ও কূপবদ্ধতার বিরুদ্ধে, পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চেতনাকে আশ্রয় করে প্রগতি ও স্বাধীনতার স্পৃহাকে মূল লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে সাহিত্য ভাবনার ও সমাজ চিন্তার। ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য, রাষ্ট্রবোধ ও অর্থনৈতিক চিন্তার আধুনিক সূত্রগুলোই রেনেসাঁসের সংঘাত ও ঝঞ্ঝাবহুল আন্দোলনের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসেছে। এখানে মনে রাখতে হবে যে, পাশ্চাত্য জগতে রেনেসাঁসের যে ব্যাপক এবং সুদূর প্রসারী ফলশ্রুতি দেখা গিয়েছিলো বাংলা দেশে তেমনটি ঘটেনি। এখানে পুনরুজ্জীবনের আলোড়ন এক সংক্ষিপ্ত পরিমণ্ডলে মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যেই সমস্ত জ্বালানি শেষ করে ফেলেছে।

কোলকাতার রেনেসাঁস বৃহত্তর বাংলায় ছড়িয়ে পড়তে পারে নি। তাছাড়া কোলকাতায় যে পুনরুজ্জীবনের উথাল পাথাল আলোড়ন উঠেছিলো তার একটা মুখ্য ত্রুটি হিসেবে দেখা দিয়েছিলো সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও ধর্ম সংস্কারের আন্দোলন অভিন্ন হয়ে ওঠা। অথচ এ দুটির মধ্যে পার্থক্য থাকা বাঞ্ছনীয় ছিলো। ফলে, ভারতের অতীত গৌরব স্মরণ করতে গিয়ে যতটা না শিল্প সাহিত্যের ওপরে জোর দেওয়া হয়েছে, তার চেয়ে বহুগুণ বেশী জোর দেওয়া হয়েছে ধর্মীয় পরিমণ্ডলের ওপরে। তা ছাড়া, রেনেসাঁসের যা মৌল অবলম্বন, অন্তত পাশ্চাত্ত্য জগতের বেলায় দেখা গেছে, সেই চারু শিল্প ও কারু শিল্পের ক্ষেত্রে বাঙালী প্রতিভার বিস্ফোরণ ঘটে নি। এ ক্ষেত্রে পুনরুজ্জীবন নেই। সাহিত্যকে কেন্দ্র করেই যতটুকু যা প্রতিভাবিকীরণ এবং মানবোদ্বোধন।

বাংলা দেশে রেনেসাঁসের গণবিচরণের প্রয়াসই মুখ্য হয়ে উঠেছিলো প্রথম দিকে এবং এই প্রয়াসই প্রাণশক্তি জুগিয়েছে সাহিত্যকে। মুক্তি বুদ্ধি যুক্তি ও জীবনের উত্থান তাগিদ যা তখন সমাজের গভীরে অঙ্কুরিত এবং অনুরণিত —যা সার্বিক স্তরে স্বাদেশিকতাকে অবলম্বন করে উৎসাহিত হতে চেয়েছে—তাকে মূর্তি দেবার চেষ্টা হয়েছে মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র এবং হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রমুখ শক্তিধর লেখক কবিদের লেখালেখিতে। কিন্তু সে আশা উদ্দীপনার শিকড় ভূমি পাওয়ার আগেই শুকিয়ে গেছে—গজিয়ে উঠেছে হতাশার যুগ। মধুসূদন স্বাধীনতা ও জাতীয় সংহতিকে প্রেরণা হিসেবে গ্রহণ করে, ব্যক্তির সহস্র অনুশাসনের শৃঙ্খল মুক্তির তাগিদটিকে গভীর ভাবে উপলব্ধি করে বিষয় নির্বাচনে, চিন্তায় ও প্রকাশের মাধ্যমে অভূতপূর্ব বিদ্রোহ ঘোষণা করে বলিষ্ঠতার সঙ্গে বপন করেছিলেন আধুনিকতার বীজ এবং তারই স্বাক্ষর 'মেঘনাদ বধ কাব্য' 'বীরাঙ্গনা কাব্য' ও তাঁর ট্র্যাজেডি নাটকগুলো। যুগীয় অভীপ্সা, আশা ও আশাভঙ্গের হাহাকার যুগোত্তরী মানুষের কাছে আজো জীবন্ত। বঙ্কিমচন্দ্র একই অভীপ্সাকে উপলব্ধি করে একটা আদর্শবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সমসাময়িক বিভিন্ন স্রোতকে মেলানোর চেষ্টা করে তলে তলে কোনো কিছুর ওপরই স্থির হতে পারেন নি। ইতিহাসকে আশ্রয় করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, সমাধান পান নি। ইতিহাস ও সমকালীন বাস্তবের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছেন, তাঁকে হতাশ হতে হয়েছে। একেবারে বাস্তবকে আশ্রয় করেছেন, সেখানেও বঙ্কিমচন্দ্রের ছিলো দ্বিধা আর সংশয়। বাস্তব পরিমণ্ডলের সঙ্গে বিরোধের ফলে ব্যক্তির চূড়ান্ত অসহায়তা ও বিপন্নতার বেদনাবহ

পরিচয় উপস্থিত করার মধ্যেই তাঁর প্রতিভার স্ফূর্তি ঘটেছে। দেখেশুনে ক্ষেপে যাওয়া সে যুগের বিবেক 'কমলাকান্ত'কে আর খুঁজে পাওয়া গেলো না সেদিন —তাকে ফিরে পাওয়া গেছে প্রায় শ'খানেক বছর বাদে স্বাধীন ভারতের আবহাওয়ায়, যেখানে সবাই-ই দেখেশুনে ক্ষেপে ওঠা 'কমলাকান্ত'। তবে দীনবন্ধু মিত্রর 'নীলদর্পণ'ই যা একটু কোলকাতার বাইরেকার বাস্তব জীবনদর্পণ হয়ে উঠতে পেরেছে। এক নীল বিদ্রোহকে কেন্দ্র করেই সেদিন গ্রাম শহরে জোট বেঁধে যাওয়ার মতো একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিলো। 'নীলদর্পণ' নাটকেই এসেছে জীবন্ত ও তাজা জীবন অভিব্যক্তি এবং মাটির কাছাকাছি বিপ্লবী সত্তার আকর 'তোরাপ'। তথাকথিত সাধুসাহিত্যে নীচুতলার আঁধারের মানুষের এটিই সম্ভবত বলিষ্ঠ অনুপ্রবেশ। দীনবন্ধুই একটা ব্যাপক এবং গভীর বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিকোণ থেকে রেনেসাঁসের অন্যতম মৌলিক শক্তিটিকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন কিন্তু তাকে ধারণ করে অস্তিত্ব আলোড়নকারী প্রকাশ দেবার মতো ক্ষমতা তাঁর ছিলো না। তাঁর শিল্পচিন্তার মধ্যেই রয়েছিলো অসংশোধনীয় দুর্বলতা। ফলে রেনেসাঁসের উৎসাহকে সন্দেহ ও সংশয়ের উর্ধ্বে উঠে দেখা তাঁর পক্ষেও সম্ভব হয় নি। বিদ্যাসাগর এবং অন্যান্য মনীষীদের সমাজ সংস্কারের আন্দোলনেরও ছেদ ঘটেছে মাঝ পথেই। তাঁদের সত্যোপলব্ধি সেদিন জীবন্ত সান্নিধ্যে কোলকাতায় কিছুটা কার্যকরী হলেও ব্যক্তিত্ববান চিন্তা-নায়ক কর্মীপুরুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই কোলকাতা থেকেও মুছে গেছে—বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই 'বিধবা বিবাহ' নিয়ে সামাজিক আলোড়ন থেমে গেছে—আজো সমাজে বিধবার বিবাহ সার্বিক স্বীকৃতি পায় নি।

তাছাড়া রেনেসাঁসই বাংলা সাহিত্যের সুবর্ণ যুগ সৃষ্টি করলেও এবং ঐ যুগের সাহিত্যই পরবর্তী যুগে মডেল হিসেবে কাজ করলেও তার প্রধানতম দুর্বলতা-গুলো ছায়াপাত করে রেখেছে এমন কি আজকের সাহিত্যেও। রেনেসাঁস-সাহিত্যে যে কলঙ্ক সবচেয়ে চোখে পড়ে তা সাহিত্যে নবাগত নবজাগরণের মানুষের খণ্ডিত রূপ। উনিশ শতকের সাহিত্যে বিচিত্রিত মানুষ প্রায়ই হয়ে উঠেছে আদর্শায়িত মানুষ। দেবতাকে বর্জন করে মানুষকেই দেবতা করে তোলার প্রবণতা দেখা দিয়েছে রক্ত মাংসের তাজা মানুষের বদলে। অস্বীকার করা হয়েছে আটপৌরে বাস্তব জীবনার্তি। অথচ এমনি সব পটভূমিতে পাশ্চাত্য সাহিত্য আঘাত-সংকট আলোড়ন উত্থানের ক্ষীণতম স্পন্দনটুকুও সুস্পষ্ট চিহ্নে

চিহ্নিত করে রেখেছে—একটা জাতির ভাবমূর্তি হয়ে দেখা দিয়েছে সে সাহিত্য, অনুভব করা গেছে দূরতম মানুষটির সঙ্গেও পশ্চিমী লেখকদের অবিচ্ছেদ্য আত্মিক সম্পর্ক। বাংলাদেশের লেখক কবি শিল্পীর সঙ্গে গোটা জাতির সে নিগূঢ় সম্পর্ক সেদিনও ছিলো না, পরবর্তীকালেও গড়ে ওঠেনি। আর এই বিচ্ছিন্নতা ও তার অভিশাপ থেকে বাংলা সাহিত্য কখনোই মুক্ত হতে পারে নি।

হাফ-ফিনিস্‌ড রেনেসাঁসের অভিশাপের কবলে পড়েই বাংলা সাহিত্য ও সাধারণ মানুষের মধ্যে আসমান জমিনের ফারাক সৃষ্টি হয়ে আছে। আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বে তাই শুরু হয়েছিলো আশা-হতাশার অধ্যায়। এই আশা-হতাশার গোটা মানসিকতাই প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্র সাহিত্যে। রবীন্দ্রনাথ স্বাদেশিকতা এবং উত্থান-চেতনাকে আত্মস্থ করেছেন, কিন্তু পরিবেশের প্রকোপে আশাহত হয়েছেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই—জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দুদিক থেকেই। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই আশা-হতাশার প্রতিক্রিয়াও ঘটেছে দু ভাবে। কখনো তিনি নির্দ্বিধায় সামাজিক অবস্থা ও জনযোগাযোগহীন স্বাদেশিক চিন্তাকে অর্থাৎ ওপর থেকে স্বাধীনতার আওয়াজ দিয়ে জনসাধারণকে সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে টেনে নামানোর চেষ্টাকে তাঁর নাটক, প্রবন্ধ, উপন্যাসের মধ্যে আক্রমণ করেছেন, কখনো রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখী হয়েই তারপর একটা প্লেটোনিক সৌন্দর্যলোকে পলায়ন করেছেন—তাঁর কবিতায়। সামাজিক, রাষ্ট্রিক এবং আন্তর্জাতিক অবস্থার সঙ্গে যেখানেই রবীন্দ্র-নাথের বিরোধ দেখা দিয়েছে বা যেখানেই তিনি মানুষ এবং মনুষ্যত্বের ওপর মার বা অত্যাচার লক্ষ্য করেছেন, সেখানেই তিনি অগ্নিক্ষরা ভাষায় তার প্রতিবাদ করেছেন মানুষের মধ্যে দাঁড়িয়ে। অথচ একটা প্রবল অস্থিরতা— মুক্তিবুদ্ধিযুক্তির প্রাখর্যের মধ্যে একটা দোলাচল মনোবৃত্তি কাজ করে যুগের মহত্তম প্রতিভাকেও ক্ষুণ্ণ করেছে। তিনি 'চতুরঙ্গ'র শচীশের মতোই খানিকটা অস্থির—কোথাও ঠিক স্থির হতে পারেন নি। ফলে বারবারই তাঁর মধ্যে একটা পলায়ন প্রবণতা নিঃশব্দে এসে বাসা বেঁধে তাঁকে কখনো উড়িয়ে নিয়ে গেছে আর্য ভারতবর্ষের তপোবনে, কখনো সত্য ও প্রেমের সৌন্দর্য উপলব্ধির জন্যে প্লেটোনিক পরি-মণ্ডলে, কখনো বা তিনি নিজেই নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন আপন কল্পনা সঞ্জাত আদর্শ ভুবনে। এবং এখানেই তিনি হয়ে পড়েছেন চূড়ান্ত রোমান্টিক মিস্টিক এবং ঋষি। তিনি হলেন 'কবি গুরু'।

কল্লোল যুগে আবার দেখা গেল রাবীন্দ্রিক আর্য প্রসন্নতার এবং তাঁর 'গুরু'ত্বর প্রবল বিরোধিতা। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিকতার বিরোধিতা অবশ্য

এর কিছু আগেই শুরু হয়েছিলো, কিন্তু স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর ও সাবালকত্বের দাবীতে এ সময়েই তরুণ লেখক কবিরা সংঘবদ্ধ ভাবে রবীন্দ্রনাথের হাতে হাত রেখেই তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। এঁরা একদিকে যেমন বস্তুনিষ্ঠভাবে সাহিত্যে ব্যাপক জনসমাবেশ ঘটাতে চেষ্টা করলেন, তেমনি সাহিত্যে কালের মর্জি ফুটিয়ে তুলতে অন্যদিকে অসংকোচে সমাবেশ ঘটাতে শুরু করলেন বিদেশী মালমশলার। এঁরা দেশ দেখলেন কুমোরের কামারের ছুতোরের মুটে মজুরের, চাষীর মাঝির জেলের আর বুদ্ধিবাদী কর্মচারী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আর সাহিত্যে আনলেন জোলা, জেমস জয়েস, ফ্লবেয়ার, লরেন্স, ইয়েটস, এলিয়ট, অডেন প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য কবি ও ঔপন্যাসিকদের রচনার বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য। বিদেশী লেখক কবিদের কাছ থেকে উপকরণ চয়ণ এবং আঙ্গিক পদ্ধতি শিক্ষণে এঁরা কুণ্ঠা বোধ করেন নি। সাহিত্য দৃষ্টিকেও এঁরা ধারিয়ে নিয়েছেন সর্বাধুনিক দুটি দর্শনে : ফ্রয়েডীয় যৌনদর্শন ও মার্কসীয় সমাজ দর্শন। তবে, রবীন্দ্রানুজ কবি ও কথাশিল্পীরা পথ ধরেছিলেন ঠিকই, কিন্তু রেনেসাঁস যে কারণে উনিশ শতকের লেখকদের কাছে প্রত্যয় হয়ে উঠতে পারে নি, ঠিক একই কারণে সন্দেহ ও সংশয়ে ফ্রয়েড ও মার্কসের তত্ত্বকে ধারণ করে কোনো সুসংহত জীবনদৃষ্টি আবিষ্কার করতে পারেন নি আধুনিকতার দ্বিতীয় তরঙ্গের লেখক কবিরা। অবশ্য, সাহিত্য ক্ষেত্রে এঁরা সত্যিকারের বিপ্লবী ভূমিকা পালন করেছেন সুররিয়ালিজম, রিয়ালিজম, ন্যাচারালিজম্, স্ট্রিম অব কনসাসনেস ইত্যাদির প্রয়োগ দেখিয়ে।

এখানে একটা কথা বলে নেওয়া দরকার যে, বাংলা সাহিত্যে কখনোই নিছক শিল্পরীতির আন্দোলন দেখা দেয় নি। প্রায় সামগ্রিক ভাবেই রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে উত্থান পতনের সমতালে উৎসাহিত হয়েছে এবং অবসাদগ্রস্ত হয়েছে বাংলা সাহিত্য। আর একথা যেহেতু ইতিহাসসম্মত ভাবেই জানা যে, রাজনৈতিক আন্দোলনের চেহারাটা স্বাধীনতা দিবস পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের ১৫ই অগাষ্ট পর্যন্ত অনিরবচ্ছিন্নতা দোষে দুষ্ট, সেহেতু নব-সংগঠিত জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ ভারতবাসীর কোনো বলিষ্ঠ জাতীয় চরিত্রও গড়ে উঠতে পারে নি। বস্তুতই জনসাধারণের জ্বলন্ত স্বাধীনতার আবেগ উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্ত পরিচালিত জাতীয় আন্দোলনের সমান্তরাল হয়ে উঠতে পারে নি প্রায় কখনোই। জাতীয় নেতৃত্ব জনতার আবেগকে কখনোই যোগ্য মর্যাদা দিয়ে সঠিক খাতে প্রবাহিত করতে পারে নি। নেতৃত্বের প্রতি অগাধ বিশ্বাসে এবং স্বাধীনতার অফুরন্ত আগ্রহে জনসাধারণ রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতিটি

ডাকেই তীব্র আবেগ ও দুরান্তরগামী উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, কিন্তু জাতীয় নেতৃত্ব নিজেদের দুর্বলতায় সেই আবেগের প্রচণ্ডতাকে ভয় করে চকিতে পিছিয়ে পড়ে নিষ্ক্রিয় হয়েছে—বল্গা টেনে ধরেছে অস্থিষ্টমুখী নাছোড় আবেগের। ফলে জাতির মধ্যে জোয়ারে নদীকে প্রতিহত করার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে বারে বারে। স্বাভাবিক ভাবেই এই আহত প্রগতির জাতীয় জীবনে মহাযুদ্ধের পরোক্ষ আঘাত ও মন্বন্তরের প্রত্যক্ষ সংহার মূর্ত্তি নিদারুণ হয়ে দেখা দিয়েছে। অবলীলাক্রমে ধ্বংস ও অনাচারের মধ্যে দাঁড়িয়ে শাসন যন্ত্রের ক্লীব আক্রমণে স্বাধীনতাকামী মানুষের অহিংস আত্মাহুতির রক্ত দেখতে দেখতে একটা চরম অসহায়ত্ব ও বিপন্নতাবোধে আক্রান্ত হয়েছে বাঙালী বুদ্ধিজীবী সমাজ। জাতীয় মুক্তি ও জাতীয় পুনর্গঠনের ইচ্ছা কেন্দ্রীয় সত্য হিসেবে উপস্থিত থাকলেও, চারপাশের বিভ্রান্তকারী পরিস্থিতির মধ্যে থেকে এমন কোনো জ্বলন্ত প্রত্যয় গড়ে উঠতে পারে নি, যাতে তার শক্তি বিকীরিত হয়ে কোনো আস্থাশীল সাহিত্য সম্ভব করতে পারে যা হয়ে উঠবে জাতীয় সাহিত্য।

ফলে প্রায় একশ' বছর ধরে স্বাধীনতা আন্দোলন চললেও, একটানা সময় জুড়েই বারবার 'নবীন মাধব'-এর অপমৃত্যু ঘটেছে আর 'তোরাপ' নিজের অসহায়ত্বের জ্বালায় অক্ষম আর্তনাদ তুলেছে। এ কথা ঠিক যে, সুস্থ নেতৃত্ব পেলে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের যে প্রাণাবেগ বাঙালী তথা ভারতবাসী স্বাভাবিক ভাবেই লাভ করেছিলো, তাতে অঙ্গে অঙ্গে পুরুষকার পাওয়া ঘোড়সওয়ারী সেই উদ্দাম মানুষগুলোর পক্ষে বাহ্যিক যে কোনো গুরুতর আঘাতের বেদনা এবং আত্মিক সমস্যা সম্পূর্ণ কাটিয়ে ওঠা এবং সেই প্রাণাবেগকে জাতীয় পুনর্গঠনের কাজে নিয়োগ করা অসম্ভব হোতো না। আর সেই একই প্রাণাবেগ নিয়ে সাধারণ মানুষ নিজেকে দেশের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের অবিচ্ছেদ্য অংশী ভেবে স্বাধীন জাতির ভূমিকা পালন করতে পারতো। কিন্তু কী ১৯৪৭-এর আগে আর কী তার পরে, জাতীয় নেতৃত্ব কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে কখনোই সাধারণ মানুষের মতামত নেবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে নি, স্বীকৃতি দেয় নি তাদের দাবীদাওয়াকে এবং কখনোই মর্যাদা দেয় নি জাতীয় উৎসাহকে। ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন নেতারা ওপর থেকে নিজেরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সেগুলোকে সাধারণ মানুষের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন, নিরস্ত্র মানুষকে সশস্ত্র পুলিশের মুখে ঠেলে দিয়েছেন এবং খেয়াল খুশি মতো স্বাধীনতার আন্দোলন এবং অর্থনৈতিক আন্দোলন-গুলোকে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। ফলে জনসাধারণের ভেতরে বিক্ষোভ

এবং হতাশা জমে জমে একটা চূড়ান্ত ভ্যাকুয়াম সৃষ্টি হয়েছে—সৃষ্টি হয়েছে একটা ফাঁপা জগৎ। এই ফাঁপা জগৎটাই--প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের সময়ে যা খুব একটা চোট পায় নি—দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ কালে জাতির আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও বিশ্বযুদ্ধানুসঙ্গসমূহের সম্মেলনে বীভৎস শ্রী-তে কদাকার রূপ ধারণ করে। সমাজে এবং জীবনে তার চেহারাটা এমন ভাবে আত্মপ্রকাশ করে যে স্বাধীনতার আগুনে হাত সেঁকতে সেঁকতে বিপন্ন সাধারণ মানুষ যুদ্ধটাকেই সমস্ত ভাঙন পতন অবমূল্যায়নের জন্যে মুখ্যত দায়ী বলে মনে করে। লেখকরাও রচনা করেন এই বিপন্নতারই সাহিত্য—অসহায়ত্বের হাহাকারে ভরে ওঠে কবিতা। সাম্প্রতিক কবি-কথাশিল্পীরা পূর্ববর্তী সময় থেকে যদি কিছু পেয়ে থাকে, তবে তা অসহায়ত্ব এবং বিপন্নতার ঐতিহ্য।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, বিশ্বজোড়া অর্থমন্দা এবং পাশ্চাত্য জগতের মূল্যবোধ-ভাঙা জীবনের হাহাকার-কান্না-হতাশ্বাস ও ক্ষয়-অবক্ষয়ের ক্লেদ যে ঊষরতাবোধের হিমমরুজিহ্বা ভারতের দিকে লেলিয়ে দিয়েছিলো তাকেও ঠেকাবার মতো শক্তি ও প্রেরণা জনসাধারণের মধ্যে বর্তমান ছিলো। তারা স্পষ্টতই এগুলোর সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্যে প্রস্তুত ছিলো। বিভিন্ন নজির তুলেই দেখানো যায়, দেশবাসীর প্রত্যয়ের অভাব ছিলো না যে স্বাধীনতাই তাদের সার্বিক কল্যাণ এনে দেবে। এবং এ জন্যেই নেতারা যে ভাবেই যখন ডাক দিয়েছেন বাঙালী তথা ভারতবাসী তখনই সে ডাকে সাড়া দিয়েছে। স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্খার তীব্রতায় জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সামিল হয়ে এটাই তাদের মধ্যে স্পষ্ট হয়েছিলো যে, স্বাধীনতার যাদুস্পর্শে সমস্ত দুর্দশা ব্যর্থতাকে পায়ে দলে, জীবন বিকাশের সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে ঠেকিয়ে সুখ সমৃদ্ধি শান্তি ও স্বস্তির মূর্তিকে সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করতে পারা যাবে। আর সেই আবেগ উৎসাহেই তারা দুর্বার ভূমিকা নিয়েছিলো স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি তরঙ্গে। কিন্তু জাতীয় নেতৃত্ব সর্তভঙ্গ করে 'আপোষে স্বাধীনতা' লাভের প্রলোভনে সে আবেগ উৎসাহকে কিছুমাত্র মূল্য দেয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধাবসানে ইংরেজ সরকার ভারতকে স্বাধীনতা দানের স্বীকৃতি দিলে আগুপিছু চিন্তা না করে--কোনো রকম সুচিন্তিত নীতিনির্দেশ এবং কার্যক্রম উপস্থিত না করেই—গান্ধিজী এবং জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ জনসাধারণকে সমগ্র জাতীয় আন্দোলন প্রত্যাহার করে ফেলে বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম নায়ক শাসক ইংরেজকেই সাহায্য করতে বলেছেন এবং জাতীয় আবেগকে কোনো রকম সত্যিকারের গঠনমূলক কাজে যথার্থ প্রবাহিত করা

থেকে বিরত থেকেছেন। নিজেরা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে প্রত্যাহৃত স্বাধীনতা আন্দোলনে আহত জাতীয় আবেগের মর্মান্তিক মৃত্যু-দৃশ্য দেখতে থাকলেন উদাসীন দর্শকের মতো। এ হলো একটা দিক। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্টদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে ভারতের কমিউনিস্টরা ফ্যাসিবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগের জন্যে জনসাধারণকে ডাক দিয়েছেন। এ ডাক বৃহত্তর পৃথিবী ও মনুষ্যত্বের দিক থেকে সেদিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিলো সন্দেহ নেই, কিন্তু তা ভারতীয় জনমানসের প্রখর উৎসাহকেই জব্দ করে দিয়েছে এবং তার প্রতিক্রিয়ায় ভারতবাসী সরাসরি একটা অনাচারী পরিস্থিতির খপ্পরে পড়ে সম্পূর্ণ শ্লথ চরিত্রের হয়ে পড়েছে।

ভারতীয় জীবনের অস্তিত্ব ঘেঁসে নেমে এলো দুঃসময়। বেঁচে থাকার জন্যে ভয়ঙ্কর মোকাবিলা করতে নেমে নারীমূল্যে পণ্যদ্রব্য সংগ্রহের দুর্দিনে কালো-বাজারে দেশীয় বণিকদের মুনাফা শিকারের জঘন্য তৎপরতা দেখে বা দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যুর মধ্যে দাঁড়িয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে সাধারণ মানুষ—পচন ধরেছে তাদের সংগ্রামী চেতনায়। এই সঙ্গেই ফ্যাসিবাদী যুদ্ধ প্রতিরোধের জন্যে আমদানীকৃত ইঙ্গ মার্কিন সৈনিকের বারুদ আর ইস্পাতের বীভৎসতায় স্তব্ধ 'মধুবংশী'র গলিতে 'বাঁকা টুপি পরা কোন আমেরিকান কাপ্তেনের লোলুপ শিশ তরুণী রাত্রির গালে চাবুক' মারলে শিহরিত হয়েছে সানের শহরের চূড়ান্ত সংকটগ্রস্ত বুদ্ধিজীবী। হতাশা এবং ক্লান্তিতে চোখের সামনে সমগ্র অস্তিত্ব নিয়ে মানুষকে পাপপঙ্কে তলিয়ে যেতে দেখে এবং নিজেদের বেক[illegible]ত্ব ও অজস্র সংকটে দিশাহারা হয়ে তারা লাভ করেছে যৌবনের রুক্ষ শূন্যতা। ব্যক্তিগত জীবনের শূন্যতার পরিসর ক্রমশ ব্যাপ্ত হতে হতে অবশেষে নামিয়ে এনেছে সংঘবদ্ধ নির্জনতা বোধ। 'নগ্ন নির্জন' বুদ্ধিবাদীর কাছে আত্মবিনষ্টির চিন্তা প্রলোভন হয়ে দেখা দিয়েছে আর তার খোরাক হয়ে এসেছে পাশ্চাত্য ভূমিখণ্ডে যুদ্ধের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে লিপ্ত জাতিগুলোর যুদ্ধক্ষত জীবনের কাৎরানি আর অবসাদ, মৃত্যুতুহিন প্রাণ ও প্রজ্ঞার রিক্ততা, জন্মের গ্লানি, টিঁকে থাকার জন্যে আপ্রাণ জমিতে ও যোনিতে আর যুদ্ধে 'সিফট নিয়মে' খাটুনি দেবার যান্ত্রিকতা ও মনুষ্যত্বহীন চরাচরে নিজের আইডেন্টিটি উপস্থাপনের জন্যে খুন রাহাজানি ধর্ষণের মধ্যে থেকে সরাসরি সমাজদ্রোহিতা। ফলে, পিতামাতা ধর্মপুণ্য ভবিষ্যৎ মনুষ্যত্ব প্রেম ভালোবাসা ও শান্তি সম্পর্কে পাশ্চাত্য মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই যে বিতৃষ্ণা দেখা দিয়েছিলো এবং সেগুলোকে জখম করার জন্যে তাদের

যে ক্রোধ-ক্ষিপ্ত আচার-আচরণ পুরোনো মূল্যবোধকে ধ্বসিয়ে এক নরকের আবহাওয়ায় গোটা মানুষের হাহাকার জাগিয়ে তুলেছিলো তারই রক্তহীন পাণ্ডুলিপি—'পেঙ্গুইন' 'পেলিকান' বাহিত ইংরেজী শিশার ক্লেদ ও কলতানি—বাঙালী লেখক ও বুদ্ধিবাদীদের মেধা দখল করে ফেললো। শুধু এ কেন, গোটা ভারতের জন্মেই দুরারোগ্য রোগ আর অবক্ষয়বাহী জাহাজ ভীড়েছে গঙ্গার ঘাটে। ভারতীয় সমাজ মানসে এই সর্বপ্রথম এবং সার্বিক ভাবে দুর্নীতি ও অনাচার স্বীকৃত হোলো—কর্ষিত হোতে থাকলো সমাজবিরোধী কার্যকলাপ। তবুও দেশ সাধারণ ভাবে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে উচ্চাশাই পোষণ করে ছিলো। ভাবা গিয়েছিলো যে, স্বাধীনতা পেলে এই ভয়াবহ পাপ-পরিবেশ মুছে ফেলে, সমস্ত নৈরাজ্য কাটিয়ে একটা স্বাধীন জাতি হিসেবেই নিজেদের বেঁচে থাকার সমস্যাগুলোর সমাধান করতে পারবে এবং আত্মিক সমস্যা নিয়েও মোকাবিলা করতে পারবে। তাই দ্বিধা থাকলেও তারা তাদের 'অগ্নিগর্ভ স্বাধীনতা'র আবেগকে সেদিন নেতৃত্বের মুখ চেয়ে প্রত্যাহার করে নিয়েছে এবং অসীম ধৈর্যের সঙ্গে মার মারী দুর্ভিক্ষ ও খুন রাহাজানির নৈরাজ্যকে উপেক্ষা করে নিষ্ক্রিয় থেকেছে। পরিণামে গোটা জাতিই একটা বেতো ঘোড়ায় রূপান্তরিত হয়েছে।

প্রকৃত পক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর্বে দেশবাসীর মধ্যে স্বাধীনতার জন্মে আবেগ পোহানো এবং শূন্যে ওড়া 'জাপানী বিমান'-এর দিকে চেয়ে 'ফ্যাসিবাদী যুদ্ধ নিপাত যাক' শ্লোগান-দেওয়া ছাড়া অন্য কোনো তৎপরতাই পরিলক্ষিত হয়নি। বরং নতুন-সৃষ্টি-অসম্ভব বন্ধ্যাভূমিতে কবি সমর সেন চিত্রিত নতুন অর্থের দ্যোতক ধৃতরাষ্ট্র, অগ্নিবর্ণ এবং পাণ্ডু প্রতীকের বাস্তব রূপই দেখা গেছে রাজনীতিতে, বিকৃত যৌনাচারে, রোগগ্রস্ত সমাজে এবং নপুংশক ব্যক্তিত্বে। তাব ফলে, যুদ্ধাবসানে স্বাধীনতা দানের টাল বাহানায় যদিও ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে নেতৃত্বের ডাকে জনশক্তি দুর্বার হয়ে উঠেছে, কিন্তু ততক্ষণে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরতি কালে ব্যবহারিক জীবনচর্যায় অভিশপ্ত জাতি নেতৃত্বের মতোই একটা আপোষকামী মনোভাব পোষণ করে প্রতীক্ষিত সংঘর্ষ—যা জাতির অগ্নিপরীক্ষা—তাকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছে। এই একটি ক্ষেত্রেই নেতৃত্ব ও সাধারণ মানুষ সমান মনোভাবাপন্ন হোলো এবং তার ফলশ্রুতিতে জাতির অবমনস্কতার সুযোগে অপ্রতিরোধ্য সর্বনাশ প্রবেশ করলো ভারতবর্ষে। একদিন যারা ইংরেজের কার্জনী চক্রান্তকে ব্যর্থ করেছিলো সেই চক্রান্তের পুনরাবৃত্তিকে কোনোরকম চ্যালেঞ্জ না জানিয়ে তারা 'র‍্যাড্‌ক্লিফ বাঁটোয়ারা'র স্বপক্ষে তড়িঘড়ি

রায় দিয়ে দিলো—লাভ করলো ভারতবর্ষের অখণ্ড জাতীয়তা ও সংহতিকে খুন করে দাঙ্গার রক্তে ও লাঞ্ছনার কান্নায় সিক্ত ভারত ও পাকিস্তান।

তবু রক্তাক্ত সীমানার দু'পাড়ে স্বাধীনতার প্রাথমিক উৎসাহে মানসিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক গ্লানি দূর করে জাতীয় পুনর্গঠনের সুদূরপ্রসারীর আশা আকাঙ্খায় এবং জীবনের নতুন স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ হতে চেয়েছে আপামর মানুষ সাধারণ। কিন্তু 'সে এক বিরাট রাত / কি পিচ্ছিল তিমির আকাশে / লোভের পাপের বাতি জ্বলে রোজ রাতের মিশরে / মৃত্যুর তোরণ দ্বার পার হয়ে শবের মিছিল / ব্যথা জয়ে ব্যবচ্ছেদাগারে / মারীমড়কের বিষে জর্জরিত ধূসর মাটিতে।'* বিষে জর্জরিত ধূসর মাটিতে একযোগে জন্ম নিয়েছে দু'টি শিশু, ১৯৪৭ সালের সন্তান—একটি ভারতীয় অভিজ্ঞতার কাছে সম্পূর্ণ নতুন একটা জাতি, উদ্বাস্তু ; অন্যটি অতি সাম্প্রতিক কবি সাহিত্যিক সমাজ। এরা দুয়েই উপদ্রুত, অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত এবং অবাঞ্ছিত। স্বাধীনতা উৎসবের মৌভোগের উচ্ছিষ্ট যাদের কাছে বদহজম সংক্রান্ত রোগের জন্ম দিয়েছে, বেঁচে থাকার জন্যে প্রতি পায়ে পায়ে নারীর নারীত্ব পুরুষের মর্যাদা হারিয়ে শোকে দুঃখে অপমানে লাট খেতে খেতেও যাদের লড়াই চালিয়ে জমি ও জীবনকে জবর দখল করে নিতে হয়েছে সেই উদ্বাস্তুদের মধ্য থেকেই এসেছে সাম্প্রতিক কবি-লেখকদের বড় অংশটি। ফলে পূর্ব বাঙলার নানা অঞ্চলের মানুষ তাদের প্রতারিত আত্মার দাবী দাওয়ার ঘোষণা দিয়ে জীবন যাপনের ক্ষেত্রে সমগ্র প্রতিকূলতার সঙ্গে কব্জি কষতে কষতে ট্রানজিট ক্যাম্পে, রেলওয়ে স্টেশনের প্লাটফর্মে স্বাধীনতার রংচটা সাইন বোর্ডের সামনে যেমন কাণ্ড মোটা করে প্রতিষ্ঠিত হতে চেয়েছে, তেমনি তারই মধ্যে থেকে বা পাশাপাশি স্বকীয় জীবন অভিজ্ঞতা দিয়ে নতুন সাহিত্য রচনা করেছে তরুণ সাহিত্যস্রষ্টারা।

সামগ্রিকভাবে নেতৃত্বের অপদার্থতা এবং ইংরেজের নিষ্ঠুর শত্রুতায় জাতির কোমর ভেঙে গেলেও স্বাধীনতা খুবই উৎসাহের সৃষ্টি করেছিল দেশবাসীর মধ্যে। প্রতি মুহূর্তেই সে আশা করেছে শুভ সম্ভাবনার। কিন্তু বিশ-বাইশ বছরেও স্বাধীন দেশ সে প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে নি। স্বাধীন সরকার কোন সঠিক নীতি অনুসরণ তো করতে পারেই নি বরং জন-জীবন নিয়ে কেবলই ছিনিমিনি খেলেছে। একটার পর একটা পাঁচশালা পরিকল্পনা করেছে অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যে, দেশবাসী প্রত্যেক বারই ভেবেছে এই পরিকল্পনা তাদের জীবনকে

* পৌষ—তরুণ সান্যাল

স্থিরতর করবে। কিন্তু তা ব্যর্থ হতে পাঁচ বছরের দরকার হয় নি—সাত বছর ধরে চতুর্থ পাঁচশালা পরিকল্পনার প্রহসন রচনাই সম্ভব হয় নি। জীবনযাত্রা নির্বাহের সমস্যাগুলোর সমাধান দূরে থাকুক, ক্রমাগতই বেঁচে থাকা দুঃসহ হয়ে উঠেছে শ্রমিক-কৃষক মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষের। আর এই দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন শ্রেণী-স্বার্থের রাজনৈতিক দলগুলো দলীয় স্বার্থের প্রয়োজনে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষকে ব্যবহার করতে চেয়েছে। কংগ্রেস নেতৃত্বের ইতিহাস সম্পূর্ণই প্রায় ব্যর্থতার ইতিহাস হওয়া সত্ত্বেও সদ্য স্বাধীন জাতি দীর্ঘদিন তার ওপর অগাধ আস্থা রেখে স্বাধীনতাকে চোখের মণির মতো রক্ষা করতে চেষ্টা করেছে—শিশু রাষ্ট্রের দোহাই দিয়ে 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়' শ্লোগানকে প্রশ্রয় দেয় নি। কিন্তু সে বিশ্বাসকেও অশ্রদ্ধা করা হয়েছে। জাতীয় পুনর্গঠনের কোন কাগুজে পরিকল্পনার মধ্যেও জাতির বাস্তব অভীপ্সাকে স্থান দেওয়া হয় নি। পরিকল্পনাগুলো ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে—জাতির স্বার্থ না দেখে বিভিন্ন জনস্বার্থ বিরোধী নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে মানুষের মোহভঙ্গ ঘটতে দেরী হয় নি। স্বার্থপর ধনিক শ্রেণীর সরকারের চরিত্র ফাঁস হয়ে পড়েছে সর্বস্তরে সাধারণ মানুষের কাছে। দেশের সামগ্রিক দুরবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার পূর্বকালে ইংরেজ যেখানে ভারতের কাছে ঋণবদ্ধ ছিলো, উত্তর-স্বাধীনতা সময়ে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব সেখানে বিদেশের কাছে দেনার দায়ে গোটা দেশটাকেই বিকিয়ে দিতে বসেছে। সাহিত্যে জাতীয় দুরবস্থার এই ছাপই প্রত্যক্ষভাবে দেখা দিয়েছে। সাহিত্যের নায়ক প্রিয়রঞ্জন দুপুরে ঘুমের মধ্যে স্বপ্নের ভেতরে অনুভব করেছে অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ছে, ঘুম থেকে জেগে উঠে বুঝেছে তা বৃষ্টি নয়—বৃষ্টিপাতের শব্দ শোনে নি সে ঘুমের মধ্যে, এ হোলো চারতলা থেকে ট্যাঙ্কের জল উপচে পড়ার শব্দ। এই ভুল এবং ভুল ভাঙার অস্বস্তিই ভরে থাকে প্রিয়রঞ্জনের সমস্ত সময়—সে নির্জীব হয়ে পড়ে স্নায়ুর ওপর উৎপীড়নের জন্যে। শুধু প্রিয়রঞ্জন নয় গোটা ভারতবাসীই সুফলা বৃষ্টির শব্দ শুনে জেগে উঠে স্বাধীনতার পর প্রত্যেকদিন হতাশ হোলো—এই ভুল আর ভুল ভাঙার অস্বস্তি দিয়েই গড়ে তোলা হয়েছে সাম্প্রতিক সাহিত্যের অবয়ব।

এই ভুলের পিছনে ছোটা এবং ভুল ভাঙার অস্বস্তিকে পূর্বসূরী কবি-লেখকরা অনুভব করতে পারলেও কারণটা জেনে সম্ভবত সংগ্রামের শক্তি সামর্থের অভাবে বা ঝুট ঝামেলা এড়িয়ে খানিকটা তোফা থাকার তাগিদে পলায়নের খুব সহজ পথ বেছে নিয়েছেন। কেউ ঐতিহাসিক উপন্যাসে আশ্রয় খুঁজেছেন, কেউ বা

রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজে অথবা স্বাধীনতার মৌভোগে মত্ত উচ্চবিত্ত উচ্চ-মধ্যবিত্ত সমাজের নীতি নিয়মহীন জীবনযাত্রার কেচ্ছাচার ও ব্যভিচার-সর্বস্ব যৌন স্বেচ্ছাচারের কাহিনী প্রচারে ; কেউ কেউ বা ঈশ্বর বা অবতার চরিত্র চিত্রণে। এবং অনেকেই ভুলের পেছনে ছুটে ব্যর্থ হয়ে আত্মানুসন্ধানের জন্যে বেছে নিয়েছেন স্বেচ্ছা-নির্বাসন। আর সেই ডামাডোলের মধ্যে বুর্জোয়া এস্টাব্লিশমেন্ট ধীরে ধীরে কব্জা করে নিয়েছে স্বাধীনতাপূর্ব কালের প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক-সম্প্রদায়কে যাদের একটা বড় অংশ কলম চালানোর জন্যে পরিশ্রমের চেয়ে নির্ঝঞ্ঝাট অর্থ ও নাম যশ পাওয়ার সহজ উপায়ের টানে এস্টাব্লিশমেন্টের দাসত্বকেই শ্রেয় মনে করলেন। দাঙ্গা, স্বাধীনতা, উদ্বাস্তু জীবন, জাতীয় পুনর্গঠনের জন্যে শিল্পনগরীর পত্তন ও ভারী শিল্প স্থাপনের মধ্য থেকে যে সব আলোড়ন দেখা দিয়েছে, তা নিয়ে ছিটেফোঁটা রচনা প্রকাশ পেলেও সামগ্রিক ভাবে কোন শক্তিশালী লেখা কেউ লিখলেন না—সাহিত্যে মূর্তি পেলো না জাতীয় অভীপ্সা।

অথচ, সাম্প্রতিক সময়ের সাহিত্যই জাতীয় সাহিত্য। এ সাহিত্য অবিশ্বাসের সাহিত্য—নিগেশনের সাহিত্য। সময় সমাজ জীবন থেকে যে বিষ উঠেছে সেই বিষ কণ্ঠে ধারণ করেই কবি উচ্চারণ করেছেন—'না'। এই 'না' ব্যবহারের দিক থেকে লেখক কবিদের কেউ সমাজ ও জীবনের প্রতি সম্পূর্ণ দায়িত্বশীল কেউ বা তা নন। একজনের সঙ্গে অন্যজনের পার্থক্য অস্বীকার ও অবিশ্বাস করার ব্যাপারে এ্যাটিচিউডের। রীতি এবং আঙ্গিক নিয়ে নানা প..ক্ষানিরীক্ষার ভেতর থেকেও তরুণ সাহিত্যিক সমাজ অভূতপূর্ব সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। ভাঙতে চেষ্টা করছেন সব কিছু—গড়ে তোলার তাগিদও লক্ষ্য করা গেছে। সমাজের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে পরিবর্তনের বুদ্বুদ এবং এ ইঙ্গিতটুকু আছে জেনেই অন্বেষণ শুরু হয়ে গিয়েছিলো আজ থেকে দশ বছর আগেই। "সুতরাং শিল্প ও জীবন তৃষ্ণার সঙ্গে এই হরিণ হরিণীর ব্যাপারটা গোড়া থেকেই আছে। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শনের শ্রেষ্ঠ কবি কল্পনায়ও তাই এই হরিণীর image। হরিণ, হরিণীকে খুঁজছে। জীবন শুদ্ধতাকে খুঁজছে।"*

* চর্যাপদের হরিণী—দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বভারতী

[ভারতে ধনতন্ত্রবাদের পূর্বাভাস—পশ্চিমী ধনতন্ত্রবাদের অনুপ্রবেশ—স্বদেশী ধনিকশ্রেণীর উদ্ভব এবং তাদের নেতৃত্বে ও স্বার্থে পরিচালিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন—পাশ্চাত্ত্য জগতের নতুন নতুন চিন্তা চেতনা ও তা থেকে ভারতীয়দের স্বদেশ চিন্তার পুষ্টিবিধান—উনবিংশ শতকের সাহিত্যিকদের ওপর তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব—সাম্প্রতিক পূর্ব সময়ের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা—সাম্প্রতিক লেখকদের পূর্বসূরীদের কাছ থেকে পাওয়া উত্তরাধিকার ।]

"নিত্য তুমি খেল যাহা, নিত্য ভাল নহে তাহা
আমি যে খেলিতে কহি, সে খেলা খেলাও হে।"

* * * *

"চলে রায় পাছু করি কোটালের থানা।
দেখে জাতি ছত্রিশ ছত্রিশ কারখানা ॥
চৌদিকে সহর মাঝে মহল রাজার।
আট হাট ষোল গলি ছত্রিশ বাজার ॥" *

আগন্তুকের মুখের 'বাঁশিটি' কোন ভুবনের শব্দে কবিকে মাতিয়ে তুলেছিলো, সে কথা নাই-বা বলা হোলো। শোনা যায়, রাম জন্মানোর আগেই নাকি রামায়ণ লেখা হয়ে গিয়েছিলো। প্রবাদের পেছনে হয়তো বা কিছু সত্যতা থেকেও থাকবে। তা থাকুক বা না থাকুক, ভারতে ধনতন্ত্রবাদ পোঁছোনোর বহু আগেই মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠতম কবির কণ্ঠে শোনা গিয়েছিলো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সুর, 'আমি বলছি, এতদিন ধরে রোজ রোজ তুমি যা খেলেছ, তা একঘেয়ে। এখন আমি যেমন খেলতে বলছি, তেমনি খেলো। তোমার ভালো লাগুক কি না লাগুক কিছু যায় আসে না।' মধ্যযুগে ব্যক্তির প্রথম কণ্ঠ এবং প্রথাবাঁধা

---

* অন্নদামঙ্গল—ভারতচন্দ্র

কবির আত্মপরিচিতির অংশ নয় বলেই আমাদের কাছে উক্তিটির গুরুত্ব অনেক বেশি।

এ কথা ঠিকই যে, পশ্চিমী বুদ্ধি-মুক্তি-যুক্তিবাদ— সেদিনের সামন্ততন্ত্র ভাঙা প্রগতিশীল প্রজন্মের ধনতন্ত্রবাদ এবং তার ঔরসজাত বুর্জোয়া ভাবধারা, যা ব্যক্তিকে মুক্ত করেছে ও তারই প্রকাশে সমুজ্জ্বল হয়ে ব্যক্তির সংস্কৃতি পত্তনি পেয়েছে, ইংরেজী বুটের শব্দেই তা ভারতের বুকে ধরা পড়েছিলো। কিন্তু ভারতবর্ষের মাটিতেও যে ধনতান্ত্রিক বিকাশ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিলো, পশ্চিমী ধনতন্ত্রবাদের উতরোল প্রগতিকে না দেখলেও—সামন্ততন্ত্রের প্রতি তাঁর প্রবল টান থাকা সত্ত্বেও ভারতচন্দ্র তা অনুভব করেছিলেন। রেনেসাঁসের তুমুল বিস্ফোরণ না ঘটলেও সামন্ততান্ত্রিক বাংলারও তেমনি একটা প্রজন্মে ধনতান্ত্রিক জগতে ঢুকে পড়ারই সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিলো সেদিন। কেননা, কেউ চেয়ে থাকুক বা না, সেদিনের পৃথিবীর একটা বড় অংশ ক্যাপিটালিষ্ট জগতে সেঁধিয়ে পড়েছিলো, রোধ করার উপায় ছিলো না।

প্রায় দু'শ বছর আগে কোথায় ছিলো সে শহর জানি না। কিন্তু কবির পিছে পিছে গিয়ে দেখা হোলো 'ছত্রিশ' রকমের 'জাতি' (কবি কথিত 'বর্ধমান'কে কোলকাতা মনে করতে আপত্তি কি?) 'ছত্রিশ' (সংখ্যাটা বহুত্ব-জ্ঞাপক?) রকমের 'কারখানা'। 'রাজার মহল'-এর (লাট প্রাসাদের?) চারদিকে 'সহর'। শহরের 'আট হাট ষোল গলি, ছত্রিশ রকমের বাজার (শ্যামবাজার, রাধাবাজার, রাজাবাজার, বড়বাজার, লালবাজার, চীনাবাজার, বৌবাজার ইত্যাদি নাকি?) সেখানে টোল পাঠশালায় 'বেদ', 'ব্যাকরণ', 'অভিধান', 'স্মৃতি', 'দরশন' পঠনপাঠন হয়। 'দেবালয়ে' পূজাপার্বন হয়। 'বৈদ্য দেখে নাড়ী ধরি কহে ব্যাধি ভেদ। চিকিৎসা করায় পড়ে কাব্য আয়ুর্বেদ ॥' বিভিন্ন শ্রেণীর 'কায়স্থ্য' (মধ্যবিত্ত উচ্চমধ্যবিত্তরা?) জাতি 'দেখে রোজগারি'। তাছাড়া আছে নানা ধরণের বেনিয়ারা 'মনিগন্ধ সোনা কাঁসারী শাঁখারি' আর অন্য আরো সবার সঙ্গে 'বাজীকর' 'ভাঁড়' 'নর্ত্তক' 'জাহাজী' এরাও আছে। এমন একজন কোনো সুন্দরীর নাম নিশ্চয়ই আছে যার কথা লোকমুখে খৈ ফোটায় আর চলতে গেলেই 'পদে কাম ফাঁস' লাগেই। অর্থাৎ এ শহরে ভালোবাসা আছে যেখানে কামবাসা অব্যর্থ। প্রেমে বসন খসে পড়তে চায়, তবু 'ভারত কহিছে শাড়ী পড়লো কসিয়া।' কিন্তু হায়! পরবর্তী অধ্যায়ে 'বিবর' 'প্রজাপতি' 'স্বীকারোক্তি' 'পাতক'। কেউ চাক বা না-চাক, ধনতান্ত্রিক সভ্যতা বিকাশের অমোঘ নিয়ম।

অষ্টাদশ শতকে ভারতচন্দ্রের ধ্যানে যা ধরা পড়েছিলো, বাস্তবে কিন্তু হোলো তা বিলম্বিত। ইংরেজ এসে পড়েছে জাঁকিয়ে। তার পায়ের তলায় পিষে গেলো সম্ভাবিত দেশজ ধনতন্ত্র। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাও ইংরেজের মর্জিতে পুনর্বিন্যস্ত হোলো। কিন্তু তলে তলে যে বিস্ফোরণের আগুন ধোঁয়া ছড়াতে সুরু করেছিলো তাকে রোধ করা গেলো না। চাই ব্যক্তির মুক্তি। গ্রহণ করা চাই যুক্তি দিয়ে আচার আচরণ সংস্কার ধর্ম সব কিছুকে। চাই সামন্ততান্ত্রিক নাগপাশ কাটিয়ে নিজেকে মুক্ত করে আনা। বেগবান আবেগ বাধা পেলো নিষ্ঠুর পরাধীনতায়। সৃষ্টি হলো বিভিন্ন মুখী ভাবধারার আবর্ত। আলোড়ন বিস্ফোরণ। আবিষ্কারের উন্মাদনা দেখা দিলো সমস্ত দিকে। একদিকে রক্ষণশীলতা। রক্ষণশীল দল নতুন ব্যাখ্যা দিতে চাইলেন যা আছে তার। তাঁরা প্রাচীন ভারতকে আবিষ্কার করলেন, পেতে চাইলেন হিন্দু কালচারকে। অন্যদল যা আছে তার সব কিছুকে করলেন অস্বীকার। তাকে আঘাত করে তৃপ্তি পেতে চাইলেন। তাঁরা আবিষ্কার করলেন পশ্চিমকে, মূলত ইংরেজ কালচারকে। আর তৃতীয় দল নিলেন উদারনৈতিক মত। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে চাইলেন সমন্বয়।

বাংলার রেনেসাঁসের দিনে এই ত্রিধারারই গুরুত্ব সমান। তবে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে পাশ্চাত্ত্য ভাবনাবাদ ও অতীত গৌরবী প্রাচ্যতা। কিন্তু সমাজ সংস্কার, যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ, স্বাধীনতাস্পৃহা, জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি আর্তি এ সব কিছুই এসেছে ইউরোপ থেকে—সঙ্গে এসেছে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে ইংরেজী ও ফরাসী সাহিত্য শিল্প। এটাই ইউরোপের ক্যাপিটালিজমের দান—বুর্জোয়া ভাবধারা। দেহ মন অস্তিত্বে মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলাদেশের প্রথম এবং সর্বাঙ্গীন বুর্জোয়া ভাবাদর্শের সৃষ্টি ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে প্রোজ্জ্বল পুরুষ। অন্যদিকে যে প্রাচ্যগৌরব উদ্বোধন—অতীতের যবনিকা তুলে পাশ্চাত্ত্য ভাব-ধারার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অবলম্বন ও অন্বেষণ, তা অল্পবিস্তর সবার মধ্যেই ছিলো। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ইংরেজী শিক্ষার আলোকেই আবিষ্কৃত ইউরোপকে গ্রহণ করতে করতেও আত্মহারা হয়েছেন 'ললিতগিরি খণ্ডগিরি'র কথা বলতে, কালিদাসের কাব্যের সৌন্দর্যে পশ্চিমী মহাকবি নাট্যকারের লেখার সৌন্দর্য প্রায় ম্লান করে দেবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁর চিন্তা চেতনাতেই বেশ বাসা বেঁধেছিলো বুর্জোয়া ভাবাদর্শের বীজ। ট্র্যাজেডির উৎসই যে সেইটি। বঙ্কিমের মতো অতবড় প্রতিভাও তার আঘাত থেকে নিস্তার পায় নি। ভেতরে ভেতরে সে বীজ বেড়ে উঠেই ঘটিয়েছিলো সেই দ্বন্দ্ব, যা তাঁকে প্রতি মুহূর্তে আলোড়িত

করিয়েছে—কি করি, কি করি না প্রশ্নে! এবং কোনো সমাধান তিনি পান নি। মাইকেল মধুসূদন দত্তকে প্রথম যুগে স্বীকার করতে বঙ্কিমের দ্বিধা ছিলো, কিন্তু তিনিই মাইকেলের মৃত্যুর পর পতাকা উড়িয়ে তাতে 'শ্রীমধুসূদন' লিখে দিতে বলেছিলেন। আর এই বিরোধের সার্বিক গ্রাসে বুঝি শেষ পর্যন্ত ফ্রাস্ট্রেশনই এসেছিলো তাঁর। এ প্রসঙ্গে 'কমলাকান্তের দপ্তর' আরো একবার উল্লেখের দাবী রাখে। বহু চেষ্টা-চরিত্রতেও পশ্চিমকে রোধ করা যায় নি। 'মুচিরাম গুড়'এর সামন্ততান্ত্রিক অস্তিত্বের ওপর ক্যাপিটালিষ্ট জগতের ভাবধারার প্রভাব দিলো স্বাধীনতার বেগবান তাগিদ। দেশের নবজাগরিত মানসিকতার তিন স্রোতকে একই বেদনায় মোচড়াতে পারলো স্বাধীনতার বোধ। এটাই বাংলার রেনেসাঁসের সার্বজনীন আবেদন।

তবে রেনেসাঁসের মূল স্বরগুলো প্রায় সমস্তই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়েছিলো। রবীন্দ্রজীবনের প্রাথমিক পর্বে প্রাচ্যগৌরব ভাবনাই ছিলো প্রখর যার ফলে তিনি মাইকেলকেও এক হাত নিতে কসুর করেন নি। তবে রবীন্দ্র-বিকাশের একটা ক্রম আছে। প্রাচ্যতার প্রতি তাঁর আগ্রহ অবশ্যই সেদিন প্রখর ছিলো, কিন্তু অন্ধ আচারকে তিনি কখনো বরদাস্ত করেন নি। ক্রমশ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের একটা মিল দেখার চিন্তাও তাঁর মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। এখানে ঠাকুর বাড়ির উদারনৈতিক এবং বুর্জোয়া ভাবধারাপুষ্ট ব্রাহ্ম আবহাওয়াই তাঁর ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। এই মিল নিয়েই গবেষণা করেছেন তিনি এবং তারই ফলশ্রুতিতে বুঝি জন্ম নিয়েছে 'চতুরঙ্গ' উপন্যাস। আর সোচ্চার হয়ে উঠেছেন 'গীতাঞ্জলি'তে 'পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার / সেথা হতে সবে আনে উপহার / দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে' বলতে। 'চতুরঙ্গ'তে জ্যাঠামশাই-এর প্রখর যুক্তিবাদ থেকে শচীশ ছিটকে পড়েছে লীলা-নন্দস্বামীর আশ্রমে। দামিনী সেখানে দাহ—সে দেহ, তার ভালোবাসা দেহজ অভিপ্রায়। শচীশ অস্থির। মেলানো সম্ভব হয়নি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে। কিন্তু জয়ী হয়েছে পশ্চিমের সৃষ্টি—ক্যাপিটালইজমের দান ব্যক্তির অস্থিরতা। 'যোগাযোগ'-এ তো অনিবার্য ক্যাপিটালইজমের কাছে সামন্ততান্ত্রিক আদর্শ-বাদের 'আনকণ্ডিশনাল সারেণ্ডার'ই দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। 'গোরা' উপন্যাসে তাই ঘোষিত হয়েছিলো 'বর্তমানে যা সম্ভব তাই আমাদের সাধনার বিষয়।' পরে রবীন্দ্রনাথ প্রায় সম্পূর্ণভাবেই পশ্চিমকে স্বাগত জানালেন। প্রথম মহা-যুদ্ধের পর থেকে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে উন্মুক্ত হোলো আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে

অঙ্গে অঙ্গে আদর্শে আদর্শে যুক্ত স্বদেশ। ধনতন্ত্রবাদ ও বুর্জোয়া ভাবাদর্শের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়ানো বাংলার মনন মেধা এবং সভ্যতার সংকট থেকে ইংরেজের কলোনী ভারতেরও মুক্তি পাবার উপায় নেই। কিন্তু বিশ্বের মহত্তম প্রতিভা সেদিন বিনা দ্বিধাতেই স্বাগত জানিয়েছিলেন নতুন ইতিহাসের প্রোজ্জ্বল অধ্যায়কে। বিশ্বের কারুর মুখে শুনে নয়, নিজের চোখে লৌহ যবনিকার অন্তরালে নিষিদ্ধ দেশ দেখে বলে উঠেছিলেন 'এ দেশে না এলে এ জন্মের স্বর্গ দেখা বাকি থেকে যেতো।' আশাবাদী কবির 'ঐ মহামানব আসে' ধ্বনিকে দেশ হয়তো তাঁর অজস্র গানের একটা অন্যতম গান হিসেবেই গ্রহণ করেছে, কিন্তু তার তাৎপর্য তাঁর মৃত্যুর আটাশ উনত্রিশ বছর পরে প্রত্যক্ষ সত্য। আজ কেউ না চাইলেও পৃথিবী সমাজতান্ত্রিক আবহাওয়া মণ্ডলে ঢুকে পড়েছে। পৃথিবীর তিনভাগ মানুষের অন্তত দু'ভাগ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির আওতায় সেকেণ্ডে কয়েক লক্ষ মাইল করে এগিয়ে যাচ্ছে। উনিশ শতকের রেনেসাঁসের পীঠভূমি ১৯৬৭-'৬৯ এর বাংলা দেশ বুদ্ধিজীবী কবিসাহিত্যিকদের চাওয়া না চাওয়ার অপেক্ষা না রেখেই এই পরিবর্তনের চিহ্ন গায়ে পরেছে।

তবে এখানেই একটা কথা বলে নেওয়া দরকার যে, বৃহত্তর জনসমাজের মধ্যে ১৯৬৭'-৬৯-এর উত্থানের যে প্রস্তুতি তাকে সাহিত্যে প্রায় এড়িয়েই যাওয়া হয়েছে। বুদ্ধিজীবী কবিসাহিত্যিকরা চেহারায় ধনতান্ত্রিক অথচ সামন্ত-তান্ত্রিক ভারত সরকারের স্বরূপটা বুঝে উঠতেই বেশ সময় নিয়েছেন এবং অবশেষে বুঝেছেন, কী মারাত্মক পক্ষাঘাতগ্রস্ত জীবনযাপন স্থায়ী হয়েছে স্বাধীনতায়। এ প্রসঙ্গে ১৯৬১ তে লেখা দেবেশ রায়ের 'উপকথার নায়ক' গল্পের খানিকটা দেখা যাক।

***** ফণি বোসের পারিবারিক জীবন সম্পর্কিত তথ্য : সঠিক সংখ্যা না জানা গেলেও এ কথা নিশ্চিতরূপে সত্য যে, ফণি বোস তিন চার বৎসরের বেশি একজনের সহিত বসবাস করে না। তার পূর্ব স্ত্রীরা কোথায় যায়, ও নতুন স্ত্রীরা কোথা থেকে আসে তার কোন হদিশ পাওয়া না গেলেও, স্বাভাবিক সন্দেহটি-ই সত্য বলে মনে হয়। যদ্দূর পর্যন্ত জানা যায়, তাতে প্রকাশ যে, ফণি বোস এ পর্যন্ত বিশ বৎসরে চারজন স্ত্রীর সহিত বসবাস করেছে। সংখ্যাটি পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয় এই কারণে যে, ফটিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (বর্তমানে বয়স সত্তর) এই সংখ্যা জানিয়েছেন, (তিনি বরাবরই ফণি বোসের প্রতিবেশী) তাঁর চোখের ও দেখার কিছু গোলমাল থাকতে পারে। কেননা

ফণি বোস তার কোনো স্ত্রীকে কোনো সময় বাইরে আসতে দেয় না। এবং স্ত্রী সর্বদা ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকে। আইন ও ধর্ম উভয় কর্তৃক-ই অসিদ্ধ ফণি বোসের এই গৃহস্থ জীবনে অন্তঃপুর সম্পর্কে সে বুঝি কিছু 'সততা' রক্ষা করে। ফলে ফটিকবাবু হয়তো দুই বৎসরের তফাতে হঠাৎ হঠাৎ একজনকে দেখেই দুজন বলে ভুল করেছেন। এ গোলমালটুকু মেনে নিলেও এতে কোনো গোলমাল নেই যে, এই সকল স্ত্রী-দের কারো কারো পেটে ফণি বোসের কিছু কিছু ছেলে মেয়ে হয়েছে। গত বছর দশেক হলো কোনো নতুন মেয়েছেলে অবিশ্যি ফণি বোস আনে নি। বছর দশেক আগে, মানে ৫২-৫৩ সালে (সালটি অত্যন্ত জরুরী, আমাদের আগামী ভাবতবর্ষের ভিত্তি প্রস্তর তো এই সময়েই স্থাপিত হয়, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। সমাজতান্ত্রিক দেশ। ফণি বোসের জীবনের ঘটনাটা ঘটেছিল হয়তো কিছু আগে বা কিছু পরে, কিন্তু মনে রাখার সুবিধের জন্য ৫২-৫৩ সালের সঙ্গেই ওটাকে জুড়ে দেয়া যায়), কোথা থেকে এক পক্ষাঘাতগ্রস্ত মেয়েছেলেকে নিয়ে এসেছে। এবং ওর আগের বউদের সম্বন্ধে যে সব বিধিনিষেধ ও প্রয়োগ করতো, এর ক্ষেত্রে সে সব তুলে দিয়েছে। মাঝে মাঝে দেখা যায়, প্রায় প্রতিদিনই বেলা দশটা সাড়ে দশটার সময় দেখা যায়, ফণি বোসের বৌ বাইরের ঘরের চৌকাঠের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে,—মরচে ধরা মাডগার্ড, টায়ার ধরার লোহার নেমি, নাটবল্টু, কালিঝুলির মধ্যে—বাইরের দিকে চেয়ে। ঘরটাকে বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় একটা মোটর তৈরী হতে পারতো এরকম উপকরণ ছড়ানো আছে, কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে।......ফণি বোঁসের শেষ-বউটা একেবারে নুলো নয়। পা দুটো নড়বড়ে। হাঁটতে পারে কিন্তু ছেঁচড়িয়ে ছেঁচড়িয়ে। তাই ঘরের মধ্যে বসে বসে ঘসে ঘসে চলাফেরা করে।.....কে জানে, হাঁটাটাই কষ্টকর বলেই বোধহয় এই মোটাসোটা পুষ্ট মেয়েছেলেটার রোগা লম্বা মুখ সত্ত্বেও, পক্ষাঘাত সত্ত্বেও, ফণি বোস ওকে তাড়ায় নি, দশ বৎসর ওকে নিয়ে ঘর করেছে ও এমন সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে যে শেষ পর্যন্ত এই নড়বড়ে স্ত্রীলোকটি তার অপুষ্টি ও অসুস্থতা ও বন্ধ্যাত্ব সত্ত্বেও ফণি বোসের স্ত্রী হিসেবে টিকে যাবে, যা কোনো সুপুষ্ট, সুস্থ ও বিয়োনি মেয়েছেলে পারে নি।.....বস্তুত ফণি বোস কতো ভালো মিস্ত্রি, সেটা এ পর্যন্ত কেউ যাচাই করে নি। যেহেতু মোটর মিস্ত্রি হিসেবে তার দক্ষতা পরীক্ষিত নয় সেহেতু সেটি সন্দেহের স্থল ; কিন্তু যেহেতু সারাজীবন সে এই বিষয়ে সমর্পিত-প্রাণ সুতরাং তার সহানুভূতি যে যন্ত্রের প্রতি তা

স্বীকৃত।......কিন্তু সেই সহানুভূতি পবিত্র নয়, কারণ সে পার্টস চুরি করে, মুলো মেয়েছেলে নিয়ে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বৎসর থেকে ঘর করে।...... ঘর করে সেই অঞ্চলে, যে অঞ্চল সকার বেকার মোটর কর্মীদের আড্ডাস্থল ও সুতরাং যে অঞ্চল আন্ত-প্রাদেশিক ও অতএব, যে অঞ্চল একটি সম্ভাবনা-নষ্ট মুলো উপকথার মতো।......এবং সেখানে ফনি বোস একটি উপকথার নায়কের মতো ঘুরে বেড়ায় ও উনিশ শ' বাহান্ন সাল থেকে প্রায় ঘর করে।......ফণি বোস যদ্দিন ঘুরে বেড়িয়েছে তদ্দিন সে উপকথার নায়ক ছিল। এখন যখন সে প্রায় ঘর বেঁধেছে তখনো কি উপকথার নায়ক হবে? .....তবে ফণি বোস বেছে বেছে ১৯৫২ সালে (প্রথম সাধারণ নির্বাচন ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মহরতের শুভক্ষণ) একটা বাঁজা মুলো মেয়েছেলেকে ধরে আনলো কেন?*****

এই উদ্ধৃতিটির গল্পত্ব উঠিয়ে দিলে এবং রূপক ছাড়িয়ে আসল বস্তুটি বের করে আনলে বাঁজা মুলো স্বাধীনতা উত্তর সময়টিই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। দেশীয় ধনপতিরা যারা স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলো—মদত দিয়েছিলো, 'উপকথার নায়ক' হয়ে ফিরেছিলো সাধারণ মানুষের মনে মনে, তারাই এখন শাসক শ্রেণী—ভারতবাসীর ভাগ্যবিধাতা। আজ যখন সমস্ত পৃথিবীই প্রায় সমাজতান্ত্রিক আবহাওয়ার কক্ষে প্রতিষ্ঠিত, তখন ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্ব মৃত ধনতন্ত্রবাদের পচা হাড়মাস—সাম্রাজ্যবাদ ফ্যাসিবাদের অস্তিত্বকে ঘাড়ে করে স্বাধীন রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনায় লিপ্ত হয়ে ভারতের সার্বিক সাধারণ মানুষকে উপহার দিয়েছে এক পক্ষাঘাতগ্রস্ত জীবন। সাধারণ মানুষ আপাত-দৃষ্টিতে তা মেনে নিলেও, প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে যমযন্ত্রণার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। খানিকটা চাপা থাকলেও তার ধারাবাহিকতা ছিলো—কখনো কালো এ্যাসফল্টে তাজা রক্তে মর্মান্তিক প্রতিবাদও লিখিত হয়েছে। কিন্তু সাহিত্যে তা প্রায় একেবারেই অনুপস্থিত। একই পক্ষাঘাতগ্রস্থ সময়ে রাষ্ট্র ব্যবস্থার হাজারো মারের মধ্যে দাঁড়িয়েও কবি সাহিত্যিকরা ভিন্ন জগতের অধিবাসী থেকে গেছেন। শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী কবি লেখকদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের বোধের যোগাযোগ স্থাপিত হয়নি। ১৯০৮ সালে পাবনা কংগ্রেসে পঠিত রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ আজও বর্ণে বর্ণে সত্য—'জন সমাজের সহিত শিক্ষিত সমাজের নানা প্রকারেই বিচ্ছেদ ঘটাতে জাতির ঐক্যবোধ সত্য হইয়া উঠিতেছে না'। তাই মানুষ যখন পাতালের অফুরন্ত ঐশ্বর্যে পা ডুবিয়ে ভারতের বাইরেকার প্রাচ্যে-পাশ্চাত্যে মহাকাশ আগলে ধরেছে বিশাল দুহাতে, বাংলার কবি সাহিত্যিক

তখন তাঁদের গল্পপত্থর নায়ক হিসেবে বেছে নিচ্ছেন ডোয়ার্ফ'কে—বামনকে। অতি-সাম্প্রতিক কালের গল্পকারদের মধ্যে অন্যতম প্রধান বাসুদেব দাশগুপ্তর 'রন্ধনশালা' বইয়ের 'রতনপুর' গল্পে নায়ক 'নীলু' 'জার্সিপরা'দের মার খেয়ে তার পবিত্র ভালোবাসা নিয়ে যখন দিশাহারা, তখন তার ট্র্যাজেডি নামলো। ভালো-বাসাকে নীলু চয়েস করেছে—ঘৃণাকে করে নি, তাই জীবন হয়ে ওঠে অভিশপ্ত। মনোপলি অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত সভ্যতার নায়ক 'নীলু', তার অস্তিত্বই বিপন্ন। 'নীলু'র জবানিতেই তার উদ্ধারহীন অসহায়ত্বের পরিচয় নেওয়া যাক ঃ

***** আমি রান্না ঘরের পার্টিশনের আড়ালে লুকিয়েছিলুম। চুমকি চারদিক ভালো করে দেখে দ্রুত চলে এলো আমার কাছে। আঁচলের তলা থেকে ছোট্ট একটা জল ভরতি কাঁচের গেলাশ বার করলো। ফিসফিস করে বললো—'এই জল ছিটিয়ে দিলে তুমি ছোট্ট হয়ে যাবে। ঠিক এই এ্যাত্তোটুকুন।' চুমকি ঠোঁটের কোনায় চুপি হেসে আঙুল মেপে দেখায়। 'ভয় পেয়ো না কিন্তু, এই ভাবেই কিছুদিন থাকবে আমার কাছে। তার পর তোমাকে বড় করে দেবো।' বলেই আমার কোন কথার অপেক্ষা না রেখে চুমকি আমার গায়ে মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে দেয়। একটু পরেই আমি ছোট হতে শুরু করি। ছোট হই...ছোট হই...চুমকির দিকে কাতর ভাবে তাকাই আমি ..চুমকি নিঃশব্দে হাসতে থাকে। ছোট হতে হতে আমি প্রায় চুমকির পায়ের আঙুলের সমান হয়ে ওর পায়ের কাছে পড়ে থাকি। চুমকি এবার আলতো করে আমায় তুলে নেয় মেঝে থেকে। ঠোঁট দিয়ে আমার ছোট্ট শরীরে চুমু খায় অজস্র। আমার সুড়সুড়ি লাগে, ককিয়ে বলি—'এই...কি কি হচ্ছে যাঃ।' কিন্তু চুমকির কানে বোধহয় আমার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর গিয়ে পৌঁছোয় না। চুমকি ওর হলদে রিবনখানা দিয়ে আমায় বাঁধলো তারপর সন্তর্পণে চুলের ভিতর রাখলো লুকিয়ে।... .....উৎসব শেষ। সকলে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছিলো। সিঁড়ির শেষ ধাপে হঠাৎ চুমকির সঙ্গে কার যেন প্রচণ্ড ধাক্কা লাগলো। ভয়ানক দুলে উঠলো চুমকির বেণী। আমি রিবনের বাঁধন থেকে আলগা হয়ে খসে পড়ে গেলুম নীচে। কিছুক্ষণের জন্যে আমি কিছু বুঝতে পারিনে, কেমন যেন হতবুদ্ধির মতো হয়ে যাই। আমার পাশ দিয়ে কত অসংখ্য পদশব্দ সিঁড়ির ধাপ মাড়িয়ে মিলিয়ে যেতে থাকে। একটু বাদে আমি ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠি—'চুমকি আয়, আমায় নিয়ে যা।' আমার ডাকে কেউ সাড়া দেয় না। হয়তো কেউই আমার গলার স্বর শুনতে পায় না। গাড়ী স্টার্টের শব্দ পেলুম। ....সিঁড়ির গোড়া থেকে রাস্তার

ফুটপাথ পর্যন্ত ছুটে আসতে আমার অনেক সময় লাগে। এসে দেখি ততক্ষণে ওদের গাড়িটার পিছনের লাল আলোটা শুধু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আমি এবার প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠি—'চুমকি আয়, চুমকি আয়।' গাড়ির পিছনের লাল আলোটা এক সময় ছোট একটা সিঁদুরের টিপের মতন হয়ে তারপর অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। অবরুদ্ধ কান্নায় ভেঙে পড়ে আমি বারবার পাগলের মতো ডাকতে থাকি—'চুমকি আয়, চুমকি আয়।' এক ঝাঁক সামুদ্রিক পাখি ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে উড়ে যায় আকাশ দিয়ে। তাদের ডানার শব্দ গোল-দীঘির শান্ত জলে, কফি হাউসের দেয়ালে দেয়ালে, প্লাবিত জোছনার শূন্যতায় বারবার প্রতিধ্বনিত হতে থাকে—'চুমকি হায়, চুমকি হায়।'*****

শেষ রক্ষা হয়নি, নীলুর আর বড় হওয়া হয় নি—সাম্রাজ্যবাদী অর্থব্যবস্থা ও তার রাষ্ট্রনীতির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। এমনি বামন সিম্বল এসেছে আরো অনেকের মধ্যে। ভারতীয় মাইথলজিকাল ফিগার বামন অবতার। তিন ভুবনের কোথায় তার তৃতীয় পা রাখার জায়গা? এই বেঁচে থাকা এবং মৃত্যু, ভালোবাসা এবং ঘৃণা, সাম্রাজ্যবাদী অর্থব্যবস্থা এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, হ্যাঁ এবং না—এই জোড়গুলো ছাড়া তৃতীয় অল্টারনেটিভ কি? এই প্রশ্নেই বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত কবি লেখক সম্প্রদায় সাধারণ মানুষের থেকে দূর। বাস্তব ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ পছন্দ করেছে জোড়গুলোরই যে কোনো একটাকে। তৃতীয় অল্টারনেটিভ সম্পর্কে তাদের ভাবনার অবকাশ নেই। কেননা তারা জীবনকে, ভালোবাসাকে, সমাজতন্ত্রকে, হ্যাঁ কে পছন্দ করেছে। এরই জন্যে সংগ্রাম। সংগ্রামহীনতা ব্যক্তির অপছন্দটিকেই প্রতিষ্ঠা দেয়। তাই সাধারণের তৃতীয়ের জন্যে ভাবনাবিলাস নেই। কিন্তু বুর্জোয়া ভাবধারাপুষ্ট অথচ অত্যাচারিত লাঞ্ছিত বুদ্ধিজীবী লেখক কবিদের আছে, অন্তত এতাবৎ কাল ছিলো বলেই সাধারণের ভাবনার বহুদূরবর্তী ভাবনাকে সাহিত্যের নতুন মর্জি করে তুলতে দুরন্ত বৈপ্লবিক প্রয়াস চালিয়েছেন স্বাধীনতা-পরবর্তী কালের সাহিত্যিকরা।

উপরোক্ত মৌলিক বিরোধ সত্ত্বেও, পক্ষাঘাতগ্রস্ত বাস্তব পরিমণ্ডলে দাঁড়িয়ে বাঙলা দেশের কবি শিল্পী সাহিত্যিকরা বলিষ্ঠ জেহাদই তুলেছেন সত্য প্রেম পবিত্রতা ও অকৃত্রিমতার জন্যে—ফিরে যেতে চেয়েছেন 'রতনপুর'-এ ; কিন্তু জনসমাজ যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে দাঁড়িয়ে নয়, বুর্জোয়া এবং সাম্রাজ্য-বাদী ভাবধারা যে পৃথিবী সৃষ্টি করেছে সেই পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে নিজেদের অজস্র বন্ধনের মধ্যে অপরিবর্তনীয় অসহায়তা নিয়ে। নিজেদের বিশ্বাস এবং

অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটাতে তাদের সততার অভাব ঘটে নি। যত অনিচ্ছাই তাঁদের থাকুক না কেন সমাজ, সময় এবং জীবন বিশ্লেষণে তাঁরা দায়িত্বশীল ভূমিকাই পালন করেছেন। শুধু সেইটুকু নিয়েই সাধারণের বৈপ্লবিক চেতনা কেবল বস্তু সম্পদগত সুখই নয় আত্মিক জীবনের বিপ্লবও সংঘটিত করতে পারে, ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে পারে নতুন প্রকাশে। একটু মনোযোগী পাঠক অতি-সাম্প্রতিক লেখালেখিগুলো ঘেঁটে দেখলেই দেখতে পাবেন যে, সে সবের রচয়িতাদের চেতনা বিদ্রোহী, বলিষ্ঠ এবং সচেতন—সক্ষম কলমের অনিবার্য ফলশ্রুতি। নিহিত অন্ধকার সত্ত্বেও, এঁদের প্রশংসায় কুণ্ঠিত হলে সত্যেরই অপলাপ ঘটবে। তাই অতি-সাম্প্রতিক কালে যে সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে তার চরিত্র মিশ্র চরিত্র। প্রতিক্রিয়াশীল এবং প্রগতিশীল বলে কোন লেখকের লেখাকেই দুই ভিন্ন কোষ্ঠের একটিতে স্থাপন করা অসম্ভব। কেননা সাহিত্য তো করছে একই ভূমিতে দাঁড়িয়ে একই রকম শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত সমাজ! এঁদের মধ্যে যাঁরা একটু তৎপর হয়ে পৃথিবীর সমাজতন্ত্র-বাদে প্রবেশ লক্ষ্য করেছেন, যাঁদের আত্মা 'কালবেলা'য়[১] 'জটায়ু'[২] যাঁরা বলছেন 'মা জননী, আমার বিস্তৃত বাঙলা দেশ / চোখে দেখেছ মানুষ মানুষ / আমি এই ছবি, এই জীবন ও মরণের আপ্রাণ মিছিল / এই কল্যাণী ও অকল্যাণী কলকাতার ছবিগুলি বুনে রাখছি / অদৃশ্য বুকের তাঁতে নানান নক্সায় / গেঁথে রাখছি / হত্যা নির্মমতা / এই সব প্রেম ভালোবাসা হিংসা ঘৃণা / গুলি লাঠি গ্যাস ও বিদ্বেষ / অথবা প্রথম যুক্তফ্রন্ট / উদ্বেল নন্দিত কলকাতা / এই সব এই সব আরো বহু কিছু / আমার সন্ততিদের হাতে তুলে দিতে চাই ' যেমন আমার বাবা হাত ধরে দেখিয়েছিলেন / কলকাতা / কবে দেবো জানো কি কলকাতা !'[৩] —তাঁরাও একই ভাবনা-লোকের বাসিন্দা। কণ্ঠ ক্ষীণ—কব্জির শক্তি সতেজ বিদ্রোহে পরীক্ষিত নয়। জনতার মিছিলে চলতে চলতেও তাঁরা বিচ্ছিন্ন। তবু স্থানে কালে বসবাসের জন্যে বৃহত্তর মানুষের পছন্দের বিষয়গুলোয় এঁরা উদাসীন থাকতে পারেন নি। যদিও সাহিত্য হিসেবে এ সব বিষয়ের রচনাগুলো প্রায় সবই অকিঞ্চিৎকর। কখনো এ ধরণের রচনাগুলো একটা সার্বিক মানববোধ থেকে সৃষ্টি হয়েছে কখনো বা হয়েছে সংকীর্ণ গণ্ডীতে দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক মতাদর্শের সপক্ষে থাকার ঘোষণা হিসেবে। শাদা আমেরিকার কালো আমেরিকার ওপর নিষ্পেষণ, কেনেডি-লুমুম্বা-লুথার কিং হত্যা, কোরিয়া-

---

১। কালবেলা—বরেণ গঙ্গোঃ ২। জটায়ু—দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোঃ ৩। কলকাতা—তরুণ সান্যাল

ভিয়েৎনাম যুদ্ধ, হাঙ্গেরি চেকোশ্লোভাকিয়ার আভ্যন্তরীণ অশান্তি—উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক ঘটনার সবগুলোতেই তরুণ লেখক কবিদের চৈতন্যের আলোড়ন এবং উৎসাহ সমান ভাবেই লক্ষ্য করা গেছে। তবে লেখালেখির দিক থেকে তা কিছুই নয়—গোয়া মুক্তির সমর সমারোহ, ভারত-চীন ও ভারত-পাক যুদ্ধ, দাঙ্গা বা দুর্ভিক্ষ জাতীয় ঘটনাগুলোও তরুণ সাহিত্যিক কবিদের কাছে বিশেষ কোনো গুরুত্ব পায় নি। এ ধরণের ঘটনার অভিজ্ঞতা তাঁদের জন্মসূত্রেই এত বিপুল, যা থেকে তাঁরা যেন সিদ্ধান্তই নিয়ে নিয়েছেন যে এসব তো আবহমান কাল ধরে চলতে থাকবেই—ও কিছু না। অথচ কোনো নতুন পৃথিবীর সতেজ স্পন্দনও তাঁরা শোনান নি। মৃত রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠের আদলে কেউ কেউ 'ঐ মহামানব আসে' ধরণের আশ্বাস শোনালেও, তা খুবই পানসে শুনিয়েছে—মনে হয়েছে রক্তহীন। কেননা সবকিছুর সম্মুখভাগেই অমোঘ নিয়ন্তার মতো এসে দাঁড়িয়েছে মানুষ। এ দেশেও প্রায় একশ' বছরের অক্ষম নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ফেলেছে অশিক্ষিত, ক্ষুধার্ত ও লাঞ্ছিত সাধারণ মানুষ এবং পড়শী পূর্ব পাকিস্তানেও, অন্য সব দেশের কথা না হয় ছাড়াই গেলো, উত্তাল রক্তদান একনায়কতন্ত্রের গর্দান নুইয়ে দিয়েছে পাকিস্তানময় 'একখানা বিশাল পায়ে'র ওপর।

তবে বাংলা সাহিত্যের যে প্রবহমান ধারা, তা নতুন মোড় নিয়েছে। মোড় নিয়েছে এই অর্থে যে, এতকাল যে ভাবে সাহিত্য হয়েছে, এখন সে ভাবে হচ্ছে না। আধুনিকতার প্রথম স্তরে গোটা মধ্যযুগীয় ভাবধারার বিরুদ্ধে অস্বীকার এসেছে নিষিদ্ধ ধর্ম ও নিষিদ্ধ চিন্তা দিয়ে, যার প্রধান হোতা মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও ইয়ং বেঙ্গল দল ; দ্বিতীয় স্তরে রবীন্দ্রনাথীয় প্রশান্তি ও তার গ্রাসের বিরুদ্ধে অস্বীকার এসেছে নিষিদ্ধ দর্শন ও নিষিদ্ধ কথার মাধ্যমে, যার নায়ক কল্লোল যুগের লেখক কবিরা আর তৃতীয় স্তরে সমাজ সভ্যতা ও সাহিত্যে যা হয়ে এসেছে সেই পোষাকী কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে অস্বীকার এসেছে নিষিদ্ধ বোধ ও নিষিদ্ধ অভিব্যক্তি দিয়ে—স্বাধীনতা উত্তরকালের প্রায় সমস্ত মুখ্য লেখকই নিজ নিজ ফ্রন্ট থেকে নিজেদের অস্তিত্ব দিয়ে তৈরী করেছেন পুরোনো বিশ্বধারণার প্রতি অস্বীকার। এখানেও নেতির নেতি তত্ত্ব কাজ করেছে এবং প্রায় সকলেই এক বৃহত্তর নেতিবাচক সিদ্ধান্তে তাঁদের বিশ্বধারণাকে সূত্রবদ্ধ করেছেন। মাইকেল নরক বর্ণনা করেছেন, 'কল্লোল যুগের লেখকরা নরক উপলব্ধি করেছেন, আর সাম্প্রতিক সময়ের লেখকরা নরকে জন্ম নিয়ে নরকেই বসবাস করে নিজেকেও নিজের ছায়া ছাড়া কিছু ভাবতে পারছেন না। একটা অস্তিত্ব অবলোপকারী

সময়ের গুহা থেকে বিলাপ, ক্রোধ, বিক্ষোভ, পাপ, পরিতাপ আর দেহ-মন-মেধার সার্বিক ক্ষুধার ভাষারূপই মন্ত্রের মতো হয়ে গড়ে তুলেছে এ পর্বের আধুনিক সাহিত্য। এ সাহিত্যের বিদ্রোহ বাংলার সাহিত্যিক বিদ্রোহেরই ঐতিহ্য সম্মত। এখানেই আন্দোলনের একটা ক্রম রক্ষিত হয়েছে।

আমরা আগেই বলেছি (দেশ ঃ কালক্রম-২) যে, সাম্প্রতিক সাহিত্যের পটভূমি অবিকল উনিশ শতকের রেনেসাঁসের পটভূমি। এ সময়ের লেখক কবিদের আন্দোলন ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের পরিণত রূপ মাত্র। দীর্ঘ আলোচনায় দেখা গেলো যে, দুটি আন্দোলনের মধ্যে মিল আছে বহু ক্ষেত্রেই এবং এ আন্দোলন ছিলো অবধারিত। তবে এখানে বলা দরকার যে, দুটি আন্দোলনের মধ্যে গরমিলও আছে বহু। প্রথমত, ইয়ং বেঙ্গলদের বিদ্রোহ ছিলো মূলত সামাজিক। তাঁদের আঘাত সামাজিক বিধিব্যবস্থা ও আচারসর্বস্ব স্থবিরতার বিরুদ্ধে। অনেক ক্ষেত্রেই তা ছিলো সরল। কিন্তু বর্তমানের তরুণ লেখক কবিদের আন্দোলনের বিষয়টাই জটিল এবং জটিলতর। বর্তমান তরুণ লেখক কবিদের বিদ্রোহ মূলত অর্থনৈতিক এবং আত্মিক দুরবস্থার বিরুদ্ধে,—বুর্জোয়া ভাবধারা প্রভাবিত মানুষের গড়া সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে। স্বাধীনতা-পরাধীনতা, জাতীয়তা-আন্তর্জাতিকতা, ধনতন্ত্র-সমাজতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ-সাম্যবাদ, প্রেম-অপ্রেম, সত্য-মিথ্যা, সততা-কৃত্রিমতা এবং জীবন-মৃত্যু প্রভৃতি ধারণাগুলোর মধ্যে পছন্দ করা নিয়েই সমস্যা। যেহেতু স্বাধীনতা, আন্তর্জাতিকতা, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ, প্রেম, সত্য, সততা, জীবন প্রভৃতিকেই পছন্দ করে নি[illegible] আজকের বড় সংখ্যার মানুষ, কবি লেখকদেরও ভাল থাকতে গেলে পক্ষ-বিপক্ষর কোনো না কোনো একটিকে বাধ্য হয়ে বেছে নিতেই হচ্ছে এবং তাঁর সে পছন্দ করাকে বিপক্ষীয়রা যে পছন্দ করছে না তা কবি লেখকদের সংবেদনশীল চেতনায় তুমুল সংঘাতের সৃষ্টি করছে। এবং তা তাঁদের জীবনকে চারদিক থেকে জটিল করে তুলেছে। ফলে, জন্মমুহূর্ত থেকেই স্বাধীন যে অস্তিত্ব তার সমস্যাটা যেমন ক্লাম্‌জি তার সমাধানের উপায়ও তেমনি ক্লাম্‌জি। কোনো সহজ সরল বাক্যে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। গল্প উপন্যাস কবিতার যে অলঙ্কার শাস্ত্রীয় সহজ স্বীকৃত কাঠামো তা মেনে সাম্প্রতিক বোধ ও অভিব্যক্তি প্রকাশও অসম্ভব। আন্তর্জাতিক মানুষের তাবৎ মূল্যবোধ-ভাঙা জটিল সময়ের জটিল চিন্তাভাবনাকে সাহিত্যে পরিণত করতে হচ্ছে বলেই সাম্প্রতিক লেখালেখিগুলো দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে সাধারণ পাঠকের কাছে। প্রতিদিনই নিজেদের যন্ত্রণাগুলো প্রকাশ

করবার জন্যে আবিষ্কৃত হচ্ছে নিত্যনতুন মেথড্। পরীক্ষানিরীক্ষা হচ্ছে নানা ধরণের টেকনিক নিয়ে। তাই আপাতদৃষ্টিতে সেগুলো দুর্বোধ্য বলে মনে না হয়ে উপায় নেই। মাইকেলের অনবদ্য অমিত্রাক্ষর ছন্দও তো সেদিন নতুন চিন্তা নতুন ভাবে প্রকাশের তাগিদেই আবিষ্কৃত হয়েছিলো এবং দুর্বোধ্য আখ্যা পেতে হয়েছিল তাকেও। রবীন্দ্রনাথের সিম্বল ব্যবহার, সাংকেতিকতা সৃষ্টি, গদ্য কবিতার ছন্দ নির্মিতি সবই তো আক্ষরিক অর্থে দুর্বোধই হয়ে ছিলো সেদিনের পরিমণ্ডলে। এ দিনের লেখালেখিও স্বাভাবিক ভাবেই তাই জলবৎ হবার কথা নয়।

দ্বিতীয়ত, উনিশ শতকের ভূমি ছিলো সামন্ততান্ত্রিক--ইংরেজের পদানত! বর্তমান প্রতিবেশ আধা-সামন্ততান্ত্রিক এবং আধামূলধনতান্ত্রিক (যা•দরকচা মেরে একচেটিয়া পুঁজিবাদের রূপ নিয়েছে) এবং রাষ্ট্রীয় ফতোয়া সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের। দেশ স্বাধীন, আন্তর্জাতিক প্রতিটি স্পন্দন সাহিত্যিকদের কাছে সুস্পষ্ট।

তৃতীয়ত, উনিশ শতকে মার্কস্, ফ্রয়েড, পাবলভ প্রমুখ মনীষীর তত্ত্ব ছিলো না—ছিলো না পদার্থ বিজ্ঞানের এমন যুগান্তকারী আলোড়ন ও জগৎ উন্মোচন বা জীববিজ্ঞানের এমনি অগুনতি সাফল্য। অধুনা মানুষের অপ্রাপ্য কি আছে সেইটেই মুখ্য গবেষণার। মানুষ বিজ্ঞান আর মানসিক শক্তিতে সব কিছুই পেতে পারে—অসম্ভব আর অভিনব নেই বলেই প্রমাণিত হয়েছে।

চতুর্থত, উনিশ শতকের রেনেসাঁসের সময়কার পাশ্চাত্ত্য চেতনার সঙ্গে আজকের পাশ্চাত্ত্য চেতনার আকাশ পাতাল পার্থক্য। সেদিন কেবল ইংরেজী শিক্ষা, সাহিত্য ও দর্শনের জানালা দিয়ে ইউরোপীয় জগতের এক টুকরো অংশের ধারণাই পেয়েছিলেন কবি লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবীরা। ছিটেফোঁটা ফরাসী সাহিত্য ও শিল্পকলা বা জার্মান সাহিত্যের সংস্পর্শই তাঁদের এসেছিলো। কিন্তু, এ সময়ে পশ্চিম এবং প্রাচ্যের সমস্ত রাষ্ট্রের ও ভাষাভাষী মানুষের সাহিত্য এবং শিল্প শিক্ষিত উৎসাহীমাত্রের কাছেই হাত বাড়ালে লভ্য—লভ্য ফুটপাথের দোকানে। পৃথিবীর দূরতম অংশের দুরূহতম ভাষার সাহিত্যও আজ দূর নয়। চর্চা হচ্ছে। অনুবাদ হচ্ছে। অনুকৃত হচ্ছে।

পঞ্চমত, দেশ এখন স্বাধীন। স্বাধীন দেশ তার ঠাট বজায় রাখতে বিভিন্ন দেশে সাংস্কৃতিক মিশন পাঠাচ্ছে, সে সব দেশের সাংস্কৃতিক মিশনও এদেশে আসছে। ছবি সার্কাস সিনেমা খেলাধূলা নাচগান যেমন আসছে তেমনি সাহিত্যের প্রতিনিধিরা হামেশাই যাতায়াত করছেন—কোন কিছুই বাদ

যাচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয় এবং এম্ব্যাসীগুলো ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করছে—ছাত্ররা ডিগ্রী পাচ্ছে। উনিশ শতকে মাইক্রোস্কোপিক দু' একজন ইংরেজী ছাড়া কিছুটা ফরাসী, পোয়াটাক জার্মান কিছু ল্যাটিনও বা জানতো হয়তো।

ষষ্ঠত, সেদিন সি· আই· এ নামক মহৎ যন্ত্র বর্তমান ছিলো না, যার দাপটে এদেশের বড়সড় মহামহোপাধ্যায় মাথাগুলো ফেটে ছত্রাখান হয়ে পড়তে পারতো শিমুল ফলের মতো। এক আধ পৃষ্ঠা রচনার প্রতিভা তখন রোজগার করে আনতে পারতো না ধারণাতীত ডলার। যার ফলে লেখককেও ডলার-পতিদের পছন্দের পক্ষে থাকার জন্যে গাইতে হোতো না 'এবার নীরব করে দাও হে তোমার মুখর কবিরে' গোছের স্বগত গান।

সপ্তমত, ইউরোপ পরপর দু'দুটো মহাযুদ্ধে সর্বস্বান্ত হয়ে সিফিলিস আক্রান্ত কুকুরের মতো বংশ জীইয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। সেখানে যুদ্ধের প্রভাব প্রত্যক্ষ। এদেশে যুদ্ধের কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু পরোক্ষ ভাবে তার যে ভয়ানক ছাপ এদেশের তরুণ অভিজ্ঞতায় পড়েছে, যে ভাবে যুদ্ধের দান এ সময়ের তরুণ চিত্ত বিপর্যস্ত করে দিয়েছে, সে রকম কোনো ছাপই রেনেসাঁসের নায়কদের ওপর পড়ে নি। তাই এ যুগের তরুণ কবির কাছে এলিয়টি ঊষরতাও এই ভাবে বেঁচে থেকে জগৎ জীবনকে দেখার তুলনায় স্বর্গ মনে হয়। কেননা, 'প্রত্যেক কীর্তির ভাঙা গলা, বাতাস অতীব লঘু যেমন শ্মশানে— / শ্মশানও নিবন্ত আজ, চতুর্দিকে পড়ে আছে চণ্ডালের হাড়'[১] আর তার স্বীকারোক্তি 'আমি মায়ের কাছে পাপ করেছি, সে জানেনা আমার মৃত্যু / সে জানেনা চলার সময়ও মানুষের পা অবশ হয়ে যায় / আমি বাবার কাছে শিখেছি পুরুষ বর্বরতা—ঈশ্বরের কাছে শিখেছি বিশ্বাসঘাতকতা—'[২]

সব শেষে, উনিশ শতকে নিজের জন্মভূমিতে নিজেকে বিদেশী উদ্বাস্তু হতে হয় নি কাউকে—ভয়াবহ দাঙ্গা আর ক্রনিক দুর্ভিক্ষ ছিলো না, আজকে তা রোগের মতো ভেতর থেকে ধ্বসিয়ে দিচ্ছে মনুষ্যত্বই।

এবং এমনি ঘটনা ঘটিয়ে দেবার জন্যে দায়ী বড় আশা করে যাকে পাওয়া হয়েছিলো, সেই স্বাধীনতারই বিশ্বাসঘাতকতা। কোনো ভুল নেই, স্বাধীনতা আন্দোলনে যারা অর্থ দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে মদৎ দিয়েছিলো—নেতৃত্ব দিয়ে যারা নিজেদের ব্যবসায়িক সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলো, গান্ধীজীর নেতৃত্বে সেই বুর্জোয়া বিপ্লব ফলবান হলে তারাই গান্ধীজীকে এবং দেশবাসীর

১। তুমি শব্দ ভেঙেছিলে—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ২। শোকগাথা—শৈলেশ্বর ঘোষ

প্রতি স্বাধীনতার অঙ্গীকারকে খুন করেছে। সেই নেতৃত্বই সরকার গঠন করে নিজেদের পুঁজির অঙ্ক পাহাড়ের উচ্চতা দিয়ে মেপেছে আর সাধারণ মানুষ বামনে পরিণত হয়েছে—গোটা দেশ হয়েছে পক্ষাঘাতগ্রস্ত। বুর্জোয়া রাষ্ট্রনীতি চালের গা থেকে তুষের মতো সম্পদ থেকে মানুষকে খসিয়ে ফেলে বিদেশের ব্যাঙ্কে পুঁজিপতিদের সম্পদ চালান করতে সাহায্য করেছে। স্বাধীনতার প্রশ্নে সেদিন সবাই এক হয়েছিলো—গড়ে তুলেছিলো জাতীয়তা। আজ ভারতবাসীর জাতীয়তার বন্ধন ক্ষুধা, দারিদ্র ও মৃত্যুর সমাহারে গঠিত হাহাকার। অন্যতর চিন্তা করতে বসেও, অত্যাধুনিক বাংলার কবি ও লেখকরা সেই হাহাকারের ভাস্কর। আজকের সাহিত্য হাহাকারের জাতীয় সাহিত্য এবং সারা ভারতে এই-ই প্রথম জাতীয় সাহিত্য রচিত হোলো। সেদিনের রেনেসাঁস ছিলো আঞ্চলিক, সাম্প্রতিকের রেনেসাঁস সর্বভারতীয়—সর্বত্রই একই আন্দোলনের ঢেউ।

এ প্রসঙ্গের সব শেষের কথা, সেদিনের রেনেসাঁস পশ্চিমকে আবিষ্কার করেছিলো, আবিষ্কার করেছিলো ভারতের কেবল সংস্কৃত সাহিত্যকে। আজকের রেনেসাঁসে 'জগত আসি হেথা করিছে কোলাকুলি' প্রকৃত অর্থেই আক্ষরিক সত্যতা নিয়ে। আর আবিষ্কৃত হচ্ছেন—সম্পূর্ণ নতুন ভাবেই গৃহীত হচ্ছেন—চর্যাপদের কবিরা, শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের বড়ু চণ্ডীদাস, মঙ্গল কাব্যগুলোর কবিরা, কৃত্তিবাস, ভারতচন্দ্র, শাক্ত কবি, হুতোম প্যাঁচা, মধুসূদন, বঙ্কিম, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ, গানের রবীন্দ্রনাথ আর এই কিছু আগের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও জীবনানন্দ দাশ (কেননা এঁদের এ সময়ই প্রথম বুঝতে পেরেছে)। তাছাড়া দলিল দস্তাবেজ ধরণের লেখা ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের অন্বয়হীন শব্দ গ্রন্থনাকেও নতুন চোখে দেখা হচ্ছে—দেখা হচ্ছে কখনো বা তাঁদের লেখা দিয়ে নিজের রচনার স্বাদ ফেরানোর জন্যে কখনো বিষয়ের জন্যে, টেকনিকের জন্যে ও ভাষা গঠনের জন্যে।

এবারে কোনো রকম বাড়তি কথা না বলেই বলতে পারা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের পর যে গদ্যপদ্যর ধারা প্রবাহিত হয়েছে, তার মধ্যে থেকে এমন কতকগুলো লক্ষণ ধরা পড়েছে যেগুলোকে আধুনিক বাঁধুনির সাহিত্য লক্ষণ বলা চলে। এবং সেগুলোতে অত্যাধুনিক সময় ও জীবন চেতনার—বিশিষ্ট মানসিকতার ছাপ ও পূর্বতর সাহিত্যের থেকে এ সাহিত্যের পার্থক্য ধরিয়ে দেয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর একদিকে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কাটিয়ে উঠে সাহিত্যকে নতুন মোড়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা, অন্যদিকে হৃদয়ের থেকে মেধাকে সাহিত্যের

ব্যাপারে বড় পিঁড়ি দেবার দিকেই বেশি ঝোঁক দিয়েছেন সাহিত্য স্রষ্টারা। নগরে কেন্দ্রিত সুতীক্ষ্ণ চেতনার কবি সাহিত্যিকদের যন্ত্রসভ্যতার জটাজালে কেবলই ক্লান্ত হওয়া এবং নৈরাশ্যের হিম যন্ত্রণা, জনতা জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার জন্যে এক ধরণের পরগাছাত্ব ও শিকড়শূন্যতা যেমন আছে, তেমনি বিপন্নতা থেকে ও রবীন্দ্র-প্রতিভার গ্রাস থেকে মুক্ত হবার জন্যে মার্কসীয় দর্শন ও ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন এ দুটি নিষিদ্ধ (সে সময়ে) অস্ত্রের ব্যাপক ব্যবহারের চেষ্টাও দেখা গেছে। অসংবদ্ধ চিন্তাস্রোতের আমদানী হয়েছে যেমন তেমনি রুশ বিপ্লবের অভূতপূর্ব সাফল্যের নজির টেনে যুক্তি শৃঙ্খলা পরম্পরায় জগত ও জীবন সম্পর্কে ডায়লেক্‌টিকাল মেটিরিয়ালিজম্ খাটিয়ে নতুন ভুবন গঠনের প্রত্যাশাও আছে। এঁদের সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের প্রশ্রয় ও দুর্বোধ্যতার প্রতি সচেতন আগ্রহ, দেহকে প্রেমের ভাণ্ড, কামকে জীবনের নিয়ন্তা শক্তি হিসেবে গ্রহণ, এথিক্স ও ঈশ্বরকে বাতিল করে দেবার চিহ্ন সুস্পষ্ট।

কল্লোল কালের লেখকরা যেমন, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের লেখক কবিরাও তেমনি সচেতন ভাবে সচেতনতর হয়ে ভাষা নির্মাণ করেছেন এবং শব্দ ব্যবহার করেছেন। লিঙ্গ, যোনি, পোঁদ, জরায়ু, চুল, বগল, প্রশ্রাব, ধর্ষণ, গু, শালা, পিচুটি, বমি প্রভৃতি শব্দের বেধড়ক প্রয়োগ ; প্রচুর দেশী-বিদেশী শব্দ, সংস্কৃত শব্দ, প্রবাদ, বিখ্যাত কবি লেখকের প্রসিদ্ধ বাক্যকে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে ব্যবহার ; গানকে গদ্যপদ্যর মধ্যে সেঁধিয়ে দেওয়া ; ছিনু, গেনু, কহিল, হিয়া প্রভৃতি প্রাচীন কাব্যে ব্যবহৃত শব্দের প্রয়োগ ; ছন্দবন্ধন ও শব্দের অন্বয় নষ্ট করে দেওয়া ; দলিল দস্তাবেজের ভাষা, মুখের কথা এমন কি গালাগালির ভাষা ব্যবহার ; অথচ, পরন্তু, এবং, বা প্রভৃতি যুক্তি-তর্কের অব্যয়ের বাহুল্য ; নিজের জবানীতে লেখা ; মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ ; প্রচুর পরিমাণে পার্সোনাল ইমেজ-এর ব্যবহার ; নিজের নাম, বন্ধু-বান্ধবী, প্রেমিকা ও স্থানের নাম ব্যবহারের ঝোঁক ; ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, তির্যকতা, ফ্যান্টাসী ও স্বপ্নকথন প্রবণতা ; টাইম এবং স্পেসের ফারাক নষ্ট করে দেয়া ; জন্ম মৃত্যুকে এক জেল থেকে অন্য জেলে স্থানান্তরীকরণ বলে মনে করা ; সভ্যতাকে হাঙর ও আক্রমনশীল হিসেবে দেখা ; যৌন সংঘর্ষকে অতি পল্লবিত করে উপস্থিত করা ; পাশ্চাত্য ছবির জগত থেকে ইজম্-এর আমদানী ; বাল্যস্মৃতিচারণা—শিশুত্ব লাভের স্পৃহা ; নষ্টালজিয়ার প্রতি প্রলোভন ; স্ট্রেট—নিজের যা কিছু বলার তা সোজাসুজি স্টেটমেন্টের মতো উপস্থিত করা ; কাব্য থেকে কবিত্বপনা বর্জন ও গদ্যকে কবিতার কাছাকাছি নিয়ে

যাবার চেষ্টা প্রভৃতি আধুনিক এবং আধুনিকতম লেখকদের গদ্য ও পদ্যের মধ্যে অত্যন্ত বলিষ্ঠতার সঙ্গে উপস্থিত হওয়ায় লেখালেখির চরিত্র পর্যন্ত পালটে গেছে আমূল। এখানে বলে নেওয়া প্রয়োজন যে এই সব বাহ্য লক্ষণ দিয়ে স্বাধীনতা পূর্ব সময়ের সাহিত্য বিচার যতটা সহজ স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ের লেখালেখির আধুনিকত্ব প্রমাণ ততটা সহজ নয়। ও সব লক্ষণ তো আছেই, তা ছাড়া এ সময়ের সাহিত্য আধুনিক হয়েছে লেখকের বিশিষ্ট এ্যাটিচিউডের জন্যেই। অধুনা সাহিত্যের প্রকাশ-বৈশিষ্ট্য ব্যক্তি কবি-লেখকের বাস্তব জীবনচর্যার হুবহু প্রতিচ্ছাপ। খাওয়া থাকা পরা ও যৌন সংযোগ করে বেঁচে থাকার মতো— মলমূত্র পরিত্যাগের মতো অত্যাবশ্যক হয়ে কসরৎবর্জিত অকৃত্রিমতার জন্যেই এ সাহিত্য পূর্বসূরীদের লেখালেখির চেয়ে আলাদা জাতের, আলাদা ধাতের, আলাদা চরিত্রের এবং আলাদা বাঁকের। জনতার জীবন থেকে বিচ্ছিন্নতার সাহিত্য বটে, কিন্তু এখনকার সাহিত্য লেখক-কবির ব্যক্তি জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বাস্তবে এঁদের জীবনটা যে অতল খাদের বেলোয়ারী কিনারে এসে উপস্থিত হয়েছে সেখানে দাঁড়িয়ে নিজেদের অস্তিত্ব নিয়ে যুঝে যেতে যেতে তাঁরা যে চীৎকার দিচ্ছেন, যে দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন, যে কান্না কাঁদছেন, বন্ধুবান্ধবকে যে ডাকটি দিচ্ছেন, মহিলাকে আঁকড়ে ধরে যেটুকু অস্পষ্ট অথচ গভীরতাপূর্ণ ভালোবাসার কথা বলছেন—অসহায়তা ও বিপন্নতার বেদনাবহ প্রকাশ নিয়ে তাই-ই সাহিত্য হচ্ছে এবং লেখক কবির একান্ত আইডেন্টিটি তুলে ধরছে পাঠকের সামনে—যে পাঠক রচনাটি পড়তে পড়তে নিজেকেই সে রচনার নায়ক ভাবতে বাধ্য হচ্ছেন।

অতি সংকটের মধ্যে থেকেও স্বাধীনতা-পূর্ব কালের লেখক কবিরা তাঁদের রচনায় প্রচুর কবিত্ব এবং অক্ষরে অক্ষরে শিল্পত্ব দেখাতে পেরেছিলেন, কিন্তু আজকের লেখকরা অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে সুস্থ মস্তিষ্কে শৈথিল্যহীন শব্দ ও বাক্য প্রয়োগ করে এবং মর্মান্তিক নিরাসক্ত হয়ে নিজেদের অস্থি-মাংস-মজ্জা অনুভূতির কথা উপস্থিত করছেন। তাই কখনো তা মনে হচ্ছে স্বগত সংলাপের মতো, কখনো বা স্বপ্নকথনের মতো।

এই নতুন বাঁকের সাহিত্যকে যাঁরা পশ্চিমী—মূলতঃ ইউরোপ মার্কিনী—নৈরাজ্যের প্রভাব বলে হরবকত মন্তব্য প্রকাশ করছেন, তাঁদের চিন্তা ও বোধ শক্তির ওপর কটাক্ষপাত না করেও বলা যায় যে, তাঁরা হয় সব কিছুকে খতিয়ে দেখেন না, না-হয় ইচ্ছে করে এ সময়ের লেখালেখির শক্তি সামর্থ্যকে অস্বীকার

করবার জন্যে অন্ধ হয়ে থাকছেন। নৈরাজ্যটা বাইরে থেকে আমদানী করা যায় না সেটা তাঁরা ভুলে যান; বিপ্লবটাও বাইরে থেকে আমদানী করার চেষ্টা বাতুলতা। ফ্রাস্ট্রেশনের ব্যাপারটা এখন আন্তর্জাতিক—কোন না কোন এক ধরণের নৈরাজ্য পৃথিবীর প্রতি কেন্দ্রবিন্দুতে আছেই। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব অথবা ইউরোপ আমেরিকায় বীট জেনারেশন, এ্যাংরী ইয়ংম্যানদের আন্দোলন, বিট্‌লদের গান নিয়ে দৌরাত্ম্য কিংবা চেকভূমিতে খ্যাপা তরুণের পেশল অভিপ্রকাশ ঘটনাগত দিক থেকে সত্যি। এক ধরণের ফ্রাষ্ট্রেশন থেকেই এর জন্ম। তবে ইউরোপ-আমেরিকার জাতীয় ফ্রাস্ট্রেশনের বয়স বেশী এবং বুর্জোয়া মর্জি সেখানে বীভৎস। স্বাধীনতার থেকে ভারতীয়রা সে ফ্রাষ্ট্রেশনের সঙ্গে পরিচিত। বুদ্ধিজীবীদের চূড়ান্ত সংকটের সে দিনগুলোতে বাংলা সাহিত্যে যে নিহিলিজম-এর অনুভব—কল্লোল-কালীন লেখকরা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরোক্ষ ঘা খাওয়া লেখক কবিরা যে সব লেখালেখি করেছেন—তাকেও পশ্চিমী প্রভাব বলতে রাজী নই। যদিও আজকের অবস্থার চেয়ে সেদিনের পরিস্থিতি ছিল একেবারেই স্বতন্ত্র। এই সময়ের একটা বৈশিষ্ট্য স্বভাবতই চোখে পড়ে। যে নিষিদ্ধ ফল নিয়ে (মার্কস্‌বাদ এবং ফ্রয়েডের তত্ত্ব) সেদিনের তরুণ সমাজ লেখার জগতে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন তাকে অনেকেই নিজেদের মেধা-মন অস্তিত্বের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে সংকট ত্রাণের হাতিয়ার করে তুলতে পারেন নি। ফলে হতাশ হতে হলো এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের করাল ছায়া সভ্যতার ওপর অন্ধকার চাপিয়ে দিলে তাঁদের আভ্যন্তরীণ ফ্রাষ্ট্রেশন চূড়ান্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। অন্যদিকে ততদিনে কিন্তু মার্কসবাদ ও ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব জনসমাজের স্বীকৃতি পেয়ে লড়াইয়ের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। সাধারণ মানুষ উৎসাহিত হতে চেয়েছে নতুন সমাজ সভ্যতা গড়ে নেবার জন্যে। যে সব লেখক 'জনসমাজের মধ্যে আছি' এই বোধে সাহিত্যে ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ খাটিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে চাইলেন তাঁদের অবস্থাটা শক্তিশালী জটিল অস্ত্রের সঙ্গে সদ্য পরিচিত অপটু সৈনিকের মতো হয়ে দাঁড়ালো। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁরা কবিতা এবং গদ্য লেখাগুলোকে একটা ছাঁচে ফেলে উপস্থিত করতে থাকলেন। ফলে প্রথম দিকে প্রাপ্তির স্বাভাবিক উৎসাহে ভাঁটা পড়তে দেরী হলো না। এক সময়ের আলোড়নকারী কবিরাও সাহিত্য সম্পর্কিত ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়লেন। দু' একজন ছাড়া কেউ বড় একটা লক্ষ্যের দিকে ক্রমাগ্রসর থাকতে পারলেন না। তাঁরা একটা ছকেরই অনুবর্তন ঘটাতে

লাগলেন, উপস্থিত করতে থাকলেন কবিত্বহীন শ্লোগান। আর অন্যরা সমর্পিত হলেন কলাকৈবল্যবাদে—নিছক সৌন্দর্যে অথবা হাজার বছরের দূর থেকে কেউ বা জোনাকীতে পুড়ে যেতে দেখলেন সবুজ পৃথিবী। এমন কি রবীন্দ্রনাথও এই বিশ শতাব্দীর বিশ্ব সংকটের শিকার হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের ধ্যান ও রসদ দিয়ে তৈরী নিজের একটা ভূমি, একটা প্রশান্তির দেশ ও এ্যাডজাষ্ট করার একটা অপূর্ব শক্তি পেয়েছিলেন বলেই টাল সামলে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও তিনি সোচ্চারে বলতে পেরেছিলেন—'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।'

তা হলেই প্রশ্ন আসে, কি দিয়েছে যুদ্ধশেষের মাটি, স্বাধীনতা পরবর্তী কালের দেশ তার তরুণতর সাহিত্যিকদের? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে—রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর দিন ২২শে শ্রাবণ থেকে স্বাধীনতা লাভের দিনটি পর্যন্ত যে সময়, সে সময়টুকুকে বাংলা সাহিত্যের বন্ধ্যা সময় বললেই চলে। এ সময়ের লেখক কবিদের কাছ থেকে গ্রহণ করার মতো কিছুই পায় নি অতি আধুনিক কবি সাহিত্যিকরা। তাই তাদের হাত বাড়াতে হয়েছে একধাপ পিছিয়ে গিয়ে জীবনানন্দ দাশ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আর অনেকটা লাফ দিয়ে কিছুটা পরিমাণে ঐ অধ্যায়ের শেষদিকের সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে। প্রথম দিকে অবশ্য তাঁদের কাউকেই আত্মসাৎ করা তরুণদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। বাস্তব দিক থেকেই অসম্ভব বলে তা সম্ভব হয় নি। তরুণ কবিদের কাছে শ্রেষ্ঠ কবি, যিনি সূর্য সেন-এর ফাঁসিতে বা ইংরেজ দস্যুদের হাতে দেশ ও তরুণতরুণীদের খুন হতে যেতে দেখেও আলোড়িত হন নি তাঁর 'নগ্ন নির্জন' জগতে, সেই জীবনানন্দ দাশের 'তরমুজের মদ', 'হিজলের গন্ধ', 'দূরতম দ্বীপ'-এর 'ধানসিড়ি নদী' আর 'মৃণালিনী ঘোষালের শব' ভরা 'নীরব স্বপ্নের' বিভোরতাকে আত্মসাৎ করতে না পেরে কেবল অনুকরণই করেছেন তরুণ কবিরা আর সমসাময়িক সংকটটাকে তাঁর নিস্পৃহ ভাবনা ভাণ্ডারে জারিয়ে নিয়েছেন 'ভয়াবহ আরতি'র উপলব্ধিতে। এই 'ভয়াবহ আরতি' তখন বিশ্ব-ভূমিতেই। সেখানে 'শত শত শুকরীর প্রসব বেদনার আড়ম্বর' আর 'সিংহের হুঙ্কারে উৎক্ষিপ্ত হরিৎ প্রান্তরের অজস্র জেব্রার মতো' আতঙ্কিত মানুষিক অস্তিত্ব। অন্যদিকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে তাঁরা যে গবেষকের মতো মানুষের অস্তিত্ব ও মৌলিক প্রকৃতি তল্লাসের অভিপ্রকাশ দেখেছেন—দেখেছেন যে আত্মহননকারী প্রদাহ, তাতে তাঁদের স্বকীয় জিজ্ঞাসাই আরো জ্বলন্ত উৎসাহ

পেয়েছে সমাধান অন্বেষার। আর ঠিক এরই সমান্তরালে বহির্ভারতীয় গোটা জগতের শ্রী চেহারা এবং প্রবল আলোড়নকারী সাহিত্য সম্ভারও স্বাধীন ভারতীয় তরুণদের মানসমেধার জগতে প্রখর তেজ বিকীরণ করতে থাকে। ফলে, তরুণ সাহিত্যিক-কবিদের নিজ নিজ এ্যাটিচিউড নির্মাণ পর্বে অনেকেই জীবনানন্দ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আত্মসাৎ করতে না পেরে প্রকারান্তরে বিদেশী লেখক গোষ্ঠির আঙ্গিক প্রকরণসহ নিহিলিস্টিক এ্যাটিচিউডটি পর্যন্ত আরোপ করতে চাইলেন নিজেদের সাহিত্যিক জীবনে। মনে রাখতে হবে, তরুণ কবি-লেখকদের অনেকের মধ্যেই তাই নতুনত্ব ও চমক সৃষ্টির প্রবণতাটা নকলনবীশ হওয়ার নামান্তব হয়ে পড়েছে। এঁদের অনেকের রচনাই প্রায় গুরুত্বহীন। কিন্তু সাম্প্রতিক সাহিত্যক্ষেত্রে যাঁরা প্রবলতর আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন এবং সত্যকার পাঠকদের খুবই ভাবিয়ে তুলেছেন, তাঁদের চিন্তাভাবনার কাছে ভারতের বাইরেকার দেশ মহাদেশগুলোর সাহিত্যের সমসাময়িক আন্দোলন—ভাববস্তু ও আঙ্গিকের বহু কিছুই—আবেদন রাখলেও তাঁদের সৃষ্টির উৎস এবং প্রেরণা স্বদেশের জাতীয় জীবনের মৌলিক বিপন্নতাই।

প্রসঙ্গক্রমে বলতে পারা যায় যে, তরুণতরদের এই অপদস্থমনস্কতা জনিত নিহিলিজম-এর জাতচরিত্রই আলাদা। অগ্রজ কবি লেখকদের যে ফ্রাস্ট্রেশন, তাকেও ইউরোপ আমেরিকা নিয়ে গঠিত পশ্চিম ভূভাগের থেকে ধার করা ফ্রাস্ট্রেশন বলা সঙ্গত নয়। অবশ্য অর্ধশিক্ষিত পাঠকরা এমনি অভিযোগ তুলেই 'বিদেশী অমুক-এর প্রভাব উহার উপর বর্তমান' ধরণের দায়িত্বহীন উক্তির মধ্যে থেকে সমালোচকের তৃপ্তি পেয়ে এসেছে এবং কবি মাইকেল মধুসূদনকে বাংলার মিল্টন, বঙ্কিমচন্দ্রকে বাংলার স্কট, নবীনচন্দ্রকে বাংলার বায়রণ, রবীন্দ্রনাথকে বাংলার শেলী এবং জীবনানন্দ দাশকে বাংলার ভেরলেন বলে এসেছে। কিন্তু আজকের কোনো শিক্ষিত পাঠক অমন ছেঁদো তুলনা টেনে তাঁদের সাহিত্যকে অবপ্রশংসা করবেন কি? সত্য বটে, ইংরেজী ভাষা ও ঔপনিবেশিক শিক্ষার জানালা দিয়েই আমাদের দেশে আধুনিক বিশ্ব-সাহিত্যের জগৎটা—আধুনিক বিশ্বচিত্তবিপর্যয়ের সোর্স টা—পরিষ্কার দেখতে পাওয়া গিয়েছিলো, তবু এ কথা কি বলা যায় যে, পৃথিবী যখন প্রত্যেক দেশের প্রতিটি ব্যক্তির নিজের চোখের চেয়েও কাছাকাছির হয়ে গেছে, তখন এক মহাদেশের মানুষের সঙ্গে অন্য মহাদেশের মানুষের ভাবভাবনার আদান প্রদান কুলুপ আঁটা হয়ে থাকবে? ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের

সাহিত্য সংস্কৃতি, আলোড়ন-বিস্ফোরণ কি পরস্পরের সঙ্গে লেনদেন করে নি ? রেনেসাঁস—প্রোটেস্টান্ট ধর্ম যে আন্দোলনের ঢেউ তুলেছিলো এবং যে সাহিত্যিক প্রেরণা সৃষ্টি করেছিলো, তা কি এক প্রতিভাকে অন্য প্রতিভার পলতে উসকে দেবার শরকাঠি করে তোলে নি ? তাই বলে কি বৃটেন আমেরিকার সাহিত্যিক কুলের তৎকালীন রচনাকে অমুক অমুক দেশের অমুক অমুক লেখকের প্রভাবে সৃষ্ট বলা হবে ? তাদের নিজেদের দেশেই কি সেই বিস্ফোরণের বীজ নিহিত ছিলো না ? সেদিনের ইংরেজ-চোষা জমিতে জাত পৃথিবীর মহত্তম প্রতিভা তো রিউপার্ট ব্রুকের আগেই বা সমসময়ে 'বলাকা'র 'সর্বনেশে' কবিতাটি রচনা করেছিলেন এবং উইলফ্রেড্ আওয়েন, এলিয়ট ও হার্বার্ট রীডের মতোই যুদ্ধের পরিণাম দেখেছিলেন একই সংঙ্গে একই সময়ে। কিন্তু তাঁদের মধ্যেকার ফারাক যে কতখানি, তা বলে দেবার অপেক্ষা রাখে কি ? যুদ্ধের ফলন রিরংসা, হাহাকার, উষরতা এবং ইউরোপ আমেরিকার জাতীয় ফ্রাস্ট্রেশন থেকে যে সব সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে তা এদেশে এসেছে কলোনী প্রভু ইংরেজের ভাষার দৌলতে এবং যুদ্ধ জাহাজের নাবিকের গায়ে বেঁধে। সিফিলিস আর নৈরাজ্যময় সাহিত্য। কিন্তু তা আসার আগেই তো 'অভিশপ্ত দেবশিশু' আর্তনাদ তুলেছিলেন 'আমার দুর্ভাগ্য এই সকলই জেনেছি' বলে। তাহলে ফ্রাস্ট্রেশনটা নিশ্চয়ই বাইরে থেকে আমদানী করা নয় ! আর সমর সেনের '…ঘরে বসে সর্বনাশের সমস্ত ইতিহাস / অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মতো বিচলিত শুনি, / আর অব্যর্থ বিলাপের বিকারে বলি : / আমাদের মুক্তি নেই, আমাদের জয়াশা নেই।' বা 'পলায়ন জীবিকা আমার' স্বীকারোক্তিটা এত গভীর এবং বেদনাদায়ক আলোড়ন দিতে পারতো না আমাদের চৈতন্যে যদি তা বাইরের প্রভাবে তৈরী হতো। কথা এই, পশ্চিমী লেখক কবিরা যেমন জাতীয় ফ্রাস্ট্রেশনকে প্রত্যক্ষ করে তাকে মহৎ সাহিত্য সৃষ্টির উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন—যেমন জীবনাভিজ্ঞতার নির্যাস দিয়েই তাঁদের জাতীয় ফ্রাস্ট্রেশন, অবক্ষয় ও রুক্ষ হাহাকারকে সুর ভাষা ও রং দিয়েছেন তেমনি বাংলাদেশেও। কী রবীন্দ্রানুজ কবি সাহিত্যিকরা আর কী স্বাধীনতা-পরবর্তী কালের লেখক-কবিরা, যাঁদের কোন সমালোচক হঠকারী মন্তব্যে 'বাংরেজী সাহিত্যে ক্ষুধিত বংশ' বলে অভিহিত করেছেন, সবাই নিজেদের আভ্যন্তরীণ সত্যকেই উদ্ধার করেছেন। বোধ ভারতে এবং পাশ্চাত্যে একই থাকার জন্যে সাদৃশ্যটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আঙ্গিকগত সাদৃশ্য যেটুকু, তা দুই পাশাপাশি অভাবী বাড়ীর বিয়ের যোগ্য মেয়ের ছেঁড়া কাপড় সামলে পরার

পরস্পর সহযোগিতা মাত্র। পশ্চিমী লেখকদের সাহিত্যের আঙ্গিকও তাঁদের জাতীয় মানসিকতা থেকেই জন্মেছে এবং সে জন্যেই তা সাধারণের বোধ্য হয়েছে। আমাদের দেশের লেখক কবিরা তাকে কব্জা করে যখন সাহিত্যে ব্যবহার করেছেন, সাধারণ মানুষের কাছে তা দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছে। কেননা, তেমন মানসিকতা সাধারণের মধ্যে এখনো নেই। সাধারণ মানুষ যেখানে প্রায় সামন্ত-তান্ত্রিক মানসিকতায় বুর্জোয়াদের কাছ থেকে কিছু বস্তুগত সুখ সুবিধা ছিনিয়ে নিতে মিছিল করেছে, শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা সেখানে মূলধনী একচেটিয়াতন্ত্রের জগৎ ছাড়িয়ে সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার শিখরে দাঁড়িয়ে সংকটাপন্ন। এ অবস্থায় সাহিত্যের জগত ও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মধ্যে আসমান জমিনের ফারাক থাকাই স্বাভাবিক।

অভিযোগকারীদের এখানেই স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, 'বাংরেজী সাহিত্যে'র ধারাটাই উনবিংশ শতক থেকে প্রাক-স্বাধীনতা কাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত। বয়সে শক্তি সামর্থ্য স্পষ্ট একদা-প্রখর সেই ধারা যে গতিহীন বদ্ধতা সৃষ্টি করেছিলো, উত্তর-স্বাধীতনাকালে সাম্প্রতিক কবি লেখক সমাজ তাকে ফাটিয়েই নানামুখী স্রোত সৃষ্টি করেছেন এবং ফসলের ক্ষেতে প্রবাহ দিয়েছেন। এ সময়ে তাঁরা যে ভাবে সচেতন পড়াশোনায় বাংলা সাহিত্যের দুর্ধর্ষ লেখাগুলো থেকে পাঠ নিয়েছেন, জীবনানন্দ-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আবিষ্কার করেছেন, তেমনি বোদলেয়ার, র‍্যাঁবো কাম্যু, কাফ্‌কা, ভ্যালেরী, ম্যলার্মে, আরার্গ, এলুয়ার, সার্ত্রে, ডষ্টয়ভস্কি, নবোকভ, গর্কি, জেমস জয়েস, এ্যাপোলীনেয়ার,কামিংস, এলিয়ট, অডেন, নাজিম হিকমত প্রমুখ লেখক কবিদের আবিষ্কার করে নিয়েছেন— এশিয়া-আফ্রিকা-ইউরোপ আমেরিকার কবি ও লেখকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ অনুভব করেছেন নিজেদের। কিন্তু যে কথা বলার, তা হচ্ছে এই যে, সে সব কবি-গল্পকারদের লেখালেখিগুলোকে তাঁরা অনুকরণ করেন নি। বহির্ভারতীয় বিশ্ব সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখাগুলোকে হাত বাড়ালে বন্ধুর মতো পাওয়া গেছে বলেই, তা তরুণতরদের ওপরে খুবই আবেদন রেখেছে এবং তরুণ লেখক কবিদের চিন্তা ভাবনা আবেগ উচ্ছ্বাস অনুভূতির সাপোর্ট হিসেবে কাজ করেছে। এবং এটাই সব দেশে সব আসল লেখকদের বেলায় ঘটে থাকে। মাইকেল থেকে মলয় রায় চৌধুরী, পবিত্র মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত ; বঙ্কিমচন্দ্র থেকে বাসুদেব দাশগুপ্ত পর্যন্ত ; রবীন্দ্রনাথ থেকে রমানাথ রায়, রত্নেশ্বর হাজরা পর্যন্ত তাইই ঘটেছে।

তা হলেই দেখা যাচ্ছে, 'প্রভাব' শব্দটা তরুণতর কবি সাহিত্যিকদের লেখার

ব্যাপারে প্রয়োগ করাটা নিছক গালমন্দ করার অভ্যাসবশতই সমালোচনা সাহিত্যে একটা বড় গদী পেয়ে গেছে। আদতে তা ভিত্তিহীন। সাহিত্যের ব্যাপারে বড়জোর এক লেখকের সঙ্গে অন্য লেখকের তুলনা করা চলে, সেও সীমিত ক্ষেত্রে মাত্র। আমরা আগেই দেখেছি নৈরাজ্যটাকেও—যদি আদৌ তা নৈরাজ্য হয়, বহির্ভারতীয় দেশগুলো থেকে আমদানী করা হয় নি। গোটা দেশের বৃহত্তর অংশের মানুষ যদিও এখনো 'ছউ নাচ', 'ঢপ কীর্তন', 'কথকতা', 'যাত্রা' প্রভৃতিতেই নিজেদের অশিক্ষা ও দারিদ্র নিয়ে পরিতৃপ্ত থেকে চাষাবাদ হাটবাজার করছে, ছেলেপুলে বিয়োচ্ছে আর বড়জোর আকাশবাণীর 'বিবিধ ভারতী' শুনছে কিম্বা গরুর গাড়িতে করে নিয়ে এসে ধান চাল পাট মহাজনের গোলায় তুলে দিয়ে মফঃস্বল শহরের রূপকথার রূপোলী পর্দায় কাঠবাসি হয়ে যাওয়া 'সঙ্গম' কি 'সাগরিকা' দেখছে, তবু পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারত ভূমিতেই একটা জাতীয় ফ্রাস্ট্রেশন দেখা দিয়েছে এবং এ ফ্রাস্ট্রেশন বিশ্বের সমস্ত কোণের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ক্ষয়, অবক্ষয়, বিপ্লব, বিদ্রোহ, যুদ্ধের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত। সাম্প্রতিক কবি লেখকদের কাছে ছটা মহাদেশ আর মহাকাশ রাষ্ট্রীয় সীমারেখাহীন। সমস্ত পৃথিবীটাই এখন সুপারসনিক বিমান, রেডিও, টেলিভিশন, টেলিপ্রিণ্টার ও রেডিও ফটোগ্রাফির দৌলতে প্রতিটি ব্যক্তির কাছে ঘর ও তার উঠোন হয়ে গিয়ে রকেট স্পুটনিকের যুগে প্রবেশ করেছে। ফলে, কোলকাতার দাক্ষিণাত্য প্রদেশেই নিউইয়র্ক সিটি, কলাবাগান বস্তিতেই আফ্রিকা, বৌবাজার স্ট্রীটেই রাশিয়া আর এণ্টালিতে চায়নার প্রত্যক্ষ অনুভব এবং এসপ্লানেডে প্রত্যেকটি আন্দোলনে পুলিশের নগ্ন আক্রমণই ভিয়েতনাম যুদ্ধের অভিজ্ঞতা দিয়েছে তীক্ষ্ণ মেধা সম্পন্ন অনুভূতিপ্রবণ কবি লেখককে। বস্তুত 'জগত আসি হেথা করিছে কোলাকুলি' নয় জগত কোলকাতা-তেই স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। মার্কিন প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন, বৃটেনের খোলাবাজারে নেমে আসা ; লুমুম্বা, কেনেডি, লুথার কিং, কেনেডিকে হত্যা ; সোভিয়েতে স্ট্যালিনের কীর্তি এবং শব-মান অপনয়ন ; চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে অরাজকতা ; কমিউনিস্ট জগত ভেঙে দু'টুকরো হয়ে যাওয়া, ইন্দোনেশিয়ায় কমিউনিস্ট নিধন যজ্ঞ ; কোরিয়ার যুদ্ধ, ভিয়েতনাম যুদ্ধ, সুয়েজ সংকট, আরব ইস্রায়েল যুদ্ধ, হাঙ্গেরি, তিব্বত ও চেকোশ্লোভাকিয়ার আভ্যন্তরীণ অশান্তি, পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলন, বীট জেনারেশনের আন্দোলন, বিটল্‌দের গান নিয়ে দস্যিপনা, হিপীদের আত্মিক শান্তি সাধনা (?) কোলকাতার তারুণ্য

মানসিকতায় একান্ত নিজস্ব বলে মনে হয়েছে। এ্যালেন গীনসবার্গ বা এভগেনি এভতুশেঙ্কো কিম্বা অন্য কারুর অনুকরণেই সে মানসিকতা গড়ে ওঠে নি।

প্রশ্ন হতে পারে কিসের বিরুদ্ধে তরুণদের বিক্ষোভ? কি চায় তাঁরা? উত্তর, স্বাধীনতা। কিন্তু এ স্বাধীনতার স্বরূপ কি? প্রশ্নটা জটিল। তবুও এর যেটুকু এঁদের লেখালেখির মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসেছে তাতে বোঝা যায় যে, এঁরা কোনো ইনস্‌টিটিউশনের মধ্যেই বদ্ধ থাকতে চান না। এঁরা মনে করেন সমস্ত পৃথিবীটাই একটা বুর্জোয়া ইনস্‌টিটিউশন। বস্তুসর্বস্বতাই এর স্বরূপ। প্রত্যেক মানুষই এই বস্তুকে নিজের তাঁবে রেখে ভোগ দখল কবতে চায়। এতদিন ধরে সংখ্যালঘু বুর্জোয়ারাই পৃথিবীকে ভোগ দখল করে এসেছে। বৃহত্তর সংখ্যার মানুষও ঐ বস্তুকে ভোগ করতে চেয়েছে—কিন্তু পারে নি, কেবল শোষিতই হয়েছে। এখন যদি বুর্জোয়াদের নিধন কবে সর্বহারা মানুষ বস্তু পৃথিবীকে তার সমস্ত সম্পদসহ দখল করে নেয় এবং ভোগ করে তবে তারাও হবে এই বুর্জোয়া দুনিয়ার প্রভু এবং বস্তু উপভোগে তারাও সুখী হবে। তারাও একটা ইনস্‌টিটিউশন গড়বে এবং সেটাও হবে ঐ বুর্জোয়া ইনস্‌টিটিউশনই। কিন্তু বস্তুর শেষ নেই—যা কখনোই মানুষকে পরিতৃপ্ত করে না। অথচ বস্তু পেতে হলে ইনস্‌টিটিউশনের আইন কানুনের বেড়াজালের মধ্যে বন্দী থাকতেই হবে। তাই এরা বস্তুকে ভোগ করতে চায় না—বুর্জোয়া ইনস্‌টিটিউশনের আইন কানুন মাত্রকেই আঘাত করতে চায়। তার নিজের ওসবের কিছুরই প্রয়োজন নেই তবে নিছক বেঁচে থাকার জন্যে—ভালোলাগার জন্যে যদি কিছু বস্তু তার এসে যায় তাকে সে উপভোগ করবে না এমন নয়। কিন্তু বস্তুকে পাওয়ার জন্যে তার কোন হ্যাঙ্কারিং নেই—উদগ্র প্রয়াস নেই। যার খুশি সে পৃথিবীকে ভোগ করুক—বস্তু পাওয়ার জন্যে আন্দোলন করুক সে ব্যাপারে তার কিছুই করার নেই। নিষেধও নেই, সহযোগিতাও নেই। জন্ম থেকেই সে নিজে সার্বভৌম স্বাধীন। বুর্জোয়া এ বিশ্বের মধ্যে তা হলে একজন লেখকের কী করার থাকতে পারে? না—তার কিছুই করার নেই। সে শুধু নিজের অস্তিত্ব নিয়ে স্বপ্ন দেখে। তাই আধুনিক সময়ের বলিষ্ঠ লেখকরা মোটামুটি সাহিত্যকে আপন আপন অস্তিত্বের ধর্মোপাসনার মতোই দেখছেন। ঠিক এমনি মনোভাবই বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেও দানা বেঁধে উঠেছিলো। তিনিও ঠিক এমনি কমলা-কান্তর জবানীতে বলেছিলেন, 'ইংরেজী সভ্যতার একটি প্রধান চিহ্ন—তাঁহারা আসিয়া এদেশের বাহ্য সম্পদ সাধনেই নিযুক্ত—আমরা তাহাই ভালবাসিয়া

আর সকল বিস্মৃত হইয়াছি। ভারতবর্ষের অন্যান্য দেবমূর্ত্তি সকল মন্দিরচ্যুত হইয়াছে—সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত কেবল বাহুসম্পদের পূজা আরম্ভ হইয়াছে। দেখ, কত বাণিজ্য বাড়িতেছে—দেখ কেমন রেলওয়েতে হিন্দুভূমি জাল নিবদ্ধ হইয়া উঠিল—দেখিতেছ টেলিগ্রাফ কেমন বস্তু? দেখিতেছি।' কিন্তু কমলাকান্তর জিজ্ঞাসা এই যে, 'তোমার রেলওয়ে টেলিগ্রাফে কতটুকু মনের সুখ বাড়িবে? আমার এই হারানো মন খুঁজিয়া আনিতে পারিবে? কাহারও মনের আগুন নিবাইতে পারিবে?'[1] এ জিজ্ঞাসা কেবল জনৈক কমলাকান্তর নয়, 'দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া যাওয়া' বাংলা দেশের তরুণ মাত্রেরই। তাঁরা সবাই বাড়ি আছেন—নিজ নিজ বাড়িতে, কিন্তু বাড়ির ভেতরে কেউই নিজেকে খুঁজে পাচ্ছেন না। অথচ ভারত সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র, কল্লোলিনী তিলোত্তমা কোলকাতা। 'নিউইয়র্কের সঙ্গে এর অবিকল মিল' বলে মন্তব্য প্রকাশ করেন নিউইয়র্ক শহরের বিদুষী মহিলা। বাঙলাদেশের কবি সাহিত্যিক কিন্তু প্রত্যক্ষ করেন একজন মানুষের সঙ্গে বহুজন মানুষের ব্যবধান, স্কাইস্ক্র্যাপার আর ফুটপাথের—ফলে, কবি বাক্য 'মনুমেন্ট মনুমেন্ট ফুটে ওঠে মৃত্যুর মতো / সুখ শেষ হয়, দুঃখ জেগে থাকে / স্বপ্ন ফুটো হয়, দুঃস্বপ্ন ফণা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে, / হাওড়া ব্রীজ চোখে দেখে কোলকাতার হাড়, / যাও, যাও, কর্পোরেশনে গিয়ে ভোটাভুটি করো।'[2] 'হাজার কড়া ন'শো নিরানব্বই জন' এর কোনো উন্নতি হয় নি—বঙ্কিমচন্দ্রের একশো বছর বাদেও হয় নি।

একই অপ্রেশন—একই বদ্ধতার মধ্যে থেকে একটা সর্বব্যাপক হতাশা জাতির মজ্জার মধ্যে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। খুনখুন খুনখুন করে হাড়ের ভেতর থেকে মনুষ্যত্বকে—সংগ্রামী চেতনাকে খুন করে ফেলতে চাইছে। এ অবস্থার মধ্যে থেকে প্রত্যক্ষই দুটি চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এক দিকে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী মহল ক্রমাগত এই মার খেয়ে নিজেদের মধ্যে লুকোতে লুকোতে নিজেরাই নিজেদের খুঁজে পাচ্ছেন না—কোথাও চাষাবাদ, কাজকর্ম, গণ-আন্দোলন এবং গরীব দুঃখীর রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের মধ্যে কোনো আশার আলোক দেখতে না পেয়ে একটা নিহিলিষ্ট মানসিকতা নিয়ে নিজের ভেতরে স্বাধীনতার তল্লাসী চালাচ্ছেন—স্বপ্ন দেখছেন; অন্যদিকে সাধারণ মানুষ প্রতিদিন হতাশ হচ্ছে, ভেঙে পড়ছে, বিক্ষুব্ধ হচ্ছে কিন্তু মিছিল দেখলে ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় মিছিলের শেষজনের পেছনে পা চালিয়ে দিচ্ছে—মেরে কেটে কিছু অর্থনৈতিক, কিছু রাজনৈতিক

১ কমলাকান্তের দপ্তর—বঙ্কিমচন্দ্র ২ টেরিলিন টেরিকট—সুবো আচার্য

অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউ বলছেন, রুটির জন্যেও তাঁর 'কাজ' করার ইচ্ছে নেই ; সাধারণ মানুষ বলছে 'কাজ চাই'। দুই মেরুর দুই সম্প্রদায়। তাই শিল্পী সাহিত্যিক কবিদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের আজ দুরতিক্রম্য ব্যবধান। আর এর ফলেই সাধারণ শিক্ষিত পাঠকের কাছে এ সময়ের লেখালেখিগুলোকে একেবারেই বিদেশী ও দুর্বোধ্য বলে মনে হচ্ছে—এবং এটাই বাংলা সাহিত্যের ট্রাডিশন। মাইকেল দুর্বোধ্য, রবীন্দ্রনাথ দুর্বোধ্য, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে দুর্বোধ্য—দুর্বোধ্য দেবেশ রায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, পুষ্কর দাশগুপ্ত ইত্যাদি ইত্যাদি। অথচ কোনো লেখাই বিদেশী মশলায় তৈরী তো নয়ই, দুর্বোধ্যও না। বিদেশী লেখাপত্রের যে সব ছাপ দেখানো হয়, এবং যে রকমভাবে দেখানো হয় সে ভাবে বলতে গেলে বলা যায় আমেরিকা আফ্রিকা ইউরোপ প্রভৃতি মহাদেশের বড় লেখকদের সাহিত্যেও বাংলা সাহিত্যের তথা ভারতীয় সাহিত্যের ছাপ আছে। আর এলিয়ট, এজরা পাউণ্ড, গীনসবার্গ প্রভৃতি একই কারণে সে দেশের মানুষের কাছে দুর্বোধ্য। আটপৌরে খাওয়া থাকা পরা ছাড়াও মহত্তর আদর্শের প্রেরণায় প্রতিমুহূর্তে এগিয়ে যাবার কিম্বা এক ধান বীজকে ধ্বংস করে বিপুল ধান এবং ধানবীজ সৃষ্টি করার তাগিদ জনসাধারণের মধ্যে আছে ; সেগুলোকে সাহিত্যে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টাও আছে এক অংশের তরুণ কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে। কিন্তু গোঁড়ামী এবং ছকে ফেলে শ্লোগানকে কবিতা বা নায়কের শহীদ হওয়ায় ময়দান ভরা কান্না বানানোর এক ধরণের বাঁধাধরা রীতিতে গল্প উপন্যাস তৈরী করতে গিয়ে তাঁরা আজে শুধু বলছেন 'অকালে জেগেছি বাংলা দেশে / কাঁদানে ধোঁয়ায় অশ্রুতে বারবার / যত না জমুক থ্যাঁতলানো পোড়া হাড় / সূর্যের ছিলো / মেঘের মেশিনে তবু / হাই টেনশনে বিদ্যুতে দুর্জয় / সেদিন বিপুল উল্লাসে ফেটে পড়ে / রক্তে জটায়ু ডানা মেলে অক্ষয়।'* কিন্তু একথা বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না যে এ কবিতা যাদের মুখ চেয়ে লেখা হয়, তাদের কাছে উপরোক্ত অর্থেই তা বিদেশী ; আর যারা জীবনানন্দ দাশের কবিতা পড়েছে তাদের কাছে জোলো। সাধারণ মানুষের মধ্যেকার যে সন্দেহ সংশয় ও সংগ্রামের জটিলতা তা কোনো একটি শব্দেও মূর্তি নিয়ে আসতে পারে নি। গদ্য রচনার বেলাতেও একই কথা। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে সাহিত্য আলোচনার সময়ে তা পরিষ্কার হবে বলেই আশা করা যায়। তবে এ কথা না বললে সত্যের অপলাপ হয় যে, যত ক্ষীণ

* গণেশ বসু

বা সরলই হোক না কেন, জীবনটা গোঁয়ারের মতো যে একেবারেই 'না' এর দিকে ছুটছে না, 'ইতিবাচক' দিকেই পৃথিবী ক্রমাগ্রসর ও মানুষ তার স্বপ্নকে সম্ভব করতে সংগ্রামী প্রবাহ সৃষ্টি করছে, সে কথা এঁরাই উপস্থিত করে মানুষকে বিশ্বাস করতে ভালোবাসতে সংগ্রাম করতে উৎসাহিত করছেন। কিন্তু একথা বলার জন্যে বিপুল অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বলিষ্ঠ ক্ষমতার লেখক এ সময়ে অনুপস্থিত। নিজেদের ভেতরে সেই জ্বালা সেই আর্তি এবং জ্বলন্ত অভিজ্ঞতার অভাবের জন্যেই গর্কি, অস্ত্রভস্কি, মায়াকভস্কি বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায় এঁদের জন্দ আকাঙ্ক্ষাকে উসকে দিতে পারেন নি। জনতার সঙ্গে অপরিচয়ের সাক্ষ্য এঁদের লেখালেখিগুলোতে সুস্পষ্ট।

দিক্‌দর্শন

[আধুনিকতার প্রথম পর্যায়ের সাহিত্য আন্দোলনের মূল উপাদানসমূহ—মধ্যযুগীয় অন্ধতার বিরুদ্ধে জেহাদ—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য—স্বাধীনতাস্পৃহা—নারীকে সাহিত্যের কেন্দ্রীয় শক্তি হিসেবে গ্রহণ—ব্যক্তির আন্তর-জগতের উন্মোচন—গদ্য-ভাষা গঠন ও ছন্দমুক্তির মধ্যে থেকে ভাঙাগড়া—যুগ যন্ত্রণায় জর্জরিত মানসিকতাজাত ব্যঙ্গ বিদ্রূপ—ঘটনার নিয়ন্ত্রণ অস্বীকার করে গদ্য কাহিনীতে মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণের আমদানী—বাংলা 'লিরিক'এর উদ্ভব—এ পর্বের গদ্য পদ্য রচয়িতাদের লেখাতে আধুনিক উপাদান ব্যবহারে সার্থকতা ও ব্যর্থতা—পরবর্তী সময়ের লেখক-কবিদের সঙ্গে এ অধ্যায়ের যোগাযোগ—রবীন্দ্র-বিরোধিতার মধ্যে থেকে আধুনিকতার দ্বিতীয় পর্যায়ের সাহিত্য আন্দোলনের আয়োজন]

'And wilt thou tremble so my heart
When the mighty breathe on thee ?
And shall thy like this depart ?
Away ! It cannot be.'*

বাঙলা দেশের ইংরেজ সন্তান বাঙালী ডিরোজিও-র এই কণ্ঠস্বর তুমুল আলোড়ন তুলেছিলো বাংলাভাষী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পিয়াসী তরুণ চৈতন্যে। 'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে' গান যেখানে, হেনরী ডিরোজিওর মুক্তি পিয়াসা তার থেকে বহু সুদূর গভীরে আবেদন পাঠিয়ে দিয়েছিলো সেদিন। তরুণ নাগরিক বাঙালী সেদিন মুক্তি চেয়েছিলো সর্বদেহ-মন-মেধার আর তারই স্পর্ধিত প্রকাশ দেখা গেলো মাইকেল মধুসূদন দত্তর মধ্যে। জিজ্ঞাসা জাগলো 'কে বা সে অধম রাম ?' মধ্যযুগের অন্ধতার বিরুদ্ধে সেদিনের বিদ্রোহী চেতনা কালাপাহাড়ী আঘাত হেনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে সজাগ করতে চেয়েছে যুগ যুগের দাসত্বের শিকার মানুষকে, আপন ঐতিহ্যের দিকে আঙুল তুলে দেখাতে চেয়েছে

* ইণ্ডিপেণ্ডেন্স—হেনরী ডিরোজিও

কে সে। তরুণ নাগরিক বাঙালী হেনরী ডিরোজিওর কাছ থেকে শিখেছিলো মানবতাবোধ—শিখেছিলো 'And feeling for degraded man / Give freedom to thc slave'.১ আর অর্জন করেছিলো পাপকে ঘৃণা করার শক্তি। ডিরোজিওর যৌবন-প্রখর উদ্দীপনার সঙ্গে সত্যানুসন্ধিৎসা মিলে যে চৌম্বক শক্তি তৈরী হয়েছিলো তার আকর্ষণ প্রবল ভাবে মধ্যযুগ থেকে ছিঁড়ে নিয়ে এসেছিলো রেনেসাঁসের তরুণ প্রতিভা। ডিরোজিওর কাব্যের মৃত্যু চেতনাই সম্ভবত তাঁদের আধুনিকতার দ্বিতীয় পাঠ হয়ে থাকবে। মধুসূদন ডিরোজিও চৈতন্যের বংশোদ্ভূত। ডিরোজিও বা অন্য কারুর প্রভাবিত নয়।

বস্তুতই, বাঙালীর আত্যন্তিক জীবন বাসনা এবং সহজাত ধারণক্ষমতা ইউরোপীয় সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞানের সরাসরি যোগাযোগে আপন জড়তা ও অন্ধতাকে ধ্বসিয়ে দিয়ে সেই ধ্বংসস্তূপের ওপর গড়ে তুলেছিলো আধুনিক জীবন জিজ্ঞাসা। অনুকৃতি নয়, প্রস্তুত অস্তিত্বের আর্তি ইউরোপীয় সাহচর্য্যে অঙ্কুরিত এবং পুষ্পপত্রপল্লবিত হয়েছে মাত্র। জীবনের অন্তর্নিহিত শক্তির চাপেই রেনেসাঁস হয়ে উঠেছে বাঙালী মানসের এক দ্বান্দ্বিক ফলশ্রুতি। সাহিত্যেও তাই ধরা পড়েছে নব মুক্তির উচ্ছ্বাস আর কামনা বাসনা অন্তর্জ্বালার—ভাঙা-গড়া উত্থান-পতনের অভিপ্রকাশ। বাংলা সাহিত্যের পাঠক লক্ষ্য করেছেন, কালান্তরের সাহিত্যে গ্রাম বাংলার প্রস্থান যেমন দ্রুত সংঘটিত হয়েছে, তেমনি দ্রুতই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নগরকেন্দ্রিক জীবন সমস্যা ও খরধার ব্যক্তি-জিজ্ঞাসা। গ্রাম ও নগরের মধ্যে অনতিক্রম্য দূরত্ব সৃষ্টি হবার সঙ্গে সঙ্গেই পুরনো জীবন-ঐতিহ্যকে বিনষ্ট করে নাগরিক কৃত্রিমতার চাষ সুরু হয়ে গেছে পূর্ণোদ্যমে। দেখা দিয়েছে সর্ববিচ্ছিন্ন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য। আধুনিকতার প্রতিষ্ঠাভূমি কোলকাতায় ইউরোপীয় সাহিত্য-সংস্কৃতিকে নবজন্মের শিশু বাঙালী সেদিন গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে দেখে তার স্বরূপকে মিলিয়ে নিয়েছে নিজেদের চিন্তা-চৈতন্য-অনুভূতির সঙ্গে। আর প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধের প্রতি অস্বীকারের জেহাদ ঘোষণা করেও যখন স্থানকালপাত্রের মধ্যে দেখেছে নবপ্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়া সংস্কৃতি ও সমাজের অপ্রতিরোধ্য ব্যর্থতা, তখন চারদিক থেকে বিড়ম্বিত যুগ-আত্মা আর্তনাদ করে উঠেছে : 'হায় ইচ্ছা করে / ছাড়িয়া কনক লঙ্কা, নিবিড় কাননে / পশি, এ মনের জ্বালা জুড়াই বিরলে। /...... কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে ?'২ এবং আশাভঙ্গের এই হাহাকারই অতি তীব্র হয়ে পরিণত মূর্ত্তি ধরেছে উত্তর-

১ দি ফ্রিডম অব দা স্লেভ—ডিরোজিও ২ মেঘনাদবধ কাব্য—মধুসূদন

স্বাধীনতা কালে 'আশা ছিলো সন্তানের উৎপন্ন চুলের পরে হাত রাখা যাবে'* কবি-বাক্যটির মধ্যে।

নতুন সাহিত্য নতুন বুর্জোয়া মানস ও সমাজ-সংস্কারের ভয়ঙ্কর ক্রিয়াশীলতার দর্পণ। ইংরেজ শাসক তার শাসনের সুবিধার জন্যে এবং ভারতবর্ষকে তার সাম্রাজ্যবাদী মুনাফার চিরস্থায়ী শিকার করে রাখার জন্যে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বসিয়ে দিয়ে ধনতান্ত্রিক ভাব-ভাবনা বপন করলেও, সে কখনোই তার এই মহাদেশকল্প কলোনীতে ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটাতে চায় নি। কিন্তু বুর্জোয়া চিন্তা-চেতনার ঐ সামান্য স্পর্শেই বাঙালীর অন্তর্নিহিত বিদ্রোহ গাছ ফেটে জব্দ আগুন বেরিয়ে আসার মতো ফুঁসে উঠেছিলো। যুক্তিমুক্তি ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধে প্রখর প্রতিভা পুরোনো সামাজিক মূল্যবোধকে—ব্যক্তিত্ব সচেতনাহীন, কুসংস্কারান্ধ তথাকথিত সমষ্টিমাঙ্গল্যবোধকে—চুরমার করে, ভগবানের বদলে মানুষকে বিশ্বব্যাপারের কেন্দ্রে স্থাপন করে তার সামাজিক অন্দোলনকে তীব্রতর করে তুললো। একদিকে জেগে উঠেছে জাতীয়তাধর্মী স্বাভিমান ও স্বাদেশিকতা, অন্যদিকে স্বদেশ ও সমাজের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কঠোর আক্রমণ। এই সূত্রেই সাহিত্যের মর্জিও পালটে গেছে—নতুন একটা মোড় নিয়েছে বাংলা-সাহিত্য। ব্যবহারিক প্রয়োজনে মধ্যযুগীয় পাঁচালী লাচারী ত্রিপদীর জগত থেকে কঠিন কঠোর গদ্য এবং অবাধবন্ধ আবেগ প্রকাশের জন্যে যুগ চরিত্রের দুর্বার বৈশিষ্ট্য প্রকাশক অমিত্রাক্ষর ছন্দ—এ দু'য়ের আবির্ভাব বিপুল সম্ভাবনা খুলে দিয়েছে সাহিত্য ক্ষেত্রে। অনুভূতি ও আবেগ মাত্র নয়, বুদ্ধি আর অর্থ প্রধান হয়ে উঠেছে সাহিত্য শরীরে। রামমোহন 'গ্রানিট স্তরের' উপর 'নিমজ্জমান' বাংলা ভাষাকে স্থাপন করলেন এবং বিদ্যাসাগর তাকে অর্থপ্রকাশক করে তুললেন। মধুসূদনও কাব্যের অর্থপ্রকাশ ক্ষমতাকে মূল বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে বিদ্রোহের স্বরূপ ব্যক্ত করলেন। সাহিত্যে উপস্থিত হলো ব্যক্তির আত্মিক বিলাপ—বিদ্যাসাগরের 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' আর মাইকেলের 'আত্মবিলাপ'। এ দুটিই অপরাজেয় সংগ্রামীর ব্যক্তিগত যন্ত্রণা-বেদনার মৌলিক প্রকাশ। ব্যর্থতা বোধের রক্ত চিহ্ন। মৃতা প্রভাবতীকে লক্ষ্য করে বিদ্যাসাগর নিজেকেই উন্মুক্ত করে বলে উঠেছেন : 'তুমি, স্বল্পকালে নরলোক হইতে অপসৃতা হইয়া, আমার বোধে অতি সুবোধের কার্য করিয়াছ। অধিক কাল থাকিলে, আর কি অধিক সুখভোগ করিতে ; হয়ত, অদৃষ্ট বৈগুণ্যবশতঃ অশেষবিধ যাতনা ভোগের

*শক্তি চট্টোপাধ্যায়

একশেষ ঘটিত। সংসার যেরূপ বিরুদ্ধ স্থান, তাহাতে, তুমি দীর্ঘজীবিনী হইলে, কখনই সুখে ও স্বচ্ছন্দে, জীবন যাত্রার সমাধান করিতে পারিতে না।' হিউম্যানিষ্টের নিজের কথা বলার কোথাও অবকাশ নেই। জীবনপ্রান্তে এসে সামান্ত সুযোগেই তাঁর নিজের একান্ত বোধটি ভাষা পেয়ে গেছে। আর মধুসূদনের সমগ্র জীবনই ট্র্যাজিক বেদনা প্রকাশের নির্ঝর। 'আত্মবিলাপ' বুর্জোয়া পরিবেশে অস্তিত্বের প্রথম কান্না, 'হায় রে ভুলিবি কত আশার কুহক ছলে।' বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে এই কান্নাই শেষ অব্দি একটা তান্ত্রিক-সুলভ রুক্ষ নিস্পৃহতা এনে দিয়েছিলো, 'প্রাণ গিয়াছে ভাই, আর নিঃশ্বাস কেন? সুখ গিয়াছে, ভাই, আর কান্না কেন? তবু কাঁদি। জন্মিবামাত্র কাঁদিয়াছিলাম, কাঁদিয়া মরিব। এখন কাঁদিব, লিখিব না।' [কমলাকান্তের বিদায়]। বাংলা সাহিত্যে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের আশাভঙ্গ ও জীবনসংকট কান্নায় রূপ নিয়েছে উনিশ শতকের বিদ্রোহের গভীরেই। পরবর্তীকালে তা অন্তরঙ্গ গীতিকবিতার অর্থাৎ লিরিকের ভরা কোটালে উচ্ছ্বসিত হয়েছে, হয়েছে ঘন ও আরো গভীর।

এখানেই রেনেসাঁসের আর একটা দানের কথা উল্লেখ করতে হয়। বাংলা সাহিত্যে উনিশ শতকের সমাজ সংস্কারের আন্দোলন যতটুকু রেখাপাত করেছে, তার বড় একটা অংশই নারীকে স্থাবর সম্পত্তি বা আসবাসপত্রত্ব থেকে মানবিক অধিকারে প্রতিষ্ঠা দেবার ও তার স্বাধীন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বকে স্বীকৃতি দেবার আন্দোলন। বুঝি এই একটি ক্ষেত্রেই 'পুনর্জন্ম' আন্দোলন নামে ও তাৎপর্যে যথার্থ এবং আংশিক ভাবে সে আন্দোলন সফলও হয়েছিলো। সতীদাহ প্রথা নিবারণ, নারীর বৈষয়িক অধিকারের প্রতিষ্ঠা, ব্যক্তি-নারীর স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকৃতিদান, নারীশিক্ষা প্রচলনে রামমোহন রায়ের যে বৈপ্লবিক সাফল্য, এসবের পেছনে একটা সার্বিক স্বীকৃতি—মানবিক বোধের একটা স্বাভাবিক পরিণতি ছিলো। আর তাই তা পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলো। শিক্ষিত কি অশিক্ষিত কারুরই, প্রথম দিকে কিছুটা কুসংস্কারগত ওজর আপত্তি থাকলেও, শেষ পর্যন্ত বিধবার বেঁচে থাকার অধিকার ও নারীর ব্যক্তিমূল্য স্বীকার করে নিতে কোনো দ্বিধা থাকে নি। কিন্তু পুরুষ শাসিত পরিবারের নিছক সম্পত্তিগত স্বার্থ অর্থাৎ বিধবার সম্পত্তিকে অবাধে ভোগদখল করা ও আত্মসাৎ করার উগ্র প্রবৃত্তি শেষ অব্দি বিদ্যাসাগরের আন্দোলনকে সক্রিয়ভাবে বাধা দিয়েছে। আইনগত ও নীতিগত স্বীকৃতিলাভ করলেও, জীবন ও যৌন সমস্যার সমাধান হিসেবে বিধবার বিবাহ বা নারীর কাম-বাসনার ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহের অধিকার সমাজের অনেক

অতিশিক্ষিত পুরুষও স্বীকার করে নিতে পারেন নি। ফলে, হিউম্যানিষ্ট বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের আপাত সাফল্য ব্যর্থতার নামান্তর হয়ে অঙ্কুরেই নষ্ট হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও, নারীর পুনর্জন্ম ও তার সার্বিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতার প্রশ্নে, নারীকে ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত করার প্রশ্নে, তার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক অধিকারের প্রশ্নে কিম্বা দেহ সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তার স্বেচ্ছা-পুরুষ-সংসর্গের স্বাধীনতার প্রশ্নে যে বৈপ্লবিক চেতনা ও সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিলো, তা বাংলা সাহিত্যের পৌরুষ সৃষ্টিতে অন্যতম প্রধান উপাদান হয়ে উঠেছে। কবিতার ক্ষেত্রে প্রেম যেমন একটা গভীর তাৎপর্য পেয়েছে—নরনারীর যৌন এবং সংস্কৃতির মিলনে অন্য এক বোধের দ্যোতক হয়েছে—তেমনি গদ্যে নরনারীর দৈহিক ও মানসিক সম্পর্ক যুক্তিতর্ক ও অনুভূতির বিচিত্র বর্ণে নতুন জিজ্ঞাসার বিষয় হয়ে উঠেছে। স্ত্রী-শিক্ষা, মেয়েদের বেশি বয়সে বিয়ে হওয়া, বিধবার বিয়ে, অসবর্ণ বিয়ে, মেয়েদের 'সীমাস্বর্গের ইন্দ্রানী'ত্ব ঘুচে গিয়ে সর্বত্র চলাফেরা করার স্বাধীনতা—এক কথায় নারীপুরুষের মধ্যেকার ফারাক দূর হয়ে যাওয়া বাংলা গদ্যপদ্যকে দুরন্ত গতি দিয়েছে। নারীমুক্তি, আবেগের প্রগতি ও বুদ্ধির খরধার তীক্ষ্ণতা নিয়ে এসে সাহিত্যে রক্তমাংসের মানব-মানবীকে ক্রিয়াচঞ্চল করে তুলেছে। একটু দৃষ্টি দিলেই দেখা যাবে, নারীই উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের মৌল সৃষ্টি—কেন্দ্রীয় শক্তি। নারী পুরুষের সম্পর্কের সমস্যা, পরিবার ও সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ নারীর সম্পর্কের সমস্যাই যুগ সমস্যা। মধুসূদন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে—এ পর্বের মেজর মাইনর সব লেখক-কবির লেখালেখির মধ্যে—নারীই একমাত্র জীবনমূল্যবোধে চিহ্নিত হয়ে পরিণতি লাভ করেছে। পুরুষ কোথাও অভিশপ্ত, কোথাও খণ্ডিত, কোথাও অস্থির আর কোথাও বা নির্বীর্য।

'আগে মেয়েগুলো ছিল ভালো / ব্রত ধর্ম কোর্তো সবে। / একা বেথুন এসে শেষ করেছে / আর কি তাদের তেমন পাবে॥'—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর রক্তেই নারী বিদ্বেষ। নারী মুক্তি অনিবার্য আবেগে যখন সমস্ত সমাজ অস্তিত্বে ভরা কোটালের টান বসিয়েছে, 'বগলেতে বৃষকাষ্ঠ শক্তিহীন যেই / কোলের কুমারী ল'য়ে বিয়ে করে সেই' এমন মানুষের প্রতিই আন্তরিক মমতা রেখে ঈশ্বর গুপ্ত আধুনিক মনুষ্যত্ব বোধের সঙ্গে লড়াইয়ে নেমেছেন। অথচ ইস্পাত কঠিন বহিরাঙ্গের অস্তিত্ব-নিঙড়ানো কান্নায় ঠিক তখনই প্রকাশিত হয়েছে ঈশ্বরচন্দ্র

বিদ্যাসাগরের আর্তনাদ : 'হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে, ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারিনা!' [বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক প্রস্তাব (২য়)]। আর এই আর্তনাদ সক্রিয় অঙ্গীকার হয়ে নারী জীবনের সার্বিক মুক্তিকে বাস্তবে রূপায়িত করেছে এবং উনবিংশ শতকের যুগ-বিবেককে ডেকে জাগিয়ে তুলেছে। শূর্পনখার নারীত্বের ইন্দ্রিয়াসক্তি—বিধবার শূন্যতাবোধ সোচ্চার হয়েছে মধুসূদনেরও অপরাজেয় লেখনীতে। ব্যক্তি নারীর স্বতন্ত্র মানবিক মর্যাদা দানের বিরোধী শক্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মধুসূদন বিচিত্র নারীর বিচিত্র মানসিক কোণগুলোকে উদ্ধার করেছেন—প্রকাশ করেছেন 'বুক ফাটে তো মুখ ফাটে না' অপবাদের মুখে ছাই দিয়ে নারীর মুখেই নারীর গোপন বাসনার সোচ্চার ঘোষণা—একেবারে যৌন ক্ষুধাও। তখনো ভিক্টোরীয় অতি-সূচিবাই-গ্রস্ত বুর্জোয়া ভাবাদর্শের ধারক ব্রাহ্মমূল্যবোধ সার্বিক স্বীকৃতি পায় নি। তাই 'তারা' সোমের প্রতি তার কামবাসাকে রুদ্ধ রেখে নিজের নারীত্বকে অপমানিত করুক, তা মধুসূদন চান নি। কুমারী কালে গর্ভধারণ থেকে শুরু করে 'জনা'র স্বামীর বিরুদ্ধে—গোটা পুরুষ শাসিত সমাজের বিরুদ্ধে—নারীর তাবৎ জেহাদ ঘোষণাকে মধুসূদন বৈপ্লবিক অভিনন্দন জানিয়েছেন। প্রমীলা, সীতা, মন্দোদরী, চিত্রাঙ্গদা, দ্রৌপদী, তারা, শূর্পনখা, কৈকেয়ী ও জনা উনিশ শতকের একটিমাত্র নারীরই সমগ্র ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। নবীনচন্দ্রর উনিশ শতকের মহাভারত 'কুরুক্ষেত্র-রৈবতক-প্রভাস'-এ এই নারীরই সত্য স্বীকৃতি।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র নীতিবাগীশ হয়ে নারীর পরিপূর্ণ স্বাধীন অভিব্যক্তিকে স্বীকৃতি জানাতে পারেন নি। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্ষমতা নির্দ্ধিধায় বিধবার দেহ বুভুক্ষাকে সহানুভূতি জানাতে পারলেন না কেন? কেন তাঁর মতো অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিভাও বুঝতে চাইলেন না, সার্বিক মুক্তি—দেহমনমেধা, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি—পঙ্কিলতাকেই ডিষ্টিল্ড করে। 'বিষবৃক্ষ' নয়, 'জ্ঞানবৃক্ষ' রচনাই যাঁর কাছে ইতিহাসের দাবী ছিলো, তার মূলে কুঠারাঘাত করে তিনি বিনা পাপে 'কুন্দনন্দিনী'কে হত্যা করেছেন—ব্যক্তিগত জীবনে বিচারক হয়েও 'রোহিনী'কে খুন করেছেন। তবু বাস্তব পরিবেশকে সচেতন দৃষ্টিতেই বঙ্কিম প্রত্যক্ষ করেছেন, দেখেছেন, প্রেমের পরিণতি দেহ সম্ভোগে—এবং তা কোন কিছুতেই বাঁধ মানে না। কুন্দনন্দিনীর দেহদান ও যৌবনের দাহকে তিনি কুন্ঠিত চিত্তে প্রকাশ করেছেন, বিধবা হীরাকে

পাপিষ্ঠা হিসেবে গ্রহণ করেই তার সহজাত দেহবাসনার বে-আব্রু বিবরণ দিয়েছেন—দিয়েছেন যুগধর্মের নিয়ন্ত্রণহীন দুর্বার গতিকে লক্ষ্য করে বাধ্য হয়েই। কিন্তু দ্বিচারিণী রোহিনীকে জীবন্ত রাখার জন্যে শিল্পীর যে সংস্কারহীন চৈতন্য, সমাজসংস্কারে বন্দী বঙ্কিম সুনীতি-কুনীতির প্রশ্নে তাকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। বঙ্কিমের নায়িকারা তো কেউই মা নয়—একটা রোমান্টিক প্রেমের নায়িকা, তবে বঙ্কিমের কেন এই আধুনিক প্রগতিকে সজ্ঞান বিরোধিতা? এর কারণ আর কিছুই নয়, নারীকে 'পজেস' করার সনাতনী পুরুষ প্রবৃত্তি—নিরঙ্কুশ ভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগ দখলের মতো অজস্র সূক্ষ্ম অনুভূতিতে গড়া একটা তাজা মেয়েমানুষকে ভোগ দখলের আদিম অভিলাষ। তা ছাড়া বঙ্কিম জানতেন না জীবন বাসনা উদ্ধারে মনস্তত্ত্বের গুরুত্ব। বাইরের ঘটনাগুলোই নায়ক নায়িকার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে বাইরেকার সংঘাতকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাই আন্তর দ্বন্দ্বের স্বরূপটি অপ্রকাশিত থাকা নারী বঙ্কিমের হাতে সমাজের পাষাণ প্রতিমার সামনে বলি হয়েছে, বলি হয়েছে নারীর স্বেচ্ছা নিয়ন্ত্রণাধিকার। রূপজ মোহ বাইরেরই—বঙ্কিম হৃদয় তল্লাস করার চেষ্টা করে নারীপুরুষকে স্বরূপে উপলব্ধি করতে পারেন নি।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঘটনার নিয়ন্ত্রণকে অস্বীকার করে চরিত্রের চিন্তা ভাবনা বোধ আর রক্তমাংসের অনুভূতিকে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে এমন ভাবে উপস্থিত করলেন যে পাত্র পাত্রীর আন্তরদ্বন্দ্বই ঘটনা সৃষ্টি করে পরিণতিব দিকে কাহিনীকে স্বাভাবিক অগ্রগতি দিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র একটা পরিকল্পিত নির্দিষ্ট ভাবকে ফুটিয়ে তুলতেই প্রায় সব চরিত্র তৈরী করেছেন এবং তারা লেখকের কথাই বলেছে। কিন্তু রবীন্দ্র উপন্যাসের চরিত্র নিজেদের কথাই—নিজেদের যুগধর্মীয় যন্ত্রণাই আত্মগত দিক থেকে প্রকাশ করতে করতে একটা পরিণত ভাব-সঙ্গমে আত্ম সমর্পিত হয়েছে। আজন্ম ব্রাহ্ম আবহাওয়ায় লালিত হয়েও রবীন্দ্রনাথ যুগের কেন্দ্রীয় সত্যটিকে সার্বিক ভাবেই আত্মসাৎ করেছেন। সার্বভৌম শিল্পী অসমাপ্ত রেনেসাঁসের মৌল গুণগুলোকে আপন অস্তিত্বে ধারণ করে ভবিষ্যৎ সময়-মানসের সঙ্গে নিজেকে এ্যাড্‌জাষ্ট করে নিয়েছেন। তাই নরনারীর যৌন ব্যক্তিত্ববোধ, যা সমসাময়িক সমাজ-চেতনার অনিবার্য ফলশ্রুতি, রবীন্দ্রনাথ তাকে শিল্পী হিসেবেই নীতি শাস্ত্রের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থেকে তুলে ধরেছেন। বিনোদিনীর অকৃত্রিম যৌন আর্তিকে—বিধবার সর্বাত্মক দেহ-বুভুক্ষাকে জাগিয়ে তুলে 'চোখের বালি'তে একটা অস্বাভাবিক পরিণতি দিলেও—

চকিতে বিনোদিনীকে অনিবার্য সঙ্গম থেকে সরিয়ে নিতে তার মুখ থেকে 'আমি বিধবা, আমি নিন্দিতা, সমস্ত সমাজের কাছে আমি তোমাকে লাঞ্ছিত করিব, এ কখনো হইতে পারে না।..তুমি চিরদিন নির্লিপ্ত, প্রসন্ন। আজও তুমি তাই থাক, আমি দূরে থাকিয়া তোমার কর্ম করি।'—বলে 'চোখের বালি'র বিহারীকে নিরস্ত করাতে চেষ্টা করলেও চতুরঙ্গের দামিনীর সমস্যা যে দেহেরই সমস্যা তা বুঝতে ভুল করেন নি। ফলে রবীন্দ্রনাথ তাকে ত্যাগের পথে নিয়ে যান নি—অন্য পুরুষ শ্রীবিলাসের কাছে সমর্পণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের নারী চরিত্রের মধ্যে উনিশ শতকের বিদ্রোহে এবং নতুন মূল্যবোধে গড়া ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য শক্তির বীরাঙ্গনাই বিচিত্র রূপে ভাস্বর। আনন্দময়ী, কুমুদিনী, ললিতা, সুচরিতা, বিনোদিনী, দামিনী, লাবণ্য প্রভৃতি নায়িকা যেমন আছে তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রের হীরা-র মতো স্থূল দেহ-লালসা ও ভোগ-সর্ব্বস্ব চরিত্র শ্যামা-ও আছে। কিন্তু নতুন সভ্যতা মন্থনে যে শক্তি উঠে এসেছে তাতে যে কালপুরুষ বিষজর্জর হবে, রবীন্দ্রনাথ এমন কথা বিশ্বাস করেন নি।

শরৎচন্দ্রও বিশ্বাস করেন নি। কিন্তু তিনি নতুন কিছু দিতেও পারেন নি। রবীন্দ্র-সময়ে লিখতে সুরু করেও তিনি অনুসরণ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্রকে। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করেও তিনি ঘটনা সাজিয়ে চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। একটু নজর দিলেই দেখা যাবে যে, শরৎচন্দ্র মাইকেল মধুসূদনের নায়িকাদেরই পুনরাবৃত্তি করেছেন—বীরাঙ্গনা কাব্যেরই ব্যাখ্যাযুক্ত অর্থপুস্তক সরল ভাষায় রচনা করেছেন এবং তা 'বেস্ট সেলার' খেতাব পেয়ে আজও বঙ্গীয় রমণীর চুল থেকে বালিশে বসা জবাকুসুম তেলের সোঁদা গন্ধ ছড়াচ্ছে। বেশ্যাকে নারী হিসেবে প্রমাণ করার উৎকট সহানুভূতি শরৎচন্দ্রের যতখানি, ততখানি নারীর অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা নেই—। উনিশ শতকের গোটা বিপ্লব প্রবাহের ঐতিহ্যে বিনোদিনী যেমন বিহারীর, ললিতা যেমন বিনয়ের ব্যক্তিত্বের উদ্বোধন ঘটিয়েছে, সুচরিতা যেমন বাইরের কঠিন বর্ম বিধ্বস্ত করে প্রেমের জোরে গোরার অন্তরে তার আনন্দিত অধিষ্ঠান আবিষ্কার করেছে, শরৎচন্দ্রের নায়িকাদের মধ্যে তা অনুপস্থিত। বাঙলা দেশের দুর্ভাগ্য এই যে শরৎচন্দ্রীয় বেশ্যাপ্রীতিই শেষ অব্দি স্থায়ী হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের থেকে নিজেদের রচনার স্বাতন্ত্র্য আনতে গিয়ে রবীন্দ্র পরবর্তী কালের লেখকরা মার্কস-ফ্রয়েডকে যদিও জবরদস্ত ব্যবহার করেছেন—মেধা চালিয়েছেন নতুন জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর সন্ধানে জটিল পরিবেশ ও জটিল মানসিকতার অলিতে গলিতে এবং

প্রবেশ খুঁজেছেন যুগানুভূতির অজস্র সূক্ষ্মতন্ত্রীতে, তবুও তাঁরা শরৎবাবুকে তাঁর ব্যাপক পাঠক-রাজ্য থেকে নির্বাসন দিতে পারেন নি। দীর্ঘদিন বাদে সমরেশ বসু পাঠকদের কাছ থেকে শরৎবাবুকে কিছুটা দূরে সরিয়ে দিতে পেরেছেন। এবং পেরেছেন শরৎচন্দ্রের মতোই এক ধরণের সম্মোহনী কায়দায়।

আমরা আগেই বলেছি যে, উনিশ শতকের সাহিত্যের কেন্দ্রমূলে নারীই- পুরুষের ভূমিকা খুবই নগণ্য। সে মাইনর ফোর্স। বস্তুত সমস্ত বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে মূর্তিমান জেহাদ উনিশ শতকের রাবণের ভাগ্য বিপর্যয়ের করুণ আর্তনাদ এবং অপরাজেয় সংগ্রামের অভিপ্রকাশ ছাড়া গোটা একটা চিহ্নিত পুরুষ ব্যক্তিত্ব 'গোরা'তেই যা একটু আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের গোবিন্দলাল দুঃখ-সুখের বাইরেকার সামাজিক সম্পর্ক থেকে দূরে—কমলাকান্তরই উল্টো পিঠ। তবে কমলাকান্ত আরো তাজা এবং দেহ-মন-মেধাব সমাজ ও জীবনের -আধুনিক পরিবেশের সামগ্রিক অভিজ্ঞতার আগুনে পোড় খাওয়া ব্যক্তিত্ব, কিন্তু নিস্পৃহ বিবেক। যদিও সে একা, গতানুগতিকতার সঙ্গে সে কিছুতেই নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না তবু সে বলে 'প্রীতিই আমার কর্ণে এখনকার সংসার সংগীত। অনন্ত-কাল সেই মহাসংগীত সহিত মনুষ্য হৃদয়তন্ত্রী বাজিতে থাকুক। মনুষ্য জাতির প্রতি যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাই না।' আর তার ধ্যানে ভেসে উঠেছে কল্যাণশ্রীময়ী মাটির প্রতিমা। শরৎ সাহিত্যের পুরুষ উদাসীন বটে—বঙ্কিমচন্দ্রের মতো তিনিও তার চরিত্রগুলোর মধ্যে থেকে নিজেকেই প্রকাশ করেছেন সত্য, কিন্তু গোটা শরৎ সাহিত্যে আপনা ইন্দ্রনাথ ছাড়া পুরুষ নেই। নবীনচন্দ্রের মহাকাব্যের পুরুষ চরিত্রের মতোই তারা স্থবির এবং পুরুষত্বহীন।

তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, মাইকেল বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পরিবেশ সচেতনা ও অভিজ্ঞতা বুর্জোয়া সংস্কৃতির মূল্যবোধকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে -সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কার, আচার-সর্বস্বতা, স্থবিরত্ব এবং পল্লী সমাজের অত্যাচার ও জড়ত্বকে আঘাত করে মনুষ্যত্বেরই প্রকাশ আনতে চেয়েছে। রামমোহনের কালে যে ব্যক্তিত্বের উদ্বোধন, মধুসূদনে তার সম্পূর্ণ প্রকাশ, বঙ্কিমচন্দ্রে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের সমস্যা আর রবীন্দ্রনাথে ব্যক্তি নিজের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। ব্যক্তি জেনেছে, এক জীবনেই মানুষের বারবার পুনর্জন্ম হয়। বুদ্ধিতে নয়, রসে নয়—জীবন কোথাও আশ্রয় পায় না। ভালো-বাসায়ও তার আশ্রয় নেই—তাকে বিশ্বাস করতে সাহস নেই, না, ইচ্ছা নেই।

শচীশ নিজের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। বিশ শতকের আধুনিক মানুষের প্রথম প্রকাশ চতুরঙ্গের শচীশ। রবীন্দ্রনাথ এই আধুনিক মানুষের অন্ধকার অব-চেতনা যেন ছুঁয়ে ফেলেছিলেন। একটা সাংকেতিক আলোক শিখায় ব্যক্তির নিজস্ব. সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সজ্ঞান স্তর ছাড়িয়ে এসে ব্যক্তি-অস্তিত্ব এবং সভ্যতা সম্পর্কের সাড়া পেয়েছিলেন চতুরঙ্গে যেখানে 'কোনো ডাকের সাড়া, কোনো প্রশ্নের কোনো জবাব নাই, এমন একটা সীমানা হারা ফ্যাকাশে সাদার মাঝখানে দাঁড়াইয়া দামিনীর বুক দমিয়া গেল। এখানে যেন সব মুছিয়া গিয়া একেবারে গোড়ার সেই লুকানো সাদায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। পায়ের তলায় কেবল পড়িয়া আছে একটা 'না'।' অতি সাম্প্রতিক কাল এই ভয়ঙ্কর 'না'-এর সভ্যতাকেই ধরতে গিয়ে আত্মখনন করে চলেছে।

আমরা আগেই বলেছি, উনিশ শতকের আধুনিকতার অন্যতম উপাদান রাজনৈতিক সচেতনা। যদিও এ রাজনৈতিক সচেতনা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার জন্যে তখনই কোনো জাতীয়তাবাদী সংগঠনের নেতৃত্বে বাস্তব সংগ্রামের আকার পায় নি—তা শুধু জাতীয়তাধর্মী স্বাভিমান ও দেশজাতি ঐতিহ্যের প্রীতিরই আবেগ কল্পনার নামান্তর ছিলো—তবু ব্যক্তিস্বাধীনতা, সাম্য (ইকোয়ালিটি) ও সৌভ্রাত্র্য প্রতিষ্ঠার প্রেরণা বাংলা সাহিত্যকে প্রগতি-চিহ্নে চিহ্নিত করেছে। প্রাথমিক দেশপ্রেমের ক্ষীণ ধারণাই জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকে সাহিত্যকে প্রাণরস সংগ্রহের প্রবণতা দিয়েছে।

'ভারতের প্রিয়পুত্র হিন্দু সমুদয়। / মুক্তমুখে বল সবে ব্রিটিশের জয়॥'[১] বলেও ঈশ্বর গুপ্তর 'দেশের কুকুর ধরি বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া'[২] বলতে বাধে নি। ইংরেজের আনুগত্য স্বীকার করেও ইরেজী সভ্যতা শিক্ষার বিরোধিতার মধ্যে যে অস্বচ্ছ স্বাধীনতা-বোধ তা রামমোহনেও ছিলো। তবে ঈশ্বর গুপ্তর কাছে গভীরতা আশা করা বাতুলতা। কিন্তু স্ববিরোধ থাকলেও ফরাসী বিপ্লবের আদর্শের মধ্যে রামমোহন নিজের যে স্বাধীনতাবোধের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আবিষ্কার করেছিলেন তা যেমন গভীর তেমনি যুগের রাজনৈতিক বোধেরই উৎস এবং প্রকাশ। আর রঙ্গলাল বোধে ধরতে পেরেছিলেন 'ব্যবসাচ্ছলে কত জাতি এসে করিলেন প্রভুত্ব স্থাপন ..'[৩] ও ডেকে বলে উঠেছিলেন 'স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায় / দাসত্বশৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায়।'[৪] একটা কাকু বক্রোক্তির মধ্যে থেকে স্বাধীনতার

১ দিল্লীর যুদ্ধ, ২ স্বদেশ—ঈশ্বর গুপ্ত ৩ কর্মদেবী, ৪ পদ্মিনী উপাখ্যান—রঙ্গলাল

আর্তি ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। কিন্তু এর মধ্যে রাজনৈতিক স্বাধীনতায় কথা নেই, যা আছে তা স্বজাতিপ্রীতি ও স্বাজাত্যাভিমানের উচ্ছ্বাস মাত্র। মধুসূদনেও স্বাধীনতা ও যুক্তির কথা রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আসে নি। বাঙালী সমাজ মানস ও পারিবারিক ঐতিহ্য থেকে পাওয়া জীবনরসই তাঁর সৃষ্টিতে অভিব্যক্ত। তবু একটা প্রচ্ছন্ন স্বদেশচেতনা যে জীবনশিল্পী মধুসূদনের মধ্যে ছিলো তা অস্বীকার করা যায় না। স্বর্ণলঙ্কা ধ্বংসের পটভূমিতে তিনি তাঁর স্বদেশের বন্ধন যন্ত্রণাকেই অভিব্যক্ত করেছেন। মধুসূদনের স্বদেশ-ঐতিহ্যপ্রীতি তাঁর মহাকাব্যের কবচকুণ্ডল। দেশ জাতি পরিবারের ঐতিহ্যরক্ষার জন্যেই 'মেঘনাদ' বাংলা সাহিত্যে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম শহীদ। আর মধুসূদনের নিজের আন্তর যন্ত্রনার রক্তক্ষরণ: 'আমরা,–দুর্বল, ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে,–/পরাধীন, হা বিধাতঃ। আবদ্ধ শৃঙ্খলে।' [১]

নবীনচন্দ্রের সময়ে বাঙালীর ইংরেজ বিরোধী মনোভাব খুবই দানা বেঁধে উঠেছিলো। আর হিন্দুজাতীয়ত্বর ধূয়াটাও ঠিক তখনই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরদের ব্রাহ্মচিন্তায় মূর্তি পেয়ে গেছে। নবীনচন্দ্র জাতি ধর্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষে মানুষের এক বিভেদহীন সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখলেন, কিন্তু এই সমন্বয় ও ধর্মরাষ্ট্রের প্রবক্তা নবীনচন্দ্রের নায়ক শ্রীকৃষ্ণই ব্যর্থ রচনার উদাহরণ। তার মুখ থেকে বাঙালী নবীনচন্দ্রের বক্তৃতা শুনেছে মাত্র। কিন্তু পরাধীনতার জ্বালা নবীনচন্দ্রের সুপ্ত চেতনায় রিনিরিনি করে বেজেই চলেছিলো এবং কবি জীবনের প্রাথমিক পর্বেই তা প্রকাশিত হয়েছিলো: 'স্বদেশের রাজনীতি, শাসন প্রণালী / কে বা রাজা, কিবা জাতি, কোথায় বসতি / কেমনে ভারতে পশি, দাসত্বে করিল মসী ..' [২]

বঙ্কিমের সময়ে ইংরেজ বড় শত্রু ছিলো না। তখনো ইংরেজ সম্পর্কে বাঙালীর ইলিউশন কাটে নি। হিন্দুরা মুসলিম শাসনের শেষ অধ্যায়ের অত্যাচার ভুলতে পারে নি। তাই স্বৈরাচারী মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে হিন্দুরই বিষ জেহাদ। হিন্দুসাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন তাদের অন্তর গভীরে। বঙ্কিমচন্দ্রও সে স্বপ্ন দেখেছেন এবং ইংরেজকে সুহৃদই মনে করেছেন। 'কাপ্তেন সাহেব, তোমায় মারিব না, ইংরেজ আমাদের শত্রু নহে' বলে ভবানন্দ ইংরেজের জয়ধ্বনি করেছেন এবং সত্যানন্দও একটা পরাজিতমন্যতা নিয়ে বলেছেন 'এখন ইংরেজ রাজা হইবে।' মুসলমান রাজা হবে না ভেবে তিনি আশ্বস্ত। স্বাধীনতা প্রেমী

---

১ আমরা (চতুর্দ্দশপদী)—মধুসূদন ২ সায়ংচিন্তা (অবকাশরঞ্জিনী)—নবীনচন্দ্র

বঙ্কিমের এতে যে কোন আন্তর স্বীকৃতি ছিলো না, তা সত্যানন্দের 'চক্ষে জলধারা' দেখিয়ে ব্যক্ত করেছেন। এই যেমন বঙ্কিমের রাজনৈতিক চিন্তার এক দিক, তেমনি অন্যদিকে আছে অত্যাচারিত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত অসহায় দেশবাসীর সঙ্গে গভীর সমমর্মিত্ব। দুঃখ যন্ত্রণায় তিনি সন্ন্যাসীদেরও বিদ্রোহী ভূমিকা দেখিয়েছেন—দেখিয়েছেন মানুষের প্রতি গভীর মমত্ব। সমকালীন রাজনৈতিক চরিত্রের সঙ্গে বঙ্কিমের বিরোধ তীব্র হয়ে কমালকান্তের দপ্তরেই প্রকাশিত হয়েছে। তিনি জাতিকে বীর্যে প্রতিষ্ঠিত করার তোড়জোড় দেখতে চেয়েছিলেন রাজনীতির মধ্যে। কিন্তু তা ছিলো না। তাই বঙ্কিমের সহানুভূতিও তাব প্রতি ছিলো না। আর তাই তীক্ষ্ণ কষাঘাত ঃ 'ভাই পলিটিক্স-ওয়ালারা, ..পিয়াদার শ্বশুরবাড়ি আছে, তবু সপ্তদশ অশ্বারোহী মাত্র যে জাতিকে জয় করিয়াছিল, তাহাদের পলিটিক্স নাই। জয় রাধে-কৃষ্ণ, ভিক্ষা দাও গো! ইহাই তোমাদের পলিটিক্স। তদ্ভিন্ন অন্য পলিটিক্স যে গাছে ফলে, তাহার বীজ এ দেশের মাটিতে লাগিবার সম্ভাবনা নাই।'[১] অতিসাম্প্রতিক তরুণ লেখক-কবিরা স্বাধীনতা পরবর্তী কালের রাজনৈতিক চেহারা দেখে কমলাকান্তর মতোই সমকালীন রাজনীতির সঙ্গে তীব্র বিরোধ অনুভব করেছেন। 'আমার এক বন্ধু বিনা কারণে পাগল হয়ে গেল, তার মায়ের / কান্নাকাটি দেখে মনে হয় আমাদের রাজনীতি মানেই তো / মূল্যবৃদ্ধি যার ফলে বাজার থেকে দুধ উধাও হয়ে যায় আর / মূর্খদের সুখ বেড়ে যায়—'[২] তাদের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য অসীম রায়ের 'দেশদ্রোহী'তে ঃ

*****আমার আবার অসাধারণ হবার ভূত কবে থেকে দেখলে? এই কলকাতায় এসে অবধি। এরই জন্যে কি পরীক্ষার ছুটি, ক্যাজুয়াল লীভ, অফ ডে সব এক করে এমন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলাম তোমার কাছে? কী দিন রাত ভাব বুঝিনা আর বুঝেই বা কী করতে পারি আমরা?...আমার মামার কথা মনে আছে। মস্ত কমিউনিস্ট ছিল ফরিদপুরে। ছেলেবেলায় মামাবাড়ি গিয়েছি। দেখি একটা লুঙ্গি আর গেঞ্জি গায়ে দিনরাত পড়ে আছে মুসলমান নমশূদ্র চাষীর বাড়ি। দু-দলে দাঙ্গা লাগবার উপক্রম হলেই মামার ডাক পড়তো। সেই সড়কি আর লাঠির জঙ্গলের মাঝখানে যেই মামা এসে দাঁড়াতো অমনি সব মিটে যেত। তারপর অনেক কংগ্রেস-কমিউনিস্ট দেখলাম। সে রকমটি দেখলাম না। ..মাথা খারাপ হয়নি মীরু! ঠিক বলছি। আমাকে

১ পলিটিক্স—বঙ্কিমচন্দ্র ২ রক্ত ট্রামের চাকায়—শৈলেশ্বর ঘোষ

একটা কথা বুঝিয়ে দাও। এত স্বাদেশিকতার বন্যা বইল উনবিংশ শতাব্দী থেকে। এত দেশ দেশ করে লোক ফাঁসীতে গেল। ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করলো। তারপর রান্নাঘরের মাঝখান দিয়ে দেয়াল উঠলো শোবার ঘর আর বৈঠকখানা আলাদা করে। দুই দেশের এতগুলো পার্টি ছিল, এত নেতা ছিল, কই একটা টু শব্দও তো কেউ করে নি। 'যে ভুল হয়েছে তা তো আর শোধরানো যাবে না এই সব স্তোক বাক্য দেশের নেতারা আমাদের শিখিয়েছেন ****

কিন্তু এই মূল্যবোধ ভাঙার আগে উনবিংশ শতক দেখেছিলো 'স্বদেশের দুর্বলতার' মূর্তি --জাতি বিদ্বেষ। গোরার মুখ দিয়ে বলিয়েও ছিলো 'আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান কোনো সমাজের বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন।' বলা হয়েছিলো, কিন্তু রাজনীতি ও ধর্ম জড়িয়ে মিশিয়ে চলছিলো প্রথম থেকেই। রবীন্দ্রনাথ এর সর্বনাশের দিকটা তুলে ধরেছিলেন বলিষ্ঠ ভাবেই, 'ধর্মের ধুয়ো দেশের ধুয়ো দুটিকেই পুরোদমে একসঙ্গে চালাচ্ছি... ভাগবদ্গীতা এবং বন্দেমাতরম আমাদের দুই-ই চাই ..তাতে দুটোর কোনোটাই স্পষ্ট হতে পারছে না। আমাদের ভারতবর্ষ কেবল ভদ্রলোকেরই ভারতবর্ষ নয়...ভারতবর্ষ যদি সত্যকার জিনিস হয় তা হলে ওর মধ্যে মুসলমান আছে। নিজের ধর্ম আমরা রাখতে পারি, পরের ধর্মের উপর আমাদের হাত নেই।...মুসলমানকেও নিজের ধর্মমতে চলতে দিতে হবে।.. কেবল গরুই যদি অবধ্য হয় আর মোষ যদি অবধ্য না হয় তবে ওটা ধর্ম নয়, ওটা অন্ধ সংস্কার।...এই যে মুসলমানদের অস্ত্র করে আজ আমাদের ওপর হানা সম্ভব হচ্ছে, এই অস্ত্রই যে আমরা নিজের হাতে বানিয়েছি।'[১] আর, তার পরিণতিই সাম্প্রতিক কবি সাহিত্যিকদের অভিজ্ঞতার নিষ্ঠুর ছিন্নমূলত্ব ও রক্ত ক্লান্ত ইতিহাস হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত এক অতি সংকীর্ণ স্বাধীনতা আন্দোলনকে পটভূমি রেখে তাঁর 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস রচনা করে স্বদেশী আন্দোলনের ঘুণপোকা সন্দীপকে সৃষ্টি করেছেন। এবং এই স্বার্থপর, নারী-দেহ লোলুপ, বাকসর্বস্ব বুদ্ধিমান উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর সন্দীপদের নেতৃত্বেই ভারতে স্বাধীনতার সাইনবোর্ড ঝুলেছে এবং পরিণামে নিহত মনুষ্যত্বের ভস্ম অপমান-শয্যায় স্বাধীনতার হাহাকার। দেশের মুক্তি আন্দোলনের সন্ত্রাসবাদী পথের বিভীষিকাকে পটভূমি করেও রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস কল্প কাহিনী রচনা করেছেন।

১। ঘরে বাইরে—রবীন্দ্রনাথ

'চার অধ্যায়'এ বিভীষিকাময় শ্রদ্ধেয় নায়ক অতীন আগুন নিয়ে খেলতে ছুটেছে—প্রেম তাকে দেশোদ্ধারের জন্যে ভয়ঙ্কর বিপদসঙ্কুল পথ উপহার দিয়েছে। অতীনের অনুভবে এসেছে: 'দেশের আত্মাকে মেরে দেশের প্রাণ বাঁচিয়ে তোলা যায় এই ভয়ঙ্কর মিথ্যে কথা পৃথিবীশুদ্ধ ন্যাশনালিষ্ট আজকাল পাশবগর্জনে ঘোষণা করতে বসেছে, তার প্রতিবাদ আমার বুকের মধ্যে অসহ্য আবেগে গুমরে উঠেছে—এই কথা সত্যভাষায় হয়তো বলতে পারতুম, সুড়ঙ্গের মধ্যে লুকোচুরি ক'রে দেশ উদ্ধার চেষ্টার চেয়ে সেটা হোতো চিরকালের বড় কথা।' 'চার অধ্যায়' একটা রোমান্টিক লিরিক সুরে বিভীষিকার জগতের মানবিক প্রেমের দিক ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের অনিবার্য ব্যর্থতার সত্য উপস্থিত করেছে। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' ভারতী-অপূর্ব মিলন ঘটানোর জন্যেই যেন রচিত হয়েছিলো। এর জন্যে সন্ত্রাসবাদী দলের রোমহর্ষক পটভূমির কিছু দরকার ছিলো বলে মনে করার কারণ নেই। শরৎবাবু রোমান্টিক প্রেমটাকে এই দেশমুক্তির সন্ত্রাসবাদী পথের গোপন উত্তেজনার মশলা বানিয়ে সার্বজনীন পাঠককে একটু নতুন স্বাদ দিতে চেয়েছেন মাত্র।

শরৎচন্দ্রের কাছে অভিযোগ এই জন্যেই যে, তিনি বিংশ শতাব্দীর কাল সংঘাতকে রবীন্দ্রনাথের পাশে দাঁড়িয়ে আবিষ্কার করে, বাস্তব শক্তিকে চিনেও তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটা অদ্ভুত সরলীকরণের মর্জি আমদানী করেছেন। শুধু শহর নয়—বাংলাদেশ এবং বর্মার পল্লীকেও যিনি আত্মসাৎ করেছেন, বুর্জোয়া ভাবধারার প্রতিষ্ঠিত মানব মূল্যবোধকে যিনি প্রস্তুত উপাদান হিসেবে পেয়েছেন, সমাজ স্বরূপকে যিনি বিজ্ঞানীর মতো বিশ্লেষণ করে প্রায় উৎসের কাছে পৌঁছে গিয়েছেন, জেনেছেন আধুনিক নরনারীর বিভিন্ন পার্সোনালিটির সত্যকে—ব্যক্তি অচলার সুরেশ মহিম দুজনকেই সমান ভালোবেসে দেহদানের অধিকারকে যিনি প্রায় স্বীকার করে নিয়েছেন এবং দেশের রাজনীতিতে সাধারণ মানুষের সক্রিয় ভূমিকাকে বাস্তব সত্য হিসেবেই যিনি প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁর কাছে যুগের প্রত্যাশা অনেকখানি। শরৎচন্দ্র সে প্রত্যাশাকে হতাশ করেছেন। এই বিস্তৃত অভিজ্ঞতা ও উপাদানকে শরৎচন্দ্র যদি অ্যাসিমিলেট করতে পারতেন, তবে তা দিয়ে তিনি অন্তত একখানা জাতীয় উপন্যাস পরবর্তী কালের জন্যে রেখে যেতে পারতেন। বস্তুবাদী সাহিত্যের ধারা তৈরী হতে হতে অকস্মাৎ মার খেতো না এবং শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত অপেক্ষা করে ফিরে সুরু করতে হোতো না। শরৎচন্দ্র শহর থেকে দূরে যে যাত্রা সুরু

করেছিলেন তা একটা গোটা অবয়ব পেতে পারতো—সাহিত্য হতে পারতো গোটা বাংলা দেশের তাজা মানুষের সাহিত্য।

উনিশ শতকের আর একটা বৈশিষ্ট্য ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও ভাঁড়ামির মাধ্যমে সমাজ সমালোচনা। সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক রঙ্গপ্রিয়তাকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি দিয়ে তার মধ্যে বুদ্ধির তীব্রতীক্ষ্ণ ছুরি চালান করে দেবার প্রবণতা উনিশ শতকেরই। রাজসভার সাবেক ঐতিহ্য— স্থূল রঙ্গব্যঙ্গই ঈশ্বর গুপ্ত সাহেব-বাংলা ও কুসংস্কার-আচ্ছন্ন বাংলার ওপর এলোপাথাড়ি নিক্ষেপ করেছেন। কিন্তু কাব্যে নাটকে প্রহসনে ও গদ্যে মাইকেল, বঙ্কিম, কালীপ্রসন্ন সিংহ, দীনবন্ধু, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়, রসরাজ অমৃতলাল —শেষ দিকে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, শরৎচন্দ্র পর্যন্ত তার যে ক্রমবিকাশ তার মধ্যে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে তিক্ত জীবনাভিজ্ঞতাকে অস্ত্র করে তাকে রঙ্গরসের পোষাক পরিয়ে সমাজ মানসকে শিক্ষিত করে তোলার প্রবণতা। 'বাহিরে যার হাসির ছটা ভেতরে তার চোখের জল' যে কত গভীর, তা প্রায় প্রত্যেকের রচনা থেকেই উপলব্ধি করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর' ছাড়া ১৯৭০ সালে সম্ভবতঃ পূর্বসূরী লেখকদের কেবল একখানা বই বাছাই করা সম্ভব হয় না। তবু ঐতিহ্য হিসেবে এ সময় যাদের কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করেছে তাঁদের সঙ্গে আরো দুটি নাম অবশ্যই যুক্ত হবে। তার একজন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যজন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। একজন শুদ্ধ স্যাটায়ারিস্ট—রচনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গেই তাঁর বিদ্রূপের হুল আর সুতীব্র জ্বালা, অন্য জন আত্মগত যন্ত্রণায় শুদ্ধ চৈতন্য, জীবন সম্পর্কে নিজের যন্ত্রণা-জ্বালার মধ্যে থেকে পেয়েছিলেন শুদ্ধ উদাসীনতা। গোটা সমাজ জীবনের যে ছবি তিনি উপলব্ধি করেছিলেন তা অদ্ভুত ফ্যান্টাষ্টিক পদ্ধতিতে প্রকাশ করেছেন। *****'একবার একজন ধাঙড়ের সঙ্গে আমি সুন্দরবনের ভিতরে বেড়াইতে ছিলাম। এক স্থানে এক গাছের নিম্নে স্তূপীকৃত হাড় পড়িয়া ছিল। প্রথম মনে করিলাম, মানুষের অস্থি, ব্যাঘ্রগণ বোধহয় মানুষ ধরিয়া এ স্থানে আনিয়া ভক্ষণ করে। কিন্তু তাহার পর আরো নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে সে সব বানরের হাড়। গাছটি দেখিলাম যে হেঁতাল নহে খেজুর নহে। খেজুরের ন্যায় এক প্রকার বৃক্ষ। কিন্তু খেজুর গাছের পাতাগুলি যেমন উচ্চ হইয়া থাকে, ইহার পাতা সেরূপ ছিল না, ইহার যাবতীয় কাঁচা পাতা নিম্নমুখ হইয়া গাছের গায়ে লাগিয়া ছিল। গাছের মাথায় কাঁদি কাঁদি সোনার বর্ণের অতি চমৎকার ফল ফলিয়া ছিল। সেই ফল

পাড়িতে ধাঙড়কে আমি গাছের উপর উঠিতে বলিলাম। ধাঙড় গাছে উঠিল। পাতার ভিতর দিয়া যেই গাছের মাথার নিকট উঠিয়াছে, আর পাতাগুলি তৎক্ষণাৎ সোজা হইয়া তাহাকে ঢাকিয়া ফেলিল। সেই সময় ধাঙড়ও "প্রাণ গেল প্রাণ গেল" বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। তাহার পরে ধাঙড়ের চর্মাবৃত হাড়গুলি নীচে পড়িতে লাগিল। এই ভয়ানক ব্যাপার দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার পর নিকটে গিয়া দেখিলাম যে, এই ভয়াবহ বৃক্ষ ধাঙড়ের রক্তমাংস, মায় হাড়ের রস পর্যন্ত চুষিয়া খাইয়াছে।'[১] ***এ থেকে আমরা বলতে পারি ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ধনতান্ত্রিক সমাজের চরিত্র সেদিনই গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন ও সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন কালপুরুষের ওপর। ইদানিং আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র সাম্প্রতিক লেখক কবিদের যে বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়েছে, তা ব্যক্ত করতে তাঁরা বাংলাদেশের এই ঐতিহ্যকেই--রঙ্গ বিদ্রূপের ঐতিহ্যকেই-- আবিষ্কার করে সম-সময়ের অন্তর্জ্বালার কারণ ঘটিয়েছে—শুদ্ধ করতে চাইছে বোধের দিক থেকে মানুষকে। তারাপদ রায় প্রমুখ যেমন কবিতার ক্ষেত্রে বাঁকা হাসিতে ছুরি মারছেন, তেমনি গদ্যে উপস্থিত হয়েছে বাসুদেব দাশগুপ্তর 'বমনরহস্য' ও তাঁর অন্যান্য বিক্ষিপ্ত গদ্য।

রেনেসাঁসের পরিচয় ভাববস্তু, উপাদান ও বিষয়ের দিক থেকে যেমন বিচিত্র তেমনি বিচিত্র ভাষা কাঠামোয় তা প্রকাশিত হয়েছে। প্রত্যেক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বই নিজের নিজের ভাষা গঠন করে নিয়েছেন। মাইকেলকে তাঁর নিজের ছন্দ আবিষ্কার করে নিতে হয়েছিলো, তৈরী করতে হয়েছিলো উপযুক্ত কবি-ভাষা। অনেক মেহনত করে বিদ্যাসাগরকে তৈরী করতে হয়েছিলো অর্থ প্রকাশক গদ্য। কিন্তু বিদ্যাসাগরের গদ্যে—তৎসম শব্দবহুল গদ্যে—এমন পাণ্ডিত্যের গন্ধ এবং তা ওজনে এত ভারী যে ব্যক্তির অন্তরের সব কথা সহজে তাতে বলা অসম্ভব। অথচ সমাজের কথা সব একসঙ্গে বলার বেগ তখন এত বেশি,—রেনেসাঁসই মুক্তি আবেগে এত অফুরন্ত প্রকাশে উন্মুখ যে, ব্যবহারিক ভাষাকে পণ্ডিতীচাল থেকে খসিয়ে আনার জন্যেও লেখক কবিদের রীতিমত বিপ্লবই করতে হয়েছে। এবং এর ফলে ভাষা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার অন্ত থাকে নি। বিদ্যাসাগর, রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয় দত্তের ভাষার বিরোধী-শক্তির ভাষা হিসেবে তাই দেশজ শব্দ ভরা মুখের ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করতে এলেন প্যারীচাঁদ মিত্র।

১। ডমরু চরিত—ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রকাশিত হোলো 'মাসিক পত্রিকা'। বাংলা সাহিত্যে দেখা দিলো প্রথম নক্সা গ্রন্থ 'আলালের ঘরের দুলাল'। প্যারীচাঁদ এ গ্রন্থে ক্রিয়াপদের চরিত্র বহুক্ষেত্রে শুদ্ধ তৎসম রেখেও দেশী ও তদ্ভব শব্দে গেঁথে তোলা ঘরোয়া ভাষা ব্যবহার করে গদ্যের একটা নতুন ধারা সৃষ্টি করলেন। এই ভাষাতেই লেখা হোলো 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত রাখার কি উপায়'। দুটি গ্রন্থে ব্যঙ্গই রক্ত হয়ে সজীব সমাজ সমালোচনা হয়ে উঠেছে। মৌখিক ভাষাতেও যে সাহিত্যরস সৃষ্টি সম্ভব তা প্রমাণিত হবার পর থেকে বহু নক্সা জাতীয় রচনা প্রকাশিত হোলো—সৃষ্টি হোলো কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'। সাহিত্যে কালীপ্রসন্ন একটা নতুন আঙ্গিক নিয়ে এসেছেন। কিন্তু এর মধ্যে ব্যঙ্গ রঙ্গত্বই মুখ্য হয়ে উঠেছে। লঘু, ধীর, তারল্য বা চপলতাহীন ভাষায় সমাজ-সময়ের নির্লজ্জ কাজ কারবারকে —আচার ব্যবহার কুসংস্কারকে—তীব্র কশাঘাত করেছেন প্যারীচাঁদ কালীপ্রসন্ন দুজনেই। কিন্তু না পণ্ডিতী না প্যারীচাঁদ-আলালী কারুর পক্ষেই বঙ্কিম মানসকে প্রকাশ করা সম্ভব ছিলো না। তাই বঙ্কিমকে এ দুয়ের শক্তি সামর্থ মিশিয়ে নিজস্ব ভাষা ভঙ্গি তৈরী করে নিতে হয়েছে। শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মুক্তি পিপাসাকেই নিজের ভাষা ও সাহিত্য রীতিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। শব্দচয়ন, শব্দসমন্বয় ও বিশিষ্ট অর্থে শব্দ প্রয়োগ করে বাক্যের কাঠামো ছাড়িয়ে ব্যঞ্জনা সৃষ্টির অপূর্ব কৌশল অবলম্বন করে বঙ্কিম তাঁব জীবন চেতনাকেই মূর্ত করে তুলেছেন। দীর্ঘদিন বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষাই সৎ সাহিত্যের ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

কিন্তু এ প্রতিষ্ঠাও রবীন্দ্রনাথে এসে ধ্বসে পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ তার যুগান্ত-কারী প্রতিভায় গদ্যের মধ্যে সুরের আমদানী করেছেন। উপমা ও উপমা-কল্প বাক্য এবং অন্যান্য অলংকারের সার্থক এবং অভিনব প্রয়োগে গদ্যের চেহারা এবং স্বরূপই বদলে নিয়েছেন তিনি। গদ্যের প্রসাদগুণ এত অপরিসীম যে তার রেশ শেষ হয়েও শেষ হতে চায় না। এ গদ্য একেবারে অনমুকরণীয় বলেই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় অন্য কোন গদ্যকারই সাহিত্য রচনা করতে আসেন নি। শরৎচন্দ্রর গদ্যও মাধুর্য্যময়। তার বিপুল শব্দ সম্পদ এবং রচনা রীতির (স্টাইল) গুণ শরৎ সাহিত্যে এক সার্বজনীন আবেদন নিয়ে এসেছে। শব্দ নির্বাচনে, অলঙ্কার প্রয়োগের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র বাস্তবের সঙ্গে নিকট সম্পর্ক রেখে কখনো কখনো গদ্যকে কবিতার কাছাকাছি নিয়ে ফেলেছেন। প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' মুখের ভাষাকে নিয়ে আসতে চেষ্টা করলো—রবীন্দ্রনাথ হলেন 'সবুজপত্র'র

শ্রেষ্ঠ লেখক এবং চলতি গন্থেরই লেখক। সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্বপ্ন সফল হোলো। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তীকালের লেখকদের সে গন্থকেও পালটে নেবার প্রয়োজনীয়তা দেখা গেলো। আধুনিকতার তৃতীয় অধ্যায়ের জটিল ও অতি সূক্ষ্ম অনুভূতির চেহারা ফোটাতে তাই ফিরে আন্দোলন শুরু করতে হলো 'নতুন রীতির' গন্থের। এঁরা গন্থকে কখনো নিয়ে আসতে চাইলেন কবিতার কাছাকাছি কখনো বা দিতে চাইলেন ইস্পাৎ-দৃঢ় কাঠিন্য। আর কখনো বা গন্থ হয়ে উঠলো অন্বয়হীন শব্দশক্তির প্রকাশ। গন্থ নিয়ে পরীক্ষা চলছে বৈজ্ঞানিক গবেষণার মতো।

উনিশ শতক, আগেই বলা হয়েছে, ব্যক্তির কথা নিজের আনন্দ বেদনা কান্না ও অনুভূতির সুর শোনাতে গিয়ে লিরিকের আকাঙ্খা করেছিলো। কিন্তু মধুসূদনের ক্লাসিক প্রতিভা নিজের শক্তির জোরে সে বাসনার মোড়কে নিজের অনুকূলে এনে সার্থক ভাবে ধ্রুপদী কাব্য রচনা করেছে। কিন্তু মধুসূদনের শক্তি, সামর্থ, ধারণক্ষমতা—বিশেষ করে যুগের সমস্ত উপাদানকে রক্ত অস্থি মজ্জা মাংসের স্বাস্থ্যে আত্মসাৎ করে ব্যবহারের ক্ষমতা আর কারুরই ছিলো না। হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের ব্যর্থতাই প্রমাণ করে যে, সামান্য শৈথিল্যেই বেনেসাঁসের অমোঘ নির্দেশে যুগবাসনা বিহারীলালকে আশ্রয় করেছে। আর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মর্জি ও আন্তর বেদনা বা সুদূরের অভিলাষ আর্তি অজস্র ধারায় প্রকাশিত হয়েছে। বিহারীলালেই গীতিকবিতার মৌলিক সুরটি প্রকাশ পেয়ে বাংলা কবিতার মূল ধারার গোষ্ঠীবোধ থেকে ব্যক্তিবোধকে মুক্ত করে এনেছে। একটা অনিন্দ্য সৌন্দর্য বোধকে মানস লোকে প্রতিমা করে তাকে পাওয়া না-পাওয়ার আনন্দ বেদনায় কবির ব্যক্তিগত আন্তর গুঞ্জরণ মুখর হয়ে উঠেছে। কবির রোমান্টিক সুদূরাভিসার শেষ অব্দি মিষ্টিক তন্ময়তায় বিভোর হয়ে পড়েছে। বিশ্ব সৌন্দর্যের মূল শক্তি রহস্যকে কবিসত্তা প্রায় ছুঁয়ে ফেলেও একটা ব্যর্থতার বেদনায় অবসিত হয়ে বলে উঠেছে 'রহস্য ভেদিতে তব আর আমি চাব না / না বুঝিয়া থাকা ভাল, / বুঝিলেই নেবে আলো'। [সাধের আসন] বিহারীলালের ভাষায় শক্তি থাকলে তিনি পাঠকের জন্যে জীবন্ত সৌন্দর্য-প্রতিমাই সৃষ্টি করতে পারতেন। তাঁর আলো-ছায়ায় গড়া সৌন্দর্য অনুভবকে রবীন্দ্রনাথ পরিপূর্ণ ভাষা-শরীর এবং সংগীত-প্রাণ দিয়ে দেশকালোত্তরী করে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথের অনেক কিছুই নতুন কালের নতুন মানুষের কাছে অস্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু তাঁর গানকে অস্বীকার করার মতো দুর্ভাগ্য বুঝি বাংলা দেশের আসবে

না। এখানেই বিহারীলালের ঐতিহাসিক স্বীকৃতি। তাছাড়া সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ কবিদের হাতে অন্তরঙ্গ গীতিকবিতার জগৎ প্রকৃতি, প্রেম, রূপ-সৌন্দর্য্যের তৃষ্ণা, আকাঙ্খা, উৎকণ্ঠা ও মানবিক আর্তি নিয়ে যুগের ব্যক্তিচেতনার বিচিত্র অনুভূতিকে আলোক শরীর দিয়েছে। একটা শূন্যতা বোধের জন্মও এই সময়ে জিজ্ঞাসা তুলেছিলো : 'কেন এই শূন্য অনুভব / কাতরে কাঁদিছে মনপ্রাণ।/ কি অব্যক্ত যন্ত্রণার রব / শ্বাসে শ্বাসে মরণ-আহ্বান!'[১] আর এই সঙ্গেই এসেছে মৃত্যু চেতনাও—রবীন্দ্রনাথের চেতনায় অন্ধকার ও মৃত্যুর অভিষেকই আধুনিক ধারার আরেক বাঁক ঘুরিয়েছে। 'সন্ধ্যা সংগীত' থেকে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত কবি সার্বভৌমের যে আলো আঁধারীর জগৎ, যে ব্যাপক রবি প্রতিভার বিকীরণ তাকে ছাড়িয়ে পরবর্তী সময়ের নতুন জিজ্ঞাসা তুলে ধরতেই সাহিত্য আন্দোলনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূত্রপাত।

রেনেসাঁসের সমস্ত শক্তিকে আত্মসাৎ করে এবং প্রতি মুহূর্তের ভবিষ্যতের সঙ্গে বেঁচে থাকতে থাকতে এ্যাডজাষ্ট করে সেই সময়ের শ্রেষ্ঠ আধুনিক লেখক হয়ে ওঠার অপরিসীম শক্তি রবীন্দ্রনাথকে মহিমান্বিত করেছে, কিন্তু ক্ষতি করেছে পরবর্তী সাহিত্য বিকাশের। রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকবেন আর উত্তর-কালের লেখক কবি আত্মনির্ভরশীল হবে, এমন চিন্তা করা তৃতীয় অধ্যায়ের আধুনিক লেখক বিপ্লবীদের পক্ষেও অসম্ভব হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রমুখ কবির আত্মোৎসর্গ ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, কাজি নজরুল ইসলাম এবং আরো এমনি অনেকের সচেতন ও সশ্রদ্ধ বিদ্রোহ রবীন্দ্রনাথ থেকে উত্তরকালের সাহিত্যকে স্বতন্ত্র চিহ্নে চিহ্নিত করতে সহায়তা দিয়েছে। গদ্যে শরৎচন্দ্রের ও পদ্যে সত্যেন্দ্রনাথের তরল রাবীন্দ্রিক সংস্করণ একটা তোফা থাকার মেজাজ নিয়ে এসে প্রমাণ করেছিলো রবীন্দ্রনাথকে কাটিয়ে আত্মপ্রকাশ ঘটানো কতো কঠিন। কবিতা, নাটক, উপন্যাস, গান, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, রম্যরচনা এবং আরো সব অজস্র রচনায় রবীন্দ্রনাথের যে বিরাট সাম্রাজ্য, তার অধিবাসী হয়েও কল্লোলপূর্ব সময়ের কবিদের কেউ কেউ সামান্য স্বাতন্ত্র্য দেখাতে পেরে-ছিলেন। আধুনিক সাহিত্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভূমি প্রস্তুতিতে তার মূল্য একেবারে অস্বীকার করার নয়।

---

১ **প্রতিভার নিবর্তন**—অক্ষয়কুমার বড়াল।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রবীন্দ্রচ্ছায়াতেই লালিত। ভাবের দিক থেকে, রূপের দিক থেকে বা কোনো দিক থেকেই প্রায় তাঁর কবিতাকে স্বতন্ত্র মূল্যে গ্রহণ করা যায় না। কবিতা যদি কামারশালায় তৈরী হোতো, তবে সত্যেন্দ্রনাথকে দক্ষ কবি বলতে আপত্তি থাকতো না। খাঁটি কবিত্ব-শক্তি তাঁর ছিলো না বরং কবিত্বের সৌখীন মজদুরী ছিলো। শব্দে ছন্দে জ্ঞানে সত্যেন্দ্রনাথ পণ্ডিত ছিলেন নিঃসন্দেহে। কিন্তু কবিতার ব্যাপারে সবটাই চালান করতে গিয়ে, বালক-সুলভ খাম খেয়ালী দেখিয়ে প্রতিদিনের সংবাদপত্রের বিষয়কে কবিতা করতে গিয়ে শুধু 'শব্দ ধুনিয়া খটাখট' বিস্তর 'কারদানি'ই করেছেন। তবে শ্রমের কবিতা এবং ছড়ার ছন্দে কিছু কিছু শিশুবোধ্য কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ খানিকটা স্বীকৃতির দাবী রাখেন। কিন্তু সিরিয়াস কবিতাব ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথের অনুভূতিটাই 'এ সম্পর্কে একটা কবিতা লিখতে হবে' ধরণের মনোভাব থেকে জাত। কবিতায় বস্তুবাদী দৃষ্টি সত্যেন্দ্রনাথ নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু গভীরতা দিতে পারেন নি তা থেকে কবিতা করতে গিয়ে। নিছক তুলতুলে পদ্যের বোল কানে বেজেই সরে গেছে, প্রাণে প্রবেশ পায় নি। প্রমথ চৌধুরী সত্যেন্দ্র নাথের ঠিক বিপরীত দিকের। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি নিয়ে তিনি কবিতার জগতে প্রবেশ করে ষ্টিলের নিব দিয়ে গোলাপের রূপ ফুটিয়ে তুললেন। কবিতায় আনলেন ঋজু বাক্যের সৌন্দর্য্য। চিন্তায় ও বাচন ভঙ্গিতে স্টাইলিষ্ট কৃষ্ণনাগরিকের বাঁকা হাসির ছোঁয়াচ লেগে তাঁর কবিতাকে আধুনিক চিহ্নে চিহ্নিত করেছে।

নজরুল রবীন্দ্রনাথের থেকে ভিন্ন স্বভাবের তাই রবীন্দ্র-সাম্রাজ্যে থেকেও তুখোড় শব্দচিত্রে, সংস্কৃত লৌকিকের বিচিত্র সমন্বয়ে এবং অ-শিথিলবন্ধ বাচন ভঙ্গিতে আধুনিক জীবনবোধের পরিচয় আনতে পেরেছেন তাঁর কবিতায়। রবীন্দ্র পরিমণ্ডল ছিঁড়ে বেরিয়ে এসে নজরুল ভাষা গঠনে যেমন স্বকীয়তা দেখিয়েছেন, তেমনি নিয়ে এসেছেন রক্ত চাঞ্চল্য। এ অধ্যায়ের অন্যতম মূল উপাদান, শ্রেণীসংগ্রাম প্রসূত সাম্যবাদকে নজরুলের পক্ষে সঙ্গত কারণেই বোঝা অসম্ভব ছিলো। তবু পরবর্তী কবিদের অনেকেরই উপজীব্য যে মানবমুক্তি, তার উদ্গাতা নজরুলই। ব্যক্তি মানুষের হৃদয় গভীরে নজরুলের প্রবেশও ছিলো অসম্ভব। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার মারের সামনে ব্যক্তির অসহায়ত্ব যে আধুনিক সত্য, নজরুলকে তা আদৌ আলোড়িত করে নি। কিন্তু সমস্ত শাসনত্রাসন ও অত্যাচারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়াইয়ের অস্ত্র যে সংঘশক্তিচেতনা নজরুল তাকে তাঁর বিশ্বাস করার জোরেই বুঝতে পেরেছেন। তাই এই আধুনিক আবিষ্কার

সংঘশক্তিচেতনার বিদ্রোহী অভিব্যক্তি ফোটাতেই নজরুল বাংলা কবিতায় একটা অগ্নিদগ্ধযন্ত্রণার সুর সংযোজন করেছেন। 'লাথি মার ভাঙ রে তালা / যত সব বন্দী শালা / আগুন জ্বালা আগুন জ্বালা ফেল উপড়ি।' তবে নজরুলের কবিতায় সামাজিক রাজনৈতিক বিদ্রোহই ছিলো, সাহিত্যিক বিদ্রোহ যে ছিলো না তা বলা বাহুল্য।

রবীন্দ্র বিরোধিতার চিহ্ন নজরুলের মধ্যে জেগে উঠেছিলো তার যৌবন ভরা অফুরন্ত শক্তির প্রেরণায়। কিন্তু মোহিতলাল মজুমদারের বিরোধিতা কবিতার চেহারাতেই পৌরুষ দেবার চেষ্টায়। কবিতার আঙ্গিকে বজ্র কাঠিন্য এনেছেন মোহিতলাল। ভাব-কল্পনায়—বিশেষ করে প্রেম সম্পর্কে নতুন তাৎপর্য আবিষ্কার করে তিনি রবীন্দ্রনাথের কাব্যের অশরীরী প্রেমানুভূতিকে অস্বীকার করেছেন এবং এদিক থেকেই অল্প সময়ের আধুনিকতার ভিত্তি স্থাপন করেছেন তিনি। তবে রবীন্দ্র সাম্রাজ্যের সম্মোহনী শক্তির কঠোর প্রতিবাদ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। তিনিই রবীন্দ্র বিরোধিতার সুচিহ্নিত কবি ব্যক্তিত্ব। যতীন্দ্রনাথ তাঁর কবি স্বভাবে বহন করেছেন একটা গভীর নাস্তিক্যবোধ ও বিশ্বাস ভাঙা হৃদয়ের আঁচ। তাঁর কবিতার মধ্যে জীবনকে দেখার তিক্ত দৃষ্টি ও জড়বাদী বিশ্বাসজাত ভঙ্গি প্রকট হয়ে উঠেছিলো। যুগ পরিবেশ ও মানব-জীবনাদর্শের বিপর্যয় যতীন্দ্রনাথের কবিসত্তাকে গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছিলো। সোপেন-হাওয়ারীয় দর্শনে আক্রান্ত হয়ে হৃদয় থেকে কিছুই পাওয়ার নেই জেনেই তিনি জ্বলে পুড়ে নীল হয়ে যাওয়া বেদনায় বাক্য সাজিয়ে বলে উঠেছেন. 'যতো দুখের আগুনে, বন্ধু, পরান যখন জ্বলে, / তোমার হাতের সুখ-দুখ-দান ফিরায়ে দিলেও চলে।' যতীন্দ্রনাথই সচেতনভাবে কবিতায় মুখের ভাষা ও শব্দচিত্র ব্যবহার করেছেন। একটা অনাবৃত বিদ্রূপে সমাজ-স্বরূপ উদঘাটন করে কবিতাকে তিনি বাস্তব-রূঢ় জীবন-চিন্তার কাছাকাছি পৌঁছে দিয়েছেন। আর এরই পরে এসেছে সংক্রান্তি—বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতার নতুন যুগসংক্রান্তি। 'কল্লোল' 'পরিচয়', 'কবিতা' অস্বীকার জানাতে শুরু করলো 'বঙ্গদর্শন' থেকে 'সবুজপত্র' পর্য্যন্ত বয়ে আসা কাল-ফলশ্রুতিকে। সুরু হয়ে গেলো রবীন্দ্রবিচ্যুত গদ্য পদ্যর বিবর্তনের ধাপ।

সবুজপত্র

[‘যে প্রাণ একমাত্র আর্টেরই বাধ্য’ এমন আর্ট সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সবুজপত্র—আর্ট সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ না হলেও, চলতি গদ্যে সাহিত্য করার নীতি পরবর্তীকালে অনুসৃত—প্রমথ চৌধুরী ও অবনীন্দ্রনাথের গদ্য—আপাতদৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের তরলিত সংস্করণ হয়েও শরৎচন্দ্র রবীন্দ্র প্রতিদ্বন্দ্বী—শরৎচন্দ্রকে ঘিরে শ্লীল-অশ্লীলতার প্রশ্ন – নবাগত ফ্রয়েডীয় যৌনবিজ্ঞান ও মার্কসীয় দর্শনকে হাতিয়ার করে আধুনিকতার দ্বিতীয় পর্যায়ের সাহিত্য আন্দোলন—গদ্যে কল্লোল যুগ ও বুদ্ধদেব বসু—বাস্তববাদী লেখালেখির সূচনা—নতুনতর জিজ্ঞাসায় মানুষ ও পরিবেশ তল্লাস—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানুষ নিয়ে গবেষণা—প্রকৃতির জীবন্ত সত্তা আবিষ্কারক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—আধুনিকতার কল্যাণ ক্ষমতায় সন্দিহান তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—গদ্যে স্ট্রিম অব কনসাসনেস রীতি—বৈজ্ঞানিক চিন্তা—জলা মাটি-সংগ্রাম—আন্তর্জাতিক মানুষের মধ্যে মানবিক আত্মীয়তার বন্ধন প্রয়াসী অন্নদাশঙ্কর রায়—প্রগতি লেখক আন্দোলন ও তার ফলশ্রুতি—সাহিত্যে যুদ্ধদষ্ট অভিশপ্ত সভ্যতার আধুনিকতা হিসেবে আবির্ভাব—সাহিত্যে বর্ণচোরা কদর্যতা, সমাজ ও জীবন-সংগ্রাম মনস্কতা এবং সমরেশ বসু—ইতিবাচক ও নেতিবাচক বোধের দ্বন্দ্বে জর্জরিত বিমল কর—সাহিত্যে ভূগোল বিস্তারের দিকে মনোযোগ—নিঃসঙ্গতা বোধ ও অতিমাত্রায় আঙ্গিক সচেতনা—প্রতীক চেতনা ও শিল্পশৈলীতে উৎসর্গীত জ্যোতিরীন্দ্র নন্দীর লেখক সত্তা—‘কথাগুলোর মানে হারিয়ে গেছে, শুধু আওয়াজগুলো আছে’—বাংলা গদ্যের তান্ত্রিক সাধক কমলকুমার মজুমদার—পূর্বসূরী গদ্যপ্রবাহের শেষ দান অর্থহীনতা এবং তাই নিয়েই সাম্প্রতিক গদ্যের যাত্রা।]

“আজকাল বাংলা ভাষা আমাদের মত মূর্তিমান কবিদলের অনেকেরই উপজীব্য হয়েছে ; বেওয়ারিশ লুচীর ময়দা। তইরি কাদা পেলে যেমন নিষ্কর্মা ছেলে মাত্রেই একটা না একটা পুতুল তইরি করে খ্যালা করে, তেমনি বেওয়ারিশ বাঙালি ভাষাতে অনেকে যা মন যায় কচ্ছেন,...সুতরাং এই নজিরেই আমাদের

বাংলা ভাষা দখল করা হয়।"[১] এই দখলদারীর সুদীর্ঘকাল পর কলকাতার তরুণ বুদ্ধিজীবীদের একটি খুদে মাসিক পত্রে ঘোষণা দেওয়া হোলো—"সানন্দে জানাচ্ছিঃ আমরা কিছু বলতে চাই না। গল্পকবিতা স্রেফ অজানা আর অল্পজানাদের প্রাণখুলে হট্টগোলের আস্তানা।..কথা তো অনেকই শোনা গেছে, এবার বোধহয় সবারই দরকার আবোল তাবোল, হল্লা, হট্টগোল, প্রলাপ—তার মানে থাক বা না থাক।"[২] অথচ এই দু'দিগন্তের মাঝখানে অন্তরে বাইরে 'স্বজাতির মুক্তির' জন্যে "...সাহিত্য হচ্ছে ব্যক্তিত্বের বিকাশ।...সাহিত্য জাতির খোরপোশের ব্যবস্থা করে দিতে পারে না, কিন্তু তাকে আত্মহত্যা থেকে রক্ষা করতে পারে।...নবজীবনের নবশিক্ষা, দেশের দিক ও বিদেশের দিক দুই দিক থেকেই আমাদের সহায়। এই নবজীবন যে লেখায় প্রতিফলিত হয় সেই লেখাই কেবল সাহিত্য—বাদবাকি লেখা কাজের নয়, বাজে।.. যে লেখায় লেখকের মনের ছাপ নেই, তা ছাপালে সাহিত্য হয় না।"[৩] এই কথাগুলো সুস্পষ্ট ভাবে চিহ্নিত করে 'যে প্রাণশক্তি একমাত্র আর্টেরই বাধ্য' এমন এক শিল্পায়িত প্রাণশক্তির সাহিত্য সৃষ্টিতে লেখকদের 'সহায়তা' দেবার জন্যে আত্ম প্রকাশ করেছিলো 'সবুজপত্র'। 'সবুজপত্রের মুখপত্রে' ঘোষণা করা হয়েছিলো সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবঃ "আমাদের বাংলাঘরের খিড়কিদরজার ভিতর প্রাচীন ভারত-বর্ষের হাতি গলাবার চেষ্টা করতে হবে, আমাদের গৌড়ভাষার মৃৎকুম্ভের মধ্যে সাত সমুদ্রকে পাত্রস্থ করতে চেষ্টা করতে হবে।" অর্থাৎ নতুন কিছু করতে গিয়ে যে সবুজের অভিযান, তার বিপুল প্রাণশক্তির ভাষাবিগ্রহ রচনা করার অঙ্গীকার ঘোষণা করে জীবন্ত মুখের ভাষাকেই 'সবুজপত্র'র লেখালেখির ভাষা হিসেবে নির্দিষ্ট করেছিলেন সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী। 'সবুজপত্রের মুখপত্র' পড়ার পর এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, 'সবুজপত্র'র ভাষা যেমন 'বেওয়ারিশ লুচীর ময়দা' নয়, তেমনি 'হট্টগোলের আস্তানা' হিসেবেও 'একখানি নতুন মাসিক পত্র প্রকাশ করতে উদ্যত' হন নি উদ্যোক্তারা। বস্তুত, বুদ্ধি-যুক্তি-মুক্তিবাদিতা, মানবাধিকারের প্রতিষ্ঠা এবং জাতির বাহ্যিক ও মানসিক জড়তার মধ্যযুগীয় দেয়াল ধ্বসিয়ে দেশবাসীর ক্রমমুক্তিকে সম্প্রকাশের তাগিদেই জীবন-শিল্পের সার্থক অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলো 'সবুজপত্র'।

প্রথম উদ্ধৃতিটিকে আধুনিক বাংলাভাষার ছেলেবেলার খামখেয়ালের নামান্তর বলে যদিবা উপেক্ষা করা যায়, 'সবুজপত্রে' চিহ্নিত যৌবনকাল পেরিয়ে

১। হুতোম প্যাঁচার নক্সা ২। গল্পকবিতা—১৯৬৭ ৩। সবুজপত্র

এসে যখন স্থিতধী প্রতিভার বলিষ্ঠ বিকীরণ বাংলা সাহিত্যে ন্যায্যত প্রত্যাশিত তখন দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটির দিকে তাকিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসে স্বাধীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেক আজ কেন 'আবোল তাবোল, হল্লা, হট্টগোল, প্রলাপ' বকার ঘোষণা দিয়ে এমন অর্থহীনতার রাজসূয় যজ্ঞ শুরু করতে চাইছে। তা হলে কি এঁদের পূর্বসূরী অসীম প্রতিভাধরদের তাবৎ সাহিত্য আন্দোলন ও সৃজন প্রয়াসের ফলশ্রুতি 'শূন্য'? সাহিত্যে তিলোত্তমা গড়তে গিয়ে এতকাল কি শুধু উদ্দেশ্যহীন প্রলাপ সৃষ্টিরই ভূমিকা রচনা করা হয়েছে—উৎসাহিত করা হয়েছে কি শিল্পের জগতে নৈরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্যে?

প্রশ্ন আছে, উত্তরও আছে। এবং সে উত্তর স্থানকালপাত্রের নিষ্ঠুর বাস্তবে। ভাবাবেগে নয়—পূর্বসূরীদের চিন্তা-চেতনা-সৃষ্টিকে সশ্রদ্ধ প্রণাম ঠুকেই যাঁরা হল্লা হট্টগোল প্রলাপ বকে নিজেদের বেঁচে থাকাটাকে নিজেদের কাছে সত্য করে দেখতে চাইছেন, বাস্তব পরিবেশ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতেই অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে তাঁদের সাহিত্য সৃষ্টির মূল্যায়ন একান্ত বাঞ্ছনীয়। কেননা, আমার বিশ্বাস, সাম্প্রতিক সাহিত্যকাররা নিজেদের জীবনটাকেই সাহিত্য করে তুলেছেন। জীবনবিমুখ সাহিত্য নয়—জীবনকে নেগেটিভ দিক থেকে দেখানোর আন্তরিক প্রয়াসে সৃষ্টি হয়েছে সাম্প্রতিক সাহিত্য। ভয়াবহতাকে ফুটিয়ে তুলে তার বিরুদ্ধে জীবন চেতনাকে প্রখর করে তুলতেই—জীবনের পরিপন্থী তাবৎ শক্তির বিরুদ্ধে আপোষহীন আক্রমণ চালাতেই তরুণতর লেখক-কবিরা তাঁদের লেখালেখিকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দলিল হিসেবে উপস্থিত করেছেন।

নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়, আধুনিকতার আন্দোলনের বীজেই ক্ষয় ছিলো। সাহিত্যের মহীরূহ উঠেছে, তাতে অজস্র ফুলফলও ধরেছে সত্য, কিন্তু উনিশ শতকে প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ—মানসিকতার বোধ শিকড় থেকেই ঝাঁঝড়া হতে শুরু করেছে। এক রবীন্দ্রনাথের জীবন সীমাতেই শিকড় নষ্ট অবক্ষত আধুনিক সমাজজীবনের ধূলিতে হেলে পড়ার রূপ প্রত্যক্ষ করা গেছে এবং রবীন্দ্রনাথই তা তাঁর 'কালান্তর'এর বিভিন্ন প্রবন্ধে সুস্পষ্ট দেখিয়েছেন। মোট কথা, রেনেসাঁসের সুফলগুলো জাতীয় জীবনের রক্তমাংসে ধরে নি। ফলে, রবীন্দ্রনাথের জীবিত কালেই 'কল্লোল' 'প্রগতি' 'কবিতা' 'পরিচয়' প্রভৃতি পত্রিকার তরুণ লেখক কবিরা সেদিন এক ভয়াবহ সংকট চেতনার আঁচ পেয়েই আধুনিকতার দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলন শুরু করেছিলেন—আলোড়িত হয়েছিলেন নতুনতর জীবনজিজ্ঞাসায়। 'সবুজপত্র'র শিল্প সৃষ্টির সদিচ্ছা সেদিনই বিভিন্ন দিক থেকে জিজ্ঞাসা-জর্জরিত

হয়ে পড়েছে। আর এ সময়ে সেই জিজ্ঞাসাই গভীর এবং আরো পরিব্যাপ্ত খাত করে এসে সমস্ত কিছুকেই অর্থহীন করে তুলেছে তরুণতর বুদ্ধিজীবীদের কাছে। আজ 'কথার মানে গুলো সব হারিয়ে গেছে, শুধু আওয়াজগুলো আছে।'

এবারে একটু তলিয়ে দেখা যাক, কোন পূর্বসূরীদের উত্তরাধিকার বহন করছেন সাম্প্রতিক কবি ও সাহিত্যকরা। আমরা আগেই দেখেছি যে, প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধ থেকে সংকটের হিম হাওয়ায় কোলকাতা জেটির সমস্ত সবুজ পত্রই ঝরে যেতে বসেছিলো। হিম ঝড়ে কেন্দ্রচ্যুত হয়ে পড়েছিলো কিন্তু গোয়ালার গলির হরিপদ কেরাণীর প্রতিবেশী, প্রমথ চৌধুরী কথিত 'চরসপায়ী', 'মদের গেলাসে অশ্রুপাতকারী', দেশোদ্ধারের জন্যে 'চাটুপাটু বক্তা' এবং বছর বছর পুত্রকন্যা আসায় ভয়াবহ আর্থিক সংকটে বিব্রত 'খেতাবধারী' 'কেতাব' লিখিয়েরা। অন্য কথায়, শহরবাসী মধ্যবিত্ত মসীজীবী শ্রেণী। বাঙলা দেশে এরাই দেশ ও আধুনিক জীবন চেতনার প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধের ধারক—এরাই স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোভাগে থেকে স্বাদেশিক চেতনাকে ফলবান করার ব্যাপারে উনিশ শতকের ঐতিহ্য বহন করেছিলো। আর এরাই বাঙলা দেশে গুড কণ্ডাক্টার—যে কোন প্রবাহই এদের মধ্যে দ্রুত সঞ্চারিত হয়ে থাকে। তাই বিশ্বময় প্রসারিত যুগীয় নিরাশ্বাস যেমন কোলকাতার বুদ্ধিজীবীদের সংশয়াকুল করেছে, তেমনি এদের মধ্যে বদ্ধমূল করে দিয়েছে বিশ্বাসহীনতা। জিজ্ঞাসা উঠেছে জীবন কি, সত্য কি, ভালোবাসা কি, ধর্ম কি, মুক্তি কোথায়, ঈশ্বর কি এবং শেষ অব্দি কিসেই বা কি? এই জিজ্ঞাসার উত্তরই এক-পা এক-পা করে এগিয়ে এসেছে 'কিছুই কিছু না' হয়ে। নিঃসীম বিশ্বাসহীনতার হাতছানিতে নিয়তি নিয়ন্ত্রিত দুর্নিবার টানেই বিরাট একটা 'না'-এর কবলিত হয়েছে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ। ফলে, সাহিত্যে অনিবার্য হয়ে উঠলো আত্মকণ্ডূয়ন এবং আত্মখনন। ব্যক্তি হয়ে পড়লো নিজের মধ্যে নিজে একা।

তবে এই আত্মজখমকারী অবিশ্বাসের বোধ এবং একাকিত্বের বোধ যা বহির্ভারতীয় বিশ্বের বিশেষ করে পাশ্চাত্য দেশের হতাশ্বাস, কান্না, ঊষরতা, যৌনতা বহন করে নিয়ে এসে আধুনিকতার দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলনের প্রধান উপাদান হয়ে দেখা দিয়েছে, তার পাশাপাশি বিশ্বাসের বোধ এবং সমষ্টিবোধ-জাত সুস্থতার বলিষ্ঠ উপাদানও পেয়ে গিয়েছিলো কোলকাতার বুদ্ধিজীবী সমাজ। বুদ্ধিজীবীদের একাংশ নতুন যুগের মার্কসবাদের সত্যদর্শনকে অনুভব

করে বুঝেছিলো শোষণে নিষ্পেষণে চারদিক থেকে মার খেয়ে একা হয়ে যাওয়া নয়—সমষ্টিবোধে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বকে স্বীকার করে নিয়ে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করার মধ্যে থেকেই আসবে সার্থকতা। শোষণহীন সমাজেই আসবে জীবন-মূল্য—শিল্পের প্রশান্তি। ১৯১৭ সালের সার্থক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম কোলকাতার অনেক বলিষ্ঠ লেখক কবিকে উত্তরণের আলোক দেখিয়ে বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করেছিলো। কিন্তু মনে রাখতে হবে, সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি-রাজনীতির সরাসরি যোগাযোগে এবং ইংরেজী বিদ্যালয়ের কল্যাণে পশ্চিমী অবক্ষয়, নেতিবোধ, নীট্‌সে-সোপেনহাওয়ারের দর্শন এবং ফ্রয়েডীয় যৌন বিজ্ঞান কোলকাতার বুদ্ধিজীবী মহলে যত দ্রুত স্বীকৃতি পেয়েছে, তত দ্রুত ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ প্রতিষ্ঠা পায় নি। এ সময়ে সাহিত্যে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত খেটেখাওয়া মানুষ মিছিল দিয়ে এলেও তা সেদিনের তরুণ সাহিত্যিকদের ভাবাবেগের তাড়নায় এসেছে। আধুনিকতার দ্বিতীয় পর্বের আন্দোলনের প্রাথমিক উদ্দেশ্যই ছিলো রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর তরলিত সংস্করণ শরৎচন্দ্র-সত্যেন্দ্রনাথ থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করা এবং সাবালকত্ব অর্জন করা। আর শুধু এই জন্যেই তাঁরা ফ্রয়েডীয় মনোবিদ্যা ও মার্কসীয় দর্শনকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন মাত্র। নিছক এই একটি প্রয়োজনে সত্যকে মশলা হিসেবে ব্যবহার করলে যে তার ফল সুদূর প্রসারী হতে পারে না তা বলাই বাহুল্য।

মোট কথা, বিদ্রোহ যেখানে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে, সেই রবীন্দ্রনাথই যখন সবুজপত্রের মুখ্য লেখক সেখানে 'সবুজপত্র'র প্রতি আনুগত্য দেখানোর কোনো প্রশ্নই ওঠে না। বস্তুত, 'সবুজপত্র'র আর্ট সৃষ্টির আন্দোলন রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে শুরু হয়ে রবীন্দ্রনাথেই শেষ হয়ে গেছে। প্রাণ আর গতি—উপনিষদ ও বার্গসঁ—'সবুজের অভিযান' এবং 'ঘরে বাইরে' সব্যসাচীর মত গদ্যপদ্য রচনা করে তিনি 'সবুজপত্র'র আড়ালে থাকা আলোর চুমকিগুলোকেও গ্রাস করে ফেলেছেন। রবীন্দ্রবিদ্রোহী তরুণ কবি ও কথা সাহিত্যিকরা 'সবুজপত্র'র আদর্শের যেটুকু স্বীকার করেছেন তা তার মুখের ভাষায় সাহিত্য করার আদর্শ। জীবন্ত সাহিত্য সৃষ্টি করার তাগিদে 'সবুজপত্র'র চলতি গদ্যের মধ্যে রক্ত প্রবাহ সৃষ্টি করে তাকে আরো তাজা এবং জটিল সময়ের জটিল চিন্তাভাবনা অনুভূতি প্রকাশের উপযোগী করে নিয়েছে এবং ভাষা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছেই।

গদ্য নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার দিক থেকে 'সবুজপত্র' ও তার নিকট সুহৃদ দুই লেখক সম্পর্কে কিছু আলোচনা করে নিতে হয়। দু'এর একজন 'সবুজপত্র' সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী, অন্যজন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাদশাহী হীরার জহুরী কৃষ্ণনাগরিক প্রমথ চৌধুরী বুদ্ধিযুক্তিমুক্তিবাদিতায়—বাস্তব অনুসন্ধিৎসায় গদ্যে-পদ্যে যতটা মেধাকর্ষণ করেছেন, সাহিত্যকে ফলবান করতে ততটা উৎসাহী ছিলেন না। উগ্র মনীষাবাদী দেহে মনে দুর্ভেদ্য আভিজাত্যের বর্ম পরে 'রাইয়তের কথা' বললেও সাহিত্যে তিনি রাইয়তের জীবনের বিপুল প্রাণশক্তিকে উপস্থিত করতে পারেন নি। বস্তুত, কি 'সনেট পঞ্চাশৎ'এর কবিতা আর কি তার গদ্য রচনা সবই যেন কিছুটা মাটি গন্ধ ছাড়া নিরক্ত জ্ঞানেরই পরিচয়। মানুষ সম্পর্কে শিল্পীর যে মরমী অনুভূতি--জিজ্ঞাসার ব্যাপকতা—তার অভাবে প্রমথ চৌধুরীর লেখালেখি নিছক তত্ত্ব ভাষণেই পরিসমাপ্ত। ফলে, তাঁর গদ্যভাষাও প্রকারান্তরে এক ধরণের সাধু ভাষাই হয়ে পড়েছে। তবে প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কে একটা কথা বলতেই হবে যে, তিনি 'সমাজ-সচেতন সাহিত্য'র হোতা। তিনিই প্রথম ঘোষণা করেছিলেন 'সাহিত্য মানব জীবনের প্রধান সহায়, কারণ তার কাজ হচ্ছে মানুষের মনকে ক্রমান্বয়ে নিদ্রার অধিকার হতে ছিনিয়ে নিয়ে জাগরূক করে তোলে।' [সবুজপত্রের মুখপত্র] এদিক থেকেই তিনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য পুরুষ।

অন্যদিকে অবনীন্দ্রনাথ শিল্পী হিসেবেই নিয়ত পরীক্ষা নিরীক্ষায় আন্তর অনুভূতির প্রতিমায় পরিণত করেছেন বাংলা গদ্যকে। অবনীন্দ্রনাথের লেখা-লেখির প্রসঙ্গে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের নাম মনে এসে যেতে পারে--আর রবীন্দ্রনাথ তো শতাব্দীর লেখকদেরই সমস্যা, অবনীন্দ্রনাথের বেলায়ও আলোচনার বড় অংশ গ্রাস করতে চান। তা সত্ত্বেও অবনীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার অন্যতম প্রধান গদ্য লেখক হয়ে উঠেছেন। তাঁর শিল্প জিজ্ঞাসাই এখানে কার্যকরী হয়েছে। বাংলা গদ্যে কথকতার ঢং, রূপকথা-উপকথা ও বৈঠকী গদ্যের চাল আমদানী করে গল্পকে কোনো অবশ্য পালনীয় গদ্যের বাঁধুনী থেকে মুক্ত করেছেন অবনীন্দ্রনাথ। উর্দ্দু, ফার্সী জগতের উপাদান ও বাংলার নিজস্ব উপাদান দিয়ে পরিবেশ রচনা করে, শব্দে শব্দে ছবি বুনে, রূপ এবং বোল্-এর খেলায় তিনি বাংলাগদ্যের একটা ভিন্ন জগৎ তৈরী করেছেন। নানা বাগ্‌ভঙ্গীতে 'চাঁই বুড়োর পুঁথি', 'ভূত পুত্‌রীর দেশ', 'বুড়ো আংলা', 'শকুন্তলা', 'রাজকাহিনী', 'ক্ষীরের পুতুল, 'জোড়াসাঁকোর ধারে', 'পথে

বিপথে' রচনা করে বাংলা গদ্যকে 'ন্যাশনাল হাইওয়ে বা ভি-আই-পি রোড'-এর মতো কোনো টানা রীতি থেকে ছাড়িয়ে এনে অবাধ বিচরণের পথ তৈরী করেছেন। অদ্ভুত আজগুবি কল্পনার আলোছায়া সুরে গাঁথা ফ্যান্টাসীর জগৎ —স্বপ্নচিত্রল কাল্পনিকতার জগতকেও তিনি যেমন অভূতপূর্ব চিত্রগন্ধে প্রকাশ করেছেন তেমনি কোথাও কবিতাকেই গদ্য চরিত্র দিয়েছেন। এ দিক থেকে 'আলোর ফুলকি' এক স্মরণীয় গ্রন্থ। পরবর্তী লেখালেখিতে অবনীন্দ্রনাথের কী প্রভাব তা অনুমান করা যায় স্বাধীনতা লাভের কিছু পরেই সভ্যতার কারাপ্রাচীর বন্দী স্বাধীনতার মারে পর্যুদস্ত লেখাগুলোর দিকে তাকালে। নতুন গদ্যরীতি তৈরী করতে গিয়ে সাম্প্রতিক লেখকরা উপকথা, বৈঠকী গল্পের ভাষা, দলিল দস্তাবেজের ভাষাকেও বিভিন্ন চরিত্র দিয়ে অতি জটিল ভাবনা, অনুভূতি ও মর্জি প্রকাশের বাহনে পরিণত করতে সচেষ্ট হয়েছেন—ছবি ও সুর আরোপ করে নিটোল চিত্রকল্প ব্যবহার করে গদ্যকে কবিতার কাছাকাছি নিয়ে অতি সিরিয়াস এ্যাটিচিউডকেও প্রকাশ করেছেন। আদর্শ বাংলার নিজস্ব কথা বলার ঢং, চণ্ডী মণ্ডপের বৈঠকী ভাষা বা রূপকথা উপকথাই—সে অবনীন্দ্রনাথের বেলাতেও যেমন, সাম্প্রতিক লেখকদের বেলায়ও তেমনি। উৎস হিসেবে যাই-ই থাক না কেন, রবীন্দ্র সাম্রাজ্য থেকে আপন শিল্পী সত্তার স্বাতন্ত্র্য প্রকাশের জন্যে সজ্ঞান শৈল্পিক গবেষণার ফলশ্রুতি যেমন অবনীন্দ্রনাথের গদ্য, তেমনি একালে অস্তিত্ব অবলোপকারী সভ্যতার গ্রাস থেকে ব্যক্তির শিল্পী সত্তার মুক্তি গবেষণাতেই জন্ম নিয়েছে বিভিন্ন হাতে লেখা নতুন রীতির গদ্য। নতুন রীতির গদ্যে বিদেশী গদ্য ভাষার—অর্থাৎ ল্যাংগুয়েজ-এরও সরাসরি প্রভাব আছে বলে তার স্পষ্ট জাতি নির্ণয়ে কিছুটা যা অসুবিধা ঘটে, নইলে মৌলিক একটা ধারার সঙ্গে যুক্ত করে দেখার খুব অসুবিধা হোতো না।

সে যা-ই হোক আমাদের বক্তব্য ছিলো 'সবুজপত্র' বড় ভাবনা বড় আদর্শ নিয়ে সাহিত্য জগতে নতুন হাওয়া বইয়ে দিতে চেয়েছিলো, কিন্তু একমাত্র চলতি গদ্যের ভিত্তিটাকেই একটু শক্ত করা এবং মুখের কথায় সাহিত্য করার দাবীকে একটু বড় রকম সমর্থন দেওয়া ছাড়া আর কিছু করে উঠতে পারে নি। 'সবুজপত্র' না হলেও বুঝি রবীন্দ্রনাথ সে দাবী অপূরণ রাখতেন না। 'সবুজপত্র' আদপেই রবীন্দ্রনাথ-অন্য কোনো সাহিত্যের ভূমিকা পত্তন করে নি।

বস্তুত শরৎচন্দ্রকেই আপাত দৃষ্টিতে সেদিন রবীন্দ্রনাথের প্রতিদ্বন্দ্বী কথা-সাহিত্যিক হিসেবে দেখা গিয়েছিলো। বঙ্কিমী রীতিতে মধুসূদনের

'বীরাঙ্গনা'র বিষয়বস্তুকে তরলিত রাবীন্দ্রিক ব্যঞ্জনায় ঢেলে সাজিয়ে কান্নাউদ্রেককারী ভাষায় যতই না তিনি সাহিত্য করুন, পদ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যেমন, গদ্যে শরৎচন্দ্রই তেমনি পাঠক-রাজ্য জয় করে এ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ প্রতিভা রবীন্দ্রনাথকেও আড়াল করে ফেলেছিলেন। এ যেমন একদিক, অন্যদিকে তিনিই সমালোচকদের সামনে বিতর্কিত লেখক হিসেবে উপস্থিত থেকে বহু-সমালোচনা-ধন্য হয়েছেন। এ কথা সর্বজনসিদ্ধ হয়ে পড়েছিলো যে শরৎচন্দ্র বাস্তবকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে বস্তুবাদী সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন এবং বাংলা সাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথী ভাববাদী জগৎ থেকে মুক্ত করেছেন—শরৎচন্দ্রের নরনারী আইডিয়ার পুতুল নয়, রক্তমাংসের মানুষ। সেই সঙ্গে এ বিশ্বাসও বদ্ধমূল হয়েছিলো যে, শরৎচন্দ্র শাস্ত্র-নীতিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে, হৃদয়কে নীতিনিয়মের ওপরে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন এবং নর ও নারীর অনেক-নিষ্ঠতার প্রশ্ন উত্থাপন করে সমাজে একটা ঝোড়ো তর্ক তুলিয়েছিলেন। সত্য অস্বীকারের উপায় নেই, শরৎচন্দ্র গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার নিষ্ঠুর দিক, তার প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র এবং অন্ধতাকে তুলে ধরে খুবই সাহসের সঙ্গে আঘাত করেছেন—সাধারণ নিপীড়িত মানুষের হয়ে জনিয়েছেন মানবিকতার আবেদন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলতে হবে যে, তাঁর সে প্রগতিশীল মনোভাব যতটা আবেগ প্রবণতার প্রশ্রয়ে লালিত এবং অভিব্যক্ত বা যতটা ভাববাদী উদাসীনতায় শরৎ-শিল্প-চেতনা সমাধান অন্বেষায় ব্যাপৃত, ততটা সংগ্রামী চেতনানিষ্ঠ ভূমিকা পালনে তৎপর নয়। দুঃখের ছবি এঁকে তিনি যতটা অন্যের কান্নাকে আকর্ষণ করেছেন, অত্যাচার উৎপীড়ন আর সমাজের কুটিল বীভৎসার বিরুদ্ধে যুগযুগ সঞ্চিত বিক্ষোভকে জাগিয়ে তোলার দায়িত্বকে ততটাই এড়িয়ে গিয়ে ঔদাসীন্যের পরিচয় দিয়েছেন। এমনকি 'মহেশ' গল্পের গফুর মিঞাকেও আল্লাহ্ নির্ভর করে হাঁটু মুড়িয়ে বসিয়ে দিয়েছেন। অথচ সে সময়ে জাতীয় মুক্তির আন্দোলনও মোটামুটি একটা অবয়ব পেয়েছিলো এবং শোষিত শ্রেণী বিশ্বে একটা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছে বলে খবর এদেশে পৌঁছেও গিয়েছিলো।

বলাবাহুল্য, সুনীতি-দুর্নীতি শ্লীল-অশ্লীল প্রসঙ্গ নিয়ে সমাজের পিত্তল বিগ্রহদের মধ্যে চুলচেরা বিচার শুরু হলেও, এ ব্যাপারে কোনো সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত সেদিনও নেওয়া সম্ভব হয়নি—আজও ব্যাপারটা ধোঁয়াই থেকে গেছে। বস্তুত শ্লীলতা-অশ্লীলতা ব্যাপারটাই আপেক্ষিক। আদালতে মেয়েছেলের শ্লীলতা-হানির জন্যে বিচারপতি রাষ্ট্রীয় বিধিমাফিক সওয়াল করে এক ধরণের শাস্তিমূলক রায় দিতে পারলেও, সাহিত্য সম্পর্কে সে রকম রায় দেবার চেষ্টা চিরকালই

ব্যর্থতার নামান্তর হয়ে থেকেছে। রুচি সংস্কার বদলানোর সঙ্গে সঙ্গেই অশ্লীল আখ্যাত বইগুলো পাঠক সমাজে ছাড় পেয়ে গেছে। তবু অশ্লীলতায় বিব্রত পণ্ডিত সমালোচকরা আন্তর্জাতিক সম্মেলন করেছেন, কিন্তু শেষ অব্দি কোনো সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত দিতে পারেন নি। সেদিন শরৎচন্দ্র সম্পর্কেও পাত্রাধার তৈল না তৈলাধার পাত্র করে পণ্ডিত-সমাজ এক ধরণের বিশ্রাম পোহালেও যখনই সুযোগ পেয়েছে ফুঁসে উঠেছে; আর অশ্লীলতার অজুহাতে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আমলের ইংরেজী আইন দিয়ে ১৯৬৫—'৬৭-র কলকাতার আদালত মলয় রায়চৌধুরীর 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' নামের কাব্যগ্রন্থ এবং সমরেশ বসুর 'বিবর'-এর ডিউপার্ট 'প্রজাপতি'কে অভিযুক্ত করেছে এবং আরো পরে বুদ্ধদেব বসুর বইকেও কাঠগড়ায় তুলেছে। কিন্তু বই যা বিক্রীর তা বিক্রী হয়ে গেছেই। এ সম্পর্কে অন্যত্র আলোচনা করা যাবে। মোট কথা, শরৎচন্দ্র খুব কিছু বড় আবিষ্কারক না হলেও সমাজে বেশ বড় রকমই একটা আলোড়ন যে তুলেছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, 'কল্লোল' 'প্রগতি' কালের তরুণ লেখকরা শরৎচন্দ্রের ভাগ্যকে ঈর্ষা করে নতুন বাঁক নেবার সাহিত্য আন্দোলনকে কানাগলিতে ঠেলে না দিয়ে অত্যন্ত সঠিক ভাবেই তাঁদের সাবালকত্ব অর্জনের মূল বাধাকে চিনতে পেরেছিলেন।

'কল্লোল' 'প্রগতি' কালের লেখকদের দাবী সাবালকত্ব—প্রতিবন্ধক রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথকে বর্জন নয় পরিগ্রহণের সমস্যাতেই তরুণ লেখকরা জর্জরিত। তাঁরা রবীন্দ্র-অন্য আধুনিক সাহিত্য করার জন্যে মূল উপাদান হিসেবে বেছে নিলেন ফ্রয়েডকে, পরে তার সঙ্গে যুক্ত হোলো মার্কসবাদ। প্রথম দিকে অস্বীকারের প্রখর প্রবণতায় বাস্তবতা সৃষ্টির ঝোঁক প্রবল হয়ে দেখা দিলো। এসেছিলো যৌনতার প্রাবল্য। এদিক থেকে প্রেমেন্দ্র মিত্রর 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে', অচিন্ত্য সেনগুপ্তর 'প্রাচীর প্রান্তর' এবং বুদ্ধদেব বসুর 'রজনী হলো উতলা' জোর আলোড়ন নিয়ে উপস্থিত হয়। এসব গ্রন্থের মধ্যে যুদ্ধজখম ইউরোপের ইন্দ্রিয় উচ্ছৃঙ্খলতা, সমাজ বিকৃতি এবং চিত্তবিপর্যস্তার সজ্ঞান অনুকরণ ও সদ্য যৌবনের নিষেধ ভাঙার আবেগ যুক্ত করে বাংলা সাহিত্যে চেপে বসা ব্রাহ্ম রুচি সংস্কারকে চ্যালেঞ্জ জানালেন লেখকরা। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত ও বুদ্ধদেব বসু তাঁদের কাব্যাত্মক গদ্যে নরনারীদেহের কামানল-জ্বলা কোজাগরী বোধে সুপ্ত অন্ধকার থেকে পাঠকের শরীরী যৌনতাকে হিচড়ে বের করে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। বুদ্ধদেব বসুর নগ্ন আক্রমণীয় নিশীথ বোধ শেষ পর্যন্ত হাহাকার করেছে এবং তা নতুন যুগের

তরুণ লেখক কবিদের চিন্তার সংকট ও অসহায়তারই নান্দীমুখ রচনা করেছে। বুদ্ধদেব বসুর ভাষার একটা মোহনীয় রূপ আছে। যার ফলে, রগরগে যৌনতাও তিনি এক অস্বাভাবিক সৌন্দর্য মাখিয়ে তাঁর উপন্যাসগুলোতে ছেপে দিয়েছেন। যৌন নিয়ে যা কিছু গোপনীয়তা ও শুচিবাই তাকে তছনচ করে তিনি অবলীলায় জীবনকে একেবারেই যৌনসর্বস্ব করে তুলেছেন। তবে একটা পাপ বোধ তাঁকে এ ব্যাপারে আক্রমণ করে শেষ অব্দি জর্জরিত করেছে। বুদ্ধদেব বসু রজনী থেকে—সম্ভোগের সমাপ্তিহীন তৃষ্ণা থেকে—কোনো দিনই উদ্ধার পান নি এবং তৃষ্ণার জল খুঁজতে খুঁজতে মানুষের পাতাল খনন করে নিজেই আপন id-এ তলিয়ে গেছেন আর জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে রচনা করেছেন 'পাতাল থেকে আলাপ' 'রাত ভরে বৃষ্টি' ইত্যাদি—বেআব্রু যৌনলীলার কুচ্ছিৎ আর্তনাদ। বুদ্ধদেব বসু তাঁর সাহিত্যের উপজীব্য করে নিয়েছেন হাল আমলের সম্পন্ন সমাজের বিশেষ একাংশের দায়দায়িত্বহীন জীবনচর্যা। গোটা দেশ এবং দেশের মানুষ তাঁর সামনে নেই। তাই অবলীলায় পুঁজিবাদী এস্টাব্লিশমেন্টের স্বার্থে স্বেচ্ছাকৃত ভাবে বিশ্বাসঘাতকতার 'নিব' শানিয়েছেন এবং তরুণ সম্প্রদায়কে নীলরক্তের জয়গান করার জন্যে আকর্ষণ করেছেন। তাঁর শিল্পভাবনা কোনো-দিনই মার্কসীয় দর্শন থেকে শক্তি সংগ্রহ করে নি। ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনে শিল্প চেতনাকে আস্থাশীল রেখে ক্রমাগত যৌন উচ্ছলতার দিকে ভ্রান্ত যাত্রায় অভিশপ্ত আত্মার বিলাপ গাথাই রচনা করেছেন তিনি। পরিণামে জনশক্তির সক্রিয় ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন সত্তার সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব অর্থমূল্যে বিক্রী .।

অচিন্ত্য সেনগুপ্তর দৃষ্টি বাস্তব জীবনের কুৎসিত, বীভৎস, দারিদ্র্যজর্জর, ক্ষুৎকাতর, পাপপঙ্কিল দিকগুলোতে প্রসারিত হয়েছে। দারিদ্র্য আর সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁর তিক্ত আশাশূন্য বিক্ষোভ বিরূপতা একটা বাহ্যাড়ম্বরের ফাঁপা স্বরূপ উদঘাটন করেছে। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত তাঁর 'কাঠ খড় কেরোসিন' এবং অন্যান্য গ্রন্থে মফঃস্বল বাঙলার দারিদ্র্যক্লিষ্ট কুৎসিত, বীভৎস এবং পাপদষ্ট জীবনের দিকটি আলোকে নিয়ে এসে এক সময় পাঠকের খুবই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। যৌনতাও তাঁর লেখালেখিতে অনর্থক উত্তেজনার বাড়াবাড়িতে পর্যবসিত হয়ে তাঁর দিকভ্রম ঘটিয়েছে। পরবর্তী সময়ে তিনিও পাপবোধ তাড়িত হয়ে ধর্মে·আশ্রয় খুঁজেছেন। গল্পের সম্মোহনী শক্তিতে একের পর এক অবতার-চরিত রচনা করেই তিনি সম্ভবত পরবর্তী কালে আত্ম-চরিতার্থ থাকতে চেয়েছেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র অচিন্ত্য সেনগুপ্ত ও বুদ্ধদেব বসুর সমসাময়িক হলেও গল্পের ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত বুদ্ধদেব বসু মূলে কবি—গল্পের শরীরেও তাঁরা তাঁদের কবিত্ব শক্তির পরিচয় চাপিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্র কবি হিসেবে কবিতাই রচনা করেন আর গল্প যখন লেখেন তা গল্পই—গল্পশরীরে কল্পনা পেলবতা দিয়ে তাকে কবিতাকল্প করে তুলতে তিনি নারাজ। এখানে তিনি বুদ্ধি ও যুক্তির তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে জীবনরহস্য উদঘাটনেই সক্রিয়। 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে'র মধ্যে যন্ত্রকল্প যৌনচর্যার বীভৎসাকে খুবই নিরাসক্ত ভাবে সংযত কলমে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। নৈতিক আদর্শ আরোপ করে চরিত্রকে ক্ষুণ্ণ করতে যেমন চান নি, তেমনি অযথা আব্রু টানতেও চেষ্টা করেন নি। এই বে-আব্রু সৌন্দর্যই সে সময়ে তুমুল আলোচনার বস্তু হয়ে উঠেছিলো। প্রেমের জগতে প্রেমেন্দ্র মিত্র নগ্ন বিকৃতি, বিকারহীন উদাসীনতা, আঘাত প্রত্যাঘাতের দুর্বোধ্য বাসনা ও চরিত্রের নিজের ওপর প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছাকেই প্রকাশ করেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রর গল্পের মধ্যে একটা সাংকেতিকতার ছোঁয়া তাঁর ভাষাকে গতিশীল করে তুলেছে। ছোট গল্পে বিচিত্র বিষয় উদ্ভাবন করে বিশ্লেষণের দক্ষতায় ও সূক্ষ্মতায় সেগুলোকে অনেকখানি রসোত্তীর্ণ করতে পেরেছেন। কেরাণী জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়েই প্রেমেন্দ্র মিত্রর ভাবনা চিন্তা অনেকটা ঘুরপাক খেয়েছে।

যৌনকে সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টার নিয়ন্তা হিসেবে জেনে এই যে আধুনিকতার দ্বিতীয় তরঙ্গ, তা ক্রমশ শোষণমুক্ত সমাজচিন্তা, জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন ও সামাজিক ভাঙাগড়ার বিভিন্নমুখী টানে খানিকটা আড়াল হয়ে পড়লেও লেখকদের অন্যতম উৎসাহের বিষয় হিসেবে থেকেই যায়। রাজনৈতিক আবহাওয়ার জন্যে এ সময়ে দেশে যে পরাজিত মনোভঙ্গী দেখা দিয়েছিলো তা যেমন সাহিত্যে গভীর রেখাপাত করেছিলো, তা থেকে উত্তরণের যে চেষ্টা হয়েছে তাও সাহিত্যে ছায়া ফেলেছে। ভারতের মাটিতে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা ধনতন্ত্রের সঙ্গে ক্ষয়িষ্ণু জমিদারতন্ত্রের বিরোধ এ সময়ের সাহিত্যকে যেমন প্রভাবিত করেছে, তেমনি সমাজতান্ত্রিক মতবাদের প্রভাবে সাহিত্যিকদের আগ্রহ বাড়িয়ে দিয়েছে নীচু-তলার অন্ধকারে পড়ে থাকা শোষণে শাসনে নিষ্পেষণে এতকালের সাহিত্যে অবাঞ্ছিত মানুষ সম্পর্কে। শিল্পী চেতনা গাঁ-গেরাম বস্তী মানুষের দিকে এমন ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলো যে তা একরকম ছোঁয়াচে হয়ে দেখা দিয়েছিলো লেখক-কবির মধ্যে। এদিক থেকে স্মরণীয় ভূমিকা সর্বপ্রথম পালন করেছেন শৈলজানন্দ

মুখোপাধ্যায় তাঁর 'কয়লা কুঠী'তে। এই সঙ্গেই লেখকদের আঞ্চলিকতার প্রতি ঝোঁকও বেড়ে যায়। তবে, শ্রমিক-কৃষক মধ্যবিত্ত মানুষ সম্পর্কে এবং শ্রমিক বিপ্লব সম্পর্কে সেদিনের লেখকদের যে উৎসাহ তা বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের স্বরূপ ও শক্তিকে উপলব্ধি করে অবশ্যই আসে নি। তাঁদের জানা ছিলো না 'সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লব' কথাটার তাৎপর্য। ফলে, আবেগ তাড়িত হয়ে শ্রমিক-কৃষক নিয়ে সাহিত্য করলেও তাদের জমির সমস্যা ও তাবৎ সম্পত্তির মালিক হওয়ার প্রশ্নটা প্রায় সব লেখকের লেখাতেই অনুপস্থিত। সাহিত্যে তাই অনেক কিছু ভীড় করে এলেও যৌন সমস্যাই প্রধান হয়ে রইলো। যৌন নিয়ে বাড়াবাড়িও যেমন আছে, তেমনি আছে আবার দেহ সম্পর্কে কারুর কারুর উৎকট শুচিবাই-গ্রস্ততা ও সংকীর্ণতা; ভূগোল বাড়িয়ে সাহিত্যের ক্ষেত্র বিস্তৃতির চেষ্টা যেমন আছে, তেমনি আছে ইতিহাস অনুসন্ধান; বর্তমান সভ্যতার গ্লানি ও ক্লেদ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা যেমন আছে, তেমনি মানুষের আন্তর প্রকৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ তল্লাস ও অস্থিরতা আবিষ্কার করার প্রয়াস; আছে তেজ এবং পরিণামে ধন-তান্ত্রিক সভ্যতার মারের কাছে নতি স্বীকার। অনমনীয় মেরুদণ্ডও যে একেবারেই নেই তা নয়, এ সময়ের সাহিত্যে যার অভাব তা হচ্ছে চিন্তার সমগ্রতার। করগুণতি দু একজনই যা ব্যতিক্রম।

স্বাধীনতা-পরবর্তী তরুণ সাহিত্যিকদের কাছে বড় লেখক মানিক বন্দ্যো-পাধ্যায়। জীবন্ত মানুষ নিয়ে প্রতিনিয়ত যেন আপন ল্যাবরেটরিতে গবেষণা চালিয়ে রক্ত মাংস চর্বির মধ্যে থেকে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন অস্তিত্বের আলোক। আমরা দেখেছি, কালের দুর্নিবার টানে সাধারণ মানুষ সাহিত্যে নিজেদের শক্তিমূর্তি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। মার্কসীয় দর্শনে কর্ষিত মেধায় প্রতিফলিত মানবিক সমস্যা সমাধানের জন্যে শিল্পী সত্তা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সর্বক্ষণের কর্মী করে তুলেছিলো। তিনি মানুষের মধ্যে থেকে এমন সব উদ্ভট সমস্যা খুঁজে বের করেছিলেন যে, একদা পাঠকের মনে হয়েছিলো, জীবন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে একটা সংকেত ছাড়া কিছুই নয়, আর জীবন বিন্যাসে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন নির্ভেজাল রূপকের। বস্তুত, তিনি গাণিতিক নিয়মে নির্মম নিরাসক্ত থেকে এক একটা উদ্ভট অজানিত সমস্যা আবিষ্কার করে নিয়েছেন এবং তাকে বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে চারদিক থেকে তন্নতন্ন করে দেখে জানতে চেয়েছেন মানুষ কি চায়—মানুষের সার্থকতা কিসে। এ জন্যেই অ্যাব-ষ্ট্রাক্টের সংগে রক্তমাংস মেলানোর গবেষণা শুরু হয়েছিলো তাঁর, আর ফলশ্রুতি

হিসেবে দেখা দিয়েছে 'দিবারাত্রির কাব্য'। অ্যাবস্ট্রাক্ট অনেকখানিই স্থান দখল করে নিয়েছে মানিক-সাহিত্যের।

পারিপার্শ্বিকের বাস্তবভূমিকে সার্থক ভাবেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসে গল্পে ব্যবহার করেছেন। দেখেছেন প্রেমের নানা বৈচিত্র্য ও বিচিত্র তার সমস্যা। মগ্নচৈতন্যের বিভীষিকা ও নৃশংসতা, নরনারীর জীবন-মৃত্যু, ঈর্ষা-হিংসা-দ্বেষ, বিভিন্ন বয়ঃগোষ্ঠির মধ্যে দ্বন্দ্ব। এগুলোর চুলচেরা বিশ্লেষণ করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে, মানুষের বেঁচে থাকার আর্তিটাই আদিম; এবং বহু বীভৎসা ও বিপর্যয়ের মধ্যে থেকে যা ফুটে ওঠে তা বেঁচে থাকারই চেহারা। পল্লী জীবনযাত্রা, গ্রাম্য কুসংস্কার এবং বিষাক্ত আবহাওয়াকে প্রকাশ্যে তুলে এনে নির্মম আঘাত হেনেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এ ব্যাপারে শরৎচন্দ্রের মতো তাঁর মনে কোনো দ্বিধা ছিলো না—ছিলো বৈজ্ঞানিকের নির্মমতা। মানুষের মন অন্বেষণের ফলশ্রুতি কখনো কখনো তাঁকে হতাশ করলেও অস্তিত্বরোধকারী শক্ত সামাজিক আদর্শগুলোর ওপর আঘাত হেনে কী এক বিশ্বাসে মানুষের স্বপ্নসম্ভাব্যতার পথ উন্মুক্ত করতে চেয়েছেন তিনি।

ঘটনা মানিক-সাহিত্যের চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে নি। এখানে তিনি মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণে চরিত্র ফুটিয়ে তোলার জন্যে ঘটনাগুলোকে লক্ষণ বা সিম্পটম হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কোথাও তিনি অপরিচিত পরিবেশ রচনা করে বা অপরিচিত উপকরণ দিয়ে বিস্ময়রস সৃষ্টি করতে চান নি, জীবনের স্বাদ দিতে—নতুনত্ব দেবার জন্যে—পরিচিত পরিবেশকেই শিল্প করে তুলেছেন। অথচ এ পর্বের আধুনিক লেখকরা অপরিচিত বিষয়, শব্দ, চিত্র ইত্যাদি দিয়ে অজানিত পরিবেশ আমদানী করে পাঠককে বিস্ময়রসে অবসিত করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন এবং তাকে আধুনিকতার লক্ষণ হিসেবে চালাতে চেয়েছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠকের দৃষ্টি সত্যতেই নিবদ্ধ করাতে চেয়েছিলেন আর সে জন্যে এক অপরূপ তন্ময়তায় জীবনকে জীবন্ত করে চিত্রিত করেছিলেন। জীবন নিয়ে পরীক্ষারও তাঁর অন্ত নেই। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন সমস্যায় মানুষকে স্থাপন করে আবিষ্কারের তাগিদ থেকেই বাংলাসাহিত্যে তিনি দুর্মর লেখক হয়ে উঠেছেন—এক দিকে যেমন তাঁর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা, তেমনি তাঁর স্বভাবে ছোপ ফেলেছিলো একটা আশ্চর্য তান্ত্রিকতা। 'জননী' থেকে পুরোনো আঙ্গিক পদ্ধতিকে অবলম্বন করে সাহিত্যিক যাত্রা শুরু করে তাঁর ক্রম-উত্তরণের পথে যৌন জ্বালার তুলকালাম

বিকৃতি দেখে যেমন 'চতুষ্কোণ' রচনা করেছেন, তেমনি 'অহিংসা'য় ধর্মস্থান ও ধর্মীয় ভণ্ডামিকেও প্রকট করে উপস্থিত করেছেন।

'পদ্মানদীর মাঝি' পর্বেই মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্প জিজ্ঞাসা মূর্ত্তি পেয়েছে। আঞ্চলিকতাকে অক্ষুন্ন রেখে বাস্তবের মৌল সত্য উদ্ধার করে বিশ্ব প্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির স্বরূপ প্রকাশ করতে চেয়েছেন তিনি। নরনারীর যৌন সমস্যাই রক্তমাংস অস্তিত্বের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য থেকে অজস্র আবর্ত সৃষ্টি করে এবং ইচ্ছাশক্তিকে পরিচালিত করে—ফ্রয়েডীয় জ্বালানী ভাণ্ড থেকে এই তত্ত্ব গ্রহণ করে তিনি যেমন জীবনের প্রেম ভালোবাসার দিকটিকে সাহিত্যে শরীরী করে তুলেছেন, তেমনি সমাজবাদী বাস্তবতার দর্শনের আলোকে মানবিক বীর্যের খনি হিসেবে পেয়েছেন গণশক্তিকে। কালের সেই দুর্মর মানুষই এসে উপস্থিত হয়েছে 'পদ্মানদীর মাঝি', 'পুতুল নাচের ইতিকথা' প্রভৃতি গ্রন্থে এবং লেখককে শক্তি জুগিয়েছে। শুধু উপন্যাস নয়, ছোটগল্পেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অসামান্য শক্তির পরিচয় দিয়ে জলা-নদী গ্রাম কল-কারখানা-বস্তির মানুষ, যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ, প্রেম-জিঘাংসা, ভণ্ডামী-সততা, মিছিল-ময়দান, সংগীত আর অনুভূতির এক একটি মীড় গভীর ও ঘন রঙের সরু মোটা তুলির টানে চিত্রিত করেছেন। এখানে 'প্রাগৈতিহাসিক' যে ভয়ঙ্কর জীবন-তৃষ্ণা, চিত্রময়তা ও দুর্বারত্ব নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, সেই নিশ্চিত শিল্পবিশ্বাস নিয়েই আত্মপ্রকাশ করেছে তাঁর ছোটগল্পগুলো—সৃষ্টি হয়েছে 'নেকী' 'ছোটবকুলপুরের যাত্রী'। তবে শেষ পর্যন্ত মানিকবাবু মানুষকে একেবারেই তত্ত্বে পরিণত করে ফেলে[illegible]—যেন তার রক্ত মাংস হাড় কিছুই নেই, আছে শুধু একটা দুর্বোধ্য বোধ যা খুঁজে খুঁজে আত্মখনন করে নিঃশেষ হয়ে গেছেন নিজেই—অলিখিত রয়ে গেছে তাঁর ধ্যানজব্দ উপন্যাস।

সাহিত্যে এখন খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ এসে উপস্থিত হয়েছে আর মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই শক্ত সমর্থ হাতে—নতুন কালের এই মৌলিক শক্তিকে সুস্পষ্ট ভাবে বুঝতে এবং চিনতে পেরে যোগ্য মর্যাদা দিয়ে নিয়ে এসেছেন। বাস্তব রাজনীতিতে সাধারণ মানুষ তাঁর সময়েই সরাসরি অংশ গ্রহণ করতে সুরু করেছিলো। মাণিক বাবু তাদের উত্থান ভঙ্গী অনুভব করেও মার্কসীয় তত্ত্বের প্রয়োগ সমস্যাতেই বুঝি জর্জরিত হয়ে পরিণামে একটা 'নেতি' বোধে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং তার ছোপ ধরেছিলো তাঁর 'সোনার চেয়ে দামী', 'চিহ্ন' প্রভৃতি উপন্যাসে। 'অস্থি'তে যদিও এই নেতিবাদী মনোভাব খানিকটা কাটিয়ে

উঠেছিলেন, তবু তা রূপায়িত হতে পারে নি। এখানেই বলে নেওয়া প্রয়োজন, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর উত্তরসূরী সাহিত্যিকরা বড় লেখক মনে করলেও, আজ পর্যন্ত তিনি যেখানে থেমে গেছেন সেখান থেকে সাহিত্যকর্ম শুরু করেন নি কেউ। যদিও 'ষ্টাডি' হয়েছে। আধুনিক জীবন ও জগতের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠেছেন লেখক : 'কিসের ক্লেদ! একমুঠো স্বপ্ন কি বমি করেছে? বলো'। স্পষ্ট দেখেছিলেন 'মা ও তার সন্তান! 'র‍্যাফায়ালের মাদোনা স্থ মিস্তিন নয়, গোগ্যাঁর তাহিতি মেয়ে নয়, পিকাসোর মাষ্টারপিসও নয়। বাজির দলের সঙ্গিনী।' আত্ম আলোড়ন উঠেছিলো 'মুখের ক্যানভাসে কটা রং এখন? কি কি কম্বিনেশন? অসহায়ত্ব, বিড়ম্বনা, লজ্জা, ক্ষোভ, ঘৃণা, বেদনা? না, না। সব মিলিয়ে একটা ঘোষণা—যন্ত্রণা'—আর এই 'ষ্টাডি'তেই ফুটে উঠেছিলো শিল্পী সত্তার আর্তি—'যন্ত্রণাকে রূপ দিতে চাই। বুঝেছি নতুন রং সৃষ্টি করতে হবে। যন্ত্রণার রং যন্ত্রণার মতো। তাই আমি খুঁজছি। কারণ, ছবি আমাকে আঁকতেই হবে।'*

মানিকবাবুর সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সর্বত্রই একটা প্রকৃতি তন্ময়তা বিভূতিভূষণকে সাহিত্যিক প্রেরণা জুগিয়েছে—প্রকৃতি প্রেমই স্ফূর্তি এনেছে তাঁর মধ্যে। প্রকৃতিকে একটা জীবন্ত সত্তা হিসেবেই তিনি বাংলা সাহিত্যে চিত্রিত করেছেন। পল্লী, বনবাদাড়, এঁদোপুকুর, ঘাসফুল আর গ্রামীণ মধ্যবিত্ত জীবনের সাদামাটা লেপা-ছোপা কাহিনী এঁকে বাংলা সাহিত্যে একটা আরণ্যক শান্তি ও মরমী পেলবতার আবহাওয়া বইয়ে দিয়েছেন। উত্তেজনা নেই, মানস সংঘাত নেই, দুঃখ দারিদ্র্য শোক আর বুক মোচড়ানো কান্নার অনাবিল প্রকাশ নিরিবিলি ভাষায় ব্যক্ত করে একটা রোমান্টিক মনোভঙ্গীকে পরম আস্বাদ্য করে তুলেছেন তিনি। কোথাও কোথাও তা একেবারে মিষ্টিক এ্যাটিচিউডই প্রকাশ করেছে। 'পথের পাঁচালী' 'আরণ্যক' 'তৃণাঙ্কুর' পড়ার পরে মনে হয়, যদি পারতেন, বিভূতিভূষণ সম্ভবতঃ মানুষকে বাদ দিয়েই তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিকে মনুষ্যগন্ধহীন সৌন্দর্যের জগৎ সৃষ্টিতে পর্যবসিত করতেন। তাঁর মনে ঠিক এই সময়েই কেন যে এসে গিয়েছিলো 'হায় দেবদারু, মানুষ নিকটে গেলে প্রকৃত সারস উড়ে যায়' ধরণের একটা বোধ, তা বোঝা দুষ্কর। কেননা, তাঁর সময়ে মানুষ সম্পর্কে সাম্প্রতিকতম কালের কবি বিনয় মজুমদারের যে বোধ, তেমন কোনো বোধ গড়ে ওঠার মতো পরিস্থিতি দেখা

*ষ্টাডি—দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দেয় নি বলেই বিশ্বাস। মানুষ তখন সবে মাত্র এ দেশে রক্তমাংস বোধ নিয়ে বাস্তবে ও সাহিত্যে ক্রিয়াশীল হতে শুরু করেছিলো এবং মানুষ সম্পর্কে আবিষ্কার তথনো কোনো স্পষ্ট আদল পেয়ে যায় নি। অথচ বিভূতিভূষণ বয়স্ক মানুষকে প্রায় এড়িয়েই গেলেন, এটা অস্বাভাবিক লাগে। প্রকৃতির প্রাণ স্পন্দন উপলব্ধি করার জন্যেই তিনি সম্ভবত বালক বালিকা বা শিশু সারল্যের দু একটি চরিত্রকে মুখ্য না করে পারেন নি। মানুষের জটিল অন্তর্জীবনে প্রবেশের অনিচ্ছা তাঁকে মানুষিক সমস্যা উদঘাটনের প্রয়াস থেকে নিবৃত্ত করেছে। এ যুগের জটিল জীবনযাত্রার রূপ ও স্বরূপ সম্পর্কে বিভূতিভূষণের একটা উদাসীন উপেক্ষাই অব্যক্ত ভাষায় তাঁর লেখালেখি থেকে অনুভব করা যায়।

বিভূতিভূষণের প্রকৃতির সৌন্দর্য ও লীলা বর্ণনার ভাষা ও বাচনভঙ্গী অনবদ্য। তিনি প্রকৃতির গদ্য ভাষ্যকার। প্রকৃতির অব্যক্ত বেদনা ও আনন্দ, গভীরতা এবং ঔদার্য তিনি এমন চিত্র-সংগীতময় করে উপস্থিত করেছেন যে তা পাঠকের মনে একটা দীর্ঘস্থায়ী ছোপ ধরিয়ে দিয়ে যায়। বহু ক্ষেত্রেই তিনি বিস্ময় রসের উপাদান দিয়ে পাঠককে মজিয়ে রাখেন। গ্রামের মানুষ ও তার পরিবেশ, শহর পরিবেশ ও শহর মানুষ—এ দুয়ের মধ্যে তাঁর অবাধ বিচরণ শক্তির অভাবই লক্ষ্য করা গেছে। অপুকে শহরে এনে কিছুতেই যেমন খাপ খাওয়াতে পারেন নি তেমনি 'আরণ্যক' উপন্যাসের প্রেম সম্পর্কটা নায়ক নায়িকার মধ্যে দূর-দূরের সম্পর্কই হয়ে থেকেছে। ভানুমতী ও শহুরে যুবকের প্রেমে একটা ফাঁক সহজেই লক্ষ্যনীয়। তবে বিভূতিভূষণের প্রকৃতি তন্ময়তা শহরবাসী পাঠকে এক আশ্চর্য স্বাদ উপহার দিয়েছে। সাম্প্রতিক কালে, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'কুয়োতলা'য় এই প্রকৃতি-মমত্বর আংশিক অনুসরণ দেখা যায়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রেরই উত্তরসাধক। ঐতিহ্যের প্রতি সশ্রদ্ধ থেকেও আধুনিক যুগপিপাসাকে স্বীকৃতি জানিয়েই তিনি মানবতার জয়গান করেছেন। আধুনিক সময় সম্পর্কে সচেতন হয়েও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় কখনোই যুগের তামসিকতায় জড়িয়ে পড়েন নি—ক্লান্ত বা হতাশাগ্রস্তও হন নি প্রায় কখনোই। রাঢ়ের প্রকৃতিকে আত্মসাৎ করে একটা সজীব আঞ্চলিকতাকে সাহিত্যে নিয়ে এসে ; বাঙলা দেশের বাউল বৈরাগী কবিয়াল ঝুমুর দলের লোক-জন, কাহার বাগদী বেদে ডোম সাঁওতাল প্রভৃতি সিডিউল্ড কাস্ট ও সিডিউল্ড ট্রাইবের মানুষ,কৃষক শ্রমিক নিম্ন ও উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর অজস্ররকম চরিত্র ও তাদের আচার ব্যবহার সমস্যা চিত্রিত করে ; বিভিন্ন শ্রেণীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট,

ও জীবনযাপনের তাজা স্রোত বইয়ে দিয়ে ; হতাশা পাপ হিংসা কান্না বিকৃত যৌনার্তি প্রেমভালোবাসার পবিত্রতা এবং প্রকৃতি ও রোগের সঙ্গে লড়িয়ে মানুষের বিপন্নতাকে জাতীয়তাবাদী লেখক সুগভীর সমবেদনায় দক্ষতার সঙ্গে 'কবি' 'ধাত্রীদেবতা' 'গণদেবতা' 'পঞ্চগ্রাম', 'কালিন্দী' প্রভৃতি উপন্যাসে এবং তাঁর ছোট-গল্পগুলোতে উপস্থিত করেছেন। এ সব উপন্যাসে গল্পে তিনি যেমন সংগ্রামী সত্তার দ্যোতনা দিয়েছেন, তেমনি 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'কে করে তুলেছেন চলমান জীবনের কাব্য। আবার, আধুনিকতাকে তারাশঙ্কর স্বীকার করে নিয়েও একদিকে যেমন ভারতে গুজরাটি বেনিয়াদের কৃপায় গড়ে ওঠা ধনতন্ত্রকে মেনে নিতে না পেরে এবং কলকারখানা গড়ে ওঠাকে প্রীতির চোখে দেখতে না পেরে স্নেহ-দয়ামায়াসহ শোষণে-দক্ষ সংগ্রামে-অপটু সামন্ত প্রভুদের অর্থাৎ ক্ষয়িষ্ণু জমিদার-তন্ত্রকেই সহৃদয় অভ্যর্থনা জানিয়েছেন নিপীড়িত জনগণের কল্যাণ সাধনের জন্যে, তেমনি তিনি মার্কসের কমিউনিষ্ট ম্যানিফেস্টোকে অভিনন্দন না জানিয়ে গান্ধীবাদকেই জনগণের ক্রমমুক্তি ও উত্তরণের পথ বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছেন। ফলে, জ্ঞানে বিজ্ঞানে চেতনায় আধুনিক সভ্যতার বিকাশকে পাশ কাটিয়ে না গিয়েও তার কল্যাণসৃজন ক্ষমতা সম্পর্কে দ্বিধান্বিত হয়েছেন। পরিণামে যে দ্বন্দ্ব তাঁর মধ্যে দেখা দিয়েছে, যে পরস্পরবিরোধী টানা পোড়েন অনুভব করেছেন তা থেকে যেমন তীব্র আধুনিকতার স্বরূপ নিয়ে জন্ম নিয়েছে 'সপ্তপদী' 'আগুন'-এর মতো লেখা, তেমনি 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' 'হাঁসুলী-বাঁকের উপকথা'র মতো রূপকথার জগৎ আর চিকিৎসা বিজ্ঞানে যুগান্তকারী সব আবিষ্কারের দিনে 'আরোগ্য নিকেতন'-এর মতো কবিরাজী চিকিৎসার জয়গাথা।

তবে, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পচেতনার পরীক্ষা নিরীক্ষা সুদূর ব্যাপ্ত। চরিত্রসৃষ্টিতে তাঁর যাদুকরের হাত। পাদ্রী পুরোহিত থেকে শুরু করে ডাকাত, খুনী, বেশ্যা, বোষ্টমী, রাজনৈতিক দলনেতা, লম্পট, ভিখিরী, সামন্তপ্রভু, ভূমিদাস, কলমালিক, মজুর, গেরস্ত বৌ, বেদেনী, নিষ্ঠুর বিচারক আর দাগী আসামী প্রভৃতি বিচিত্র নরনারী তারাশঙ্করের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও শিল্পবোধে নিখুঁত-ভাবে রূপায়িত হয়েছে। যুগের বিষ তিনি পান করেছেন, সমাজ সভ্যতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁর শিল্পীসত্তার ঐশ্বর্য্য। ফলে, নিয়ত আবিষ্ক্রিয়ার ফল-শ্রুতিতে স্বভাবতই তিনি সময় মানুষকে অস্থির আধুনিক কাল থেকে ফলবান ভবিষ্যতের দিকে পথ দেখাবেন এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু তারাশঙ্করের শিল্প-মানসিকতায় এমন একটা চঞ্চলতা ও তৎসহ প্রসন্নতা প্রশ্রয় পেয়ে গেছে যে,

আবিষ্কারকের ভূমিকা ত্যাগ করে তিনি এখন হয়ে পড়েছেন উদাসীন 'বিচারক'—জীবন ও বিশ্বপ্রকৃতির আবিষ্কর্তা নন, প্রতিষ্ঠিত সূত্রের গোলগাল ব্যাখ্যাতা। এই আত্মগত প্রসন্নতাই শিল্পীর বিপদ ডেকে এনেছে—তিনি হয়ে পড়েছেন বাস্তবোর্ধ জগতের ভাববাদী লেখক—যুগযন্ত্রণার প্রতি উদাসীন প্রসন্ন দৃষ্টি বুলিয়ে কাহিনী জাল বুনে চলেছেন সমানে। অথচ, সাম্প্রতিক যুগের জেহাদ প্রসন্নতার বিরুদ্ধেই—কেননা, "এই বাঙলায় ওড়ে রক্তমাখা নিউজপেপার বসন্তের দিনে।"*

আধুনিক সাহিত্য আন্দোলনের এ পর্ব থেকেই চিরাচরিত পরিবেশে দেশ নদী সমুদ্র পর্বত ছাড়াও নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধানের বিচিত্র সংস্কৃতির জীবনধারা সমূহ এসে পড়ায় সাহিত্যের সংগে যেমন ভূগোল ও ইতিহাসের ব্যাপক যোগাযোগ ঘটে এবং দেখা দেয় বিচিত্র সমস্যা ও তার সমাধানের প্রয়াস, তেমনি রচনারীতি ও আঙ্গিক নিয়ে অনুসন্ধিৎসু লেখকদের বিশদ পরীক্ষা নিরীক্ষার উৎসাহও বিচিত্র পথে এগিয়ে গিয়ে বাংলা সাহিত্যকে আধুনিক জীবনের উপযুক্ত মুকুরে পরিণত করতে চেয়েছে। এ সময়ে লেখকরা যেমন কাহিনী থেকে চরিত্র চিত্রণের ওপরই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন ও ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনীর গণ্ডী থেকে প্রেমকে মুক্ত করে নরনারীর মনের গভীর থেকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভবকে টেনে বের করে এনে প্রেমের প্রকৃতি উদ্ধার করতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন, তেমনি বিচিত্র অনুভূতি, সূক্ষ্ম চাহিদা, জটিলতা ও নানামুখী শক্তি সমস্যাময় আধুনিকতা প্রকাশের উপযুক্ত গদ্য আবিষ্কারে আত্মনিয়োগ করে ভাষাকে সময়োপযোগী করতে চেষ্টা করেছেন।

ষ্ট্রিম অব কনসাসনেস বা চৈতন্যস্রোত সাম্প্রতিক লেখালেখিতে যে বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছে এবং প্রায় সব লেখকই যাতে উৎসাহিত, তার উৎস এ পর্বেই। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'অন্তঃশীলা' গোপাল হালদারের 'একদা' 'অন্যদিন' 'পরের দিন' চৈতন্যস্রোত বা ষ্ট্রিম অব কনসাসনেস রীতির জগতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। স্বকীয় শক্তিতেই ধূর্জটিপ্রসাদ স্থায়ী প্রথার বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, মননের সূক্ষ্মতায় নরনারীর হৃদয়বোধকে প্রাণময় করে তুলেছেন। তাঁর রচনায় স্থান পেয়েছে শ্রমিক ধর্মঘট এবং সমসাময়িক রাজনৈতিক হাওয়া। বাস্তববাদী লেখকের প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনে যে বৈদগ্ধ্য এবং বাস্তবতার সম্মিলন, তারই পূর্ণ রূপায়ণ যেন গোপাল হালদারের লেখায়। তিন 'দিন'এর গ্রন্থে একটি মানুষের আমূল উপস্থিতি ঘটিয়ে বিপ্লবের

*শক্তি চট্টোপাধ্যায়

ভয়ঙ্কর প্রদাহ প্রখরতা বৈদগ্ধ্য দীপ্তি উন্মত্ততা বিক্ষোভ সংক্ষোভ অন্বিষ্ট-সন্ধানে একাগ্রতা বিফলতা আর্তনাদ নানা চিত্র-চরিত্র স্থির প্রাজ্ঞচিন্তায় একসঙ্গে বহমান রেখে তিনি উপন্যাসে ব্যাপ্তি ও গভীরতা দিয়েছেন। গোপাল হালদারের রচনার মূল কথা সমাজতান্ত্রিক চেতনাজাত মানবিকতা বোধ। তীব্র অন্তর্জ্বালায় আধুনিক জিজ্ঞাসাকে তিনি ক্ষিপ্র ভাবে পাঠকের বোধের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। গোপাল হালদারের বৈদগ্ধ্য অননুকরণীয় হলেও পরবর্তী কালের লেখার ওপর তাঁর প্রভাব কম নয়। সময়কে 'একদা ট্রেনে'তে কয়েক ঘণ্টায় সংক্ষিপ্ত করে এনেছেন অসীম রায় এবং গদ্যের জাত বজায় রেখেছেন দেবেশ রায়।

ষ্ট্রিম অব কনসাসনেস রীতিতে লেখালেখির ঝোঁক, শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্তর সম্মিলিত শক্তি উচ্ছ্বাস ও সমস্যা বিশ্লেষণের তীক্ষ্ণতা, হৃদয়ের বদলে মেধাকে লেখাতে বড় স্থান দেবার প্রয়াস, বৈজ্ঞানিকের অনুসন্ধিৎসা এ সময়ে বাংলা কথা সাহিত্যকে অন্যতর চরিত্র দিতে শুরু করেছে। এ নির্মাণ পর্বে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের মতো অনেকেরই নাম করা যায়, কিন্তু আমাদের প্রয়োজনের দিক থেকে কতকগুলো বিশিষ্ট সূত্রই মাত্র লক্ষ্যনীয়। আধুনিকতার মূল কণ্ঠস্বরকে যাঁরা ধরতে চেষ্টা করেছেন এবং পরবর্তী সময়ের ওপর যাঁদের কিছুমাত্র প্রভাব পরোক্ষেও এসেছে তাঁদের মধ্যে বনফুল (বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়) অন্যতম। একটা বৈজ্ঞানিক কৌতূহল নিয়ে চরিত্র উদঘাটনের জন্যে মনের অলিগলিতে তল্লাস চালিয়ে বনফুল মানুষের মৌলিক প্রকৃতি আবিষ্কারের চেষ্টা চালিয়েছেন নিরন্তর। এক একটা বিশেষ 'মুড'-এর ওপর ভিত্তি করে সাইকো-এ্যানালিসিসের মাধ্যমে নানা ঘটনা ও সমস্যা উদ্ভাবন করে তার সমাধান দেবার প্রয়াসেই নিয়োজিত হয়েছে বনফুলের শিল্প প্রেরণা। অনুবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার অতি-প্রবণতাই মানবিক দৃষ্টিতে মানবধর্ম তুলে ধরতে দেয় নি তাঁকে। বিজ্ঞানবিশ্বাসী লেখক শেষ পর্যন্ত ঐতিহ্যগত অধ্যাত্মসংস্কারে জড়িয়ে পড়েছেন। বনফুল একদিকে 'স্থাবর' জঙ্গম'এর মতো বিরাট-বিশাল সব গ্রন্থ রচনায় যেমন উৎসাহ পেয়েছেন তেমনি তাঁর শিল্পচেতনা পাঁচ-সাত বাক্যের মধ্যে এক একটি মুড-কে ধরে রাখতে সমান আগ্রহ পোষণ করেছে।

জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে আন্তর্জাতিক মানুষকে একমাত্র মনুষ্যত্বের বন্ধনে বেঁধে আপন স্বদেশ চেতনায় বাংলাসাহিত্যে উপস্থিত করে অন্নদাশঙ্কর রায় দেখাতে চাইলেন পরিবেশ-পটভূমির বা শিক্ষা-সংস্কৃতির পার্থক্য সত্ত্বেও মানুষে মানুষে আত্মীয়তার বন্ধনই একমাত্র আকাঙ্খিত। সমাজ সংসারের অকর্মন্যতা

ও ভীরুতার মর্মমূলে আঘাত করে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ এবং অত্যন্ত সিরিয়াস এ্যাটি-চিউডে মানবিক সমস্যা ও সংকটকে চিত্রিত করেছেন। পিছুটান ও ক্লীবত্ব অন্নদাশঙ্করের অসহ্য—মানবিক গুণগুলোর সঙ্গেই তাঁর অকৃত্রিম সমমর্মিত্ব। লঘু পরিহাসে ও করুণ রস সৃষ্টিতে অন্নদাশঙ্কর যেমন সিদ্ধহস্ত তেমনি চিন্তাশীল গূঢ় বিষয় ও ঘটনা উপস্থাপনেও। তাঁর সৌন্দর্য চেতনা ও মানবিকত্ব বোধ হরিহর আত্মার। 'আগুন নিয়ে খেলা' 'পুতুল নিয়ে খেলা' 'আমি অফিস ধরলুম' প্রভৃতি পরিহাস মুখর রচনার পাশাপাশি 'সত্যাসত্য'র মতো সংকটারূঢ় মানবত্মার স্থির লক্ষ্যে পৌঁছোনোর সমস্যা সংগ্রামকে চেতনার উচ্চগ্রামে বেঁধে উপস্থিত করতে সমান দক্ষতা দেখিয়েছেন অন্নদাশঙ্কর। জীবনদর্শনকে তিনি জগদ্দল পাথর বলে যেমন মনে করেন না তেমনি তাঁর সাহিত্য দর্শন, ভাষা এবং লেখার স্টাইলও পরিবর্তনশীল। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ও প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্রে' লালিত ও পুষ্ট হলেও অন্নদাশঙ্করের সভ্যতা-সচেতনা কিছুতেই তাঁকে 'প্রসন্নতা পিয়াসী ভিখারী' হতে দেয় নি। তিনি সভ্যতার সংকটে আলোড়িত ও বিপন্ন হয়েও দেখেছেন "..ছোট ছোট ডানাগুলিতে কি দুরন্ত দুঃসাহস আর তাদের ছোট ছোট প্রাণগুলোতে কী প্রখর প্রাণপিপাসা"। এ দুরন্ত দুঃসাহস আর প্রাণপিপাসা 'আটলান্টিক অভিযাত্রী' পাখীদের নয়—জীবনাভিযাত্রী মানুষকেই সত্যদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছেন অন্নদাশঙ্কর।

আন্তর্জাতিক বর্তমানকে সাহিত্যে ধরার যেমন সক্রিয় প্রয়াস দেখা গেছে এ সময়ের লেখকদের মধ্যে তেমনি অন্ধকার অতীতকেও আলোকে [illegible]নার চেষ্টা হয়েছে। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার সূত্রপাত রমেশচন্দ্র দত্ত বা বঙ্কিমচন্দ্র থেকেই। রবীন্দ্রনাথও রচনা করেছেন দূর ইতিহাস নিয়ে উপন্যাস। কিন্তু এ সময়ে অপেক্ষাকৃত নিকট ইতিহাস এবং স্বকপোল কল্পিত ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার চল দেখা দিলো। প্রমথনাথ বিশী বেশ কয়েকখানা এমনি ঐতিহাসিক উপন্যাসের সৃষ্টি করলেন। 'জোড়াদিঘীর চৌধুরী পরিবার' 'কেরী সাহেবের মুন্সী' 'লালকেল্লা'—এ গ্রন্থগুলো ইতিহাসের জাবদা খাতা বললেই চলে। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে নরনারীর দেহ ও মনের ক্ষুৎপিপাসা ও প্রবৃত্তির তাড়নাকে সুডৌল ভাষাভঙ্গীতে অতি আয়তনের গ্রন্থগুলোর মধ্যে পরিবেশন করেছেন তিনি। অধ্যায়ে অধ্যায়ে পাঠকের কৌতূহলকে টেনে রাখার জন্যে লালিত্যময় ভাষায় ইঙ্গিতময় যৌনতার জোগান দিয়েছেন প্রত্যেকটি উপন্যাসে। এতকাল ধরে শিল্পচেতনার যে প্রসারতা তা তাঁর মধ্যে অনুপস্থিত। সরস বিরস ছোট

গল্পগুলোর একটা আকর্ষণীয় দিক থাকলেও গভীর অনুভূতির দ্যোতনা তাঁর ছোট গল্পে নেই। কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলো যে বাজারে চলেছে তার পেছনে লেখকের সুললিত ভাষা ও ঐতিহাসিক যৌনতার ঝঙ্কার যেমন আছে তেমনি আছে এস্টাব্লিশমেণ্টের বাজার তৈরী করে দেবার সক্রিয় প্রয়াস। স্বাধীনতা পরবর্তী কালে এস্টাব্লিশমেণ্ট ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার জন্যে যেন একটা অলিখিত ফতোয়াই দিয়ে বসেছিলো। যার ফলে ভুরিভুরি ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখা হয়েছে—যক্ষের ঝাঁপি থেকে অন্ধকার ঝেড়ে বেরিয়ে এসেছে ঝাঁকাঝাঁকা ইতিহাস। অথচ বাংলায় ডঃ নীহার রঞ্জন রায় ও ইংরেজীতে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের লেখা দুটো বই মিলিয়ে পৌণে একখানা ছাড়া বাঙালীর ইতিহাস নেই। তবে বিমল মিত্রের 'সাহেব বিবি গোলাম' ও প্রমথনাথ বিশীর 'কেরী সাহেবের মুন্সী' এক সঙ্গে পড়লে আধুনিক কোলকাতার প্রথম পর্বের খানিকটা উপ-ইতিহাসের স্বাদ, যৌনতা এবং রোমান্টিকতা মিলিয়ে পাওয়া যায়। •

সাবলীল কাব্য ভাষা, কাহিনী নির্মাণে দক্ষতা নিয়ে ছোট গল্প উপন্যাসে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে একটা বিশিষ্ট স্থান দখল করেছেন। চরিত্র সৃষ্টি তাঁর লেখালেখিতে প্রধান নয়। স্পষ্ট রাজনৈতিক দৃষ্টিতে পরিবেশ রচনা ও কাহিনী নির্মাণ করে ঘটনার দুর্মর আদিমতাকে প্রকাশ করার জন্যে ভাষাকে যেমন গতিময় করে সুদূরের দ্যোতনা এনেছেন, তেমনি কখনো করে তুলেছেন সাংকেতিক। পরিণত জীবন বোধের প্রকাশ তাঁর রচনায় যদি বা খানিকটা অস্পষ্ট, জীবনের রহস্য উদঘাটনের জন্যে অনুভূতির সংস্পর্শে বাস্তবকে পৌঁছে দিয়ে সত্য-সূত্র আবিষ্কার করার একটা প্রয়াস তাঁর লেখায় দুর্লক্ষ্য নয়। পরিবেশ ও জীবন রহস্য উদঘাটনের আগ্রহে 'উপনিবেশ'এ ঔপনিবেশিক মানুষের প্রেম ভালোবাসা, হিংস্রতা, জমির জন্যে জীবনের আন্তরিক ক্ষুধা প্রভৃতি মিলিয়ে জীবনের যে খর-আন্দোলন, অথবা 'চর ইসমাইল'বাসী কৃষিজীবি মানুষের বাঁচার জন্যে যে আবেগ তাড়িত সংগ্রাম, তাকে প্রাণবন্ত করে এঁকেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। 'উপনিবেশ'-এর মতোই কাহিনী-প্রধান উপন্যাস 'লালমাটি' এবং 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী'। উপনিবেশ-এ যেমন ঔপনিবেশিক মানুষের জীবনযাত্রা জীবন্ত হয়ে উঠেছে, 'লালমাটি'তে তেমনি রাঢ় বঙ্গের কৈবর্ত বিদ্রোহের পট-ভূমিটি তুলে বক্তব্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন পরিকল্পিত শৈলীতে। রচনায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যেমন নাটকীয়ত্ব সৃষ্টি করেন তেমনি পরিবেশন করেন রসময়স্মবি। ছোট গল্পে তাঁর চকিত চমক এবং সংবেদনশীল হৃদয়ের ছোপ পাঠকের মনে

দীর্ঘক্ষণ অনুরণন তোলে। 'টোপ', 'ফুল', 'তিতির' স্মরণীয়। তবে আধুনিক সময়ের প্রত্যাশা তাঁর লেখা থেকে যথেষ্ট মেটে না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, ৪২-এর আন্দোলন ঐতিহাসিক কারণেই বাংলা সাহিত্যে গভীর প্রভাব রেখে গেছে। কোলকাতায় দু-একটা বোমা পড়া ছাড়া সরাসরি এদেশে যুদ্ধ হয় নি। কিন্তু পশ্চিমী অবক্ষয়ের রাহুগ্রাসে বিপর্যস্ত হয়েছে এদেশের জীবন মানসও। এ্যালকোহল, যৌনতা, অপরাধ প্রবণতা নির্মম নাস্তিত্ব, শুভাশুভ বোধশূন্যতা, সমাজ ও মানুষের প্রতি দায়িত্বহীনতা, পাশবতা একযোগে জড়ো হয়ে বাঙলা তথা ভারতেও এ যুগের বিষাক্ত আবহাওয়ার পত্তন গড়েছে। একদিকে যুদ্ধের অভিশাপ অন্যদিকে দুর্ভিক্ষের বলয়-গ্রাস। বাঙালী জীবন হয়ে পড়েছে ক্ষুধার দাস, নারীদেহ হয়েছে পণ্য অন্নের বিনিময়ে। আর্থিক বিপর্যয়ে মধ্যবিত্তের সংকটাবস্থা, কালোবাজারী, মুনাফাখোরী, বেকারিত্ব। এ যেমন একদিকে, অন্যদিকে তেমনি অগ্নিস্নাত '৪২। নাভিশ্বাস ওঠা ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের স্বাধীনতা দানের প্রতিশ্রুতিতে যুদ্ধে ভারতের সাহায্য দান, স্বাধীনতা আন্দোলন স্থগিত রাখা, ইংরেজের বিশ্বাসঘাতকতা, কমিউনিস্টদের ফ্যাসিবাদী যুদ্ধকে রোখার জন্যে আন্দোলনের ডাক—'জনযুদ্ধ' ঘোষণা, মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা ফ্যাসিস্ট আক্রমণে তরুণ সাহিত্যিক 'সোমেন চন্দ'র মৃত্যু প্রভৃতি রাজনৈতিক ঘটনা বাঙালী মনীষাবাদীদের মধ্যে একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কিন্তু সব কিছুর পেছনে যতটা আবেগ, ততটা স্থির বিশ্বাস ছিলো না। ফলে, এ সময়ের সাহিত্য কার্বংকলের মতো বহুমুখী যন্ত্রণাই তুলেছে, যন্ত্রণার সঠিক উৎস খুঁজে পেতে দেয় নি—দেখায় নি সমাধানের উপায়। এবং তা উত্তর কালের জন্যে রেখে গেছে শুধুই দিশেহারাত্ব। অথচ সুস্থতা চেয়েছিলেন এ সাহিত্যের স্রষ্টারাও। সুস্থতা আনার চেষ্টাও চলেছিলো কাল সংকটের প্রাক্ মুহূর্ত থেকেই। তৈরী হয়েছিলো 'প্রগতি লেখক সংঘ'। শুরু হয়েছিলো নতুন সাহিত্য আন্দোলন।

"নতুন সাহিত্য আন্দোলনের উপযোগী ক্ষেত্র দেশের বুকেই প্রস্তুত হতে থাকলেও সাক্ষাৎ তাগিদ কিন্তু এলো বাইরে থেকে। ১৯৩২ থেকে ১৯৩৫ সনের মধ্যে বিলাত প্রবাসী কিছু ভারতীয় তরুণ এদেশের অন্যান্য তরুণদের মতোই গভীর মর্মপীড়া বোধ করছিলেন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপর্যয়ে। স্বদেশে থেকে দূরত্বের দরুণ এঁদের অন্তর্দাহ হয়তো আরো তীব্র হয়ে উঠেছিল।

সংকট মুক্তির পথের জন্য এঁরা তাই মাঝে মাঝে আলোচনা চালাতেন নিজেদের মধ্যে। বিলাতে তখন সমাজবাদের প্রভাবে তরুণ বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রমহলে প্রগতিশীল চিন্তা ও সাহিত্যধারা কিছুটা দানা বাঁধছিল যার প্রকাশ দেখা যায় New Writing আন্দোলনের মধ্যে।......সমাজবাদ ও সমাজবাদ প্রভাবিত প্রগতিশীল চিন্তা স্বভাবতই এঁদের আকৃষ্ট করল প্রবলভাবে এবং সাহিত্যের প্রতি নিবিড় অনুরাগের দরুণ এঁদের অনেকেই ঝুঁকেছিলেন প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনের প্রতি।......আর সবশেষে যুদ্ধের বিরুদ্ধে এই উদাত্ত ঘোষণা: 'আমরা এ সুযোগে আমাদের দেশবাসীর পক্ষ হইতে অন্যান্য দেশের জনসাধারণের সহিত সমস্বরে বলিতেছি যে আমরা যুদ্ধকে ঘৃণা করি এবং যুদ্ধ পরিহার করিতে চাই ; যুদ্ধে আমাদের কোনো স্বার্থ নাই। কোনো সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে যোগদানের আমরা ঘোর বিরোধী।'......সর্বভারতীয় সংঘ ১৯৩৬ সনের শেষ দিকে 'Towards Progressive Literature' নামে একটি সংকলন প্রকাশ করে। লেখকদের মধ্যে ছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সাজ্জাদ জাহীর, মামুদ জাফর, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সুধিবৃন্দ।......বাংলাদেশে তখন প্রগতি লেখক সংঘের সভাপতি ছিলেন পরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, কোষাধ্যক্ষ সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ও সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। এছাড়া হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বিশেষ উৎসাহী ছিলেন সংঘের কাজকর্মে। এঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, নীরেন্দ্র নাথ রায়, হীরণকুমার সান্যাল, আবু সঈদ আইয়ুব, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রবীণ ও নবীন লেখকরা। এঁদের অনেকেই ছিলেন 'পরিচয়' পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আর স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, মন্মথ সান্যাল, অরুণ মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, বিনয় ঘোষ, সরোজ দত্ত প্রভৃতি ঘনিষ্ঠরা অনেকেই ছিলেন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সঙ্গে যুক্ত। বন্দীশালা থেকে মুক্তি পেয়ে গোপাল হালদার মহাশয়ও যোগ দিলেন লেখক সংঘে।...... প্রবন্ধ বাদেও নতুন দৃষ্টিভঙ্গির গল্প বা কবিতা লেখার রেওয়াজ শুরু হয় এই সময়ে। মনোরঞ্জন হাজরার 'নোঙরহীন নৌকা' ও 'পলিমাটির ফসল' এবং গোপাল বাবুর 'একদা' এই দিক দিয়ে অগ্রণী প্রচেষ্টা। 'প্রগতি' নামে একটি সংকলনও প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ সনে।"*

১৯৩৮ সনে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় লেখক সংঘের সম্মেলন থেকে

*প্রগতি লেখক আন্দোলনের পৃষ্ঠপট—চিন্মোহন সেহানবীশ (পরিচয় ১৩৬৭ শারদীয়)

প্রস্তাব নেওয়া হোলো : "সনাতন সংস্কৃতিতে ভাঙন ধরার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সাহিত্যে আটপৌরে জীবনের বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাবার আত্মঘাতী প্রবণতা দেখা দিয়েছে। আমাদের সাহিত্য প্রত্যক্ষ ও প্রাকৃতিককে ছেড়ে অপ্রত্যক্ষ ও আধ্যাত্মিকের দিকে ধাবিত হয়েছে...ফলে রচনা ভঙ্গী অন্ধ নিয়মানুগত্যের বিষম জালে জড়িয়ে পড়েছে, তার ভাবসম্পদ হয়েছে রিক্ত ও বিকৃত।... আমাদের সমাজ যে নবরূপ ধারণ করেছে তাকে সাহিত্যে প্রচলিত করা এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করে প্রগতিকামী মনন ধারাকে বেগবান করা—এই আমাদের কর্তব্য ।..... সাম্প্রদায়িকতা, জাতিবিদ্বেষ, যৌনস্বৈরাচার, সামাজিক অবিচারের যে ছায়া সাহিত্যে পড়েছে তার অপসারণের জন্য তাঁদের (লেখকদের) সচেতন থাকতে হবে।...আমরা চাই জন-জীবনের সঙ্গে সর্ববিধ কলার নিবিড় সংযোগ ..আমরা বিশ্বাস করি যে ভারতবর্ষের নবীন সাহিত্যকে আমাদেব জীবনের মূল সমস্যা—ক্ষুধা, দারিদ্র্য, সামাজিক পরান্মুখতা, রাজনৈতিক পরাধীনতা নিয়ে আলোচনা করতেই হবে।"

প্রগতি লেখক আন্দোলনের অন্যতম সহযোগী চিন্মোহন সেহানবীশের লেখার উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্টই দেখা গেলো, কতকগুলো সুস্থ চিন্তায় পূর্বস্থরী লেখক কবিরা সমবেত ভাবে দেশ জাতি ও সাহিত্য নিয়ে আন্দোলন শুরু করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে দেখা দিয়েছিলো তৎকালীন এস্টাব্লিশমেন্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, জেগেছিলো জীবনান্বেষার স্বাধীন দায়িত্ব, নতুন পরিবেশের মানবিক সমস্যা নিয়ে দুর্ভাবনা, সাহিত্যের আঙ্গিক প্রকৃতি ও রীতিনীতি নিয়ে নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষার তাগিদ। যুদ্ধের বিরুদ্ধে ঘৃণা, পরাধীনতার বিরুদ্ধে জেহাদ তুলে তাঁরা জীবন সংগ্রামকে চিত্রিত করতে চেয়েছেন—সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে মসী চালিয়ে সভ্যতার ক্রমবিকাশকে জানিয়েছেন অভিনন্দন। এঁরা সেক্স এ্যানার্কিজম-এর বিপদসংকেত অনুভব করে শুরুতেই সেদিন তাকে প্রতিরোধের সংকল্প যেমন নিয়েছিলেন, তেমনি দেশ জাতির অতীত বর্তমানকে ব্যক্তি অস্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত করে নতুন যুগের নতুন সংস্কৃতিবান ঐতিহ্য সৃষ্টি করতেও বদ্ধপরিকর হয়েছেন। একই প্রগতি মঞ্চে সেদিন উপস্থিত হয়েছেন বুদ্ধদেব বসু, সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং গোপাল হালদার ও আবু সঈদ আয়ুব। শেষে তা হোলো ফ্যাসীবাদ বিরোধী শিল্পী ও লেখক সংঘ—রবীন্দ্র-রোলাঁ-র সঙ্গে কণ্ঠস্বর যুক্ত হোলো যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 'will not rest'. লেখকদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিলো অসামান্য উৎসাহ।

প্রেরণা মহৎ ছিলো—উদ্দেশ্যও ছিলো গভীর। তবু যুদ্ধ হোলো—যুদ্ধের দানে এলো শিকড়ে-পচন-লাগা সাহিত্য। প্রগতির মঞ্চ ধ্বসে সহস্রখান হয়ে পড়লো নির্মীয়মাণ প্রতিমা। হতাশা, ক্লান্তি, বিকৃতি, যৌনতা, উচ্ছ্বাস, উল্লাস, চিৎকার, শীৎকার, আর্তনাদ, কান্না, কৃত্রিমতা, পঙ্গুতা, আত্মিক যন্ত্রণা, অবসাদ-গ্রস্থতা, চৈতন্যের দৈন্য, অস্ফুট জিজ্ঞাসা, কুয়াশাদষ্ট চোখের করুণ জিজ্ঞাসা, লক্ষ্যহীনতা, হত্যা, আত্মহত্যা, যন্ত্র-জিঘাংসা ও বেশ্যা দিয়ে রচিত হতে থাকলো সাহিত্যের সাম্প্রতিক প্রজন্মের ভূমিকা।

৪২-এর রাজনৈতিক উচ্ছ্বাসের পটভূমিকায় এসেছে মনোজ বসুর 'ভুলি নাই'। নৈরাশ্য বিক্ষোভ ক্ষুধা অন্তর্দ্বন্দ্ব যৌনতা জটিলতা আর শ্রমিক-কৃষক বিপ্লবে সংশয়াচ্ছন্ন চেতনাকে ঊষর ভূখণ্ডে কর্কশ কাকের চিৎকারে যুক্ত করে গড়ে তোলা হয়েছে নবেন্দু ঘোষের 'ডাক দিয়ে যাই'। এ পটভূমিতেই সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' ও 'পরশুরামের কুঠার'। সুবোধ ঘোষের সমস্ত গল্পই জীবনের খণ্ডাংশ। বিষয় নির্বাচনে দক্ষতা দেখিয়ে অপ্রত্যাশিতের রস জোগানোতেই তিনি উৎসাহিত। মাতৃত্বের দায়িত্ব নিতে অস্বীকারের বিপন্ন বাস্তবে (পরশু-রামের কুঠার) মহাযুদ্ধের আবর্ত প্রসূত উদ্‌ভ্রান্ত পরিস্থিতির দান যে বিহ্বলতা ও ঘরভাঙা (কর্ণফুলীর ডাক) অসামাজিক প্রণয় (তমসাবৃত) তাকে যেমন স্বল্প পরিসরে মননের ও ব্যঞ্জনার জোরে রসোত্তীর্ণ করে তুলেছেন, তেমনি তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনকে আবেগে বিশ্লেষণে বিচিত্রিত করেছেন উপন্যাসে। কি 'তিলাঞ্জলি' আর কি 'গঙ্গোত্রী' সর্বত্রই পটভূমি রচনায় সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন সুবোধ ঘোষ। তথ্য তত্ত্ব সমস্যা মননে আধুনিক সাহিত্য যে তথাকথিত ললিত কলার জগতকে ভেঙে দিয়েছে এবং এখানে অর্থনৈতিক সমস্যা ও রাজনৈতিক সমস্যা-সংকুল পরিবেশের সঙ্গেই হৃদয় সমস্যা ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত, এটা জেনে ফেলাতেই সুবোধ ঘোষের উপন্যাসে স্থান নিয়েছে বিশ্ববিজ্ঞান অর্থনীতি রাজনীতি সমাজনীতি। প্রতিনিয়ত চলছে তাঁর নতুন আঙ্গিক, নতুন রীতি ও নতুন বিষয় উদ্ভাবনের প্রয়াস। রক্তের সমস্যা নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলশ্রুতি দিয়ে তিনি 'সুজাতা' রচনা করে মানুষের বদ্ধমূল ভ্রান্ত ধারণাতেও তাই আঘাত দিতে চেয়েছেন।

নতুন কোনো দিক উদ্‌ঘাটনের জন্যে নয়—নতুন চিন্তা চৈতন্যের জন্যেও নয়, সমসাময়িক কোলকাতায় যে কুৎসিত প্রবৃত্তি, মানুষ্যত্বের দৈন্য এবং তার বিরুদ্ধে অসহায়ের আন্দোলন ও রোমান্টিক বিপ্লবীপনা—ভাঙা ফুটপাথের হাইড্রান্ট-

ভাঙা কলতানির মতো যে যৌনতা তাকেই কড়া বাস্তব হিসেবে সাহিত্যে পরিবেশনের দক্ষতা দেখানোর জন্যে 'মোমের পুতুল' ও 'কিনু গোয়ালার গলি'-র লেখক সন্তোষকুমার ঘোষ উল্লেখযোগ্য। কম্যুনিস্টদের ঘিরে শ্রদ্ধা ভালোবাসা ঘৃণা নিন্দা ভয় মিলে যে অস্বচ্ছ ধারণা ও উত্তেজনা তাকে লেখালেখিতে বড় পিঁড়ি দিয়ে সন্তোষ ঘোষ এক ধরণের সমাজ বাস্তবতা, যৌন মিলনের উত্তেজনা ও ফাঁকা বিপ্লবের বারুদ পরিবেশন করেছেন। কিন্তু চরিত্র সৃষ্টিতে তিনি খুব একটা সার্থকতা দেখাতে পারেন নি—কোথাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি 'মুখের রেখা', মৃত্যুবোধে আলোড়িত হয়ে 'মুখের রেখা' উপন্যাসকে ভাবনা প্রধান করে তুললেও জীবন সম্পর্কে সন্তোষ ঘোষের কোনো তন্ময় ভাবনা এখানেও অনুপস্থিত। বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে একটি মনের জোড় স্থাপনের চেষ্টাই এই উপন্যাসে। সময়-মানুষের রুগ্ন নির্জীবতা ও পাপবোধকে একটা দার্শনিকতা দেবার প্রয়াস তাঁর যেমন আছে তেমনি পরবর্তী কালে তাঁর লেখায় প্রকট হয়ে উঠেছে বিষণ্নতা।

প্রগতিবাদী লেখালেখির আন্দোলন সিদ্ধান্ত করেছিলো এক, বাস্তবে নিষ্ঠুর কাল তা বদলে দিয়ে করে দিলো অন্য। 'প্রগতি' নিয়ে এলো বস্তি—ক্ষেত খামার কলকারখানার জীবনযাত্রার সাহিত্য, বোধের জগতে আনতে চাইলো আমূল পরিবর্তন, কিন্তু কাল প্রবল আকর্ষণে সাহিত্যের গতিকে টেনে ফেরালো বিপরীত মুখে। লেখকের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ থাকলো শানের শহর অর্থাৎ মেট্রোপলিটান সিটিতে বা মফঃস্বল শহর-শহরতলীতে। মদ মেয়েলোক সাহিত্যে হয়ে পড়লো স্বভাবজ দ্রব্য—থকথকে যৌনতা সর্বংসহ। প্রেম ব্যাপারটা নিছক নারী মাংস নিয়ে কাড়াকাড়িতে পরিণত হয়ে সাহিত্যকে করে তুললো পাশবিক অত্যাচারের ধারাবিবরণী। এ সময়ের সাহিত্যে শ্রমিক সংগ্রাম বিস্তর আছে, অধ্যাপকীয় আভিজাত্য আছে, স্মাগলিং-কালোবাজারী-মুনাফাখোরী আছে—আছে মালিকের অত্যাচার উৎপীড়ন শোষণ এবং তার বিরুদ্ধে নৈতিক প্রতিবাদ। বাংলা সাহিত্যে নির্বিচারে স্থান পেলো গুপ্ত হত্যা, শ্রমিক হত্যা, গর্ভ নিয়ে আত্মহত্যা, রাহাজানি। বিবেক বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে নীতিশাস্ত্রের তোয়াক্কা সাহিত্য করে না, কিন্তু সাহিত্য-বিবেক বা শিল্পত্ব বলে যে একটা কথা আছে, তাকেও অস্বীকার করে বাস্তব সমাজের ফটোগ্রাফ তুলতেই প্রবল ঝোঁক দেখা গেলো অনেক লেখকের মধ্যে। তবু জীবনকে শিল্পিত করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন অনেক কথাসাহিত্যিকই। তাঁদের মধ্যে দেখা দিয়েছিলো ইতিবাচক এবং নেতিবাচক বোধের তুমুল একটা অস্থিরতা, যা থেকে আর উদ্ধার আসে নি

তাঁদের। এই দু' ধারার সুচিহ্নিত লেখক সমরেশ বসু এবং বিমল কর।

আপাত দৃষ্টিতে বাস্তব পরিবেশের ভয়ঙ্কর বীভৎসা, গণ-আন্দোলন, দাঙ্গা, নির্যাতন, স্বাধীনতা, উদ্বাস্তু-তাঁবু, শ্মশান, বেশ্যাবস্তি, কারখানা-মিল এলাকা, শ্রমিক-জেলে চাষী, উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্ত, বাউল বৈরাগী, ভিখিরী অর্থাৎ স্বাধীনতা পূর্বকালের দশ বছর এবং স্বাধীনতা পরবর্তী কালের পঁচিশ বছরের বাঙলাদেশের পটভূমিকায় বিপুল অভিজ্ঞতা নিয়ে-বাংলা সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেছেন সমরেশ বসু। মিথ্যা নয়, একটিই মাত্র এ্যাডভেঞ্চারিষ্ট নায়কের সঙ্গে লোভনীয় বস্তুর অজস্র সমাবেশ ঘটিয়ে তাকে নিশ্চিত লক্ষ্যে অর্থাৎ পাঠক-বিজয়ে পৌঁছে দেবার মতো ভাষা, কল্পনাশক্তি এবং অভিজ্ঞতার প্রাচুর্য সমরেশ বসুর আছে। কিন্তু নেই জীবনপাঠে সম্পূর্ণ দৃষ্টি। যেখানে তিনি অভিজ্ঞ, সেখানে গল্প বলার দক্ষতাও তিনি দেখিয়েছেন। 'উত্তরঙ্গ' থেকে শুরু করে 'গঙ্গা' 'বি-টি রোডের ধারে' 'শ্রীমতী কাফে' 'বাঘিনী' 'বিবর' 'প্রজাপতি' 'পাতক' প্রভৃতি হৈ চৈ তোলা উপন্যাস এবং 'আদাব' 'পশারিণী'র মতো বহু গল্প দিয়ে বাংলা সাহিত্যের কলেবর বৃদ্ধি ঘটিয়েছেন তিনি।

সমরেশ বসু প্রগতি শিবিরের দরজা দিয়েই সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন। প্রগতি সাহিত্যের প্রথম দিকে মূল ঝোঁক ছিলো বাইরের ক্রিয়াকাণ্ডকে তুলে ধরার। সমরেশ বসুর হাতে তা শুধু প্রাত্যহিকতার নানা দিকের রূপ ব্যঞ্জনাতেই ব্যাপৃত হোলো না, অন্তর্জগতের পরিচয়ও তিনি তুলে ধরতে চাইলেন। নানা অবস্থার বিচিত্র মানুষ ভীড় করে এলো তাঁর সাহিত্যে। মানবিকতার কথাও উচ্চারিত হোলো। কিন্তু যে প্রত্যয়সিদ্ধ দৃষ্টিতে অন্তরে-বাইরে অবিচ্ছিন্ন সমগ্র একটা মানুষকে আবিষ্কার করে উপস্থিত করতে হয়, সেই আবিষ্কারকের দৃষ্টির অভাবে সমরেশ বসুর কোনো লেখাতেই প্রায় একটা গোটা মানুষের পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে প্রগতি শিবির এতাবৎ সাহিত্যে অপরিচিত কতকগুলো নতুন উপকরণ এবং আবেগ-সর্বস্ব ভাবনা ও ঝকঝকে ভাষায় বোনা কাহিনী দেখে এমনই হাততালি দিয়েছে যে সমরেশ বসুর মধ্যে কতকগুলো ব্যাপার মুদ্রাদোষে পরিণত হয়ে গেলো। যেমন, আধাশিক্ষিত শাহরিক এবং এ্যাডভেঞ্চারিষ্ট একটি নায়ক, খানিকটা শ্রমিক দরদী কম্যুনিস্ট সংগ্রাম, কিছুটা যৌন উত্তেজনা এবং উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর চৌখস আভিজাত্যের পরিচয় কিছুটা। এগুলোই ঘুরেফিরে তাঁর সমস্ত উপন্যাসে এসেছে এবং একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যাবে স্বাধীনতার পরে যখন প্রগতি

সাহিত্য আন্দোলন রাজনৈতিক কারণে উঠে গেছে—প্রগতি লেখকরা ভ্রান্ত হঠকারী রাজনীতির কবলে পড়ে যে যার স্বেচ্ছা-নির্বাসন বেছে নিয়েছেন আত্ম-সমীক্ষার জন্যে, ঠিক তখনই এস্টাব্লিশমেন্টের দিকে একটু একটু করে এগিয়ে এসেছেন সমরেশ বসু। তাঁর লেখালেখির প্রাথমিক উপাদানগুলো নগ্ন বিকৃত কদাকার চেহারা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে, লেখালেখিতে মুখ্য হয়ে উঠেছে পারভার্টেড সেক্স স্টেটমেন্ট। বইগুলো হয়ে পড়েছে বেস্ট সেলার মার্কা।

এ সত্ত্বেও, সমবেশ বসুর কৌলীন্য অস্বীকারের উপায় নেই। আধুনিকতার মানদণ্ডে ভাষা তাঁর খুব একটা জোরালো না-হলেও অপরিচিত বিষয়, মানুষ, পরিবেশ, শ্ল্যাং শব্দ আমদানী করে বিস্ময়রসে কাহিনীকে ভিজিয়ে মাঝেমাঝেই নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি করে এমনভাবে গল্প ফাঁদেন যে পাঠক একটানে তা নিঃশেষ না করে পারে না। আধুনিকতম সময়ে, এককালে তাঁর যে পরিশ্রমের দিকটা ছিলো বা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তাকে উপস্থাপনের যে দুর্মর প্রয়াস ছিলো, তা নেই বললেই চলে। সহজে হপ্তাখাটা উপন্যাস খাড়া করার জন্যে তিনি (হেমিংওয়ে, তারাশঙ্কর তো গড়ে ওঠার বেলা থেকেই আছেন এবং সার্ত্রে-কাম্যু-কাফকা-ডষ্টয়ভস্কির কথা না হয় না-ই তুললাম) একেবারে হাল আমলের কবি লেখকদের লেখালেখি থেকে বিষয়, চরিত্র এবং এ্যাটিচিউড পর্যন্ত অনুকরণে লিপ্ত হয়ে পড়েছেন। তরুণ সাহিত্যিকদের লেখালেখির আলোচনা প্রসঙ্গে এ ব্যাপারে তাঁর কাজ কারবার দেখানো যাবে, এখানে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে, যে নদীকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অপূর্ব আবহ রচনা করে, পরিবেশের ঘনত্ব দিয়ে, কুবের-কপিলার প্রেমের চরিতার্থতা দেখিয়ে ও জীবন-নাটকের নিরুচ্ছ্বাস পরিণতি এনে শরীরী করে তুলেছেন 'পদ্মানদীর মাঝি'তে; পাড়ের জীবনযাত্রা, লৌকিক সংস্কৃতি আচার অনুষ্ঠান ও অতীত বর্তমানকে গভীর জীবনবোধ দিয়ে করালী ও বনোয়ারীর সঙ্গে যুক্ত করে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যে নদীকে তরঙ্গিত জীবন স্রোতে পরিণত করেছেন 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য়; এমন কি অদ্বৈত মল্লবর্মণ মালোচাষীদের জীবন প্রবাহকে যে নদীর সূত্রে গ্রথিত করে নদী ও জীবন ধারাকে একটা গভীর গতিশীল দার্শনিকতায় পরিণত করেছেন 'তিতাস একটি নদীর নাম'এ ও ফুটিয়ে তুলেছেন অনন্ত জীবনপিপাসা, সেখানে Old Man And The Sea এবং 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র পুষ্ট হয়ে হিমি ও বিলাসের রোমান্টিক প্রেমের ঘটনা ছাড়া সমরেশ বসু তাঁর 'গঙ্গা'র আর কী পাঠককে উপহার দিয়েছেন? পুনরুক্তি

অপ্রয়োজনীয়। অথচ তাঁর বিপুল অভিজ্ঞতা, কাহিনী নির্মাণ ক্ষমতা, আগ্রহ আকর্ষণের কৌশল লেখক মাত্রেরই ঈর্ষণীয়। এখানে যে জীবন গভীরতার অভাব দেখা যায়, পরবর্তী কালে ল্যাণ্ডমার্ক খেতাব পাওয়া বইতেও তারই অভাব পাঠকমাত্রেরই চোখে পড়বে।

গ্রাম জীবনের পাড় ভেঙে পড়া ও শহর জীবনের তিন-স্তর দেয়াল ভেঙে পড়ার এই সংকট মুহূর্তে ইতি ও নেতির টানা পোড়েনের অস্থিরতায় বিমল করের ব্যক্তিত্বে এসেছে দুই বিরোধী সত্তার দ্বন্দ্ব। আধুনিকতার খরতর স্রোত ও ভয়ঙ্করতা বর্ণে বর্ণে তুলে এনে বিমল কর ক্লান্ত অবসাদগ্রস্ত বিবর্ণ নৈরাশ্য-জর্জর মানুষের চরিত্রকে শিল্প করে তুলেছেন। সাহিত্য রীতি ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে তিনি কিছুতেই চর্বিত চর্বণ করতে রাজী নন। ফলে একনাগাড়ে চলেছে তাঁর পরীক্ষা নিরীক্ষা। পরিবেশ রচনায় যেমন তাঁর দক্ষতা তেমনি চরিত্র চিত্রণে, আখ্যান বিন্যাসে ও মননে সংগতি রেখে রচনাকে শিল্প করে তোলার প্রয়াসে তিনি ক্লান্তিহীন। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁর সজ্ঞান পরিমিতি বোধের জন্যেই তাঁর রচনার সৌন্দর্য কোথাও ক্ষুন্ন হয় নি। অজস্র জটিলতাময় ব্যক্তির সহস্র সূক্ষ্ম অনুভূতির অনুরণনকে ভাষায় তুলে ধরার জন্যে গল্পকে কবিতা করে তুলেছেন বিমল কর। ভাষা তাঁর অনেক সময়েই সাংকেতিক হয়ে উঠেছে।

প্রেম সম্পর্কে বিমল করের জিজ্ঞাসা-যন্ত্রণা এই সময়ের অবিশ্বাসকে ও গাঢ় ধূসরতাকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে। নারীর দেহের প্রয়োজনেই পুরুষ--ভালোবাসা প্রতারণার খেলা। রূঢ় বাস্তবে যে ভালোবাসা ফাঁস হয়ে পড়েছে তার তিক্ত ক্ষার স্বাদই বিমল কর তাঁর পাঠককে উপহার দিয়েছেন। মহৎ প্রেমের মরীচিকার প্রাণঘাতী কালচে-লাল রক্তচিহ্নের ছাপ ছড়ানো তাঁর লেখালেখি পাঠককে রুদ্ধনিঃশ্বাসে লেখকের বক্তব্যের সঙ্গে একমত হতে টেনে নেয়। 'ত্রিপদী' 'ফানুসের আয়ু' 'খোয়াই'-এ প্রেমের আধুনিক রূপ ও স্বরূপ, মানসিক বিকার, নারীমাংস ছেঁড়াছেঁড়ির বীভৎস বাস্তবতা—জীবনের নোংরা ও ইতর দিককে একটা জেহাদ ঘোষণাকারী কলমে চিত্রিত করেছেন বিমল কর। জীবনের সর্বস্তরে যে 'ইঁদুর' ঢুকে তাবৎ মূল্যবোধকে কেটে ফেলেছে, তা বিমল কর 'দেওয়াল' ভেঙে পড়ার সময়ই শুধু দেখেন নি—মূল সত্যটাকে তিনি আবিষ্কার করেছেন শিল্পদৃষ্টি গড়ে ওঠার বেলাতেই। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, অবক্ষয় বাইরে থেকে আমদানী করা হয় নি বা আসে নি। 'ওর ইঁদুর তো বাইরে নেই—ঘরেই রয়েছে' উক্তিতেই স্পষ্ট যে বিমল কর সেদিনই আবিষ্কার

করে ফেলেছিলেন দেশ ও জাতির ভেতর থেকেই ওপরে উঠে পড়েছে ক্ষয়। আর ছোটগল্পগুলোয় টুংটাং আওয়াজেই চরিত্র পরিবেশ ও জীবন প্রকৃতির স্বরূপ ঠিক ফাইন আর্টের দক্ষ শিল্পীর মতো এঁকে ফেলেছেন বিমল কর। অতি সাম্প্রতিক সময়ের রোগগ্রস্ত বিষাদাতুর আশাশূন্য চেতনার সূত্রপাত বিমল করের লেখায়। পৃথিবী ও জীবন আজ যে একই হাসপাতালের বাসিন্দা বলে প্রতিপন্ন হয়েছে তার ভূমিকা বিমল করই রচনা করেছেন। তবে শিল্পী জীবন সম্পর্কে হতাশ হতে চান না, আশা রাখতে চান, কিন্তু 'সুধাময়'এর প্রশ্ন থাকে:

**** জীবন কোন দিন শূন্যে গিয়ে থামে না। তবে দুঃখ? হ্যাঁ, দুঃখ আছে। আছে বলেই আশা দিয়ে ভালবাসা দিয়ে তার সঙ্গে যুঝতে হবে। কর্মফল, ভাগ্য, ঠাকুর দেবতা এসব কোন কাজের কথা নয়, সত্যও নয়। আমাদের জীবন একটা রঙিন ছোট কাগজ নয়, আর তাতে সরু কাঠি কেউ এঁটে দেয় নি—যে আমরা নিছক ঘুড়ি—সুতো দিয়ে বাঁধা। এমনও নয় অন্য কারো হাতে লাটাই আছে—তার খেয়াল খুশিতে আমরা উড়ছি, নামছি, গোত্তা খাচ্ছি —তারপর একসময় সুতো কাটা হয়ে ভেসে যাচ্ছি। না, জীবন ঘুড়ি নয়। অথবা গালে হাত তুলে, গলায় ফাঁস লাগিয়ে আকাশের দিকে মুখ করে ভগবান ভগবান করে কেঁদে ককিয়ে ছটফট করে শেষ করে দেবার জন্যে নয়। তবে জীবন কি? আয়ুকে রক্ষা করার ইচ্ছা, মুক্তির পিপাসা, প্রেম আর আনন্দ। সৎকে রক্ষা করো, সত্তাকে রক্ষা করো—জীবন পূর্ণ হবে।***

একি জীবনের সঙ্গে উদাসীন সঙ্গমকারী সন্ন্যাসী সত্যদ্রষ্টার মতো বাণীলিপি নয়? এই দার্শনিক ভঙ্গি তাঁর নিজের লেখালেখির মধ্যে আরো পরিণত তো হয়েছেই, তরুণতর লেখকদের ওপরও প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করেছে—বিশেষ করে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ওপরে। ভাষার বিষণ্ণতা ও ঠাণ্ডা গতি তাঁর নিজের 'খড়কুটো' উপন্যাসে যেমন মিষ্টিক দ্যোতনা এনেছে তেমনি তরুণদেরও তা আকর্ষণ করেছে। তিনি নিজে যেমন পরীক্ষা নিরীক্ষায় অক্লান্ত লেখক তেমনি সংগঠক। আধুনিক সাহিত্যের নতুন মোড় ফেরাতে তরুণ লেখকদের নিয়ে তিনিই আন্দোলন শুরু করেছেন।

শহরবন্দী জীবনের বদ্ধ আবহাওয়া এবং পঙ্কিল আবর্ত থেকে সাহিত্যকে মুক্ত করার প্রয়াসও এ সময়ের কিছু কিছু লেখকের মধ্যে দেখতে পাওয়া গেলো। এই তাগিদেই জলা-নদীপাড়ে ছুটে গেছে আগ্রাসী শিল্প জিজ্ঞাসা—বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারে জমা পড়েছে অমরেন্দ্র ঘোষের 'দক্ষিণের বিল' 'চর কাসেম' ও মনোজ

বসুর 'জল জঙ্গল'। কিন্তু এটুকুতেই তৃপ্ত হতে চাইলেন না বাংলার লেখক। বাংলা সাহিত্যের পরিসর বাড়ানোর আগ্রহে বাংলাভাষায় চিত্রিত হতে থাকলো বাংলার বাইরেকার ভূখণ্ডও। অসামান্য দক্ষতা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে স্থান করে নিলেন সতীনাথ ভাদুড়ী। তাঁর লেখার রূপনির্মিতিতে যেমন শক্তিশালী হাতের পরিচয়, তেমনি পরিবেশ নির্মাণে ও বিষয়-বক্তব্য উপস্থাপনে। সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোড়াই চরিত মানস' বাংলা সাহিত্যে সম্ভবত অনন্য। কি বিষয় নির্বাচনে আর কি ভাষা নির্মাণে তিনি যে artist of the people তার পূর্ণপরিচয় দিয়েছেন। বাংলার বাইরেকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রা—সে ভূখণ্ডের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, আচার আচরণ, উৎসব অনুষ্ঠান, প্রেমভালোবাসা, মিলন বিরোধ, রীতিনীতি, ধর্মবিশ্বাস, কথ্যসংলাপের ভাষা, প্রবাদপ্রবচন এমন-কি তুলসীদাসী রামায়ণের শ্লোক অব্দি তিনি তাঁর তীব্র অনুসন্ধিৎসা ও বিশিষ্ট জীবনবোধ দিয়ে এমন এক আশ্চর্য দক্ষতায় 'ঢোড়াই চরিত মানস'-এ পরিবেশন করেছেন যে বিহার প্রদেশের একটা বিশিষ্ট অঞ্চল তার সর্বস্ব দিয়ে পাঠককে সর্বক্ষণ জারিয়ে রাখে। অতি সাম্প্রতিক কালে সুবিমল বসাক ঢাকাই কুট্টি ভাষায় এরকম একটা প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু তা তুলনায় আসে না। স্ট্রিম অব কনসাসনেস রীতিতে লেখা সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' এবং কিছু ছোট গল্পও তাঁর শক্তির পরিচায়ক।

এছাড়া সাম্প্রতিক কালের লেখকদের পূর্বসূরী কিছু কিছু গল্পকারদের নাম নানা কারণেই শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করতে হয়। তাঁদের আঙ্গিক পদ্ধতি, রীতি, পরিবেশ ও চরিত্র উপস্থাপনের ঋদ্ধি ও সিদ্ধি, ভাষা ব্যবহারের বিচিত্রতা ইত্যাদি মিলিয়ে রচনার বহিরঙ্গ সজ্জার যে নতুনত্ব, তা পরবর্তী কালের সাহিত্যে আঙ্গিক প্রকরণ চর্চার অতিরেক এনেছে। এদিক থেকে ফরম-এ নিঃসঙ্গ বিষয়বস্তুতেও নিঃসঙ্গ অমিয়ভূষণ মজুমদারের শিল্পমানসিকতা অতি-আধুনিক সাহিত্যের নান্দীমুখ রচনা করেছে বললেই চলে। ফিউডালিজম থেকে বেরিয়ে এসে যুগ ও জীবনের ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় আত্মপ্রকাশকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। 'দীপিতার ঘরে রাত্রি' ও 'নীল ভুঁইয়া'-তেই অমিয়ভূষণ মজুমদার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন। ধারালো, সুচিন্তিত এবং পেনিট্রেটিং শব্দে অভ্রান্ত লক্ষ্যসন্ধানী গদ্যের ভাষা তৈরী করে নিয়েছেন তিনি। অনিবার্য ভাবেই তাঁর 'গড় শ্রীখণ্ড' পাঠককে লেখকের শক্তি সম্পর্কে সজাগ করে। চরিত্র উদ্‌ঘাটনের জন্যে সংলাপ ব্যবহার না করে আত্মগত ভাবনার সূত্রগুলোই তিনি

উপস্থিত করেন। প্রকৃতি চিত্রণে তিনি যে নির্লিপ্ততা ও স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন তা বিস্ময়কর। সমস্ত কিছুকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার প্রবণতায় অনেকটা সুররিয়ালিষ্টিক কায়দায় দেয়ালের চুন খসে পড়া থেকে পানের বোঁটার চুন খসা পর্যন্ত সবকিছু তিল তিল করে চিত্রিত করেছেন অমিয়ভূষণ। খুব ডিসপ্যাশনেট ভঙ্গীতে বিষয়টি তুলে ধরে একটা নিঃসঙ্গ স্বরূপ ফুটিয়ে তোলার দিকেই তাঁর শিল্পী স্বভাবের ঝোঁক। এবং তা এই হাল আমলেও দেখি : 'আমি যাই এখন? ফিস ফিস করে বললো ভাসান।—কিন্তু। খুঁটি ছেড়ে শোভা এগিয়ে এলো। কিন্তু। শোভা ঢোক গিললো। কিন্তু .....একি ভালো না। বলো। এই উরুণ্ডী। একি ভালো না বলো? কি যেন আর সেই হাঁস ওড়া......। এটাও কি মিথ্যা গল্প এই উরুণ্ডী? মানে প্রবঞ্চনা?—আমি যাই এখন। অ্যাঁ। ভাসান আর একটু পিছোলো। যাই এখন? অ্যাঁ? যাই? ভাসান তার বাড়ির রাস্তার দিকে আর একটু সরে গেল। আচ্ছা, সে কাল। যাই এখন? অ্যাঁ।' সম্ভবত 'উরুণ্ডী' গল্পের এটুকুতেই তাঁর পরিচয় উঠে আসে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নন্দীর মধ্যে দেখা গেছে একটা ফরাসী মানসিকতা ও বৈদগ্ধ্য। তিনি সর্বত্র প্রকৃতির একটা মাংসল উপস্থাপন ঘটিয়ে যৌনপ্রতীকে চিত্রিত করেছেন সব কিছু। সেক্স পারভারশনের রূপ নিঃসংকোচে আকর্ষণীয় বাচনভঙ্গিতে বর্ণনা করে তিনি যেমন 'খালপোল' রচনা করেছেন, তেমনি নির্বাচিত পরিবেশে নিষ্ঠুর আক্রোশ, জ্বালা, হরবকত হত্যা, বহুতর মৃত্যু, বীভৎসা আর কান্না, আদিম শক্তি ও আদিম রিপুর তাড়নাকে ফুটিয়ে তুলেছেন 'পঙ্গু', 'জ্বালা', 'চোর', 'মীরার গল্প', 'দিনের গল্প রাতের সংগীত' প্রভৃতি ছোট গল্পে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নন্দীর ব্যক্তিত্বই গড়ে উঠেছে পরস্পর বিরোধী দুই সত্তার দ্বন্দ্বে। তাঁর লেখাতে তা সুস্পষ্ট। তাঁর শিল্পীসত্তা অর্জন করে নিয়েছে আশ্চর্য প্রকাশ ক্ষমতা আর সেই ক্ষমতাতেও তিনি কদর্যতাকেই ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য দিয়েছেন। শিল্পিত শব্দযোজনার সামর্থ্যে, আশ্চর্য প্রতীক চেতনায় ভাষাকে তীব্র করে মনস্তাত্বিক গবেষণায় চরিত্রের ভেতর-বাইরের স্বরূপ উদ্ধার করে তিনি 'সূর্যমুখী' 'নীলরাত্রি' 'নিশ্চিন্তপুরের মানুষ' প্রভৃতি গ্রন্থে নিজের বৈশিষ্ট্যের ছাপ রেখেছেন। মানবিক চিত্তবৃত্তি ও পাশব প্রবৃত্তিকে সমূলে উদ্ধার করার শিল্পশৈলী ও প্রতীক সৃষ্টির ক্ষমতা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীকে অনেকের কাছেই ঈর্ষণীয় করেছে।

অতি-সাম্প্রতিক বাংলা গদ্যের প্রাগ্‌লগ্নে আপন বৈশিষ্ট্য নিয়েই আত্মপ্রকাশ

করেছেন অসীম রায়। একটা তির্যক দৃষ্টিভঙ্গীতে সবকিছুকে তলিয়ে দেখে সেদিনের so called Communist movement-এর ফাঁপাপনাটাকে তুলে ধরে তাকে ক্ষতবিক্ষত করেছেন তিনি। 'দ্বিতীয় জন্ম', 'গোপাল দেব'-এর নাম এদিক থেকে স্মরণীয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে সমাজ জীবনে যে মূল্যবোধের সংকট, অসীম রায় তাকে তাঁর 'একদা ট্রেনে'তে খুব সংক্ষিপ্ত সময় সীমায় কমিয়ে এনে ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন। অতি বিখ্যাত লেখকদের ওপরও তাঁর এ লেখার প্রভাব লক্ষ্যণীয়। ছোট ছোট কাহিনীর বৃত্তে নানান ধরণের চরিত্র উপস্থিত করে নতুন সমাজ পরিবেশে ব্যক্তির যে সাম্প্রতিকতম সমস্যা এবং বাস্তবতার যে নয়া স্বরূপ অসীম রায় তাকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে আবিষ্কার করে পরিবেশন করেছেন। ইন্দো-পাকিস্তান যুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা 'দেশদ্রোহী'র মধ্যে থেকে একটা প্যাথোজ যেমন ফুটে বেরোয়, তেমনি বেরিয়ে আসে একটা অসহায় জিজ্ঞাসা। একদা দেখা সেই আদর্শবান মানুষ—কংগ্রেস-কম্যুনিষ্ট আর তাঁর চোখে পড়ে না। কথাগুলো—যা জগত-জীবন, সত্য-সুন্দর-আনন্দ, কামনা-বাসনা-স্বাদ প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করতো, তাও 'শব্দের খাঁচায়' বন্দী--অর্থশূন্য—সব যেন ফাঁকা বুদ্‌বুদ। 'গোপাল দেব'-এ অসীম রায় প্রকাশিত, 'একদা ট্রেনে'তে চিহ্নিত, 'দেশদ্রোহী'তে তাঁর জুড়ি নেই, 'শব্দের খাঁচায়'-তে অসীম রায়ের তুলনা অসীম রায়ই। প্রেম-কাম নয়—যে জমি জীবনকে উৎপন্ন সন্তান স্নেহে সম্পন্ন সাধনার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, তারই কামনায় সংগ্রাম; নির্জনতা-নিঃসঙ্গতা-অসহায়তায় নিজেকে কূপমণ্ডুক রাখা নয়—জনতার মধ্যে জীবনকে পরীক্ষিত করে তার সাফল্য ও ব্যর্থতাগুলো থেকে অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে এগিয়ে যাওয়া চরিতার্থতার দিকে—একথাটাই বলতে যেন ফাঁপা মানুষ ও ফাঁকা আওয়াজের স্বরূপটা পরিষ্কার ভাষায় তুলে ধরে অসীম রায় হুঁশিয়ার করে দিতে চেয়েছেন সময়-সমাজকে।

আপন স্বভাবেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ওপর ক্ষোভ নিয়ে সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সব কিছুর ওপরই তাঁর ক্রোধ—ক্রোধ তাঁর নিজের ওপরও। একটা গভীর নাস্তিকতাই যেন তাঁর রক্ত মাংস বোধে। আর এই নাস্তিকতার দৃষ্টিভঙ্গিতে জগৎ জীবনের স্বরূপ একটা ঝাঁঝালো ভাষায় প্রকাশ করতে তিনি অকুণ্ঠিত। আর তাঁর উল্টোপিঠ অস্তিবাদী সমাজ সচেতন লেখক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। সুচিন্তিত পরিকল্পনায়, প্রথাসিদ্ধ রচনারীতিতেই তিনি তাঁর সাহিত্য-বিজ্ঞানের জ্ঞান অনুযায়ী পরিবেশ রচনা করে, চরিত্র তল্লাস

করে এবং ঘটনার দ্বন্দ্ব উপস্থিত করে কাহিনী নির্মাণ করেছেন। শ্রেণী সংঘাত ও মানসিক সংঘাত যুগপৎ তাঁর লেখালেখিতে স্থান দখল করে 'বিকিকিনির হাট' ও 'তিন তাসের খেলা'কে এ সময়ে উল্লেখযোগ্য করেছে।

খুবই বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও, কোনো অধ্যায়ের গড়ে ওঠা সাহিত্যিক ছাঁচে তাঁর লেখালেখি হয় নি বলেই এখানে কমলকুমার মজুমদারের নাম স্বতন্ত্র চিহ্ন হিসেবে উল্লেখ করা হচ্ছে। একেবারে আলাদা জগতের এবং আলাদা জাতের চিত্র-গল্পকার তিনি। শব্দ সচেতন ধ্রুপদী ধারার আর্টিষ্ট লেখক কমলকুমার। পরীক্ষা নিরীক্ষায় সদা সচেতন—গদ্যে তিনি কাঠখোদাইকর-শিল্পীর মতো শব্দ খোদাইকর। খুঁদে খুঁদে ছবি আঁকেন—একটার পর একটা ছবি সাজিয়ে আর্ট এক্সিবিশনের মতো একটা বাক্য গঠন করেন। বাক্য সাজে, না, দক্ষ শিল্পীর ছবি সাজানো হয়। একটা ষ্ট্রিম—চিন্তাভাবনা সৌন্দর্যানুভূতির একটা স্রোত—লোকজনের, সামাজিক বিষয়ের, সংস্কৃতির, জীবনচর্যার, প্রকৃতি পরি-বেশের, গাছপালা পাখিপাখালির ও ঐতিহ্যের মৌল আবেদনকে বয়ে নিয়ে চলেছে নির্দিষ্ট রস-সৌন্দর্য সঙ্গমে। দেশ জাতি পরিবেশের কোনো কিছুই বাদ পড়ে না সাধক শিল্পীর তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও অনুভূতি থেকে। অক্ষম পাঠকের ও অচল পাঠকের অর্থাৎ খেয়াল গানের শ্রোতার মতো বহু সাধনায় যে পাঠক সহৃদয় হন নি, কমলকুমার মজুমদারের রচনার মধ্যে তাঁর প্রবেশ অসম্ভব। একটা ছবিকে বহুক্ষণ ধরে চেখে চেখে তার মূল স্পিরিটের সঙ্গে একীভূত হয়ে তবে লেখকের মূল ভাবনার এ্যাসোসিয়েশনে আসতে হয় এবং অন্য ছবিতে তখন পাঠকের এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে। কম্যুনিকেশনের ব্যাপারে কমল মজুমদারের ভাষা সাধারণ পাঠকের কাছে জগদ্দল বাধা। স্বভাবতই এত পরিশ্রম এই ভয়ঙ্কর দ্রুত-চলা সভ্যতার যুগে অনেক পাঠকের পক্ষেই করে ওঠা অসম্ভব—এ পরিশ্রম করা প্রায় দুঃসাধ্য তবে 'অন্তর্জলি যাত্রা' করে 'সুহাসিনী পমেটম' দেখতে দেখতে 'শ্যাম নৌকা'র গতিশিথিল স্রোতে যাত্রী একটা বিপন্ন বিস্ময় বোধ নিয়েও দু'একটা ছবি যদি কোনোক্রমে আন্দাজ করতে পারে, তবে খুশি না হয়ে পারে না।

আদতে বাঙালী সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করে কমলকুমার মজুমদার বিষয়ে বোধে ভাষায় ও তাঁর লেখার গোটা প্রক্রিয়াটায় এমন জটিল সৌন্দর্যের ছোপ জুড়ে দেন যে তার সঙ্গে আন্তরিক অপরিচয় ও মাটি নদী পরগনার বাংলাদেশ ও দেশের ঐতিহ্যগ্রন্থী থেকে বহু দূরে ছিটকে পড়া মানসিকতার পাঠককে কমল মজুমদারের একপৃষ্ঠা রচনাও ক্লান্ত করে। কেননা, তা এক পৃষ্ঠা নয়—স্বদেশ

সংস্কৃতি ও স্মৃতিসংস্কারের একটা অধ্যায়। সাধু ভাষায়—বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমের ভাষা কাঠামোর ওপরে দাঁড় করানো নতুন ভাষায় রচিত কমল মজুমদারের রচনায় যেমন গহন অরণ্যের রোমাঞ্চ আছে, ভয় মিশ্রিত বিস্ময় আছে তেমনি একটা দুর্বার টানও আছে সংগীত-শব্দ-রঙ মিলিত শোভাযাত্রার সৌন্দর্যের। কোনো কিছুই বাদ যায় না কমলকুমারের দৃষ্টিতে। এমনকি শ্রেণীতে শ্রেণীতে বর্ণে বর্ণে জাতে জাতে মানুষের রক্তবিনিময়ের ব্যাপারটিকেও নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় লক্ষ্য করে তিনি তাঁর লেখায় পরিবেশন করেছেন। বড় লেখক, তবু কমলকুমার মজুমদার অসার্থক। কেননা, তান্ত্রিক শ্মশানেই বাস করেন। লোকালয়ে কি হচ্ছে না-হচ্ছে তাতে তাঁর কিছু যায় আসে না। দিন বদলের পালার দিকে কমলকুমারের ভ্রূক্ষেপও নেই। তাঁর জগতে তিনি শুধু একাই নন—সম্ভবতঃ নিজেও তিনি তাঁর শিল্প থেকে বিচ্ছিন্ন। কমলকুমার মজুমদার অননুসৃত, অননুকৃত।

পূর্বসূরীদের এই লেখালেখির ভেতর থেকে—অতিবিশাল গ্রন্থজগৎ থেকে দেশ মানুষ শব্দ যা বেরিয়ে এলো তার দিকে তাকিয়ে সাম্প্রতিক লেখকদেরই বুঝি 'একজন ভাবলে, মরচে ধরা টিনের কৌটোর মতো মানুষের মুখ। আর একজন দেখলে, হাসতে হাসতে ট্রেনের মুখ চলে যাচ্ছে।'*

* মতি নন্দী

'কবিতা'

[আধুনিকতার দ্বিতীয় পর্বের কবিতার দুটি মূল সুর : রুক্ষ সর্বশূন্যতায় নিষ্ঠুর একাকিত্ব এবং বহুত্বের মধ্যে ব্যক্তির আত্মোপলব্ধি—কবিতায় বিচিত্র ভাবসংঘাত ও ক্রিয়া বৈচিত্র্য—আঙ্গিক ও প্রকরণগত অভিনবত্ব—জটিলতা এবং দুর্বোধ্যতা—ব্রাহ্ম মরালিটিকে চুরমার করে রবীন্দ্র বিরোধিতার মধ্যে থেকে সাবালকত্ব অর্জন, যদিও রবীন্দ্রনাথই এ পর্বের আধুনিকতার প্রথম কবি—তরুণ কবিদের বিপন্ন বিস্ময় ও ঊষরতা বোধ ভারতীয় জীবন মানসেরই প্রতিচ্ছাপ—আধুনিক কবিতা বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে অনিবার্য কারণেই অবিচ্ছিন্ন হলেও বিদেশী প্রভাব খুঁজতে যাওয়া অর্থহীন—এ পর্বের এক ধারা 'ধ্বংসের ক্ষয় রোগে শিক্ষিত নপুংশক মন'-এর হাহাকার ফুটিয়েছে অন্য ধারায় 'রক্তের অক্ষরে' নিজের মুখ দেখে 'কঠিন'কে ভালোবাসা—ভিন্নতর বাস্তব পরিবেশে তরুণদের স্বাধীনতাপূর্ব রচনাদর্শের সীমাবদ্ধতা থেকে ছাড় পাবার আন্দোলন শুরু।]

ফাঁপা মানুষ—ঠাসা মানুষ। এ ওর গায়ে ঠেস দিয়ে শুকনো গলায় ফিসফিসিয়ে চাপা অর্থহীন আলাপ চালায়, যেন শুকনো পাতায় দীর্ঘশ্বাস পড়ছে অথবা সরাবখানার ভাঙা কাঁচের ওপর ইঁদুরের আনাগোনা চলছে। 'রূপহীন কিমাকার, বর্ণহীন ছায়া / পক্ষাঘাতগ্রস্ত বেগ, অঙ্গভঙ্গী নিশ্চল'[১] মানুষ আর মানুষের জগৎ। এখন দিনের আলোর মতো স্পষ্ট, এই চালেই দুনিয়াদারীর শেষ। হাঁক ডাক দিয়ে নয়, কাৎরানিতেই জীবন আর জগতের খেল খতম। কেননা, 'মানুষের সভ্যতার মর্মে ক্লান্তি আসে / বড়বড় নগরীর বুক ভরা ব্যথা / ক্রমেই হারিয়ে ফেলে তারা সব সংকল্প স্বপ্নের / উদ্যমের অমূল্য স্পষ্টতা।'[২] ব্যক্তি ক্লান্ত—খুব ক্লান্ত। নিজের জীবন নিয়ে ক্লান্ত, ক্লান্ত অন্যের জীবন-মৃত্যু নিয়েও। আর সে ব্যক্তি যখন মনীষাবাদী, তার কাছে তো শরীরের সুখ সুবিধাই সব নয়। কী যেন বোধ তার রক্তের ভেতরে কাজ করে। কী যেন! তার উচ্চৈঃস্বরে স্বগতোক্তি 'আছি

১। ফাঁপা মানুষ—টি, এস, এলিয়ট (অনুবাদ বিষ্ণু দে) ২। মিতভাষণ—জীবনানন্দ দাশ

বিশ শতকের শহরে, কলকব্জার আশ্রয়ে, / ভাগ্যগুণে উচ্চশ্রেণীতেও জন্মেছি, / আমার শরীরের সুখসুবিধের ব্যবস্থা সবই অন্যে ক'রে দেয় / তারা অসংখ্য, তারা অনামী, তাদের দেখা যায় তবু যায় না, / তারা আছে ব'লে ট্রাম চলে, জল পড়ে কলে, / আলো জ্বলে বোতাম টিপলে / আমাদের অন্ন বস্ত্রের ভার তাদেরই উপর / তারা আছে, তারা থাকবে, এটা ধ'রেই নিই, / সভ্যতা তো এই ব্যবস্থারই নাম।'[৩] 'আমার দুর্ভাগ্য এই সকলই জেনেছি'[৪]। 'আমরা মৃত্যুর আগে কি বুঝিতে চাই আর? জানিনা কি আহা, / সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মত এসে জাগে / ধূসর মৃত্যুর মুখ ;—একদিন পৃথিবীতে স্বপ্ন ছিল—সোনা ছিল যাহা / নিরুত্তর শান্তি পায় ;—যেন কোন মায়াবীর প্রয়োজনে লাগে / কি বুঝিতে চাই আর? ..রৌদ্র নিভে গেলে পাখিপাখালির ডাক / শুনিনি কি? প্রান্তরের কুয়াশায় দেখিনি কি উড়ে গেছে কাক?'[৫] এই 'অমেয় জগতে / নিজস্ব নরক মোর বাঁধ ভেঙে ছড়ায়েছে আজ ; / মানুষের মর্মে মর্মে করিছে বিরাজ / সংক্রমিত মড়কের কীট ; / শুকায়েছে কালস্রোত, কর্দমে মিলে না পাদপীঠ / অতএব পরিত্রাণ নাই।'[৬] নাই নাকি? শুধু 'অনুর্বর বালুর উপরে / কর্কশ কাকেরা করে ধ্বংসের গান?'[৭]

স্থানকালপাত্রের আভ্যন্তরীণ গলদের সুযোগে কতকগুলো প্রক্ষিপ্ত ভাবনা ও ঘটনা দীর্ঘস্থায়ী বন্দোবস্ত পেয়ে এমন বাড় বেড়ে গেছে, যার ফলে বাংলা বাবু-কবিতা আপাত দৃষ্টিতে উপরোক্ত বিপন্ন অস্তিত্বের ভয়াবহ ক্লান্তি, শূন্যতা এবং অবসাদগ্রস্ত নির্জনতাকেই—অতীত ভবিষ্যৎ ব্যাপ্ত নিহিলিজমকেই—আধুনিকতা বলে উপস্থিত করেছে। এবং দুধের থেকে মদের প্রভোকেশনই বেশি। নেশা একবার ধরলে জীবনের মর্মান্তিক বিনাশের আগে বড় একটা কাটে না। বাংলা কবিতার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে—গদ্যেও অন্যথা হয় নি। অথচ গায়ে গায়ে থেকেই ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার হুশিয়ারী ছিলো. তুমি আছ 'আপন কৃপণতার পাণ্ডুর মরু দেশে, / পিপাসিতের জন্যে জল নেই সেখানে, / পিপাসাকে ছলনা করতে পারে / নেই এমন মরীচিকাও সম্বল।'[৮] এবং এ জগৎ স্বপ্ন নয়। রক্তের অক্ষরে দেখা গেছে—আঘাত আর বেদনার অভিজ্ঞতায় এসেছে প্রত্যয় 'সত্য যে কঠিন' সে কখনোই বঞ্চনা করে না। আর জীবন হচ্ছে 'আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা জীবন, / সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে, / মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে।'[৯]

৩। খণ্ডবৃষ্টি, ৪। প্রেমিক—বুদ্ধদেব বসু ৫। মৃত্যুর আগে—জীবনানন্দ ৬। নরক—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ৭। ঘরে বাইরে—অমর সেন ৮। পত্রপুট (১১), ৯। রূপনারানের কূলে—রবীন্দ্রনাথ

ষ্ট্রাগল আজীবন। আজীবন সত্যোদ্ধারের সংগ্রাম। সংগ্রামে হারজিৎ আছেই। এক পা এগোনোর জন্যে দু' পা পিছিয়ে যাওয়া—ফেরারী হয়ে যাওয়াও রণ-কৌশল। কিন্তু ব্রাহ্ম মুহূর্তে এগিয়ে আসতে দ্বিধা থাকবে কেন ? 'সাত সাগরের তীরে / ফৌজদার হেঁকে যায় শোনো ; / আনো সব সূর্যকণা / রাত্রি মোছা চক্রান্তের প্রকাশ্য প্রান্তরে। / —এবার অজ্ঞাতবাস শেষ হোলো ফেরারী ফৌজের।'[১০] 'পড়ে থাক এ আত্মঘাতী অনাত্মস্ত খেয়োখেয়ী / ঘেয়ো কুকুরের মতো অন্ধকারে উচ্চকিত দিন / শুধু স্বর্ণপদলেহী রাজত্বের ভাগ বাটোয়ারা শত শিখিধ্বজ / দুঃস্বপ্ন গৌরবে কল্পনার ফোয়ারায় বিদেশীর পায়ে দেহি-দেহি / স্বদেশের রক্ত পঙ্কে নির্লজ্জ রৌরবে। / চলো যাই জীবনের তরঙ্গ মুখর সমুদ্র সৈকতে .জীবন মুখর যেথা সুস্থ প্রাণ সচ্ছল ভেলায়।'[১১] অন্ধকারের বুকে শব্দ উঠতে দেরী হয় নি। 'কারা দৃপ্ত পদক্ষেপে বেগে / সম্মুখে এগোয় পথে রাত্রি শেষে মরীয়া আবেগে দীর্ঘদীপ্ত অভিযানে ; সে-গতির তাপ ভগ্ন মনে / অকৃত্রিম অভিজ্ঞান সৃষ্টি করে যুগ সন্ধিক্ষণে।'[১২] আশায় আত্মহারা হয়ে ওঠে অন্ধকারের অন্তরাল চৈতন্য 'এলো কি মুক্তি / রঙে রঙে মুছি / রাত্রি, উষার একী বিপ্লব !'[১৩] আর দেখতে দেখতে 'মৃত্যু ভয়কে ফাঁসিতে লটকে দিয়ে / মিছিল এগোয় / আকাশ বাতাস মুখরিত গানে / গর্জনে তার / নখদর্পণে আঁকা / নতুন পৃথিবী, অজস্র সুখ, সীমাহীন ভালোবাসা।'[১৪] ব্যক্তি তো চিরকালই অসহায়। একা আর বোকা একই কথা। পারিপার্শ্বিকের নিষ্ঠুর বাধার বিরুদ্ধে—অত্যাচারের বিরুদ্ধে—অসহায় মানুষের অস্তিত্ব বজায় রাখতে উজ্জ্বলতম আবিষ্কার বিপ্লব—বিপ্লবের মিছিল। ব্যক্তির বিপন্ন সত্তার সমান্তরাল আধুনিকতার সমষ্টি-চেতনা। যে সমষ্টিতে ব্যক্তির স্বকীয়তা লুপ্ত হবার কথা ওঠে না। 'এক হোক এককের বহু বহু বহুধায় এক / সোঽহ কাময়ত দ্বিতীয়ো মে জায়েতেতি / . সেই একতায় নিঃশেষ হোক এক ও বহুর নেতি।'[১৫]

আধুনিকতার দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলনের মূলত এই দুটিই মূল সুর এবং সুস্পষ্ট ধারা। রুক্ষ সর্বশূন্যতার নিষ্ঠুর একাকিত্ব এবং বহুত্বের মধ্যে ব্যক্তির স্বকীয়তার উপলব্ধি। মুখ্য সুর—কিন্তু এ দুটিই সব নয়। একটু খতিয়ে দেখলেই আধুনিক বাংলা কবিতায় আরো কয়েকটি প্রচ্ছন্ন সুর ধরতে পারা যায়। কোনো

১০। ফেরারী ফৌজ—প্রেমেন্দ্র মিত্র ১১। ওর্ঁাও গান—বিষ্ণু দে ১২। দিনযাপন—কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ১৩। অতিক্রান্তি—মণীন্দ্র রায় ১৪। একটি কবিতার জন্যে—সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৫। বহুবড়বা—বিষ্ণু দে

ক্ষেত্রে অবক্ষয়িত পরিবেশে বিপন্ন একাকিত্ব ও বহু মিলে একত্বের বোধ সৃষ্টি করেছে, আবার কোথাও শুদ্ধ শিল্পের ধুয়ো তুলে মানুষের চিরপদার্থ সন্ধানের প্রবণতা নতুন কবিদের মধ্যে প্রকট হয়ে উঠেছে। এবং বোধের দিক থেকে বহু ভাব সংঘাত ও ক্রিয়া বৈচিত্র্যের চিহ্ন নিয়ে বাংলা আধুনিক কবিতার প্রবাহ নতুনতর চেহারা পেয়েছে। এরই সঙ্গে এসেছে উপকরণ ও আঙ্গিক প্রকরণের ভিন্নত্ব। জটিলতা ও দুর্বোধ্যতা। তাছাড়া কবিতার অঙ্গ গঠনে বেপরোয়া নীতি গ্রহণ করে কিছু কিছু কবি প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম মরালিটিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শব্দ প্রয়োগে, ভাব ও ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে অতি শুচিবাই বরদাস্ত করলেন না —একটা স্বাধীন মনোভঙ্গীতে নিজেকে বেআব্রু প্রকাশ করলেন কবিতার মধ্যে। আবার কোনো কোনো কবি নিজের উলঙ্গ অনুভবকে কদর্য ভাবে উপস্থিত করাটাকে খুব একটা বড় ফ্যাকটর বলে মনে না করে বরং ধারালো বক্তব্যকেই প্রধান করে তুললেন। তাঁরা চার দিকের বিপন্ন বাস্তবের মধ্যে নিজেদের স্থাপন করে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত বোধকে নিজেদের নতুন চেতনা দিয়ে ধাক্কা দিলেন এবং কবিতাকে গণবাসনার ম্যানিফেস্টো হিসেবে উপস্থিত করলেন। তবে যিনি যে-ফ্রণ্ট থেকেই লিখুন না কেন প্রায় সবার মধ্যেই ভাবের থেকে ভাবনা, আবেগের থেকে চিন্তা বড় হয়ে উঠলো। হৃদয়ের বদলে মেধাই বেশি প্রাধান্য পেলো কবিতায়।

চরিত্রগত দিক থেকেই আধুনিকতার দ্বিতীয় পর্বের কবিতা ভিন্ন স্বাদের হয়ে উঠলো। এ পর্বের একজন কবির সঙ্গে অন্যজনের আসমান জমিনের ফারাক। বিশ শতকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে বিভিন্ন কবি তাঁদের স্বতন্ত্র ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য দিয়েই উপলব্ধি করেছেন এবং সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন। জীবনানন্দ দাশের মায়াবী নদীর দেশ বা অনন্ত সময়ের ক্লান্তি আর সুধীন্দ্রনাথ দত্তর অবক্ষয়িত মরীচিকার প্রেত নৃত্যাঙ্গন মরুভূমিতে প্রপন্নতা এক নয়। গাঢ় গভীর অনুভূতির স্পর্শকাতরতা ও মননের তীক্ষ্ণ তীব্র রূঢ় সৌন্দর্য বোধ দুই বিপরীত দিগন্তের। আবার বুদ্ধদেব বসুর অভিশপ্ত দেবশিশুত্বের পাপ বোধ এবং সকলই জেনে ফেলার দুর্ভাগ্য এবং অমিয় চক্রবর্তীর আন্তর্জাতিক মানুষের কৃষ্টি-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য জ্ঞান আর রবীন্দ্রসুলভ প্রসন্নতা-তিয়াশা সম্পূর্ণই ভিন্ন। পরবর্তী সময়ের সমর সেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যেও মিল নেই। সবাই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের—বিচিত্র দার্শনিক ভিত্তির ওপরে দাঁড়িয়ে। তবু আধুনিকতার আন্দোলনে সেদিন বৈচিত্র্যের মধ্যেই ঐক্য গঠিত হয়েছিলো—ভাবনায় ভাবনায়

দুস্তর ব্যবধান থাকলেও সাবালকত্ব অর্জনের সমস্যা সমাধানের জন্যে গড়ে উঠেছিলো যুক্ত ফ্রন্ট। রবীন্দ্রনাথের মতো সব কিছুর মধ্যেই প্রসন্ন থাকার ঐশী শক্তি এবং সমগ্রতা বোধ এ সময়ের কবিদের থাকার কথা নয়—নেইও। খণ্ড ছিন্ন অংশত্বের অধিকার নিয়ে দেশ ও জাতির আভ্যন্তরীণ ঝাঁঝরা দিকটার নিষ্ঠুর স্বরূপ দেখে এঁরা যে সংশয় ক্লান্তি বিতৃষ্ণা ও হতাশা অনুভব করেছেন, তাকে উপেক্ষা করে রবীন্দ্রনাথের মতো তপোবন ভারতের সৌন্দর্যলোকে ছোটা এঁদের পক্ষে সম্ভব হয় নি—ছুটতে চানও নি কেউ। এঁরা হয় নিষ্ঠুর বাস্তবে মুখ থুবড়ে পড়েছেন, নয়তো তার সঙ্গে লড়াই করেছেন। এবং এটাই তাঁদের উত্তরণ দিয়েছে—আধুনিক করেছে।

এ উত্তরণ পেতে কিন্তু কম বেগ পেতে হয় নি তরুণ কবিদের। এঁদের মূল সমস্যা হয়ে দাঁড়ালেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অথচ তিনি স্বীকার করতেই চান নি বিদ্রোহটা। প্রথমে তো 'শেষের কবিতা'য় তিনি তরুণ কাব্য আন্দোলনটাকে ঠাট্টা করে উড়িয়েই দিয়েছিলেন। নতুনতর হবার চেষ্টাকে উপহাস বিদ্রূপ শ্লেষ ও আক্রমণে তুলোধোনা করে এক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অন্য রবীন্দ্রনাথের কন্‌ট্রাডিকশনটা ব্যক্ত করে নতুন সময়ের সঙ্গে এ্যাডজাষ্ট করে নেবার চেষ্টাই তিনি প্রাঞ্জল করে তুলেছেন 'শেষের কবিতা'য়। বিবাদ যিনি মানতে চান না তাঁর সঙ্গে বিরোধ করাটাই বিপদ। 'কল্লোল'-এর কবিদেরও সেটাই বিপদ হয়ে দেখা দিয়েছিলো। রবীন্দ্র-অন্য হবার দুর্মর তাগিদে এবং রক্ত-মাংস-অনুভূতির নির্যাসিত নিজেদের কথা নিজেদের মতো করে বলার তীব্র বাসনায় তরুণ কবিরা তাঁদের বিদ্রোহের একটা নির্দিষ্ট আকার দিতে পেরে-ছিলেন বলেই তা রবীন্দ্রনাথকে অল্প সময়ের জন্যে লড়াইয়ে নামিয়ে আনতে পেরেছিলো। মহাভারতের গুরু দ্রোণাচার্যের মতোই রবীন্দ্রনাথ 'কল্লোল' 'কবিতা' 'পরিচয়'-এর বিদ্রোহীদের লড়াইটাকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি জানালেন। কেননা তিনি দেখেছিলেন, এঁরা কেউ সার্বভৌম শক্তি নয়, পাঁচ জনের সম্মিলিত শক্তি, নিজ নিজ দিক থেকে এঁরা বাংলা কবিতায় বোধবিন্যাসের সংহতি যেমন এনেছেন, তেমনি এনেছেন বুদ্ধির প্রদীপ্তি, চিন্তার সূক্ষ্মতা, বিষয়ের ঘনত্ব ও শব্দচয়নের নিপুণতা। বেপরোয়া কবিবাক্য গঠনের ক্ষমতায় এঁরা বাংলা কবিতার যেমন পৌরুষ সৃষ্টি করেছেন তেমনি গদ্য ও পদ্যের ভাসুর-ভাজ সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিয়ে কবিতার অন্তরে বাহিরে অঙ্গে অঙ্গে নতুন কালের মর্জি ফুটিয়ে তুলেছেন। আর এজন্যেই বুঝি রবীন্দ্রনাথের স্বেচ্ছাবসর

গ্রহণের বাসনা জেগে থাকবে : 'কথার উপরে কথা চলেছ সাজিয়ে দিন রাতি, / এইবার থামো তুমি / থামিবার দিন এলে থামিতে না থাকে যদি জানা / নীড় গেঁথে গেঁথে পাখী আকাশেতে উড়িবার ডানা / ব্যর্থ করি দিবে / থামো তুমি থামো।'[১৬] নানা রবীন্দ্রনাথের একখানা মালা গাঁথা তবু থামে নি। 'মহুয়া'কালীন ভাবনা 'পুনশ্চ'তে রূপায়িত হয়ে আরো দীর্ঘ দিন পর্যন্ত—'শেষ লেখা' পর্যন্তই নিরবচ্ছিন্ন। এবং গদ্য কবিতা—নতুন কালের উপকরণ ও মর্জির উপস্থাপনে রবীন্দ্রনাথই লিখলেন রবীন্দ্র-অন্য কবিতা। কিন্তু জাতে তা রবীন্দ্র-নাথেরই কবিতা—সমগ্র বোধের কবিতা।

বোঝা গেলো, স্বভাব কবিত্ব যা বিপদ, তাঁর শেষ পর্বের সমসাময়িক তরুণ কবি সমাজের সামনে রবীন্দ্রনাথ সেই বিপদ হয়েই দীর্ঘজীবী থাকায় একটা বাস্তব সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছিলেন। 'নানা রবীন্দ্রনাথের' একজন রবীন্দ্রনাথ 'চণ্ডীদাস সমস্যা'-র মতো বিদঘুটে একটা ব্যাপারে বাংলা কবিতা পাঠককে জড়িয়ে না ফেললেও, বাংলা কবিতা রচনাকারদের বিব্রত করেছেন খুবই। তাঁর মৃত্যুর চব্বিশ পঁচিশ বছর বাদেও স্ব-কণ্ঠস্বরের মুক্তি এবং সাবালকত্ব অর্জনের দাবীতে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার কোনো অতি তরুণ কবিকেও যখন ক্রুদ্ধ চীৎকার দিতে হয়, 'তিন জোড়া লাথির ঘায়ে রবীন্দ্র রচনাবলী লোটায় পাপোসে'[১৭] তখন বুঝতে বাকী থাকে না তাঁর অগ্রজ কবিদের, ঠিক একই কারণে, কী রক্তদগ্ধ আবেগ নিয়ে তুলকালাম আন্দোলনে লিপ্ত হতে হয়েছিলো। আধুনিক কবিতার যে কোনো পাঠকের কাছেই স্পষ্ট যে, আধুনিক কবিতা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিদের রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই একটা সংঘর্ষ-সমন্বয়ের দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়েছে বহুদিন। ঠিক এই সময়েই বিশ্বনামক অতি-বিস্তৃত অজানা এবং আবছা-জানা অসীমটা যুদ্ধের দৌত্যে আধুনিক কবির কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠে বিশ্বভর জটিলতা ও অবমনস্কতার করাল আক্রমণে কোলকাতার সব সবুজপাতা হলুদ করে ফেলেছিলো। 'আমরা যাইনি যুদ্ধে / শব আর শেয়ালের মাঝখানে / জানি নাই কম্পিত মুহূর্ত / তবু বারুদের গন্ধ এখানের বাতাসে কি নেই ?' বলে প্রেমেন্দ্র মিত্র যে বক্রোক্তি উপস্থিত করেছিলেন তার অর্থ—'আছে'। এবং তা খুবই তাৎপর্যবহ। এই বারুদের নিষ্ঠুর প্রজননে ইউরোপীয় সমাজ জীবনে যে বীভৎসা, ঊষরতা এবং অবক্ষয়ের বলয়গ্রাস, তাই-ই সরাসরি অন্ধকার ছায়া ছড়িয়ে দিয়েছে তরুণ বাঙালীর ভাবাকাশে।

১৬। পত্রপুট (১৬)—রবীন্দ্রনাথ ১৭। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বন্ধুত্ব, পবিত্র প্রেম, বাঁচা, জীবন, শান্তি এবং ঈশ্বর সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠিত সকল ধারণা ধ্বসে গিয়ে দিশাহারা করে তুলেছে ঘরে বাইরের মানুষকে। শুধুমাত্র টিঁকে থাকার প্রাণান্ত চেষ্টায় সুনীতি, সুস্থ থাকা, আত্মসংযমে স্থির থাকার নীতিনিয়ম উড়ে গিয়ে সেখানে জুড়ে বসেছে অনিবার্য নৈরাজ্য। ফলে, সমগ্র মূল্যবোধ ভেঙে যাওয়ার হাহাকারকেই সম্বল করে কবিতা রচনা করতে এসে নরক, মরুভূমি আর রমণী ও রজনীতে সমর্পিত জীবনের ব্যক্তিগত বোধ বিকীরণ করা ছাড়া উপায় থাকে নি বাঙালী কবিদের। প্রকাশিত হয়ে পড়েছে দুর্গম অন্তরগুহাস্থ অবৈধ ঈপ্সা, যা চেরাগ জ্বেলে ধর্ষণ করেছে সামাজিক শুভবুদ্ধি। তৎসহ দায়িত্বহীন যৌনাকাঙ্ক্ষার কাৎরানি ও গোঙানির শব্দ। ইদিপাস-মন্যতা, হীনম্মন্যতা ও সংঘবদ্ধ নির্জনতা চাষের ফলশ্রুতিতে বাংলা কবিতার জগতে উঠে এলো নগর জীবনের অন্ধকার আবর্ত। সেই সঙ্গেই সদ্যোজাত সোভিয়েত দেশের নতুন উৎসাহ—সুস্থ জীবন ধারণা প্রতিষ্ঠার উদ্যম এবং দৃশ্যমান সাফল্য সমান্তরাল রেখায় এসে কোলকাতার সেই একই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একাংশকে নৈরাশ্যের 'বিরুদ্ধ শক্তি' হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। তাঁরা আশ্বাস পেয়েছেন, শক্তি পেয়েছেন, বিশ্বাস করার মতো জোর পেয়েছেন মার্কসীয় সমাজ দর্শন থেকে—ভরসা রাখতে পেরেছেন সংঘশক্তির ওপরে। এঁদের তল্লাসী ঈশ্বরের জন্যেও নয়, 'আত্মা' আবিষ্কারের জন্যেও নয়—সমাজশক্তির মধ্যে জীবনবিকাশের প্রতিবন্ধকগুলোকে জেনে নেতির নেতি অনুসরণের মাধ্যমে 'নতুন পৃথিবী অজস্র সুখ সীমাহীন ভালোবাসা'র আগ্রহে বহুকে এক করার সূত্র নিরূপণের জন্যে। এবং তাই কবিদের একাংশ মার্কসীয় দর্শনের প্রয়োগে সিদ্ধি খুঁজেছেন। আশা-নিরাশার বা মিছিল-নির্জনতার পরস্পরবিরোধী বোধে কখনো কখনো কিছুটা দোলায়িত হলেও এই কবিগোষ্ঠীর সমস্যাকে এড়িয়ে গিয়ে বা সমস্যার সঙ্গে মোকাবিলায় পর্যুদস্ত হয়ে হাত তুলে দেওয়া বা পলায়নকে জীবিকা করার কোন প্রশ্নই জাগে নি। কিন্তু সময় কাউকে স্থিরতর থাকতে দেবার মতো নয়—প্রসন্ন থাকতে দেবার মতো তো নয়ই। কেউই তাই রবীন্দ্রনাথের মতো দুঃখ-মৃত্যুকে উদাসীন প্রসন্নতায় দেখতে পারেন নি। অতএব যাঁরা 'পরিত্রাণ নাই' জেনে সংঘবদ্ধ উত্থানের আহ্বান জানিয়েছেন তাঁদের সবারই বিদ্রোহ প্রসন্নতাসিদ্ধ রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে যেমন তুমুল হয়ে উঠেছিলো, তেমনি সোচ্চার হয়ে ছিলো বাস্তব স্থানকালপাত্রের প্রতিষ্ঠিত স্থবিরত্বের বিরুদ্ধে।

বাইরের চেহারায় আন্দোলনের প্রত্যক্ষ চিহ্ন ধরেই আধুনিক কবিতার

আবির্ভাব। আগেই বলা হয়েছে রবীন্দ্রনাথই আধুনিকতার দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলনের প্রথম কবি। কালের তালে তালে স্বভাব কবি এগিয়ে চলেন এবং অতি-সাম্প্রতিকতার স্পর্শও তাঁকে বেশ আলোড়িত করে। রবীন্দ্রনাথেরও ঋতু বদল এবং রীতি বদলের ধুয়োটা আর কিছুই নয়, কাল চৈতন্যের সঙ্গে আত্মসম্মিলনের ফলে আঙ্গিকগত এবং আলম্বন-বিভাবগত পরিবর্তন, বিষয়বস্তু ও ভাষার নবীকরণ ও রূপগত আধুনিকীকরণ। এ সময়েও আপন কবিস্বভাবেই রবীন্দ্রনাথ সাময়িক ভাবে তাঁর অখণ্ড আদর্শবাদ থেকে নিষ্ঠুর বাস্তবে নেমে এসে অর্থাৎ প্রশান্তি থেকে অশান্তিতে জড়িয়ে পড়ে সমসাময়িক জীবনমানসের বিক্ষোভ সংক্ষোভকে স্বকীয় অভিজ্ঞতার আলোকে প্রতিফলিত করে তাদের নতুন তাৎপর্য দিয়েছিলেন। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বাস্তব সমগ্রকে বৃহত্তর বাস্তবাংশ হিসেবে গ্রহণ করেই তাদের নতুন মূল্য যোজনা করেছেন এবং আধুনিক সমস্ত ঘটনাতেই বিচলিত হয়ে কবিতা রচনা করেছেন। পুরোনো কাব্য ধারণার সঙ্গে লড়াই করে নতুন কাব্যাদর্শের ভিত্তিও স্থাপন করেছেন তিনিই। শুধু কবিতা লিখেই নয়, প্রবন্ধ রচনা করেও আধুনিক কবিতার স্বপক্ষে রবীন্দ্রনাথ বিপুল বলিষ্ঠতা দিয়ে ওকালতি করেছেন—কবিতাকে গদ্যের পৌরুষ এবং চরিত্র দেবার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন ঝানু আধুনিকের মতো।

এ ব্যাপারে বিস্মিত হবার কিছু নেই। রবীন্দ্র সাহিত্যই সাক্ষ্য দেয় যে তিনি নানা রবীন্দ্রনাথ হয়েছেন। অর্থাৎ আধুনিক হয়েছেন চিহ্ন-সহ অনেক বার। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ একাধারে আধুনিক, রোমান্টিক এবং এসকেপিষ্ট। এবং এ জন্যেই যত সহজে তিনি এ সময়ের আধুনিক মানসিকতার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন, ঠিক তত সহজেই বাস্তব ভূমি থেকে তাঁর পলায়ন সম্ভব হতে পেরেছিলো। আমরা জানি, কবিজীবনের প্রথম পর্বে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ। বলাবাহুল্য, জাতীয়তাবোধ তাঁর আন্তর্জাতিকতাবোধের সঙ্গেই যুক্ত। কিন্তু একটা বৃহত্তর বাস্তবতার অংশ হিসেবে প্রাথমিক পর্বের জাতীয়তাবোধকে দেখার অনিবার্য ফলশ্রুতিতেই অতি-উৎসাহিত কবির পক্ষে 'শিবাজী উৎসব'-এর মতো সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী কবিতা রচনা সম্ভব হয়েছিলো। পরবর্তী কালের এ্যাবষ্ট্রাক্ট জাতীয়তাবোধের ধারণা সেদিন থাকলে তিনি ওই কবিতাটি কিছুতেই রচনা করতেন না বলেই বিশ্বাস। কেননা তিনি প্রজ্ঞা দিয়ে বুঝেছিলেন জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিকতাবাদের বিরোধী নয়। তাই 'একজাতি একপ্রাণ একতা'র শ্লোগান মুখে করে জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা

আন্দোলন যখন 'বিলিতি বর্জন' আন্দোলন হয়ে উঠলো, খুব স্বাভাবিকভাবেই তা রবীন্দ্রনাথের এ্যাবষ্ট্রাক্ট জাতীয়তাবোধকে আহত করেছে। ফলে, দেখা দিয়েছে হতাশা—একটা গভীর বেদনা বোধে রবীন্দ্রনাথ স্তরে স্তরে জমে ওঠা অন্ধকারের নির্জনে দাঁড়িয়ে 'ঘাটেরও নয় পাড়েরও নয়' এমন মাঝখানের 'জন' হয়ে খানিক বাদেই পলায়ন করেছেন প্রাচীন ভারতে। পলায়ন করেছেন জানিয়ে শুনিয়েই : 'এবার আমায় বিদায় দেহ ভাই / কাজের মাঝে আমি তো আর নাই।' এবং এটা ঘটেছে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে।

সমগ্র জীবন জুড়েই রবীন্দ্রনাথ এমনি দুই বিপরীত বিন্দুর মধ্যে দোদুল্যমান থেকেছেন—বাস্তবতায় পদার্পণ এবং ক্ষণপরেই প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্যলোকে প্রত্যাবর্তন। কীট্সের হেলেনিক সৌন্দর্যশক্তির মতোই প্রাচীন ঔপনিষদিক তপোবনের সৌন্দর্যশক্তি রবীন্দ্রপ্রতিভার সর্বদুঃখহর আশ্রয়। রূঢ় বাস্তবতা তাঁর আদর্শবাদী মনোভঙ্গীকে আহত করলেই তিনি রোমান্টিক ডানা মেলে বাস্তব থেকে পলায়ন করে আত্মরক্ষা করেছেন—আদর্শবাদী বাস্তবতাকে অক্ষত রাখতে তৎপর হয়েছেন। এই কাব্যচরিত্র থেকেই 'খেয়া'র দীর্ঘকাল বাদে আশা ও আশাভঙ্গের কবিতাগুলো সংযোজিত হয়েছে 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থে। পশ্চিমের মানুষকে যে অ-নিশ্চিতির দর্শন—যে উদ্দেশ্যহীন ক্রমিক হয়ে চলার বার্গসঁ গতিবাদ—অস্তিমূলক চিন্তায় আস্থাবান করে তুলতে চেয়েছিলো, রবীন্দ্রনাথ তার সঙ্গে ঔপনিষদিক যাত্রাবাদকে ককটেল করে নিয়ে সৌন্দর্য হয়ে উঠতে আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং অভয় দিয়ে খুবই উৎসাহের সঙ্গে বলেছিলেন, 'ভয় নাই, ভয় নাই যাত্রী / ঘরছাড়া দিকহারা অলক্ষ্মী তোমার বরদাত্রী।' কিন্তু 'যা কিছু সঞ্চয়' 'দুই হাতে ফেলে ফেলে' যাবার আহ্বান জানালেও একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন মর্মান্তিক হয়ে উঠেছিলো কবির মধ্যে, 'রাত্রির তপস্যা সেকি আনিবে না দিন ? / নিদারুণ দুঃখরাতে / মৃত্যু ঘাতে / মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্তসীমা / তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা ?'—যেন সন্দেহ ছিলো। এই সন্দেহ করার প্রবণতা এবং 'দুঃখরাতের' চেতনাই রবীন্দ্রনাথকে আধুনিক কবির চরিত্র দিয়েছে।

আধুনিক সমস্যা পীড়নে কণ্টকাকীর্ণ চারদিকের বাস্তবকে সত্য-চিত্র-চরিত্রে প্রকাশ করার জন্যেই কবিতায় গদ্যের কাঠিন্য দরকার হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথও কবিতায় কথ্য রীতি ব্যবহার করে প্রকাশকে ধারালো করে তুলেছেন। কিন্তু আধুনিক জীবন যন্ত্রণা ও জিজ্ঞাসার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে এসে খুব বেশি দিন

ঊষর ভূমিতে বিচরণ রবীন্দ্রনাথের ধাতে পোষাবার কথা নয়। তরুণ আন্দোলনকে শুধুমাত্র সক্রিয় স্বীকৃতি জানিয়ে অচিরেই আবার প্রস্থান করেছেন আনন্দলোকে —তাঁর সৌন্দর্যলোকে। আঙ্গিক প্রকরণে আধুনিক আবিষ্কারের ছাপ থাকলেও বোধের ক্ষেত্রে পরবর্তী কবিতাগুলোতে কবির অর্জিত প্রশান্তিই স্থায়ী ভিত্তি। এখানেই আধুনিক কবিরা রবীন্দ্রনাথের থেকে স্বতন্ত্র। নির্মম বাস্তবতার সঙ্গে তরুণরা কেবল মোকাবিলাই করে গেছেন। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত দেখেছেন অসীম দুঃখ—মরু আর অমানিশা; নজরুল 'বিদ্রোহী রণক্লান্ত'; রবীন্দ্র প্রশান্তি থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে নির্জন হেমন্তের শীতে অবসন্ন ক্লান্ত জীবনানন্দ অনন্তসময়গ্রন্থির সঙ্গে বাঁধা পড়ে অবসান্ত; দুর্মর অস্থিরতায় সমস্যার নিপীড়নে রূঢ় রুক্ষ নাস্তিত্বে মুখ থুবড়ে পড়েছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত; অতীত ও বর্তমানের অনুর্বরতায় অবাধ সঞ্চরণশীল বিষ্ণু দে-র চলেছে 'শিল্পের শেষ শান্তি' অনুসন্ধান; আদিগন্ত সংসারের দূর প্রান্তে কোথাও কি নীড় আছে জেনে রবীন্দ্র প্রশান্তির অনুধ্যানাশ্রিত প্রেরণার আন্তর্জাতিক ধূলি মালিন্যের মধ্যেই নিরন্তর যাত্রী হয়ে তার এষণা বেসে যাচ্ছেন অমিয় চক্রবর্তী; আন্তর প্রেরণায় কবিতা রচনা করতে গিয়ে মানব মানসের চিরপদার্থের রহস্য সন্ধানে সমাজনীতি বা রাজনীতি পরিহার করে আপন মনের কাছে চলে গেছেন 'অভিশপ্ত দেবশিশু' বোধের বুদ্ধদেব বসু; গ্লানিকর আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে মোকাবিলা করতে গিয়ে ধ্বসে পড়েছেন শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের সমর সেন যাঁকে সাম্যবাদী ফতোয়া উদ্ধারের শ্লোগান দিলেও কবিতার সিদ্ধি দেয় নি; সংবাদ আর শ্লোগানকে কবিতা করার সক্ষমতায় পদাবলীর অনুষ্টুপ রচনা করে সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে এক রকম করে মেনে নিতে হয়েছে 'ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত'। লক্ষ্য করার যে, সবাই নির্মম সভ্যতার বাস্তব পৃথিবীতে দাঁড়িয়েই শেষ অব্দি মোকাবিলা করেছেন—অন্বিষ্ট খুঁজছেন ব্যক্তির মধ্যে বা সমষ্টির মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের মতো সর্বদুঃখহর আশ্রয় নেই কারুর।

তবে একথা নিশ্চিত যে, নিরবচ্ছিন্ন গতিতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ঋতু এবং রীতি বদলে বদলে ক্রমউত্তরণ লাভ করেছে। সার্বজনীন এবং সমসাময়িক জীবন চেতনাকে উদার মানবিকতার দৃষ্টি কোণ থেকে গ্রহণ করার আর্তিই তাঁকে আধুনিক সাহিত্যক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট আসনে স্থায়ী করেছে। তরুণ কবিদের কারুর পক্ষেই তাঁকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নি—রবীন্দ্র পরিমণ্ডল ছিঁড়ে তবে বাংলা কবিতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে দাঁড় করাতে হয়েছে। আধুনিক কবিতার

কবিরা সমস্যা সচেতন হয়েও তীক্ষ্ণ জীবন চেতনাকেই ভিত্তি হিসেবে নিয়েছেন। অতি সমস্যা-সচেতনা কোনো কোনো কবির কবিতার শিল্পরূপকে আহত করেছে যেমন, তেমনি অতিরিক্ত বাস্তব চেতনা কোনো কোনো কবির শিল্পী-প্রকৃতির প্রতিকূল হওয়ায় এবং রুচির অনুকূল না হওয়ায় তাঁরা অন্তরাশ্রয়ী হতে বাধ্য হয়েছেন। দেখা গেছে, জীবনের অতি নগণ্য অনুভূতি এবং গভীর গাঢ় সমস্যা জটিলতার অভিজ্ঞতা তুল্যমূল্য হয়ে উঠেছে এবং অন্তরাশ্রয়ী কবিরা তাঁদের ব্যক্তিগত অনুভূতিমালাকে—কখনও বা কল্পনা বিলাসকেই—শিল্পপ্রতিমায় পর্যবসিত করেছেন। আগেই বলা হয়েছে, তরুণ আধুনিকদের পটভূমি ছিলো খণ্ডিত—প্রতিভারও সমগ্রতা তাঁদের পাবার কথা নয়। তাই খণ্ডিত প্রতিভা এবং প্রকাশ শৈলী প্রশংসার দাবী রাখলেও তার স্বপক্ষে সার্বজনীন স্বীকৃতি জোটে নি। অথচ, রবীন্দ্রনাথ সার্বজনীন স্বীকৃতিরই প্রতীক—নতুন এবং পুরনো ভাবধারা এক রবীন্দ্রনাথেই ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত। ফলে, তিনিই প্রথম দিকে দিগন্ত দূরের কবিদের মধ্যেকার সংযোগ সূত্র হয়ে উঠেছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে রবীন্দ্রনাথকে পরিগ্রহণের সমস্যাতেই আলোড়িত। বাংলা গল্প উপন্যাসের মতো কবিতাতেও রবীন্দ্র ঐতিহ্যের—প্রসন্ন সুন্দর মানবিকতার আদর্শের—বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষিত হলেও তরুণ কবিদের অনেকেই জীবনের গভীরে ঠিক প্রবেশ করতে পারেন নি। কিন্তু বিদ্রোহটা ছিলো খাঁটি। নিষ্ঠুর বাস্তবকে আকণ্ঠ পান করে তরুণের অভিযান শুরু হয়েছিলো প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দুই যুগন্ধর প্রতিভার দেশ থেকে, তাঁদের চৈতন্যে কখনো রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যলোক ও জীবনবাদিতা কখনো বা এলিয়টের রুক্ষ উষরতা ও মূল্যবোধনষ্ট মানুষের হাহাকার এসে ঝাপটা দিয়েছে।

অন্যান্য বহু বিচিত্র ভাব সংঘাত এবং শৈল্পিক চিহ্ন—পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের নানামুখী সাহিত্য প্রেরণা ও রূপরীতিগত আন্দোলনের ছাপ আধুনিক বাংলা কাব্য-শরীর ধারণ করলেও তার শিকড় বাঙলা দেশের শহরেই প্রোথিত। কোন কারণেই তার ছিন্নমূল হবার দুর্ভাগ্য ঘটে নি। আধুনিক কবিতার সচেতন পাঠকের কাছেই ধরা পড়ে কবি এবং তার পারিপার্শ্বিকের চরিত্র—এ যুগের জখম চৈতন্য এবং তা থেকে উত্তরণের দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও সিদ্ধি—আধুনিক ব্যক্তি সংবিতের প্রকাশ। এখানে আধুনিকতার দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলনের ভাব পরিমণ্ডলের সামান্য পরিচয় উপস্থিত করা যাচ্ছে :

'এই জীবনের বোঝা আমার কত, / হৃদয় তলে শত কাঁটার ক্ষত, / ভেবে-

ছিলেম ঘুচিয়ে ধূলা যত / হব নিষ্কলঙ্ক' [১৮] 'I have lost my sight, smell, hearing, taste and touch : / How should I use them for your closer contact ?'[১৯] 'এ অমাবস্যায় / বল্গাহারা কালো অশ্ব ঊর্ধ্বশ্বাসে ধায় / কালো চিন্তা মম / আত্মঘাতী ঝঞ্ঝা সম......যাক ধেয়ে। / সৃষ্টিহীন দৃষ্টিহীন রাত্রি পারে / ব্যর্থ দুরাশারে / নিয়ে যাক— / অন্তিম শূন্যের মাঝে নিশ্চল নির্বাক'[২০] 'I have known them all / Have known the evenings, mornings, afternoons, / I have measured out my life with coffee spoons.'[২১] 'মৃত্যুর গ্রন্থি থেকে ছিনিয়ে ছিনিয়ে / যে উদ্ধার করে জীবনকে / সেই রুদ্র মানবের আত্মপরিচয়ে বঞ্চিত / ক্ষীণ পাণ্ডুর আমি '[২২] 'I am tired of my own life and the lives of those after me, / I am dying in my own death the death of those after me.'[২৩] 'দিন রাত মনে হয়, কোন আধমরা / জগতের সঙ্গে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে আছি' [২৪] 'This form, this face, this life / living to live in a world of time beyond me ; let me / resign my life for this life...'[২৫] 'এ জন্মের সত্য অর্থ স্পষ্ট চোখে জেনে যাই যেন / সীমা তার পেরোবার আগে' [২৬] 'And we thank thee that darkness reminds us of light.'[২৭] 'দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে / এসেছে আমার দ্বারে...জীবনের মিথ্যা এ কুহক / পদে পদে এই বিভীষিকা, দুঃখে পরিহাসে ভরা / ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি— / মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে।'[২৮] —জীবনের বোঝা, বিস্বাদ, সংবেদনহীনতা, অন্ধকার অমাবস্যা রাত্রির কালো চিন্তা, সব জেনে ফেলে জীবনকে কফির চামচে মেপে ফেলা, জীবন মরণ নিয়ে ক্লান্তি, আধমরা জগতে মৃত্যুগ্রন্থি থেকে জীবন ছিনিয়ে বাঁচা—জীবন ত্যাগের বাসনা, সত্যোদ্ধারের আপ্রাণ প্রচেষ্টা—জীবনের মিথ্যা কুহক, বিভীষিকা, দুঃখ, ভয় এবং মৃত্যুর অন্ধকার স্বরূপ। আধুনিক কবিদের অতি ব্যাপক ধারার দুই স্থির পাড়—পশ্চিম আর পূবের দুই যুগন্ধর প্রতিভার প্রায় একই সময়ের মানসিকতা।

১৮। শঙ্খ (প্রথম পাঠ, দেশ ১৯৭০ শারদীয়)—রবীন্দ্রনাথ ১৯। Gerontion—T. S. Eliot ২০। কালোঘোড়া—রবীন্দ্রনাথ ২১। The Love Song of J. Alfred Prufrock—Eliot ২২। পত্রপুট (১২)—রবীন্দ্রনাথ ২৩। A Song of Simon—Eliot ২৪। বাঁশী—রবীন্দ্রনাথ ২৫। Marina—Eliot ২৬। রোগশয্যায়—রবীন্দ্রনাথ ২৭। The Rock'X—Eliot ২৮। শেষলেখা—রবীন্দ্রনাথ

মৌল প্রকৃতিতে ভিন্ন হলেও, আপাত দৃষ্টিতে প্রাচ্য পাশ্চাত্যের এই প্রতিভার আধুনিক জগৎ প্রসূত অনুভূতির মধ্যে একটা মিল খুঁজে পাওয়া দুরূহ নয়। এবং মিল আছেই। আর সেই বোধের উত্তরাধিকার বহুদিন পর্যন্ত বহন করেছেন আধুনিক তরুণ কবিরা। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁদের নাড়ির যোগ, বিশ্বাসের ঘনত্ব, উজ্জ্বল প্রশান্তিময় স্বদেশ সোহাগ ও স্মৃতি সংস্কারের নিবিড় আত্মীয়তার বন্ধন। 'দুঃখের অন্তরে যেথা শান্তি সুমহান' ভূমি না পেলেও, দুঃখ দগ্ধ তিমিরের রক্ত-আর্ত পীড়নের অন্তর্জ্বালার যে যন্ত্রণা, তা তরুণ কবিসমাজ আপন স্থানকালপাত্রের মধ্যে থেকেই রবীন্দ্রনাথের মতো অনুভব করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ছিলো মহা অতীত থেকে সুবিশাল ভবিষ্যৎ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত ধ্যানের অখণ্ড আলোকোদ্ভাসিত নীল পাণ্ডুলিপি। বেদনায় ভরে যাওয়া পেয়ালায় সর্বৈব আনন্দের আস্বাদ। অনন্ত সূর্যোদয় থেকে অস্তান্ত সূর্যের অভিজ্ঞতা শেষ অব্দি রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন দিয়েছে প্রথম সূর্যোদয়ের মুহূর্তের মতোই 'কে তুমি' এবং সামনে তেমনি টান টান পড়ে থেকেছে উত্তরহীনতা। এ উত্তরহীনতাটাই অসহ্য হয়ে উঠেছে তরুণ কবিদের কাছে। তাঁরা যথার্থ উত্তর পাবার জন্যে সূর্যের পিছে ধাওয়া করে মরুভূমিতে গিয়ে পৌঁছেছেন। এসেছে খণ্ড চেতনার দুর্ভাগ্য। রবীন্দ্রনাথ বর্তমানের 'ছোট ছোট পিঞ্জর'এ আবদ্ধ বাস্তব জীবনের যন্ত্রণা জ্বালাকে তাঁর প্রতিভার মনন প্রক্রিয়ায় সুবৃহৎ বাস্তবের ভগ্নাংশ—অসীমের সীমাময় স্বরূপ—হিসেবে উপলব্ধি করেছেন এবং সীমার সঙ্গে অসীমের মিলন সাধনের পালা গেয়েছেন সমগ্র জীবন। দুঃখ ও তিমির প্রবাহে জর্জরিত যে রবীন্দ্রনাথ তিনিই দুঃখ ও তিমির চেতনার কবি হিসেবে আধুনিক কাব্যের ধারাপাতে প্রথম আধুনিক কবি হয়ে উঠেছেন। কিন্তু ভুললে চলবে না যে, প্রজ্ঞার সমগ্রতার দিক থেকে তিনি আধুনিক তরুণ কবিদের মনন সমগ্রতার বিপরীত ভূমির বাসিন্দাই থেকে গেছেন। অন্য দিকে টি.এস.এলিয়ট এক সংকট চেতনার রুক্ষ নিঃশ্বাসের দাহকে অখিল মানুষের সোচ্চার আবেগে পরিণত করেছেন। 'ইগো'র তাড়না-রহিত বিশ্বাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে নষ্ট জমিনের মৌলিক সত্যের পরিচয়বাহী ভাষায়, মননের তীক্ষ্ণ বৈদগ্ধ্যে ও ইতিহাস চেতনার সার্বিক নির্যাসনিষিক্ত প্রগতিতে একটা প্রফেটিক উক্তি উদ্ধার করেছিলেন 'Hieronymo's mad again / Datta. Dayadhvam. Damyata / Shantih Shantih Shantih.' আর এটাই পরিবেশ সচেতন বাঙালী তরুণ কবিদের কাছে প্রখর আবেগময় অহল্যা অস্তিত্বের টান পৌঁছে দিয়েছিলো।

আধুনিকতার দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথম কবি রবীন্দ্রনাথকেও যে এলিয়টীয় সংকট চেতনা গভীর ভাবে আলোড়িত করেছিলো তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় 'পুনশ্চ'তে 'জার্নি অব দা মাজি'-র অনুবাদে এবং এলিয়ট সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে। তবে এই সংকট কণ্টকাকীর্ণ বাস্তবে রক্তাক্ত রবীন্দ্রনাথকে অচিরেই মুক্ত করে নিয়ে ছিলেন প্রশান্তির কবি রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের এই শোষণ শক্তি এবং তালে তাল মেলানোর শক্তিকে রুখে দাঁড়াতে এবং নিছক গুরুবাদী কবি হয়ে আশীর্বাদ কুড়োতে গররাজী হওয়াতেই আধুনিক কবিরা তাঁদের বিদ্রোহের কেতন উড়িয়েছেন। তাঁরা বুঝেছিলেন যে, সত্যেন্দ্রনাথ, কুমুদরঞ্জন, যতীন্দ্রমোহন, করুনানিধানদের দলে ভিড়ে কবিওয়ালা হওয়া যদিবা সম্ভব, কবি ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি সম্ভব নয়। আর এজন্যেই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো স্বকীয় ভাষা এবং আঙ্গিকের আবিষ্কার—যা কিনা আলাদা চরিত্র দিয়েছে তাঁদের কবিতায়। শুরু হয়ে গেছে প্রতীক-চিত্রকল্পের চর্চা। পাশ্চাত্য কবিদের থেকে আঙ্গিকপ্রকরণ চর্চার পাঠ নিয়ে নিজেদের নবলব্ধ অভিজ্ঞতাকে পাঠকের মেধার কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে চললো তুরন্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা। প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য আন্তর বেদনা এবং সংবিতকে প্রকাশের জন্যে, কমিউনিকেশনের জন্যে, তাঁরা কথ্য-রীতির ভাষা প্রয়োগ পদ্ধতি আবিষ্কার করে জানালেন, এ কবিতা স্বতন্ত্র—এ কবিতা পুরোনো রীতি কানুন মানে না। ভাবে, ভাষায় এবং চিত্রকল্পে নতুনত্বের প্রবর্তনে, প্রতীক ব্যবহারের অভিনবত্বে, ঐতিহ্যকে জীর্ণ করে ব্যবহার করার সক্ষমতায়, রবীন্দ্রনাথ-এলিয়টকে ব্যবহার করার বেপরোয়া ঝুঁকি নিয়ে ভূগোলকে, নিয়মকে, প্রথাকে পর্যুদস্ত করে, মানুষকেই অম্বিষ্ট করে বিপজ্জনক পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্যে থেকে যে কবিতার জন্ম হোলো, তা অন্য—অন্য স্বরূপে ও চরিত্রে। রবীন্দ্র-প্রস্তুত কাব্য ভূমিতে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথকে ব্যবহার করে তাঁকেই অস্বীকার করে নতুন অজস্রতা সৃষ্টির প্রকরণের মধ্যে থেকেই নির্মিত অন্যতর কবিতা।

কেবল পরিগ্রহণে নয়—বর্তমান বুদ্ধি সত্য বিবেককে সমন্বিত করে বিশ্ব সম্পর্কে স্বকীয় অভিব্যক্তি অর্জনের সংগ্রামই প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছিলো তরুণ কবিদের মধ্যে। আত্মপ্রকাশ করার জন্যে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো এ সময়ের কবি গোষ্ঠীর নিজস্ব মুখপত্রের—এক নয় একাধিক। প্রকাশিত হয়েও ছিলো 'কল্লোল' 'কবিতা' ও 'পরিচয়'-এর মতো শক্তিশালী লিটল ম্যাগাজিনগুলো। কিন্তু এগুলোর প্রায় সবকটি পত্রিকারই প্রথম পাতার শোভা বর্দ্ধন করতে

ছাড়লো না শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্বাদ। তা সত্ত্বেও, ঐ বিরাট নাম চাপা 'নাম'-গুলোর মধ্যে থেকেই আত্মপ্রকাশ করেছে তৎকালীন বিশ্বপরিবেশ, আপন স্বদেশ ও তার সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি। দেখা গেছে বিশ শতকীয় সভ্যতার আক্রমণে বিধ্বস্ত তরুণ কবিদের রক্ত পোড়া কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন ঊষরকল্প ভারতীয় জীবনমানসের মর্মান্তিক প্রতিচ্ছাপ।

সাহিত্য আলোচনায় বিদেশী কবি লেখকের প্রভাব খুঁজে বের করার একটা রেওয়াজ চলে এসেছে সুদীর্ঘকাল ধরে। এক সময় এটা খুব গৌরবের বলেই গণ্য হোতো। এখনো কেউ কেউ বোদলেয়ার, মালার্মে, এলুয়ার, রিলকে, অডেন, স্পেণ্ডার, এজরা পাউণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য কবি, এমন কি বর্তমান কবিদের বাপ ঠাকুর্দার বয়সী কবিদের প্রভাব দেখিয়ে বাংলা কবিতাকে বাহবা দিয়ে থাকেন অথবা নিন্দাবাদ করে নিজেদের পাণ্ডিত্য জাহির করে থাকেন। এখানে সেই সনাতনী পুনরাবৃত্তির কোন কারণ নেই। কেননা আলোচনার শুরুতেই বলে আসা হয়েছে, কোন কবি বা লেখকের মানসগঠনে ও ধরণের প্রভাব খুব একটা বড় বিষয় নয়। অনুকরণকারীরা আর যাই-ই হোক, শত দক্ষতা দেখালেও. 'কেউ কেউ' যাঁরা কবি তাঁদের মধ্যেকার একজন নয়। সত্যিকারের কবি তাঁর অস্তিত্বের উপলব্ধিকেই প্রকাশ করে থাকেন আর সে জন্যে কমিউনিকেশনের ভাষাও তিনি আবিষ্কার করে নেন। এ জন্যে সিম্বল, চিত্রকল্প, রূপক, সংকেত যেমন মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে তেমনি ব্যবহৃত হতে পারে সংগীত ধর্মও। কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রে শব্দই শেষ পর্যন্ত অনুভূতি প্রকাশের উপায় হিসেবে থেকে যায়। আর এই শব্দকে ভাব প্রকাশের জন্যে উপযুক্ত ভাবে ব্যবহারের কৃতিত্বই কোন একজন কবিকে সার্থকতায় নিয়ে যায়। এই শব্দ প্রয়োগ ও শব্দ সাজিয়ে ভাব ভাবনা অভিব্যক্তির মূর্তি গঠনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বিত হতে পারে, কিন্তু যে মূর্তিটি গঠিত হয় তা কবির নিজস্ব বোধেরই বিশিষ্ট প্রকাশ-প্রতিমা। সলতেয় আগুন না থাকলে খড়কে কাঠির যেমন কোনো মূল্য নেই, কবির ভেতরে তেমনি বিশিষ্ট মনোভঙ্গী না থাকলে প্রভাবের কোনো মূল্যই স্বীকার্য নয়। কবিতার প্রথম সর্ত তা কবিতা হয়েছে কিনা—তা আস্বাদ্য হয়েছে কিনা। যদি হয়ে থাকে, তবে তাতে কার এবং কিসের প্রভাব পড়েছে তা তল্লাস করতে রোম থেকে রমনা-র কবিদের সারেগামা নামাবলী উপস্থিত করার কোনো সার্থকতা নেই। পাশ্চাত্য দেশে রোমান্টিক, সিম্বলিষ্ট, ইমেজিষ্ট, রিয়ালিষ্ট কি সুররিয়ালিষ্ট কবিরা আন্দোলন করে কবিতার ধরণ ধারণ মর্জির

বিশিষ্ট চেহারা দিয়েছিলেন বলেই যে বাংলাদেশের কবিতাতেও ঐসব রূপ-রীতি আঙ্গিক এমন কি ভাবও এসেছে, এরকম ভাবনা আহাম্মকি। একটা বিশিষ্ট পটভূমিতেই ঐ ধরণের প্রবণতা সৃষ্টি হয় এবং বাংলাদেশেও আধুনিক কবিতার প্রজন্মে সে পটভূমি বর্তমান। মহাযুদ্ধ পরবর্তী কালে বাংলাদেশের শহর ভরে হতাশা, বেদনা, মর্মান্তিক নিঃসঙ্গতা কি ছিলো না? ছিলো না কি আনন্দলোকের জন্য—আত্মার শান্তির জন্য—আর্তি? ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক, এ সব নিয়ে কি সংশয় দ্বন্দ্ব ছিলো না? ইতি-নেতির সংশয় দোলায় দুলে জড়বাদী বিজ্ঞানের আক্রমণে নষ্ট বিস্ময়বোধকে পুনরুজ্জীবিত করার তাগিদ কি কোনো কোলকাতার সদ্য ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিচরণশীল মানুষের মধ্যে জাগে নি? বাস্তব পটভূমিই তো কবিদের আবেগ কল্পনা ও রহস্যবোধে উদ্‌বুদ্ধ করেছিলো এবং বিশ্বজগৎ উপলব্ধিকে বুদ্ধিগ্রাহ্য কোনো উপায়ে নয়, প্রতীকে চিত্রকল্পের ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করতে উৎসাহিত করেছিলো। রহস্যময় জগত ও জীবনের যে উপলব্ধি আর অনুভূতি কবিদের মধ্যে দেখা দিয়েছিলো তাকেই প্রকাশ করতে ব্যঞ্জনাময় প্রতীক সন্ধান করতে হয়েছে তাঁদের। বিভিন্ন অনুভূতির মধ্যেকার যোগসূত্র আবিষ্কার করে প্রকাশের জন্যেই গঠন করতে হয়েছে দৃশ্য-গন্ধ-স্পর্শ-স্বাদের ভিন্ন ভিন্ন চিত্রকল্প (imege)। এ জন্যে বোদলেয়ার, র‍্যাঁবো, লাফর্গ, মালার্মে, ভ্যালেরি অর্থাৎ ফরাসী প্রতীক চিত্রকল্পবাদীদের প্রত্যক্ষ কি পরোক্ষ প্রভাব আছে কি নেই এ নিয়ে তৈলাধার পাত্র, না পাত্রাধার তৈল করে পাঠককে বিধ্বস্ত করে দেওয়া ছাড়া কোনো লাভ হয় না। বরং পাঠকের রসবোধকেই আহত করা হয়। আধুনিক কবিদের কবিতায় প্রভাব যদি কিছুর পড়ে থাকে তবে তা পারিপার্শ্বিকের—সমসাময়িক জীবন, সমাজ ও চিন্তার। তবে বিজ্ঞান বিশ্বজগতের প্রতিটি কোণকেই ব্যক্তির চোখের চেয়েও নিকটে এনে দিয়েছে। কোলকাতায় কুমেরু কুক্ষির পেঙ্গুইনের কোনো আলোড়ন পৌঁছুবে না এ রকম ভাবনাও গুরুত্বহীন। আমরা বলতে চাই, অনিবার্য কারণেই আধুনিক কবিতা বিশ্ব সাহিত্যের সঙ্গে এখন থেকে অবিচ্ছিন্ন এবং রুচি, মর্জি, চেহারা চরিত্র, রূপ রীতি ও আঙ্গিক-প্রকরণ সব দিক থেকেই একেবারে নতুন ব্যাপার হোলো—শেষ হোলো ঢিলেঢালা ভাবে অসংযত হৃদয়াবেগ প্রকাশের কাল। কবিতা হোলো পরিবেশ সচেতন, বুদ্ধি প্রধান, সংযত আবেগের সুঠাম নির্মাণ —অঙ্গে অঙ্গে তার নতুনত্ব। আর, এর স্রষ্টাদের প্রথম চিহ্ন 'বন্দীর বন্দনা' (বুদ্ধদেব বসু—১৯৩০)। এর মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে প্রথম স্বকীয় কণ্ঠ:

'অলস আবেশে মোরা জীবনেরে দেখিনি মধুর ;—
ললাটে ঝরিছে স্বেদ—তারি স্বাদ মোদের অধরে,
হৃদয়ে দুঃখের যজ্ঞ—তারি জ্বালা প্রত্যেক অক্ষরে,
মোদের আকাশ রুক্ষ, শ্যাম স্বপ্নে নহে যে মেদুর।'[২৯]

স্পষ্টতই সময়-সমাজ-জীবন আধুনিক কবিদের যা দিয়েছে তা মরু অন্ধকার, রুক্ষতা, বিনষ্টি, ক্লান্তি আর আপন দুর্ভাগ্য নিয়ে দিশাহারাত্ব। যখন জীবনের সুন্দর কল্যাণ সমুত্থানের আয়োজন, এবং তাঁদের প্রেম ভালোবাসার জয়গান রচনারই কথা ঠিক তখনই জীবনের নষ্ট ব্লু-প্রিন্টের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাঁদের বলতে হয়েছে 'যৌবন আমার অভিশাপ।'[৩০] সমগ্র পরিবেশে তাঁরা দেখেছেন, এখানে 'গোবি সাহারার বুকে...একখানি মেঘ ধার'[৩১] হিসেবে পাবার কামনা ; এখানে 'দ্বাদশ রবির বহ্নি জ্বালা ভয়াল'[৩২] ; এখানে উট পাখীর সামনে 'আজ দিগন্তে মরীচিকাও যে নেই / নির্বাক নীল নির্মম মহাকাশ'[৩৩] ; তার আশেপাশে 'হলদে তৃণ / ভরে আছে মাঠে,—পাতায়, শুকনো ডাঁটে / ভাসিছে কুয়াশা / দিকে দিকে,—চড়ুইয়ের ভাঙা বাসা / শিশিরে গিয়েছে ভিজে, পথের উপর / পাখীর ডিমের খোলা, ঠাণ্ডা কড়কড় ! / শশাফুল,—দু একটা নষ্ট শশা,— / মাকড়ের ছেঁড়া জাল,—শুকনো মাকড়শা'[৩৪] 'খাঁ / খাঁ রোদ, নিস্তব্ধ দুপুর ; / আকাশ উপুর করে ঢেলে দেয়া / অসীম শূন্যতা...পৃথিবীর মাঠে আর মনে— / তারি মাঝে ডাকে / শুষ্ক কণ্ঠে কাক'[৩৫] ; আর 'সোনার দিগন্ত ধান লুণ্ঠিত গ্রামের কিনারায়'[৩৬] শহরে 'ভিখারীর চোখ, গ্রামছাড়া রাঙামাটির পথের বৃদ্ধের আর / বৌ মানুষের বিধবার আর ত্রিকাল-দর্শী শিশুদের চোখ / ঘরহারাদের, কারখানা ছাড়া ছেলেদের আর মেয়েদের / যেন লাখো লাখো চোখে অগ্নিবর্ষী জঙ্গম পর্বত।'[৩৭] এবং এই প্রপন্ন পরিবেশের মধ্যে 'বিষণ্ন বায়ু নিশ্বসি কহিয়া গেছে কানে : / শাপভ্রষ্ট দেবশিশু তুমি।'[৩৮] তাঁর অভিজ্ঞতায় এসেছে 'সকালের রোদ আজ বিকেলের ছায়ায় মলিন।'[৩৯] আর সমস্ত অস্তিত্বময় এক বিস্বাদ অনুভব 'রাত নেই, দিন নেই বারেবারে চমকে উঠি / আমার মনে শান্তি নেই, আমার চোখে ঘুম নেই, / স্পন্দমান দিনগুলি আমার দুঃস্বপ্ন।'[৪০]

২৯। মোরা তার গান রচি—বুদ্ধদেব বসু ৩০। বুদ্ধদেব বসু ৩১। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ৩২। নজরুল ইসলাম ৩৩। সুধীন্দ্র নাথ দত্ত ৩৪। জীবনানন্দ দাশ ৩৫। প্রেমেন্দ্র মিত্র ৩৬। অমিয় চক্রবর্তী ৩৭। বিষ্ণু দে ৩৮। বুদ্ধদেব বসু ৩৯। অজিত দত্ত ৪০। সমর সেন

শাপভ্রষ্ট দেবশিশুদের এই দুঃস্বপ্নের আক্রমণ রবীন্দ্র কাব্য নিয়ে তোফা থাকা পাঠককে সচকিত করে তুলেছিলো খুবই ; ভয়ঙ্কর উৎপাত হিসেবেই তারা মনে করতে চাইলো—প্রচার করতে চাইলো—আধুনিক বাংলা কবিতাকে। নিন্দামন্দর ঝড় খেয়েছে, তবু ডাঁটা মোটা হয়ে উঠেছে কবিতা এবং কবিতাই এ যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্প। এ শিল্প পূর্ব শিক্ষাসংস্কারের মূলে আঘাত করেছে এবং গোল গোল পেলব পেলব পদ্য ধারণায় কুঠারাঘাত করে, আলংকারিক রীতি-নির্দেশ অমান্য করে নতুন কবিতা আন্দোলন শুরু করেছে বলেই গোটা ধকল সহ্য করতে হয়েছে কবিতাকে। কবি হয়েছেন জনসাধারণের কাছে আতঙ্ক। রবীন্দ্রনাথেরও অসামান্য সমঝাওতা করার শক্তি তরুণ কবিদের সঙ্গে এ্যাডজাষ্ট করে উঠতে অসমর্থ হয়ে পড়েছিলো। তবু তরুণ কবিরা আপন সামর্থের জোরে তাঁর এবং তাঁর পাঠকদের স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছেন। এঁরা চিৎকার ফাটিয়ে বলেছেন : 'অর্থ নয়, কীর্তি নয় স্বচ্ছলতা নয়— / আরো এক বিপন্ন বিস্ময় / আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভেতরে / খেলা করে / আমাদের ক্লান্ত করে / ক্লান্ত—ক্লান্ত করে '[৪১]; বলেছেন আরো : 'আমাদের মুক্তি নেই, আমাদের জয়াশাও নেই ; / তাই ধ্বংসের ক্ষয় রোগে শিক্ষিত নপুংশক মন / সমস্ত ব্যর্থতার মূলে অবিরত খোঁজে / অতৃপ্ত রতি উর্বশীর অভিশাপ /...তবু সত্য শুধু পতন বন্ধুর পথ / বন্ধ্যাভূমি আর নিষ্ঠুর দিগন্ত।'[৪২]—সময়ের হাওয়া ঘুরে ঘুরে আবৃত্তি করেছে এই স্বর।· কল্লোলের জেনারেশন থেকে একটা ট্রাডিশনের মতো দীর্ঘশ্বাস, ক্লান্তি, ক্ষয় আর নপুংশকত্ব বোধ এ সময়ের থেকে স্বাধীনতার পরের হাংরী জেনারেশন পর্যন্ত চলে এসেছে। যদিও সাম্প্রতিক কবিদের কাব্য পরিসর তাঁদের পূর্বসূরীদের থেকে বহু বহু গুণ বড়।

উদ্ধৃত কবিবাক্যগুলো থেকে স্পষ্টতই বেরিয়ে এসেছে একটা সমষ্টি বোধ। এখন শুধু ব্যক্তি নয়—'সমষ্টি' সুদ্ধ ভুগে যাচ্ছে বিপন্ন বিস্ময়ে, 'জয়াশা' নেই 'সমূহের'। এই সংঘবোধই আধুনিকতার দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলনের দ্বিতীয় আবিষ্কার। ব্যক্তি চলে যেতে চাইছে নিজের প্রাণের কাছে, একা। অথচ অনুভবে আছে 'আমরা'—'আমরা মধ্যম পথে বিকেলের ছায়ায় রয়েছি / একটি পৃথিবী নষ্ট হয়ে গেছে আমাদের আগে'[৪৩] এবং 'বসন্তের জ্যোৎস্নায় অই মৃত মৃগদের মত / আমরা সবাই '।[৪৪] ঘোরতর জীবনবাদীদের তো মিছিল-ই সত্য—ব্যক্তি হচ্ছে মিছিলের মধ্যেকার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের এক। আধুনিক কবিদের

৪১। জীবনানন্দ ৪২। সমর সেন ৪৩।, ৪৪। জীবনানন্দ

অবশ্যই এটা জানা ছিলো, সাহিত্য গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে করা যায় না, কিন্তু সাহিত্য আন্দোলনের জন্যে অবশ্যই একটা গোষ্ঠীর সহযোগিতা দরকার। এবং সে জন্যেই আসমান জমিন ফারাক দূরের বিভিন্ন মানসিকতার ও বোধের কবিরা গোষ্ঠীভুক্ত হয়েছিলেন প্রায় সবাইই—এমন কি প্রগতি লেখক সংঘের মঞ্চেও বুদ্ধদেব বসু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জোটভুক্ত হতে বাধে নি। এক দিকে ক্লান্তি, মৃত্যুচেতনা, শূন্যতা, সর্বজ্ঞতার দুর্ভাগ্য জীবনের স্ট্রাগল-এর দিকটা রুদ্ধ করে দিয়েছে—কবিজীবনের সংগীত হয়েছে 'সব কাজ তুচ্ছ হয়—পণ্ড মনে হয়, / সব চিন্তা—প্রার্থনার সকল সময় / শূন্য মনে হয় / শূন্য মনে হয়।'[৪৫] অন্য দিকে জীবন ছন্দের তালে তালে বয়ে এসেছে গর্জমান অন্বিষ্ট-যাত্রা। এখানেও কবিকে পরিবেশের প্রচণ্ড মার খেতে হয়েছে। কিন্তু মারের সাগর পাড়ি দেবার দুর্মর প্রেরণায় কবি আরো উদ্দীপিত হয়ে দুর্বার অভিযানের শ্লোক উচ্চারণ করেছেন যা তীক্ষ্ণ, রক্তাক্ত এবং অপরাজেয়।

এই আধুনিক কবি গোষ্ঠীর প্রয়াস হয়ে ওঠে জনগণের সঙ্গে এক-দিল হয়ে হয়ে তাদের কাছে জীবনের ঋণ শোধ করার। সমাজনীতি রাজনীতি এবং বেঁচে থাকার—সবার সঙ্গে সমান সুখে বেঁচেবর্তে থাকার—জীবন নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে এঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন, 'বজ্র লুকায়ে রাঙা মেঘ হাসে পশ্চিমে আনমনা— / ... ছলে বলে কলে দুর্বলে হেথা প্রবল অত্যাচার'[৪৬] ঘোষণা দিয়েছেন 'আমি বিদ্রোহী রণক্লান্ত / আমি সেইদিন হব শান্ত / যেদিন অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না'[৪৭]; তাঁরা দেখেছেন, 'ডেকে ওঠে সিমেণ্ট (না সোডিয়াম) কারখানার সাইরেন জোরে / কাঁপিয়ে উপত্যকা—গ্রামের নির্ভর ঐ ফ্যাক্টরী'[৪৮]; সোৎসাহে উচ্চারণ করেছেন, 'আমি কবি ভাই কামারের আর কাঁসারীর / আর ছুতোরের মুটে মজুরের, / আমি কবি যত ইতরের'[৪৯] আর মধ্যবিত্ত কবি ব্যক্তিত্বের অভিজ্ঞতা, 'সারাদিন ভর পদে পদে ব্যর্থতা / তিক্ত মনের বিরস রুক্ষ কথা / আনন্দ আশা তিলে তিলে লাঞ্ছিত—'[৫০] এবং এ মুক্তির প্রত্যয় দিয়েছে সংঘবদ্ধ খেটেখাওয়া সাধারণ মানুষের উত্থান, 'জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার— / মেঘচূড়া জনহীন— / হালকা হাওয়ায় কেটে গেছে কবে লোকনিন্দার দিন'[৫১]। কেননা বেশ জানা গেছে যে, অঙ্গে অঙ্গে পুরুষ-কারের অঙ্গীকার আছে, আশ্বাস আছে 'সবুজপ্রতাপে এই শুকনো কাঠামো চূর্ণ

৪৫। জীবনানন্দ ৪৬। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ৪৭। নজরুল ইসলাম ৪৮। অমিয় চক্রবর্তী ৪৯। প্রেমেন্দ্র মিত্র ৫০। অন্নদাশঙ্কর রায় ৫১। বিষ্ণু দে

হবে'[৫২]। তাই 'দগ্ধ হোক আমার এ সব'[৫৩]। যখন কূল ছাপিয়ে ওঠা কারুর দুই বুকে 'হাতের স্পর্শ' ঠেকিয়ে অন্য ক্যাম্পের কবির অনুভব 'এই সমস্ত দুরন্ত পৃথিবীর চিহ্ন মুছে যায়'[৫৪] এবং আরো সব, অথবা যখন 'দেহ ঝরে,—ঝ'রে যায় মন / তার আগে / এই বর্তমান,—তার দু' পায়ের দাগে / মুছে যায় পৃথিবীর পর / এক দিন হয়েছে যা—তার রেখা,—ধুলার অক্ষর'[৫৫] ভেবে হাত তুলে দিয়েছেন, তখন বেজে উঠেছে তীব্র প্রত্যয়ের তরুণ কণ্ঠ 'প্রাণে লেগেছে প্রাচীন সূর্য ; / এ করাল সংক্রান্তি নিঃসন্দেহে পার হব / যে মৃত্যু প্রাণ আনে তার ফিনিক্স গানে / প্রগতির সম্মিলিত বীর্যে, অক্লান্ত আত্মদানে'[৫৬] 'ছাড়াই মাঠ, ছাড়াই হাট ধূসর পায়ে পায়ে / মিলছি ভুখ-মিছিলে গায়ে গায়ে, / কারখানায় অন্ধ, দিক ভ্রান্ত, ভয় ভয়, / মনের দিক প্রান্তে ঠিক সন্ধ্যা হয় হয়'[৫৭] তবু 'যন্ত্রণার যুদ্ধ। প্রতিরোধ'।[৫৮] এবং প্রার্থনা, 'হে সূর্য তুমি আমাদের দিয়ো আলো আর উত্তাপ / আর উত্তাপ দিয়ো ঐ রাস্তার ধারের উলঙ্গ ছেলেটাকে'[৫৯]। এবং সেই সঙ্গেই আবেদন রাখা হয়েছে নিজের যৌবনের কাছে, 'হে যৌবন, হে যাদুকর, হে আমার নেতা / জীবনের উচ্ছল মিলিত শোভাযাত্রার সঙ্গে আমাকে মিলাও / যে শোভাযাত্রার শুরু নেই শেষ নেই'।[৬০] আর 'অদম্য প্রাণ শক্তিতে পেশী তরঙ্গিত ঘাড়ে / অর্জ্জুন গাছের পাতা ফাঁক ক'রে / বাতাস আচমকা হাত রাখে / না আমরা মরব না'[৬১]। আশায় উদ্বেলিত কবি অনুভব করেন 'এখনি এখানে / মানুষের ঘরে ঘরে দুরন্ত অক্ষরে ফেটে পড়ে / শান্তির জীবন তৃষ্ণা'[৬২]। জীবনের এবং শান্তির এই সক্রিয় বাসনাকে উপলব্ধি করেই সম্ভবত হেমন্তের হিম নির্জন বিষণ্ণ সুদূর থেকে ফিরে আসে অতি সাম্প্রতিক কাব্য ভাবনার অন্যতম আদর্শ (মডেল)-র কণ্ঠস্বর 'তবুও এদের গতি স্নিগ্ধ নিয়ন্ত্রিত ক'রে বারবার উত্তর সমাজ / ঈষৎ অনন্যসাধারণ'[৬৩] —ঈষৎ নয় সম্পূর্ণতই।

উত্তর-সমাজ আধুনিকতার তৃতীয় পর্যায়ের আন্দোলন শুরু করতে গিয়ে অবশ্যই পূর্বসূরীদের কাছ থেকে পেয়েছেন তাঁদের অর্জিত নতুন প্রসিদ্ধি। তবে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন ক্লান্তি, মৃত্যু, শূন্যতা, সংঘচেতনা ও জীবনতিয়াশা। ভাবাবেগকে আমল না দিয়ে এঁরা মননকে আরো তীক্ষ্ণ করেছেন কবিতায়।

৫২। অরুণ মিত্র ৫৩। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ৫৪। বুদ্ধদেব বসু ৫৫। জীবনানন্দ
৫৬। সমর সেন ৫৭, ৫৮। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ৫৯। সুকান্ত ভট্টাচার্য
৬০। জগন্নাথ চক্রবর্তী ৬১। রাম বসু ৬২। মণীন্দ্র রায় ৬৩। জীবনানন্দ

তাছাড়া মুখের কথাকে সাধু হিসেবে উপস্থিত করার রাখাঢাকি একেবারে ধূলিসাৎ করে গালাগালির ভাষাকেও কবিতায় ব্যবহৃত হবার মর্যাদা দিয়েছেন। জ্ঞানের ব্যাপকতা ও মনের সূক্ষ্মতায় নিজেদের রক্ত মাংসের জীবন; বস্তুসম্পদ বিকীরিত সভ্যতা ও রহস্যময় তৃতীয় ভুবনকে এঁরা কবিতার প্রাণে ও শরীরে অভূতপূর্ব সাফল্যের সঙ্গে উপস্থিত করেছেন। স্বাধীনতা-পূর্ব কালের মুখ্যত দুই ক্যাম্পের একটির ক্লান্তি ও অবসাদের রোগ—শূন্যতাবোধের অভিশাপ বিস্তৃত হতে হতে অতি সাম্প্রতিক কালের কিছু কবির কবিতাকে যেমন 'হাউলিং'এ ও যুগীয় আত্মার করুণ চীৎকারে পরিণত করেছে—কালের প্রত্যক্ষ অংশের নিখুঁত প্রতিমা করেছে—তেমনি, কিছুটা ক্ষীণ কণ্ঠের হলেও, দ্বিধাহীন ভাবে উচ্চারিত হয়েছে বলিষ্ঠ জীবন প্রত্যয়ের কথা—রচিত হয়েছে কালের অস্পষ্ট ও অপ্রত্যক্ষ অংশের মূর্তি। নিজের প্রাণের কাছে চলে আসতে আসতে সাম্প্রতিক সময়ের 'সূর্যের আত্মহত্যার' তদন্তকারী 'তিন উল্লুক কাঁহাকা'[৬৪] জীবনের মার এড়াতে শামুকের মতো নিজের কঠিন বিবরে সেঁধিয়ে পড়েছেন, সেখানে 'উদাসীন সঙ্গম'[৬৫] শেখানো হয় নি বলে মেয়ে, না বেশ্যাকে, অনুযোগ করে জীবনকে স্বপ্ন রমনের রমণীর উরুর আশেপাশেই প্রত্যক্ষ করেছেন। সাম্প্রতিক সময়ের কোনো কোনো কবি নিজ হাতে ক্রুশবিদ্ধ যীশু। তবু অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত 'নিষিদ্ধ কোজাগরী'র পুরোহিত—ঈশ্বর সন্ধানে তৎপর—মিষ্টিক। এবং তরুণ সান্যাল বলেন 'যেতে চাই সত্যকার চিরন্তন সমুদ্রের কাছে'। তাছাড়া আছে আরো বহু ক্রিয়াবৈচিত্র্যের দৃশ্য গন্ধ শব্দ স্পর্শ স্বাদের সুনিপুণ ..া শিল্পের প্রকাশ। কিন্তু আধুনিক কবিতার তৃতীয় পর্যায়ের আন্দোলনের ফলশ্রুতি সম্পর্কে আলোচনা করার আগে তাঁদের পূর্বসূরীদের রচনার খানিকটা পরিচয় নিয়ে নেওয়া দরকার। তাঁদের কাব্যস্বরূপ আলোচনা করে দেখতে হবে আধুনিকতার বৈশিষ্ট্যগুলো তাঁদের ভাবে-ভাষায় বস্তুতে-আঙ্গিকে কোন এবং কি দ্যোতনা নিয়ে উপস্থিত থেকেছে এবং পরবর্তীদের কাব্য ভাবনায় তা কি ইন্ধন জুগিয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ের কবিদের কাছে গুরুত্বের দিক থেকে অবশ্যই জীবনানন্দ দাশের নাম আগে মনে আসে। তবে আধুনিক পর্যায়ের আন্দোলনের নেতার নাম নিশ্চিত ভাবেই বুদ্ধদেব বসু। উদ্ধৃত প্রায় সমস্ত কবিবাক্যের যোগফল থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, একটা প্রচণ্ড আকুলতা, তিক্তদীর্ণ বিষাদ, দুরারোগ্য

৬৪। শক্তি চট্টোপাধ্যায় ৬৫। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সংশয় নিয়ে সুরু হয়েছে আধুনিক কবিতা—বিদ্রোহ অন্তরে বাইরে। তবুও কি যেন এক দুর্বোধ্য ভাবনায় নির্জনতাসিদ্ধ কবিপুরুষও আশা পোষণ করেছেন, একদিন কোলকাতা 'কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে।'[৬৬]

কোলকাতার ক্রূর কোলাহল—অর্থাৎ সভ্যতা ও তার অস্থিরতা থেকে জীবনানন্দ বহুদূর, 'অনন্ত সময়গ্রন্থি'র সঙ্গে যুক্ত। মানুষের লোকালয় ও তার কোলাহল তাঁকে ক্লান্ত করে। চারদিকে যখন ভাঙন পতন অভ্যুদয়—দুই মহাযুদ্ধের মাঝখানে যখন অসীম শক্তিধর মানুষের দুই হাতে প্রায়-ছেঁড়া শিকল আর সৃষ্টির অদম্য উৎসাহ, জীবনানন্দ তখন মানুষের হাতে গড়া ঘড়ির কোনো মূল্য না দিয়ে, বর্তমান অশান্তির গণ্ডীকে অবহেলা করে বহু সুদূরে 'বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে' 'স্বপ্নের ভিতরে' 'সেই মুখ' নিয়ে বিভোর থেকেছেন। অথবা 'তরমুজের মদ'-এ ধরে যাওয়া হাতের মধ্যে একখানা 'নগ্ন নির্জন হাত' চেপে মুখোমুখি নীরব। 'তখন হলুদ নদী নরম নরম হয় শর কাশ হোগলায়', চারদিকে হিজল জারুলের ফুল 'সোনালি আগুন / চুপে জলের শরীরে / নড়িতেছে—জ্বলিতেছে—মায়াবীর মত জাদুবলে' আর 'শিশিরের শব্দ', 'পাখীর নীড়ের থেকে খড়' পড়ার শব্দ / নক্ষত্রের হইতেছে ক্ষয় নক্ষত্রের মতন হৃদয়, পড়িতেছে ঝরে' / 'মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়' উপলব্ধি করতে 'পাখীর নীড়ের মতো চোখ' দুটোর দিকে বিবশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছেন কবি। 'জলের গন্ধ' 'শিশুর মুখের ঘ্রান' আর 'ঝিঁঝির গন্ধ' ভরা 'করুণ জ্যোৎস্না'র হেমন্তে বিশ্বব্যাপী মহীনের শ্রান্ত ঘোড়ার বিজন ঘাস চিবোনোর শব্দে ধরে-আসা হৃদয়ে চুপ-যাওয়া কবি 'শত শত শূকরীর প্রসব বেদনার আড়ম্বর'-এ অত্যাচারিত বোধ করে যেন স্বগতোক্তি করেছেন 'একদিন—একরাত করেছি প্রেমের সাথে খেলা' 'হলদে পাতার মতো আমাদের ওড়া উড়ি'। এবং এক ফুঁয়ে সব উড়িয়ে দিতে গিয়ে 'মিলনোন্মত্ত বাঘিনীর গর্জনের মতো অন্ধকারের বিরাট সজীব রোমশ উচ্ছ্বাসে' জ্বলে উঠে চকিতে যেই মনে হয়েছে 'আমাদের সন্ততিও আমাদের হৃদয়ের নয়' তখনই জীবনানন্দ অন্য এক আলোকের দেশে যেতে বনহংসীর সঙ্গে বনহংস হবার সাধ পোষণ করেছেন, সেখানেও শব্দ গন্ধ স্পর্শ স্বাদ ছবির শরীরী উপলব্ধি। 'আকাশের রঙ ঘাস ফড়িঙের দেহের মতো কোমল নীল' 'রোদের নরম রঙ শিশুর গালের মতো লাল' 'অকূল সুপুরি বন স্থির জলে ছায়া ফেলে / এক মাইল ছায়া ফেলে আছে' সেখানেও। কিন্তু 'জীবনের রঙ তবু

৬৬। জীবনানন্দ দাশ

ফলানো কি হয় / এই সব ছুঁয়ে ছেনে।' তা হবার নয়। 'বাসি পাতা ভূতের মতন / উড়ে আসে। কাশের রোগীর মত পৃথিবীর শ্বাস,— / যক্ষ্মার রোগীর মত ধুঁকে মরে মানুষের মন'। কবির অসহ্য লাগে। নতুন পৃথিবীতে চলতে চলতে চমকে ওঠেন। 'একটি মোটরকার গাড়লের মত গেল কেশে'। 'কয়েকটি আদিম সর্পিনী সহোদরের মত এই যে ছড়িয়ে আছে / পায়ের তলে, সমস্ত শরীরে রক্তে এদের বিষাক্ত বিস্বাদ স্পর্শ অনুভব করে' কবি তবু হেঁটেছেন যন্ত্রস্পর্ধিত পৃথিবীতে। দেখেছেন 'চারিদিকে বিকলাঙ্গ অন্ধ ভীড়—অলীক প্রয়াণ / মন্বন্তর শেষ হলে পুনরায় নব মন্বন্তর ; / যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে নতুন যুদ্ধের নান্দীরোল ; / মানুষের লালসার শেষ নেই ; / উত্তেজনা ছাড়া কোনো দিন ঋতু ক্ষণ / অবৈধ সঙ্গম ছাড়া সুখ / অপরের মুখ ম্লান ক'রে দেওয়া ছাড়া প্রিয় সাধ নেই। / ···মানুষের দুঃখ কষ্ট মিথ্যা নিষ্ফলতা বেড়ে যায়'। এখানে 'জীবাণুর থেকে আজ কৃষক, মানুষ / জেগেছে কি সম্প্রসারণে' ভেবে বিস্মিত হতে হয় কবিকে। কবির শেষ উপলব্ধি জন্মে 'কেবল কাস্তের শব্দ পৃথিবীর কামানকে ভুলে / করুণ, নিরীহ, নিরাশ্রয় / আর কোন প্রতিশ্রুতি নেই।' দেখে শুনে কবি-হৃদয় আর্তনাদ করে ওঠে 'একি ভোর ? / অনন্ত রাত্রির মতো মনে হয় তবু'। কেননা মানুষ যা কিছুই করুক না কেন—যা কিছু সৃষ্টি হোক 'শস্য তবু অবিকল পরের জিনিস'। এবং সে জন্যেই জীবনানন্দ কাল-পুরুষের কাছে দোষ স্খালন করে বলেছেন 'মৃত্যুরে বন্ধুর মত ডেকেছি ত—প্রিয়ার মতন'।

বাস্তব পৃথিবী থেকে রেজিগনেশন দিয়ে জীবনানন্দকে আশ্রয় খুঁজতে হয়েছে 'ধানসিড়ি' ও 'জলপিপি'র তীরে চিত্র ও স্বপ্নময় জগতে। এখানে তাঁর আত্মার স্ফূর্তি এবং সত্তার অভিন্নত্ব। জীবনানন্দের বাস্তব শুধু 'জীবনের টুকরো টুকরো সাধের ব্যর্থতা ও অন্ধকার' —'সিগারেটের ধোঁয়া ; / টেরিকাটা কয়েকটা মানুষের মাথা / এলোমেলো কয়েকটা বন্দুক—হিম—'। তাই সেখান থেকে পলায়ন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে তাঁর।

আদ্যন্ত কবিতার মধ্যে জীবনানন্দ কখনো বা ইম্প্রেশনিষ্ট চিত্রকরদের মতো ল্যাণ্ডস্কেপ তৈরী করেছেন। আবার তিনিই সুররিয়ালিষ্ট কবিতার স্রষ্টা। এক-দিকে কঠিন কনট্রাস্টের মধ্যে থেকে আলোছায়ার বিচিত্র খেলার বিমুক্ত প্রকৃতি —সে সুস্নিগ্ধ কিন্তু আপাত অসংলগ্ন রংতুলির টানে গঠিত একটা মহাপার্থিব প্রকৃতি—এবং তা বাংলাদেশেরই (বিশেষত জলা বরিশালের) চিত্রবর্ণ সজ্জার অনুভূতির শরীরী উপস্থাপনের অপূর্বতায় অনবদ্য। অন্যদিকে ফ্রয়েডীয়

মনোবিজ্ঞান সূত্রে মগ্নচৈতন্যের গভীরে সঞ্জাত অতিবাস্তবের উদ্ধার করে জীবনানন্দ তার ইতিহাসচেতনা সমাজচেতনা এবং ইন্দ্রিয়ঘন অস্তিত্বের সত্য উদ্ধারের প্রয়াসে চেতনাবচেতন দেহমন ও ভেতরবাইরের সমস্ত বর্ডার লাইন ভেঙে অনন্তের ও সময়হীনতার জগৎ রচনা করেছেন।

দেশজ ডায়ালেক্ট ও সাধু ক্রিয়াপদের ব্যবহারে, ইমেজ গঠনের স্বকীয়ত্বে, মননগত উপমা সৃষ্টিতে, ছবির ওপর স্বপ্নিল প্রলেপ যোজনার অভিনবত্বে এবং চিত্রে চিত্রে, শব্দে শব্দে, গোটা কবিতার অঙ্গে লাবণ্যের ঢল নামিয়ে রক্তমাংসল অনুভূতিতে ক্লান্তি বুনে দিয়ে, বিপন্ন বিস্ময় জাগানো লিরিক মূর্ছনা প্রবাহে, উপমা রূপক সন্দেহ উৎপ্রেক্ষা স্বভাবোক্তি প্রভৃতি অলঙ্কার ব্যবহারের দক্ষতায় সবুজ আরক, ধানীমদ ও রক্তিম উত্তেজকে জীবনানন্দ 'কোনদিন জাগবো না আর' বলে নিজেও যেমন ঘুমিয়ে পড়তে চেয়েছেন, পাঠককেও তেমনি ঘুমিয়ে পড়তে বাধ্য করেন। তাঁর কাব্যে এক অদ্ভুত প্রকৃতিময়তা, তার সঙ্গে মিশেছে অতীত ধূসর দ্বীপ—দেশ-বন্দরের বোধস্পর্শী নরনারী আর 'বাতাসের ওপরে বাতাস / আকাশের ওপরে আকাশ' এবং নক্ষত্র। ইতিহাস পুরাণ রূপকথা, বিমূর্ত প্রতীক আর চিত্রকল্পে ভরা 'ব্যাবিলন' 'নিনেভ' 'গ্রীস' 'চীন' 'মিশর' 'গেয়েমিন' 'আলেকজান্দ্রিয়া' 'বিদিশা' বা 'নাটোর'—কবি জীবনানন্দের দেশ সবই কীর্তন খোলা নদীর তীরে। জলা বরিশালের নদীপরগনার প্রতিচ্ছাপে গড়া এক মহা-জাগতিক ভূগোলবাসী জীবনানন্দ দাশ। আর তার ফলে স্বাভাবিক ভাবেই বর্তমান মানুষের খণ্ডত্বই তাঁর চোখে পড়েছে—কখনো দেখেছেন শুধু 'পাখীর নীড়ের মতো চোখ', কখনো 'নগ্ন নির্জন হাত' কখনো বা 'করুণ-শঙ্খের মত স্তন'। আর কুয়াশাময় ধূসর সুদূরের অরুণিমা সান্যাল, বনলতা সেন, সুরঞ্জনা, সবিতা কি অন্য কোনো ব্যবহৃত নামই তাঁর মনে পড়েছে। সবই কবির 'নির্জন স্বাক্ষর' দেওয়া 'মহাপৃথিবী'র জীবন চরিত।

আমরা দেখেছি, বর্তমান প্রতিবেশের চারপাশের কল্লোল কোলাহল শ্লোগান ও জীবন স্পন্দনে কবির এই নির্জন জগৎ চিড় খায় নি। তিনি আধ-বোঁজা চোখে 'শতশত শুকরের চীৎকার' ভরা অন্ধকারে পৃথিবীর জলন্ত জীবন হয়তো দেখেছেন ; দেখেছেন দুঃখ দৈন্য জ্বালা দূর করার ব্যর্থ প্রয়াস মানুষের। কবি হয়তো এ ব্যাপারে যুক্তও হতে চেয়েছেন। কিন্তু 'কমিটি মিটিং ভেঙে আকাশে তাকালে মনে পড়ে / সে আর সপ্তমী তিথি ;—চাঁদ—'। 'বেলা অবেলা কালবেলা'য় পৌঁছে জীবনানন্দ মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে সত্যের মূর্তি প্রত্যক্ষ

করে বিশ্বাস পেয়েছেন মানুষের প্রতি—'মানুষের প্রাণ থেকে পৃথিবীর মানুষের প্রতি / যেই আস্থা নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো, ফিরে আসে, মহাত্মা গান্ধীকে / আস্থা করা যায় বলে', তবু কবি এগোতে পারেন নি ডাণ্ডি বা সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পথ ধরে জনতার ভেতরে। মানুষের প্রতি যে গভীর মমত্ব উপলব্ধি করা যায় জীবনানন্দের কবিতায়, সে এক শাশ্বত মানুষ—অনন্ত মানুষের ধারণারই প্রতীক। কিন্তু 'ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি রাশি দুঃখের খনি' দেখে তিনি নিষ্পেষিত মনুষ্যত্বের জন্যে মানুষকে, মানুষীকে ভালোবেসে দেখেছেন, ঘৃণা করে দেখেছেন—তবু পেতে চেয়েছেন। অপূর্ব মাদকতার আমেজমাখানো অবসন্ন বেদনার রসে তৃপ্ত হয়ে একটা উৎসাহহীন আত্মবিলুপ্তির পথে নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত টানে জীবনানন্দ এগিয়ে গেলেও—তিমির বিলাসী কবি মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করেছেন 'অন্ধকারে সবচেয়ে সে শরণ ভালো / যে প্রেম জ্ঞানের থেকে পেয়েছে গভীর ভাবে আলো'। অতি সাম্প্রতিক কালের কবিরা সে মন্ত্রেই দীক্ষা নিয়েছেন—জীবনানন্দ দাশকেই তাঁরা আধুনিক সময়ের দ্রষ্টা বলে মনে করে তাঁর অর্জিত দৌলতের বহু কিছুকেই গ্রহণ করেছেন, আত্মসাৎ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁরা তার সময় ব্রহ্মাণ্ডকে উপলব্ধি না করতে পেরে প্রায় উদ্ধারহীন অভিশাপগ্রস্ত জীবনের কান্না চীৎকার ও গোঙানিকেই কবিতা করে তুলেছেন। সত্য বটে, জীবনানন্দ প্রশান্তি-সন্ধানী, কিন্তু চরিত্রগত দিক থেকে তিনি রবীন্দ্র-প্রশান্তির বিপরীত দূরত্বেই থেকে গেছেন। এবং সেই প্রান্ত থেকেই সাম্প্রতিক কবির চীৎকার: 'উল্লুক আমায় বলবে প্রসন্নতা পিয়াসী ভিখারী / চোয়ালে থাপ্পর যদি কম হয়, লাথি মারব পোঁদে' (শক্তি চট্টোপাধ্যায়)।

অমিয় চক্রবর্তী কিন্তু রবীন্দ্র পরিমণ্ডলেরই—সেই ধ্যানলোক প্রভাবিত প্রশান্তির কবি। আন্তর্জাতিক ভূগোল মানুষ ও সংস্কৃতির অভিজ্ঞতায় বিচিত্র এবং অসামান্য তাঁর কবিপ্রজ্ঞা। সর্বদেশী পরিব্রাজক হয়ে আন্তর্জাতিক মনুষ্যত্বের সঙ্গে আত্মীয়তায় এবং গভীর মমতায় কোনো দিনই আধুনিকতার হলাহল কোলাহলের সঙ্গে জড়িয়ে না পড়ে অমিয় চক্রবর্তী এতটুকু শান্তিময় বাসা ও একটি অবিকল্প ভালোবাসার নীড় তল্লাস করে যাচ্ছেন। কালপুরুষের সঙ্গে যেতে যেতে তিনি দেখেছেন পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদীদের উপনিবেশে নখে দাঁতে বারুদে ক্ষত বিক্ষত দস্যু কাণ্ড; দেখেছেন 'নির্যাতিত নিগ্রো শোধে তারই / আমৃত্যু ভীষণ দাম অপমানে রাত্রি দিন / অধম বনিক ঘোরে সাম্রাজ্য পাপের মুর্খ দাপে।' এই মানবতার রাবীন্দ্রিক ঐতিহ্য—মানব সত্য—প্রকাশের জন্যেই তাঁর

কাব্যে স্থান পেয়েছে বিচিত্র মহৎ ও তুচ্ছ, তাৎপর্যময় সত্য এবং অর্থযুক্ত বস্তুর সশ্রদ্ধ সংগ্রহ। মিতাচারী, স্বল্পভাষী সংহত সংকেতময় শব্দে বিচ্ছিন্ন অসংলগ্ন আধুনিক জীবনকে ফুটিয়ে তুলতে রূঢ় তীক্ষ্ণ বাক্য বিন্যাসের মধ্যেও একটা লিরিক টোন সৃষ্টি করেছেন অমিয় চক্রবর্তী। কবিতায় বহু ক্ষেত্রেই তিনি মিষ্টিক। অমিয় চক্রবর্তী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু জগৎকেই তাঁর সমগ্র কবিতার ভিত্তিতে স্থাপন করে বিজ্ঞান ও বস্তু চেতনার বিশ্ব রহস্য উদ্ধার করতে না পেরে আপন ধ্যানলোকের আলোকে সমস্ত বিরোধ ও অসংলগ্নতার মধ্যে সংগতি স্থাপন করতে চেয়েছেন। তিনি জানেন, কাব্যসৃষ্টি সমাজ প্রবাহের সঙ্গে জড়িত, কিন্তু তাই-ই শেষ নয়। শ্রেয়কে পেতে হলে চাই অন্তরের ভাস্বর অংশের সঙ্গে বিজ্ঞান ও বস্তুর সংযুক্তি।

স্বদেশের ভয়াবহ বেদনার ছবি, দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ দেখে সভ্যতার কল্যাণকরতা সম্পর্কে সন্দিহান কবি আন্তর্জাতিক জগতে মহাদেশে মহাদেশে গোলক চাঁপার তলায় মাটির বাড়ির খোঁজে বেড়িয়েছেন। দেখেছেন কলকারখানা যন্ত্র, ইস্পাত কংক্রিট—প্রাণের ওপরে অন্ধ অত্যাচার। শুনেছেন সাইরেনের শব্দ, কামানের আওয়াজ—আর দেখেছেন 'বর্বরের হাতে দুঃখ পেয়েও নিভৃত করুণার জিৎ'। এবং বলেছেন 'পাপের বিরুদ্ধে পাপী হয়ে, হত্যার বদলে হেনে হত্যা, শোক / মাথা নীচু করব না কোটি লোক'। পোড়ো জমিতে—সৃষ্টির ঊষরতায় এবং খরাধরা শুভোপলব্ধির চেতনাময় জগতে কবি চেয়েছেন সৃষ্টি—'পুরোনো কুঞ্জ ঝাঁঝর ঝটায় / ভিন গ্রামে ওড়ে, শূন্য এদিক / বৃষ্টি পড়ুক বৃষ্টি পড়ুক'। অমিয় চক্রবর্তীর মধ্যে ব্যক্তিগত বেদনা আধুনিক পৃথিবীর ঝড় ঝাপটা যুদ্ধ দাঙ্গায় বিধ্বস্ত জাতিগোষ্ঠীর বেদনার সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। কোথাও ক্রোধ নেই —আছে তাঁর অপার করুণা। যন্ত্রকে তিনি বস্তু শক্তির প্রতীক এবং মন্ত্রকে তিনি আধ্যাত্মিক শক্তির প্রতীক করে নিয়ে দুটিকে হরপার্বতীর একাঙ্গে পরিণত করেছেন : 'ওঁ চুন সুরকির ভাঙা চোঙ' এবং ইলেক্‌ট্রিক ফ্যানের 'ধ্বনি ঘর্ঘর হতে···ওম—'। বিজ্ঞানকে তিনি শক্তির—কল্যাণ শক্তিরই—স্বরূপে দেখতে পেয়েছেন, কিন্তু সন্দেহ জেগেছে তার সার্বিক সমস্যা সমাধান ক্ষমতায়। ফলে, আশ্রয় নিতে হয়েছে আধ্যাত্মিক দর্শনে। কিন্তু সমস্ত ভাঙন পতনেও বিশ্বাস হারান নি অমিয় চক্রবর্তী। 'দেশ মহাদেশ ভাঙে গড়ে দেখে বারবার / মাটির পৃথিবী জোড়ে আরবার' বলে তিনি অনুভব করেছেন 'ডুবন্ত মনে ছবির পরে ছবি / মৃন্ময়ী বাড়ি গোলক চাঁপা গোড়া বাঁধানো' সেখানে 'কে স্থির দাঁড়ায়ে

আলো নিয়ে' আর 'সিঁড়ির কাছে চেনা কচি গলার আওয়াজ'।

ইম্প্রেশনিষ্টদের মতো কথায় কথায় তিনি ছবি এঁকেছেন কবিতায়। এখানে চিত্রধর্ম—যান্ত্রিক চিত্রধর্মই প্রকট। আর ছন্দের অভিনবত্বে, শব্দ নির্বাচনে ও তার ব্যবহারে কোনোরকম শুচিবাইগ্রস্ত সংস্কার না রেখে প্রচুর বিদেশী শব্দ, ইংরেজী ভাষায় যন্ত্র ও যন্ত্রাংশের নাম, দেশজ শব্দ ও অর্থনৈতিক রাজনৈতিক পারিভাষিক শব্দের সঙ্গে বেদ উপনিষদ ও গায়ত্রী মন্ত্রের অভিন্ন সংযোগ সৃষ্টি করে অভিনব স্বাদের কবিতা রচনা করেছেন অমিয় চক্রবর্তী। 'হারানো অর্কিড' গোছের ইমেজে বেদনার দ্যোতনা ও ব্যাপ্তি এনে, আধুনিক জীবনের উচ্চণ্ডতা, রক্তপাত, ঘাম, নৃশংসতার সমস্ত বীভৎসাকে তাঁর কাব্য শরীরে রুয়ে দিয়েও তিনি বলতে পেরেছেন 'বন ঝাউ ছিলো প্রতিবেশী / কাঠ তার তক্তা হোলো, ডাল কটা পুড়বে উনোনে ; / হঠাৎ সহস্র দিন শেষে যেন এক লহমায় মিশ্র সন্ধ্যা রাত্রি আজ ছায়া সাক্ষ্যহীন / খোয়াই খয়ের রঙ, রাঙা দিগ্বলয় চতুর্দিকে নবজাত বৃক্ষের সমাজ'।—এ যেন রবীন্দ্র প্রজ্ঞারই সিদ্ধি সুন্দর প্রতিধ্বনি।

শিক্ষাজাত বৈদগ্ধ্যই এ সময়ের কবিদের মধ্যে বৈশিষ্ট্য এনেছে। জীবনানন্দে ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক বস্তুর অনুষঙ্গ, অমিয় চক্রবর্তীতে আন্তর্জাতিক বিষয়বস্তু ও বৈজ্ঞানিক দার্শনিক জ্ঞান, সুধীন্দ্রনাথ দত্তর মধ্যে ভারতীয় পুরাণ ও বৈদিক ঐতিহ্যচিন্তা এবং বিষ্ণু দে'র কবিতায় ভারতীয় আর গ্রীক মাইথলজিকাল বিষয়বস্তুর সগর্ব ব্যবহার। কবিতার সর্বচরতা বোঝাতে এবং মানুষের অতীত এবং বর্তমানের প্রগাঢ় সান্নিধ্যের পরিচয় আনতেই এ সবের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো। এ পাণ্ডিত্য কোথাও কোথাও ভার হলেও আধুনিক আবেগে বহু ক্ষেত্রেই তা ধারালো হয়ে উঠেছে। কিছুটা দুর্বোধ্য হতে বাধ্য হয়ে আধুনিক কবিতা কেবল বহুমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত পাঠকের কাছেই রসাবেদন রেখে ব্যাপক অর্থে বিচ্ছিন্নতা দোষে দুষ্ট হয়েছে। কিন্তু কবিতা হয়েছে সচেতন হাতে নির্মিত শিল্প।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তর পাণ্ডিত্য তাঁর কবিতাকে ক্লাসিক বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। বিশ্ব-সমস্যায় জর্জরিত সুধীন্দ্রনাথের রক্তের যোগ গাঙ্গেয় সবুজের সঙ্গে থাকলেও মানুষের প্রতি সাংঘাতিক অনীহা আপন ভূমির লাঞ্ছিত, নিপীড়িত, স্বাধীনতা ও জীবন পিপাসায় মরীয়া হয়ে ওঠা মানুষ তাঁর কাব্যে নিষ্ঠুর ভাবে উপেক্ষিত। ডিক্টেটর, ফ্যুয়েরয়, ট্রেইটর সম্পর্কে ভাবিত দুর্ভাবিত থেকে, মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কে আতঙ্কিত হলেও একটা আশ্চর্য নিস্পৃহ ভাব সুগভীর নাস্তিক্য এনে কবি

ব্যক্তিত্বকে সাঙ্গীকৃত করেছে উট, উটপাখীর সঙ্গে—জেগেছে মরু অস্থিরতা। কারণ, তাঁর কাছে আধুনিক বিজ্ঞান শক্তির মতো মার্কসীয় দর্শন কোনো আবেদন রাখে নি। প্লেটোর 'কেভ্ এ্যালিগোরি'র মতোই সম্ভবতঃ তাঁর কাছে মনে হয়েছিলো বাঁচার সংগ্রাম—'সাম্যবাদ, কৃষিজীবী ক্লীবের ক্রন্দন' বলে মনে হয়েছে সুধীন্দ্রনাথের কাছে। লোকালয়ে বিশ্বাস নেই, প্রেম আত্মমর্ষণে পরিসমাপ্ত—নিজেকেই ভালোবাসার বীভৎস অতিরেক তাঁকে ট্রাজেডির নায়কে পরিণত করেছে। সুধীন্দ্রনাথের উপলব্ধিতে এসেছে 'জানা' শুধু অভিশাপ, 'এমন কি বিধাতার / জ্যোতির্ময় সিংহাসনখানি ডুবেছে নাস্তির গর্ভে, সে কথাও জানি'। ফলে সুধীন্দ্রনাথের ক্রন্দন—না, আর্তনাদ, 'শান্তি শান্তি শান্তি চারিধারে / কেবল অন্তরে মোর ক্ষুব্ধ হাহাকার।' প্রেম তাকে 'নিরাশ্বাস বুদ্ধির তিমির' থেকে উদ্ধার করতে পারে নি। তিনি শুধু বুঝেছেন, নারীপুরুষ 'সর্বস্বান্ত পৈশাচিক ঋণ শুধে শুধে'। সুধীন্দ্রনাথের কাছে প্রেমে নিষ্ঠা, একাগ্র প্রেম যাপন, স্মৃতি পোহানো, অঙ্গীকার সমস্ত কিছুই মিথ্যা বলে মনে হয়েছে এবং সেকথা জোরের সঙ্গেই বলেছেন: 'অসম্ভব প্রিয়তমে, অসম্ভব শাশ্বত স্মরণ; / অসঙ্গত চির প্রেম; সংবরণ অসাধ্য, অন্যায়'। আর সেই সঙ্গেই স্বীকারোক্তি 'আমার মনের আদিম আঁধারে / বাস করে প্রেত কাতারে কাতারে / প্রাক্‌পুরাণিক বিকট পশুর দায়ভাগ মোর শোনিতে নাচে'। এবং এই বোধের মর্মান্তিক উত্তরাধিকার পেয়েই সম্ভবত অতি-সাম্প্রতিক কবি ক্রুদ্ধ হয়ে ফেটে পড়ে বুঝতে চেয়েছেন 'লিঙ্গ প্রহার করে হৃদয় পর্যন্ত পৌছানো'[৬৭] যায় কিনা। বিশ্ব সংসারের সবকিছুর মধ্যে একটা 'নিখিল নাস্তি' অনুভব করে সুধীন্দ্রনাথ ক্ষোভের সঙ্গে—না, একটা তান্ত্রিক সুলভ বাস্তব বিতৃষ্ণায়—বলে উঠেছেন 'অধুনা অসহ্য মোর, ভবিষ্যৎ বন্ধ অন্ধকার / কাম্য শুধু স্থবির মরণ।' তিনি দেখেছেন 'শূন্যে ঠেকেছে লাভে লোকসানে মিলে, / ক্লান্তির মতো শান্তিও অনিকাম'। সারাজীবন শূন্যতার চাষ করে 'সোহং'বাদ ধ্বনিত করে 'আমি সে আত্মা' ঘোষণা দিলেও সুধীন্দ্রনাথকে 'জনশূন্যতা'ও আশ্রয় দেয় নি।

নেতিবাদী দর্শনকে পুঁজি করে অভিজাত উন্নাসিকতায় সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্নতা বজায় রেখে বর্তমানে বিশ্বাস হারিয়ে, ভবিষ্যতে আস্থাহীন হয়ে পরিনামে সুধীন্দ্রনাথ বুঝেছেন, রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে মানুষ শুধুই অসহায়। যুদ্ধের ছাই ভাগ করে নিতে শান্তি-আলোচনা প্রহসন ছাড়া কিছুই নয়। এবং

৬৭। শক্তি চট্টোপাধ্যায়

নিয়তিবাদী দার্শনিকের মতো নাস্তির দাহে কালি হয়ে যাওয়া কলিজার রক্ত ক্ষরণ ঘটিয়েছেন কবিতার মধ্যে : 'মানুষের মর্মে মর্মে করিছে বিরাজ / সংক্রমিত মড়কের কীট / শুকায়েছে কালস্রোত, কর্দমে মিলে না পাদপীঠ / অতএব পরিত্রাণ নাই।'

সর্ববিচ্ছিন্ন উন্নাসিক আভিজাত্য, বুদ্ধিবিলাসিতা, নৈরাশ্য-আক্রান্ত হৃদয়ে নিরুত্তেজ আবেগে কবিতা রচনা করেছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। দীর্ঘ কবিতা রচনাতেই তাঁর উৎসাহ। ক্লাসিক বৈদগ্ধ্যে কবিতার বহিরঙ্গ সংস্কারে কবিতাকে ঋজু ও তীক্ষ্ণ করার দিকেই তাঁর দৃষ্টি। আবেগের সঙ্গে যুক্তির বিবাহ ঘটিয়ে গদ্য বিন্যাসের ধাঁচে কবিবাক্য গঠন করে তিনি যেমন শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি তৎসম শব্দ ও দেশজ শব্দকে চলতি ও গ্রাম্য ক্রিয়াপদের সঙ্গে যুক্ত করে অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন ছন্দ নির্মাণে। কিন্তু সমগ্র কাব্য প্রক্রিয়ার মধ্যে থেকে সুধীন্দ্রনাথ যতটা ভাষাকে পেয়েছেন, ভাবকে তেমনি করে না পাওয়ায় তাঁর কবিতা বহু ক্ষেত্রেই যান্ত্রিক হয়ে পড়েছে। এবং এই কৃত্রিম কাব্য ভাবনা এবং জড় পাণ্ডিত্যই তাঁর কবিতাকে পাঠকের কাছে সহজ-আস্বাদ্য হতে দেয় নি। পাঠক তাঁকে প্রায় বর্জন করেছে। যুগের বিবর্ণতা, বিষাদ ও নৈরাজ্যের সাংঘাতিক আক্রমণে সুধীন্দ্রনাথ সর্বত্র যে ঊষরতার 'অখিল ক্ষুধা' অনুভব করেছেন, তাঁর উত্তরসূরী কবিগোষ্ঠী সমাজ-রাষ্ট্রের আরো জঘন্য পরিস্থিতিতে যদি 'হাওড়ার ব্রীজকেও লঙ্কা নিমক মেখে' টাকনা দিয়ে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মতো খেয়ে ফেলতে চান তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

অধুনা বিয়ের বাজারে চালু মনোরম ছাপাই বাঁধাই এবং অভিনব প্রচ্ছদের বেশ কয়েকটি পদ্যের বইয়ের লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র সর্বজনবোধ্য কবি। 'প্রথমা'র দিকে তিনি নজরুলের সরব কণ্ঠস্বরের সমকণ্ঠী হিসেবে চাষী মজুরে মুক্তি খুঁজেছেন—গদ্যে শুধুই কেরানী জীবন বিন্যাস করেছেন যদিও। সমাজতান্ত্রিক ভাবনায় ভাবিত হয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র দেখেছেন মানব পীড়ন, মানুষের ওপর মানুষের অমানুষিক শোষণ ও অত্যাচার, কিন্তু 'অগ্নি আখরে আকাশে যাহারা লিখেছে আপন নাম' তাদের দেখে উৎসাহিতও হয়েছেন খুব। কিন্তু জাতীয় চেতনা প্রখর সংগ্রামশীল হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সন্দিগ্ধ হতে হতে জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। তিনিও সভ্যতাকে মনে করেছেন কৃমিকীটে গড়া— 'এখনকার মেয়েদের চোখ আজ চকচকে ধারালো'। বাস্তব-সচেতন এবং হিসেবী রোমান্টিক কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র। ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং স্ববিরোধী ভাবনার হয়েও

কবিতায় মধ্যবিত্ত জীবনের কামনা বাসনা, ক্লান্তি ও বিক্ষোভকে দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধযন্ত্রণাকে সুমধুর লিরিক দ্যোতনা দিয়ে পরিবেশন করেছেন। প্রথম দিকে তিনি হৃদয়ের জোয়ারে সাগর উদ্দেশে সাগর পাখী হয়ে ধাওয়া করেছিলেন কিন্তু পরবর্তীকালে 'সাগর থেকে ফেরা' ছাড়া তাঁর উপায় ছিলো না। তিনিও আধুনিক কবিতার জগতের অধিবাসী হয়ে জেনেছেন 'মৃত্যু জীবনের শেষ আবিষ্কার।'—এবং 'অবিরাম অবরোধে আপনারে নিঃশেষে আহুতি।'—এ তাঁর নির্মম নিয়তি।

স্বাভাবিক সহজতার জন্যে এবং জটিল গঠন প্রক্রিয়া বর্জিত কবিতা বলে প্রেমেন্দ্র মিত্রর কবিতা বহুজন পাঠকের কাছে সমাদর পেয়েছে। কিন্তু দু-একটি কবিতা ছাড়া সময় কিছুই বুঝি রাখবে না তাঁর। এ ক্ষেত্রে তাঁর কবিতাও নজরুলের কবিতার পরিণতির মতোই স্বল্পায়ুর।

'কবিতা' পত্রিকা এবং আধুনিক কবিতা আন্দোলনের নায়ক বুদ্ধদেব বসু। যেমন অতি-সাম্প্রতিক কালে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা এবং কবিতা আন্দোলনের উদ্যোক্তা সম্পাদক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে বাদ দিয়ে স্বাধীনতা-পরবর্তী কালের কবিতার পরিচয় তোলা যায় না, তেমনি বুদ্ধদেব বসুকে বাদ দিয়ে রবীন্দ্রোত্তর কালের কবিতা আলোচনা করার মানে আধুনিক কবিতার বড় একটা মহলকেই অন্ধকারে রাখা। যে চিন্তাতেই তিনি চিন্তিত হোন না কেন তাঁকে এড়িয়ে গিয়ে বাংলা কবিতার আলোচনা করা সমাজের অতিমঙ্গল প্রয়োজনেও গর্হিত মনে করি। আর সাহিত্য যদি সাহিত্য হয় (অতি পারভারশন থেকেও মহৎ সাহিত্য হতে পারে) তবে তা সমাজের কি পাঠকের কোনো ক্ষতি করতে পারে বলে বিশ্বাস করা বাতুলতা। এ যে, স্বীকার করতেই হবে, প্রথমত এবং প্রধানত বুদ্ধদেব বসু (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও যেমন) কবি। সংগঠক হিসেবেও বুদ্ধদেব বসু অতৃতীয়। তাঁর সাহিত্য আন্দোলনের ফলশ্রুতি খুবই ব্যাপক এবং সুদূর বিস্তৃত। সব আন্দোলনেরই সুফল কুফল আছে—বুদ্ধদেব-সুনীল পরিচালিত আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তাই, এটা ধরে নেওয়াই ভালো। বুদ্ধদেব বসুর অসামান্য কৃতিত্ব কবি বাছাই এবং তাঁদের স্বীকৃতি দানে। সাহিত্য বোদ্ধা হিসেবেও তিনি আঙুল গুণতি কয়েকজনের একজন, যদিও নিজের লেখালেখি সম্পর্কে তিনি একটু বাড়াবাড়ি চিন্তাই পোষণ করেছেন বলে মনে হয়।

বিভিন্ন অধ্যায়ে নানা প্রসঙ্গে বলে আসা হয়েছে, বুদ্ধদেব বসু আন্তর প্রেরণায় মানব মনের চির পদার্থ অন্বেষণে সদাতৎপর, বোদলেয়ারী পাপবোধে মূর্ছিত

ও অভিশপ্ত দেবশিশুবোধে চিরকাল নির্বাসিত কবি-ব্যক্তিত্ব। রজনী উতল দেওয়া, যৌবন কাঁপানো উজ্জ্বল অভিজ্ঞান পরিপূর্ণ কাব্য-শৈলীর প্রদীপ্ত কবিতা রচনা করে বুদ্ধদেব বসু রক্তমাংসল প্রতিমা করে তুলেছেন কবিতাকে। বুদ্ধদেব বসু রোমান্টিক, কিন্তু বাস্তব পৃথিবীর চুলে স্পর্শ রেখে—যোনি-যৌনাঙ্গের সম্পর্ক ছিন্ন করে নয়। তিনি তাঁর কবি চরিত্রানুগ পাশ্চাত্ত্য কাব্য ও দর্শন থেকে প্রেরণা পেয়ে চামড়া মাংসবন্দী হৃদয় এবং অস্তিত্বের সত্যোদ্ধারের চেষ্টা করেছেন এবং তাই দিয়েই রবীন্দ্র বিরোধী বিদ্রোহে সামিল হয়েছেন। স্বাধীন শিল্প সাহিত্য গড়ার দুর্দমনীয় আবেগ, একটা উচ্ছ্বাসপ্রবণ অভিজাত-সমাজ-লালিত ক্ষত এবং রোগ তাঁর কাব্যকে গ্রাস করেছে। ভাষায় অভাবনীয় দখল ও পাণ্ডিত্য নিয়ে দেশী বিদেশী শিল্প সাহিত্য আস্বাদন ও অনুধাবন করে নিপুণছন্দে, পরিমিত জ্ঞানের পারদর্শিতায় তিনি তাঁর অবচেতনায় 'মাদাম সাবাতিয়ে'কেই রচনা করেছেন। পরিবর্তীত পৃথিবী প্রেম, ধর্ম বা নীতি সম্পর্কিত মূল্যবোধ পালটে সুন্দর কুৎসিতের ব্যবধান ঘুচিয়ে যে নতুন তাৎপর্য এনেছে—শ্লীলতা অশ্লীলতার পুরোনো ধারণা পালটে দিয়ে বুর্জোয়া ব্রাহ্ম শালীনতা ও মর্যাদাবোধকে ধুলিসাৎ করে যে নতুন সত্য ধারণা এনেছে, বুদ্ধদেব বসু তাকে সম্পূর্ণ আত্মস্থ করে রক্তমাংসের জৈবিক সত্তা এবং তাড়নাকে তীব্র আবেগে এবং সূক্ষ্ম বিন্যাসে সম্প্রচারিত করেছেন, 'হৃদয়ের রক্ত তব ক্ষণে ক্ষণে করিব শোষণ / কায়াহীন বুভুক্ষু অধরে' বলতে তিনি দ্বিধা করেন নি। কেননা তিনি জানেন রক্তমাংসের নায়িকার 'কুমারীত্ব করিতে মোচন / পটুতার নাহি ছিল সীমা।'

তিনি দক্ষতার সঙ্গে বহু নতুন উপমায় নারীদেহের চুল, চোখ, ঠোঁট, স্তন যোনি, জঙ্ঘা বর্ণনা করে আধুনিকতার বিদ্রোহী মনোভঙ্গী প্রকাশ করেছেন—নিষিদ্ধ জগতকে আলোকে এনেছেন তীব্র বিক্রমে। বুদ্ধদেব বসু আধুনিকতায় সিদ্ধ—অবশ্য কুমারী সিদ্ধ—পুরুষ। যৌবন তাঁর অভিশাপ। প্রেমকে তিনি জেনেছেন দেহ বুদ্ধি ও আত্মার সমাহারে গঠিত জৈবিক বোধ এবং সঙ্গমে তার পরিপূর্ণতা। তাই রমণে রমণীর লজ্জা তাঁর অসহ্য। তাই প্রায় গোঙানির মতো বলেছেন, 'আমার দুর্ভাগ্য এই সকলি জেনেছি / মোর কাছে এসে আজ যে অঞ্চল টানি দাও সুন্দর লজ্জায় / জানি, তাহা শ্লথ হবে কোন এক রাতে / (তখন কোথায় আমি ?) / যে শঙ্কার শিহরণে তব দেহ লাবণ্যেরে মোর কাছে করেছ মধুর / (ওগো কঙ্কাবতী— / মধুর মধুর !) / জানি, তাহা থেমে যাবে ধূসর প্রভাতে এক, যবে চক্ষু মেলি / পার্শ্বস্থ জানুর দৃঢ় আকুঞ্চন থেকে /

আপনার কটিতট নেবে মুক্ত করি'। এবং এর পর 'জোনাকি'-র আলোকে 'রাঙাভাঙা চাঁদ'-এ করে 'যে আঁধার আলোর অধিক' সেই আঁধারে উড়ে যেতে যেতে বুদ্ধদেব বসু ক্রন্দমান বেহালা বাদক। কী পেয়েছেন! অর্থ। বেনিয়া বুদ্ধি যেমন প্রেম এবং তার দেহকে পণ্যে পরিণত করেছে, লেখক হিসেবে বুদ্ধদেব বসুও জেনেছেন 'কড়ি'-টাই আসল, আদিম কাল থেকে তা স্ত্রী যৌনাঙ্গেরই প্রতীক। বুদ্ধদেব বসুর উত্তরসূরীরাও পেয়েছেন তাই। বুদ্ধদেব বসুর সমাজচেতনা ও কালচেতনা রহিত যৌন শীৎকারের অবাঞ্ছিত উত্তরাধিকার নিয়ে কাব্য ভাবনা গড়েছেন অনেকে। সাহিত্যে অশ্লীলতা বলে কোনো কথা নেই—থাকা উচিতও নয়। কিন্তু ব্রাহ্ম শুচিবাইগ্রস্ত আবহাওয়া কাটাতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ যে যৌনসর্বস্ব চিন্তার প্রজন্ম দিয়েছেন, তা যদি দোষের না হয়, তবে কী দোষ করলো শক্তি, সুনীল, শৈলেশ্বর—বিশেষ করে—মলয় রায়-চৌধুরীদের কবিতা! কোথায় তাঁদের অশ্লীলতা? পূর্বসূরীদের মতো 'দ্রৌপদীর শাড়ি' চাপিয়ে যৌনতাটাকেই মুখ্য করে তোলা হয় নি বলে? সাম্প্রতিক কাল যৌন নিয়ে বিরক্ত। যৌনতা কেন্দ্রিকতাই সাহিত্য সৃষ্টির বা চূড়ান্ত মুখ্য বিষয় নয় জেনে—কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের রাজসভার প্রতিভাধর ভাঁড় গোপালের মতো এঁরা যৌনবন্দী জীবনকে ঠাট্টা করছেন বলেই কি তাঁরা আদালতে সোপর্দনীয়? এ যুগের অশ্লীল আক্রমণে তরুণ কবি যখন 'পোঁদের জ্বালায় হু হু' করে 'গীতবিতানী' ঢঙের লিরিক পদ্যে আশ্রয় খুঁজছেন তখনই 'কুমারীর মৃত্যু'র পরে পরেই 'কবির মৃত্যু' ঘটেছে—কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর কলম চলছেই। 'মর্চে পড়া পেরেকের গান'-এ চেতনায় সেপটিক হবার মতো কিছু নেই।

বুদ্ধদেব বসুর কোনো সামাজিক দায়িত্ব নেই। কেননা তিনি বহু আগেই জেনেছেন 'জীবনের কানে কানে কঙ্কালেরা চুপি চুপি কথা কয়'। থাকবে কি? সভ্যতা শুধু মৃত্যুকেই জন্ম দিয়েছে। কবিতায় তাঁর বিষয়বস্তুর প্রাধান্য নেই। কথ্যরীতি ও কাব্যরীতির মিশেল দিয়ে চলতি শব্দের দুঃসাহসিক প্রয়োগ দেখিয়ে এবং মিলের তাজ্জব চমক এনে বিশুদ্ধ কবিতার জন্যে তিনি আত্মদাহ করেছেন। 'প্রেমিক পাখির মতো ফিরে আসা ঘরে / ছন্দে ছন্দে হিন্দোলিত বায়ু মণ্ডলের / আলিঙ্গন গাঢ় করে ক্রমে / নামো এ্যারোড্রামে' বলে তিনি বিদিশা ইত্যাদির স্বপ্ন কল্পনাতেই নেমেছেন। রূঢ় বাস্তবে যে জীবন ছন্দ এবং ঘর্মাক্ত রন্দ্রে ঘুরে এসে দুঃখে বেদনায় লজ্জায় রমণীর চুলে মুখ মুছে বেঁচে ওঠার জন্যে রাত কাটানোর কোজাগরী স্বপ্ন, বুদ্ধদেব বসু সেই মানবিক চির-

পদার্থকে সন্ধান করেন নি। শুদ্ধ সাহিত্য বলতে একটা পান্‌সে রক্তহীন কলা কৈবল্যবাদের ধারাকেই সৃষ্টি করেছেন এবং তা নরেশ গুহ, অরুণ সরকারে এসেই প্রায় শুকিয়ে গেছে—আলোক সরকার মরাখাতে জল খুঁজে খুঁজে চূড়ান্ত ব্যর্থতার সাক্ষ্য।

কবিতা সামাজিক শিল্প। সমাজের মৌল সমস্যা যৌনের নয়, জমির—সুস্থ বাসস্থানের—জীবনের। স্বাধীনতা আর যুদ্ধহীন মানবিক পরিবেশ রচনা করে এইটুকু আশা পোষণ করা যে সূর্যের চূড়ান্ত মৃত্যু অব্দি মানুষ পৃথিবীতে থাকবে এবং ধ্বংসের ধ্বংস নীতিতে অজস্র নতুনতার জন্ম হবে। মানুষের গোটাটাই নষ্ট, এ কথা ভাবলে নিজেকেও নষ্ট ভাবতে হয়—এবং নিজের নষ্টত্ব দিয়ে সৃষ্টি পুরোপুরি নষ্ট মানুষের কাছে যে কোনো আবেদনই রাখবে না, তা বাহুল্য। এ যদি হয় তবে লেখালেখির কি দরকার! পুরো মানুষের সার্বিক বিনষ্টি আসে নি ধরে নিয়েই সৃষ্টি। তাই সাহিত্য করতে গিয়েই মানুষের কথা মনে রাখতে হবে। কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর সক্রিয় প্রচেষ্টায় গড়া তথাকথিত স্বাধীন-সাহিত্য-সমাজ সাহিত্যকে সমাজ মানস-বহির্ভূত রেখে দিতেই লেখকদের উৎসাহিত করেছে। বিপন্ন পরিস্থিতিতে দেখা গেছে, এই স্বাধীন-সাহিত্য-সমাজ বিশেষ এক শক্তির সঙ্গেই গাঁটছড়া বেঁধেছে এবং প্রমাণ করেছে স্বাধীন সাহিত্যের ধুয়াটা তাঁদের ঝুটো। অবশ্যই কবি সাহিত্যিক তাঁর চিন্তা ভাবনায় স্বাধীন। আধুনিকতা তাঁকে সু এবং কু, পাপ এবং পুণ্য, জীবন ও মরণকে সমান সত্য হিসেবে দেখতেই স্বাধীন থাকবার চেতনা দিয়েছে। কিন্তু ইহুদি-পোড়ানোর বেলায় স্বাধীন থেকে চিৎকার করবো কিন্তু কমিউনিস্ট পোড়ানোর বেলায় চুপ করে থাকবো এমন স্বাধীনতাটা ন্যক্কারজনক। স্বাধীন ব্যক্তিত্ব ভিয়েৎনামের নরনারীঘাতী-যুদ্ধকেও যেমন ঘৃণা করে চীনের ভারত আক্রমণকেও সমান ঘৃণা করে। কিন্তু বুদ্ধদেব বসুদের স্বাধীন ব্যক্তিত্ব সন্দেহের উদ্রেক করে। মানুষ হিসেবে যাঁর চরিত্র অকপট নয়—সাহিত্যিক হিসেবে যত সুন্দরসন্ধানী দৃষ্টিতে সুন্দর কথা সাজান না কেন, তা সত্য নয় বলে ধরে নিতে বাধা নেই। সংস্কার-মুক্ত যুক্তি ও মুক্ত বুদ্ধি আধুনিকতার অন্যতম উপাদান সন্দেহ নেই, কিন্তু তা কি নতুন ভূমির তল্লাসের জন্যে নয়—জীবনে মানুষকে মূর্ত করে তোলার জন্যে কি তার প্রয়োগ নেই?

এদিক থেকে স্বাধীনতা-পূর্ব কালের অনন্য কবি ব্যক্তিত্ব বিষ্ণু দে। প্রজ্ঞা, পাণ্ডিত্য ও জীবনবোধে একালের দুরতিক্রম্য দুর্বোধ্যতা, প্রখর আবেগ ও যুক্তিকে তিনি এক পাত্রে পরিবেশন করেছেন। এলিয়টীয় ধীশক্তি, সুসংহত বাক্য-

বিন্যাস, কবিতার শরীর গঠনে তীক্ষ্ণ সচেতনতা, ভারতীয় ও গ্রীক মাইথলজির ব্যবহারে দক্ষতা এবং ঐতিহ্যকে জীর্ণ করে নতুন তাৎপর্যে ব্যবহার করার নিশ্ছিদ্র দক্ষতায় তিনি বাংলা কবিতাকে আধুনিক প্রাণ শক্তির পরিচায়ক করে তুলেছেন। দেশজ শব্দ, পরিচিত ও অপরিচিত সংস্কৃত শব্দ যোজনা, অখণ্ডকে জেনে ব্যাপ্তির তিয়াশা, মানুষের সৃষ্টিতে ও সম্পদে সমৃদ্ধ পৃথিবীর ওপর আস্থা, প্রকৃতির সজীব সান্নিধ্য, অতীত ও বর্তমানের উষরতায় অবাধ এবং সাবলীল চলাফেরা, মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুসরণ, নানা যোজনা ও নানা জগৎ যাপনার সুবিশাল অভিজ্ঞতা বিষ্ণু দে'র কবিতাকে কঠিন কাঠামো এবং ধ্রুপদী কাব্যের মর্যাদা দিয়েছে। মানুষের মহামিছিলেই তিনি তাঁর সাধনার সিদ্ধি পেয়েছেন। কঠিনের সাধনা করে সহজকে—মন্ত্রসুলভ সহজতায় কবিতাকে যেমন উত্তরণে এনেছেন, তেমনি নাটকীয় বিষাদ মিলনের সংঘাতকে কাব্য শরীরে বপন করে কবিতাকে বহুদূর গভীর ও বিস্তৃত রসেরও করে তুলেছেন।

একৃজিষ্টেনশিয়ালিজম্-এ অবিশ্বাসী বলেই বিষ্ণু দে এলিয়টের ভাবশিষ্য হয়েও কোনো ধর্মে আশ্রয় খোঁজেন নি। তাঁর মানবতাবোধ এবং রাবীন্দ্রিক মানব বিশ্বাসই বিষ্ণু দে'র কবি সত্তাকে কালের সমস্ত সংকটে স্থির লক্ষ্যগামী রেখেছে। পৃথিবীর মমত্বে জড়িয়ে, মর্ত্য মানুষের অসীম ক্ষমতায় আস্থাবান থেকে শান্তি আনন্দ এবং সৌন্দর্য সৃজন মানুষেরই মৌলিক শক্তি-নির্ভর বলে জেনে বিষ্ণু দে তাঁর ধ্যানলোক ও বাস্তব জগতে সম্মিলন ঘটিয়েছেন উমা-উর্বশীর।

যন্ত্রের পেষণে পিষ্ট হয়েও মানবাত্মার অপরাজেয় শক্তিকে তিনি তুলে ধরেছেন কবিতায়—অতীত ধূসর স্বর্ণ যুগের জন্যে কখনও হাহাকার করেন নি। মার্কসীয় চিন্তায় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশ্বাসে তাঁর কবি প্রাণ শুধু উৎসাহিতই নয় রাজনৈতিক চেতনাকে তিনি কাব্য করে তুলেছেন : 'বিশ্বমাতার এ উজ্জীবনে / বৃষ্টিতে বাজে রুদ্র গগনে / লক্ষ ঘোড়ার খুর।' তিনি সত্য দৃষ্টিতেই দেখেছেন 'বহু বঞ্চনা বহু অনাচারে / অমর প্রাণ / বীরদল চলে হাজারো মজুর / লাখো কৃষাণ।' বিষ্ণু দে তবুও যান্ত্রিক মার্কসীয় পার্টিতত্ত্বে বিশ্বাস করেন নি। কিন্তু মার্কসীয় তত্ত্বের ভিত্তিতে জনগনের সংহতিতেই যে আদর্শ সমাজ গঠিত হবে সে প্রত্যয় তাঁর কোনো দিনই চিড় খায় নি।

প্রেম সম্পর্কেও বিষ্ণু দে'র চিন্তায় রয়েছে মার্কসবাদ। এ ক্ষেত্রে ফ্রয়েড প্রথম দিকে কিছুটা আমল পেলেও পরবর্তীকালে নিশ্চিত ভাবে কবি জেনেছেন শ্রেণী সংকটই সমাজের মৌল সংকট। তাই নৈরাজ্যের প্রশ্রয় নেই বিষ্ণু দে'র কবিতায়!

প্রেমকে তিনি মানবিক সৌন্দর্য হিসেবে দেখে প্রত্যয়সিদ্ধ উচ্চারণ দিয়েছেন, 'আমি জানি আকাশ পৃথিবী / আমি জানি ইন্দ্রধণু প্রেম আমাদের'। দেহ আত্মা, অসম্ভব থেকে অবশ্য সম্ভব, চোরাবালি থেকে ভরাকোটালের তীরে তীরে পলিমাটি-মন লোকালয়ে সর্বক্ষণ—কখনো বিভ্রান্ত না হয়ে, অধিক প্রিয় হবার লোভে সহজ হবার চেষ্টা না করে একটা বিপ্লবী চেতনাকে তাঁর আত্মার নিঃশ্বাসে পরিণত করেও তথাকথিত পপুলার 'ডাকে' পার্টি-কথনকে কবিতা না করে বিষ্ণু দে দেশজ কথ্যরীতি ও সংগীতকে, ছবি ও ভাস্কর্যকে, সারা মানুষকে ও আত্ম-ভাবনাকে, মেধা ও হৃদয়কে এক কেন্দ্রীয় সত্যের অন্বেষায় কবিতায় যুক্ত করেছেন। কবি প্রসিদ্ধিগুলোকে নতুন মূল্যে ব্যবহার করে নতুন চিন্তার দ্যোতনা যেমন এনেছেন তেমনি গ্রাম জীবনের সমগ্র সংস্কৃত আর্থিক-ভিত্তি-সমাজ-আচারের মধ্যে একটা আদিম সৌন্দর্য প্রেরণা উপলব্ধি করে বিষ্ণু দে সার্বিক মুক্তি ও স্বাধীনতাকে মেধায় আর হৃদয়ে একাকার করে ফেলেছেন 'সংহত নিখিলে / আসমুদ্র হিমাচল সমতল সমুদ্র গঙ্গার পদ্মার / সিন্ধুর ভল্লার / স্বাধীন স্বাধীন জলে জীবনের ঢেউ'। জন্ম জীবন ও আধুনিক জটিলতার মধ্যে সমগ্র মনুষ্যময় সত্তায় দাবী করেছেন 'হে সুন্দর বাঁচার বিস্ময়ে বিষাদে সম্ভ্রমে জীবনে আকাশ / অবকাশ বাঁচার আনন্দ চাই'। তিনি স্পষ্টতই 'লক্ষ লক্ষ কর্মময় মানুষের মিছিলের একাগ্র আরতি' দেখেছেন আনন্দময়তার প্রতি।

তবে এ আনন্দ বোধ রবীন্দ্র-ভাবনা জাত আনন্দলোক না হয়ে বিষ্ণু দে'র অর্জিত মানুষের পদযাত্রার পদাবলীতেই ক্রমাগ্রসর হয়েছে। যদিও বহু ক্ষেত্রেই রবীন্দ্র আনন্দলোকের ছায়া বিষ্ণু দে'র আনন্দধারায় পড়েছে তবু তা স্বতন্ত্র। যদিও পরে পরে তাঁর দর্শনে (মার্কসীয়) বিশ্বাসী বহুজন কবি এসেছেন কিন্তু বিষ্ণু দে'র সৃষ্ট ধারাকে বেগবতী করতে কেউই প্রায় সক্ষম হন নি। ধ্রুবপদে তিনি যে-যাত্রা করেছেন, তাঁর অনুসারীদের দ্বিধাগ্রস্ত বিশ্বাস, অসামর্থ, চিন্তার দৈন্য সে-যাত্রা পথে যেতে চিহ্নিত পদক্ষেপ সৃষ্টি করতে পারে নি। তাঁর অনুজ কবি যত দূরেই যান হয়ত 'লক্ষ্মীর পা' দেখেন, কিন্তু 'বীজকম্প্র শ্রাবণ ধারায়, কার্তিকের কুয়াশায় নবান্ন ভূষায় / মাঠে মাঠে, এখানে ওখানে, জেলায় জেলায়, দেহে মনে' দেখেন না—দেখতে পেলেও তা প্রত্যয়ের দিক থেকে অসম্পূর্ণ। বিষ্ণু দে'র ছন্দ তাঁর কবি ভাবনারই আবিষ্কার, সমগ্র ভাবনার বেগবান অভিব্যক্তি।

তবু এ কথা বলতে আপত্তি নেই যে, উপযুক্ত শিক্ষা, অর্থাৎ বিভিন্ন বিষয়ে রীতিমতো জ্ঞান না থাকলে বিষ্ণু দে'র কবিতা 'গন সাধারণের' কাছে 'দুস্

ক্যাপিটাল'-এর মতোই অচ্ছুৎ। তাঁর কবিতা বস্তুতই নির্বাসিত এবং তাঁর প্রাপ্য সুভাষ মুখোপাধ্যায় জনসাধারনের কাছ থেকে সুদেআসলের থেকেও কিছু বেশি বুঝে পেয়েছেন, কিন্তু বিষ্ণু দে পান নি। পাঠক বিষ্ণু দে'র কবিতা থেকে সশ্রদ্ধ দূরত্ব বজায় রেখেছে।

জীবনানন্দের পরই যে শক্তিশালী কবি স্বাধীনতা পরবর্তী কালের কবিদের প্রবলভাবে টেনেছেন এবং তাঁর চিন্তায় অনুভাবিত করেছেন তিনি সমর সেন। বিষ্ণু দে'র কবিতায় স্বগতোক্তি নেই—নেই পরাজিত-মন্যতা। কিন্তু যে কবিসত্তা পাণ্ডু, ধৃতরাষ্ট্র এবং অগ্নিবর্ণ, ক্যাকটাস, ন্যাড়াবট, রক্তমুখী রক্তকরবীর সমগোত্রীয়, যাঁর চতুস্পার্শ্বস্থ বাস্তব সবুজহীন শানের শহর পীচের পথের পাড়ে কোলকাতা, আর চারদিকে মানুষের কুচ্ছিৎ নষ্ট বিকার, ক্রোধ, কল্যাণহীন কাম, উন্মার্গ-গামীতা, তার পক্ষে পরাজিত-মন্যতা এবং বিলাপ-প্রায় স্বগতোক্তিই স্বাভাবিক। বাস্তব পরিবেশ এবং সময় সমর সেনের অস্তিত্বকে ধর্ষণ করেছে। রবীন্দ্র ঐতিহ্য থেকে ততদিন বহুদূরে এসে গেছে বাংলা কবিতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংস স্তূপের ওপর শান্তির ললিত বাণী নতুন যুদ্ধের ভূমিকা হয়েই প্রচার পেয়েছে। শহর কোলকাতা ঘাগী বেশ্যার মতো প্রসাধনে সিফিলিস লুকিয়ে সুন্দরী সভ্যতার নজীর। এখানে পণ্যসর্বস্বতার মধ্যে মানবিক সম্পর্কহীন জীবন যাত্রার বিচিত্র যৌন অনাচার, যৌন লালসা ও রাজনৈতিক পারভারশন, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, বন্ধ্যাত্ব, নপুংশকত্ব, হতাশা, দীর্ঘশ্বাস আর ব্যর্থতার ক্রমপ্রবাহ, সভ্যতার আলো-হাওয়ায় রোগ—ক্ষয় রোগ, স্বাস্থ্যহীনতা, রক্তহীনতা, পাণ্ডুরতা আর দুঃস্বপ্নের অরাজকতা—স্বাভাবিক জন্ম অসম্ভব। খণ্ডকালের সংকীর্ণ পিঞ্জরে বন্দী যৌবনের প্রাণ পদার্থ এই পরিবেশে স্বাভাবিক ভাবেই শুকিয়ে ঝরে পড়েছে। সমর সেনের কবিতা সভ্যতার হাতে নিহত সেই প্রাণ পদার্থের আর্তনাদ ও সময় সমাজ মানুষ সম্পর্কিত বিবৃতি।

সমর সেন তাঁর চারদিকে শহরের দিকে তাকিয়ে দেখেছেন, 'আকাশে ধোঁয়ার ক্লেশ / চারদিকে ধোঁয়ার গন্ধ / আর হাওয়ায় অসংখ্য ধুলোর কণা / জীবন্ত জীবাণুর মতো' 'আর রাত্রি / শুধু পাথরের উপরে রোলারের / মুখর দুঃস্বপ্ন।' এবং ভোর। এখানে জীবন 'কাঁচা ডিম খেয়ে প্রতিদিন দুপুরে ঘুম, / নারী-ধর্ষণের ইতিহাস / পেস্তাচেরা চোখ মেলে প্রতিদিন দৈনিক পত্রিকায়' দেখা 'চিত্তরঞ্জন সেবাসদন...বিষণ্ণমুখে / উর্বর মেয়েরা আসে'।—গোটা সভ্যতাকেই প্রতীক করে তীব্র তিক্ত উপদ্রুত সমর সেন প্রশ্ন করেছেন, যেখানে 'কালীঘাট

ব্রীজের পরে লম্পটের প্রতিধ্বনি' কেন 'তোমার ক্লান্ত উরুতে একদিন এসেছিল / কামনার বিশাল ইশারা', 'হে ম্লান মেয়ে, প্রেমে কি আনন্দ পাও, / কী আনন্দ পাও তুমি সন্তান ধারণে ?' সভ্যতার অত্যাচারে সমর সেন একটা নিঃশ্বাস নিঃসীমতা অনুভব করেছেন, দেখেছেন 'অন্ধকারে তিলে তিলে পৃথিবী মরে / বুঝি, পিঙ্গল বালুচর সর্বভুক, অবিনশ্বর'। এ বণিকী সভ্যতার দিকে আঙ্গুল তুলে পরিণাম উচ্চারণ করতে তাই তাঁর বাধে নি, 'আমাদের মৃত্যু হবে পাণ্ডুর মতো'। কেননা, তিনি দেখেছেন রাষ্ট্রপতি, রাষ্ট্রপরিচালনার শক্তিশালী সক্রিয় অঙ্গ বুদ্ধিজীবী শ্রেণী, কবি নিজেও যে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, তারই অন্ধতায় আজ শ্রেণী বিলোপ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে কৌরবদের মতো। ভাঙাগড়া উত্থান পতনের সাক্ষী কবি স্বীকার করেন, 'তাই ঘরে বসে সর্বনাশের সমস্ত ইতিহাস / অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মতো বিচলিত শুনি, / আর অব্যর্থ বিলাপের বিকারে বলি : / আমাদের মুক্তি নেই, আমাদের জয়াশা নেই'। জীবনের ঘোর তামসিকতা ও সভ্যতার বীভৎস আক্রমণ দেখে সমর সেন সাঁওতাল পরগনার নিঃসঙ্গ নির্জনতা ও স্তব্ধতার মধ্যে নিজেকে সভ্যতা থেকে প্রত্যাহার করে নিয়ে যেতে চেয়েছেন 'দুর্মুখ পৃথিবী পেছনে রেখে'। কেননা, চিরকেলে মধ্যবিত্ত চিরসত্য 'পলায়ন জীবিকা আমার'। কিন্তু যাবেন কোথায় ? সাঁওতাল পরগনা ? কবি অবশ্য তাই বাসনা করেছেন, 'আমার ক্লান্তির উপরে ঝরুক মহুয়া ফুল / নামুক মহুয়ার গন্ধ'। তবে এ সভ্যতা যে তার নিয়মেই সেই নির্জন আদিবাসী দেশও আক্রমণ করবে তা তিনি না জানলেও নাগরিক কবি ভারতচন্দ্র জানতেন যে 'নগরে আগুন লাগলে মন্দির বাঁচে না'। আর অগ্রজ কবি সুধীন্দ্রনাথও মরুময়তার মধ্যে এটাই অনুভব করে জিজ্ঞাসা তুলেছেন, 'অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে ?' অতি সাম্প্রতিক কবিরাও বুঝি একই কামনায় 'ফ্রেজারগঞ্জ' 'চাইবাসা' ছোটাছুটি করে আশ্রয় নিয়েছেন নিজেদের আন্তর বিবরে।

কিন্তু, আত্মধিক্কারে, ব্যঙ্গের তীব্র কষাঘাতে, ছুরিকাটা সত্য ভাষণে, সারা জীবন এক পংক্তি পদ্য না লিখে অনিন্দ্য কাব্য গদ্যে সময়, সমাজ, রাষ্ট্রব্যবস্থা, সভ্যতা, স্বশ্রেণী এবং নিজেকে উদঘাটন করে এক নিঃসীম শক্তিতে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আত্মবিলুপ্তি ঘটাতে সমর সেন শেষ পর্যন্ত আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিলেন মার্কসবাদকে, তার পার্টিস্বরূপকে। এক অপার তৃষ্ণা এবং অবসন্ন অস্তিত্বের মধ্যে থেকে জেগে উঠে জিজ্ঞাসা তুলেছিলেন, 'খাপছাড়া ঘুমে দূরে শুনি জোয়ারের

জল / কিসের কল্লোল ?' না, 'কালের গর্ভ থেকে বিপ্লবের ধাত্রী / যুগে যুগে নতুন জন্ম আনে'। তাই খুবই উৎসাহিত হয়ে কম্যুনিস্ট ম্যানিফেষ্টোর পদ্যানুবাদের মতো কবিতা লিখতে চাইলেন, 'পৃথিবীর বদরক্ত বের হোক / অস্ত্রোপচার নিতান্ত প্রয়োজন'। আর বলেছেন' 'অপরের শস্যলোভী, পরজীবী পঙ্গপাল / পিষ্ট হবে হাতুড়িতে, ছিন্ন হবে কাস্তেতে'। সঙ্গে সঙ্গে উপদেশও দিয়েছেন নিজের শ্রেণীকে, 'ঘুণধরা আমাদের হাড় / শ্রেণী ত্যাগে তবু কিছু / আশা আছে বাঁচবার'। কিন্তু সমর সেনের কবিতা বাঁচে নি। তিনি যে অবস্থায় যেতে যেতে যেখানে পৌঁছেছিলেন সেখান থেকে ফেরা যেমন অসম্ভব, তেমনি নতুন কিছুতে বিশ্বাস স্থাপন তার চেয়েও অসম্ভব—অসম্ভব কবিতা লেখা তো বটেই। আর এটা বুঝতে পেরেছিলেন বলেই—এবং অত্যন্ত সৎ কবি বলেই—বিনা দ্বিধায় কবিতা রচনার ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়েছেন নিজেকে। লিখতে না পারলে গিনিপিগ জন্ম দেবো না—লেখক হিসেবে এই সততার পরিচয় দিয়েছেন সাম্প্রতিক কালের অন্যতম দুর্ধর্ষ গদ্য লেখক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যদিও তা চরিত্রগত দিক থেকেই একেবারে স্বতন্ত্র অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ঘটেছে। সমর সেনের যদি 'ঈশ্বর' থাকতো এলিয়টের মতো তবে হয়তো তিনিও বন্ধ্যা জগৎ জীবনের নির্মম চেতনা থেকে উৎক্রান্তি পেতেন, কিন্তু ধর্মকে তিনি বুঝি লেনিন-উক্ত 'অহিফেন' জ্ঞানেই বাতিল করেছেন—দেখেছেন বেশ্যা এবং পাপীদেরই ধর্মে সমর্পিত হতে, কবিতা লিখে সমর সেন কিছু পাপ করেন নি। শ্রেণী সংগ্রামের মধ্যে মুক্তি খুঁজে ব্যর্থ—পেয়েছেন শুধুই চীৎকার। নিঃসঙ্গতার পাশব যন্ত্রণা সে চীৎকারে তৃপ্তি পায় নি। তাই নেমে এসেছে গভীর মৌনতা।

অতি সাম্প্রতিক কবিদের জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু এবং সমর সেনই মুখ্যত তাঁদের মানসানুযায়ী চিন্তা ভাবনা কলাশৈলীর ইন্ধন জুগিয়েছেন। কিন্তু এক-স্রোত কবিকে অবলীলায় প্রভাবিত করেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তর পত্রিকা-খাদ্য যোগানোর ঝোঁক, নজরুল ইসলামের সরল সহজ প্রত্যক্ষ উক্তি ব্যবহারের প্রবণতা এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রর হার্দ্যগুণের সমাহারে যে ভূমি তৈরী হয়েছে তাকেই যোগ্য উত্তরাধিকারীর মতো সদ্ব্যবহার করেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তীক্ষ্ণ সাম্যবাদী রাজনীতির প্রেরণা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার মৌল ভিত্তি। সমর সেন মধ্যবিত্ত জীবনের হতাশা ক্লান্তির যে আবর্তে থেমে গেছেন—জেনেছেন উদ্ধার অসম্ভব—তাঁর সেই শেষ মাইল স্টোন থেকে

সেই ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, চাবুকের মতো বাক্য, পরিশ্রমী শিল্পনিষ্ঠা, তীক্ষ্ণ বাচনভঙ্গী, অপ্রাসঙ্গিকতাবিরাগ, সাবলীল ছন্দবিন্যাস, ও দেশ নদী মানুষের প্রতি একটা সুগভীর মমত্ব নিয়ে সংবাদ এবং শ্লোগানকে কবিতা করে তুলতে কখনো প্রায় সাংবাদিক, কখনো প্রায় শ্লোগানিষ্ট হতে হতে তিনি যে মূলত কবি তা প্রমাণ করেছেন। অবমূল্যায়নের (ডেকাডেন্স) পরিপূর্ণ স্বরূপকে একটা অসহ্য বিতৃষ্ণায় তীব্র বিদ্রূপ ও তীক্ষ্ণ শ্লেষে জর্জরিত করে, শাণিত সংক্ষিপ্ত বাক্যে বুর্জোয়া ভাবাদর্শকে ক্ষতবিক্ষত করে এবং প্রায় কখনোই হতাশাগ্রস্ত না হয়ে সংশয়হীন চিত্তে আপন অন্বিষ্টকে প্রলেটারিয়েটদের অন্বিষ্টের সঙ্গে যুক্ত করে ক্রমাগ্রসর হয়েছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পদাবলীর অনুষ্টুপ। তাঁর দ্বিধাহীন কণ্ঠ উচ্চারণ করেছে, 'অগ্নিবর্ণ সংগ্রামের পথে প্রতীক্ষায় / এক দ্বিতীয় বসন্ত। আর / আমরা রেখে যাব / সংক্রামক স্বাস্থ্যের উল্লাস'।

ব্যক্তিগত জীবন-ভাবনা নয়, নিয়ত জিজ্ঞাসু প্রাণের সহৃদয় সমাজচিন্তা ; এবং তথাকথিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নয়, সমষ্টির মধ্যে স্বাধীন ব্যক্তিত্বের উদ্বোধন যে আধুনিকতা, সুভাষ মুখোপাধ্যায় সেই অর্থে আধুনিক। সমগ্রের মধ্যে থেকে তাঁর মুক্তি প্রয়াস—চৈতন্যের জড়ত্ব বিনাশ। শ্রমিক শ্রেণীর দর্শনের প্রতি আনুগত্য তাঁকে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে প্রেরণা দিয়েছে শ্রমিক আন্দোলনে। আর সেজন্যেই তাঁর কবিতা হয়েছে মিছিল থেকে ভেসে ওঠা টুকরো টুকরো কণ্ঠস্বরের মতো। 'পেট জ্বলছে, ক্ষেত জ্বলছে / কে খাজনা শুধবে ? / হুজুর, এবার না বাঁচালে / আগুন জ্বলে উঠবে।' বাস্তব জীবনের ঘূর্ণাবর্ত থেকে পূর্বসূরী বহু কবি যেখানে পলায়নকেই জীবিকা করেছেন, সেখানে সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেছেন, 'বিড়ম্বিত জীবনে আবার / কুরুক্ষেত্র করাঘাত করে। / পালাবার নেই কোন খিড়কির দুয়ার'। যুদ্ধের বীভৎসতার চিত্রকেও কবি কোনো রকম জটিল প্যাঁচ ছাড়াই উপস্থিত করেছেন 'আর্তনাদ করে নিচে অগণিত প্রজাপুঞ্জ ; / লুণ্ঠিত খামার বন্ধ বাক্যালাপ / ভূলুণ্ঠিত গাছের গোলাপ'। কিন্তু তিনি জেনেছেন 'পথে পথে পদশব্দ ওঠে / আকাশে নক্ষত্র ফোটে ; / নদী করে সম্ভাষণ, পাখি করে গান / মাঠের সম্রাট দেখে মুগ্ধনেত্রে / ধান আর ধান'। সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা শোষণ ত্রাসন ও অত্যাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে কবি-সত্তার ঘোষণা, 'এখানে আমার পাশে— / হিমাচল / কন্যাকুমারিকা / অলঙ্ঘ্য প্রাচীর ঐক্য / প্রতিজ্ঞা পরিখা'। গণমানসের খুব কাছেপিঠে থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় দেখেছেন এলোমেলো হয়ে যাওয়া মৃত 'বাবরালির চোখের মতো আকাশ', কিন্তু

তাঁকে উজ্জীবিত করে 'মিছিলের একটি মুখ'। তিনি বলেন 'যে দেবে প্রাণ, জীবন দেবে / বরমাল্য তাকে'। তাঁর সমগ্র অস্তিত্বই 'সমুদ্রের একটি স্বপ্ন'।

'মিছিলের একটি মুখ' আর সমাজগত মানুষের সংগ্রাম সংবাদকে জীবন দর্শনের উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে, 'জ্বলে সাংহাই, জ্বলে হ্যাঙ্কাও' জানিয়ে কিউবার মুক্তি সংগ্রামের খবর দিয়ে, 'দিয়েন বিয়েন ফ্যু' ইত্যাদির খবরকে স্টালিনগ্রাদের লড়াইয়ের ঐতিহ্যে যুক্ত করে সুভাষ মুখোপাধ্যায় 'সলেমানের মা'কে আশ্বাস দিয়েছেন,—হুশিয়ার করেছেন দুনিয়ার দুশমনদের এই বলে যে, তাদের রাজাগুলো সামলানো ছাড়া উপায় নেই, কেননা, নিজেদের 'ঘোড়াগুলো বাঘের মতো খেলছে'। সমস্ত বিশ্ব ব্যাপারই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের চেতনা দর্পণে প্রতিফলিত বলে তিনি সব নীচতার উর্দ্ধে উঠে বলতে পেরেছেন নতুন সম্ভাবনার নাম দেওয়া হবে 'আফ্রিকা' তাতে যতই বাধা আসুক। মিছিল ত্যাগ করেন নি সুভাষ মুখোপাধ্যায় কোনো অবস্থাতেই। আর যেতে যেতেই রিলে করেছেন বেকার শ্রমিক কৃষক কে কোথায় শহীদ হোলো—ট্রামের চাকায় যা দেখা যাচ্ছে তা জল নয় রক্ত ; শুনিয়ে যান 'ভবিষ্যৎ কথা বলছে ক্রুশ্চেভের গলায়' ; ঘোষণা করেন 'কাল মধুমাস' কিম্বা 'ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত'। তবে যেখানেই যান তাঁর 'চোখের পাতায়' লেগেই থাকে 'নিকানো উঠান / সারি সারি / লক্ষ্মীর পা—'। আর গোটা আকাশটাতেই বুঝি দেখেন সেই মিছিলে দেখা মুখ এবং দিগন্তের কাছে সব উঁচু গাছই বুঝি সেই 'মুষ্ঠিবদ্ধ হাত'—না, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের চোখে শুধু 'পতাকা / দুলছে / দুলছে / দুলছে...'—বিশ্বময়।

সমাজ কাঠামো পাল্টানোর দ্বন্দ্বকেই কাব্যের দ্বন্দ্ব হিসেবে গ্রহণ করেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তাঁর কবিতা কখনো কখনো লিরিক মূর্ছনা দিলেও কখনোই ব্যক্তিগত আন্তর বেদনার রক্তচিহ্ন ও অনির্দেশ্য সুদূরতা আনে নি—মেলেনি উধাও লোকে উধাও হবার কল্পনার ডানা। অন্যএক ঝুলন্ত বাসযাত্রীর কাছে একটু পা রাখার আবেদন রেখে, পাঁচ আঙুল হ্যাণ্ডেলে বসিয়ে দেন তিনি। তামাম পৃথিবীর গতি আর চলার সংগ্রাম ফুটে ওঠে সেই মুহূর্তে। তবে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ইন্টিমেট পপুলারিটির কবি, আর এর দোষগুণ দুই-ই তাঁর কবিতাকে আঘাত করেছে।

যে শিশু গভীর এবং ক্রূর অন্ধকারের রাত্রে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলো তার হাতে খবর পাওয়া গিয়েছিলো নতুন বিশ্বের এবং নতুন কবিতার। আর 'যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে' তেমন কোনো চেতনাশীল সক্ষম কবি তার সে বার্তাকে

গুরুত্ব দিয়ে উপলব্ধি না করায় সে হারিয়েই গেলো বাংলা কবিতার জগৎ থেকে। সুকান্ত ভট্টাচার্য্য সম্পর্কে এ কথাটিই সত্য। সুকান্ত সম্পর্কে অনেক আবেগ অশ্রুপাত হয়েছে—তাঁর কবিতাকে কম্যুনিস্টরা শ্লোগান করে—গান গেয়ে বিপ্লবী চেতনা জাগাতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু তিনি যে কবিতার চিরাচরিত চরিত্রই পাল্টে দিয়ে নতুন কবিতার জন্ম দিয়েছেন—একেবারে স্বতন্ত্র একটি ধারা সৃষ্টি করেছেন, সে ধারাকে পূর্ণতা দেবার জন্যে কোনো কাব্য আন্দোলন সৃষ্টি করে নি। এ ধারায় যতটুকু যা হয়েছে তা পরবর্তী কবিদের বিচ্ছিন্ন চেষ্টায় হয়েছে—হয়েছে ব্যর্থ আবেগ ও সংগ্রাম বিলাসের জন্যে।

সুকান্ত বিকাশের সুযোগ পান নি। যে বয়সে তিনি শৈশবের স্বপ্নচূড়ার থেকে নেমে এসে রূঢ় রাস্তাকেই পথ করে কবিতা রচনা করেছেন 'পদলালিত্য-ঝংকার মুছে যাক / গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ হানো। / প্রয়োজন নেই কবিতার স্নিগ্ধতা— / কবিতা তোমায় আজকে দিলাম ছুটি, / ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়ঃ / পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি'— সে বয়সে পূর্ণাঙ্গ কবি ব্যক্তিত্ব আশা করা যায় না। তবু সুকান্তই কাল চৈতন্যকে ধরতে পেরেছিলেন, বুঝতে পেরেছিলেন কেউ চেয়ে থাকুক বা না, গোটা পৃথিবীটা সমাজতন্ত্রের এলাকায় ঢুকে পড়েছে। এবং বাংলা দেশে সুকান্তই এনেছেন সাদা-মাটা সংগ্রামী জীবনের কণ্ঠস্বর—'টুকরো টুকরো করে ছেঁড়ো তোমার / অন্যায় আর ভীরুতার কলঙ্কিত কাহিনী / শোষক আর শাসকের নিষ্ঠুর একতার বিরুদ্ধে / একত্রিত হোক আমাদের সংহতি'। কেননা 'এখন সেই সময়, / সচেতন মানুষ! এখন আর ভুল ক'রো না— / বিশ্বাস ক'রো না সেই সব সাপেদের / জমকালো চামড়ায় যারা নিজেদের ঢেকে রাখে / বিপদে পড়লে যারা ডাকে / তার চেয়ে কম চটকদার বিষাক্ত অনুচরদের। / এতটুকু লজ্জা হয় না তাদের ধর্মঘট ভাঙতে / যে ধর্মঘট বেআব্রু ক্ষুধার চূড়ান্ত চিহ্ন'। তীব্র প্রত্যয় আর দুঃসাহসের সঙ্গে সমস্ত কাব্য সংস্কার ভেঙে, তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়কে পরম মূল্যবান বলে গ্রহণ করে সমস্ত কিছুর মধ্যে শোষক আর শোষিতের রূপ প্রত্যক্ষ করে সুকান্ত তাঁর কবিতাকে মুক্তি সংগ্রামের হাতিয়ার করে তুলেছেন। বুকে যক্ষ্মা নিয়ে তিনি যেমন শ্রদ্ধানন্দ পার্কে গুলি খাওয়া মানুষের রক্ত দেখতে গেছেন এবং সে রক্ত দেখে সাম্যবাদী বিপ্লবে সর্বশক্তি নিয়োগের প্রেরণা পেয়েছেন, তেমনি সেই প্রেরণাকে কবিতায় রূপান্তরিত করেছেন—'বিপন্ন পৃথ্বীর আজ শুনি শেষ মুহুর্মুহু ডাক / আমাদের দৃপ্ত মুঠি আজ তার উত্তর পাঠক'। সব্যসাচীর মতো ব্যক্তিগত

জীবনে মৃত্যুর সঙ্গে এবং সমষ্টিগত জীবনে মনুষ্যত্বের শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে করতে সীমান্ত থেকে তাঁর প্রিয়তমা ভবিষ্যতের সুন্দরী পৃথিবীর কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন সুকান্ত 'ঘরে ফেরার সময় হয়ে গেছে'। যুদ্ধশ্রান্ত জীবন বলেছে, 'আমি যেন সেই বাতিওয়ালা, / যে সন্ধ্যায় রাজপথে পথে বাতি জ্বালিয়ে ফেরে / অথচ নিজের ঘরে নেই যার বাতি জ্বালার সামর্থ্য, / নিজের ঘরেই জমে থাকে দুঃসহ অন্ধকার'। বাতি জ্বালিয়ে অন্ধকার দূর করার সামর্থ আর হয় নি সুকান্তর। তাঁর অকাল মৃত্যু বাংলা কাব্যের একটা সত্য সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দিয়ে গেছে। তবে কিছু না হোক, রবীন্দ্র ভিত্তির ওপরে দাঁড়িয়েও সুকান্ত অন্তত পাঁচখানা আঙ্গিক চেতনা সম্পন্ন, জীবন ও শিল্পের একীকরণ জাত উজ্জ্বল ও মানব রসময় মমত্বে ভরা কবিতা রচনা করে গেছেন। কবিতা ও সাধারণ মানুষের অভীপ্সা যুক্ত হবার একটা সম্ভাবনা এই প্রথম বাংলা সাহিত্যে দেখা দিয়েছিলো। কিন্তু হয় নি। সুকান্তকে প্রায় কেউ-ই সার্থক ভাবে অনুসরণ করেন নি পরবর্তী কবিরা। তাঁরা পাঠ নিয়েছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে এবং তথাকথিত প্রগতিপন্থী হয়ে—ডিরেক্ট ও ডেলিবারেট এবং কমিটেড লেখক হয়ে কবিতা রচনা সুরু করেছেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের চোখা কথা ও বক্র আক্রমণের প্রলোভন এবং অতি প্রত্যক্ষ আলম্বন বিভাব অস্বাভাবিক আকর্ষণী হয়ে তরুণ কবিদের অনেকের স্বকীয়ত্বকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের কঙ্কাল গ্রাস জীবনকে যখন ভয়ংকর ভাবে দিশাহারা করে তুলেছিলো, কোলকাতার কালো পীচে অবক্ষয়িত জীবনের ছায়া এবং বুটের শব্দ স্পষ্ট হয়ে উঠে মানুষের অভিশপ্ত জীবনলিপি রূপে দেখা দিয়েছে, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের 'মধুবংশী'র গলিতে 'বাঁকা টুপি পরা কোন আমেরিকান কাপ্তেনের লোলুপ শিশ' যখন 'তরুণী রাত্রির গালে চাবুক' মেরেছে, অসহায় মধ্যবিত্ত মানুষ নিজেদের অক্ষমতা নিয়ে ক্লীব দিন যাপন করলেও যে মাঝে মাঝে আক্রোশে জ্বলে উঠেছে এবং রোমান্টিক প্রেমের স্বপ্ন দেখতে গিয়ে নিষ্ঠুর ভাবে আঘাত পেয়েছে তাকে নিখুঁত ভাবে চিত্রিত করেছেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। তবু জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র বলেছেন 'তোমার বিশাল হাত আমাকে ফিরিছে খুঁজে খুঁজে, জানি, / শিকারী হাতের ছায়া কেঁদে গেছে দেহের উপর / আমার বুকের রক্ত হয়নিকো এখনো তো-হিম।'···যদিও 'আমি থাকি পড়ে অসহায় / পক্ষাঘাত দুর্ভেদ্য প্রহরী / ...আমার এ গুহাকাশে বজ্র হানো'। চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় ক্ষাপা রাজনীতি ও নেতৃত্বকে ব্যঙ্গ করে বলেছেন 'আজ অবশেষে

জনগণে মিশি নেতা / অ্যাসেম্ব্লি হল জমাট করো কি সাধে ? / ক্রেতা বিক্রেতা তুমি তাদের সেথা। / রক্তের দাগ ঢাকবে আর্তনাদে'। বিরাম মুখোপাধ্যায়ের কাছে পরিষ্কার 'ক্লান্তির বিকার শুদ্ধি পড়ন্ত বিকেলে—/ কোটিপতি ঠিকাদার ডুবে যায় রুপালি পর্দায় / — কী অগাধ শান্তি দেয় ভায়োলেট চোখ আর / তিলোত্তমা হাসি। / নীল রাত / রক্তে মৌল নেশা ? / বেশ্যারাত্রি প্রেমের নিলাম হাঁকে দম্পতি-শরীরে, / পদ্মিনী জরায়ু ক্লান্ত, কন্দর্প নাকাল'। সমর সেনের আগে থেকেই এঁরা বিনষ্টির চরিত্র তুলে ধরেছিলেন। সমর সেনের পরে প্রগতি ও শ্লোগানের প্রলেপে এসব চাপা পড়েছিলো। স্বাধীনতার পরে দেশীয় নেতৃত্ব জামাকাপড় খুলে ফেলে দিলে, সাম্প্রতিক কবিরা পুরোনো ক্ষতের কৃষ্ণ রেনেসাঁস এনেছেন মাত্র।

আধুনিক কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলনের প্রথম দিকের কবি গোষ্ঠীর মধ্যে মনীশ ঘটক দেখেছেন 'স্বার্থ-পরমার্থ-দ্বন্দ্বে আজি নির্বাপিত / সে অনল স্মৃতি ভস্মস্তূপে সমাহিত। / অনলস কাল আবর্তনে / মহীরুহ হয়েছে অঙ্গার / হয়তো পরম কোনো ক্ষণে / অঙ্গারে ফুটিবে হীরা'। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত দেখেছেন 'শস্য ফলে, নদী বহে, ঊর্ধ্বে জাগে উচ্চঙ্গ পর্বত, / হাস্য করে মৌন মুখে উলঙ্গ, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ'। অন্নদাশঙ্কর রায় ব্যঙ্গ বিদ্রূপ শ্লেষ বক্র ভাষণে সমাজের অসামঞ্জস্যকে জর্জরিত করে জনতার সঙ্গে যুক্ত হতে চেয়েছেন। ছড়া লিখতে গিয়ে কঠিন সত্যকে উদ্ধার করেছেন। 'আনন্দ আশা তিলে তিলে লাঞ্ছিত' হলেও তিনি তাঁর কাব্যে চেয়েছেন, 'বিহঙ্গের গীতিমুক্তি বনস্পতি পরমায়ু মৃত্তিকার রস, / শিশিরের স্বচ্ছ সুখ, শিশুর শুচিতা'। অজিত দত্তর কবিতা কিছুটা রোমান্টিক এবং গঠনের দিক থেকে বেশ কিছুটা আঁটো সাঁটো। 'শহরে বাজারে হাটে, মাঠের সবুজে' তিনি নতুন কবিতা সন্ধান করেছেন। ব্যঙ্গ বিদ্রূপেও দক্ষ অজিত দত্ত—'দাঁত আছে মজবুত সব বেশ ? / পাথর চিবিয়ে আছে অভ্যেস ? নইলে / রইলে / ভাত না খেয়ে / চালে ও কাঁকরে আধাআধি থাকে হে।' সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিতায় কোনো কায়দার মারপ্যাঁচ নেই। বৈদগ্ধ্য ও আন্তরিকতার হরিহর সম্পর্কের মধ্যে থেকে একটা নিবিড় অনুভূতির প্রকাশ আছে সর্বত্র। অকপট তাঁর স্বীকৃতি 'আমার সে মন নেই / যে-মন সমুদ্র হ'তে জানে'। কবি অরুণ মিত্র তাঁর ঋজু, ভারমুক্ত প্রতীকে কথা বলার সক্ষমতায় টেকনিকের অনুসন্ধানের সঙ্গে জীবনের রহস্যকেই উদ্ধার করে সমগ্র সমাজ চৈতন্যের প্রতি গভীর আস্থা পোষণ করে নিজের একাকীত্বের

নির্জনতা থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছেন। ব্যক্তি চিন্তা এবং সমাজ চিন্তা এ দুয়ের মধ্যে একটা অতিদারুণ দ্বন্দ্বও তাঁকে পীড়িত করেছে। ঐতিহ্যের সঙ্গে পূর্বাপর সম্পর্ক রেখেই সংকট চেতনা থেকে উত্তীর্ণ তাঁর ব্যাপ্ত চেতনা বলে উঠেছে 'করাতের দাঁত আমাদের রক্তাক্ত করেছে ; / চামড়া ছিঁড়েছে, ছিঁড়ুক / মাংস চিঁড়েছে, চিঁড়ুক / হাড় পর্যন্ত আঁচড় লেগেছে, লাগুক— / আমরা বাঁচলাম'। রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা'র ঢঙে লেখা ফরাসী কাব্য চর্চার স্পষ্ট স্বাক্ষর ও ঋজু গাঁথুনির ফলশ্রুতিতে তাঁর কবিতা 'এখন আশ্চর্য রকম প্রত্যক্ষ'। কবিতার ক্ষেত্র আবিষ্কারে একটা স্থির প্রত্যয়ে পৌঁছেছেন অরুণ মিত্র।

বাংলা আধুনিক কবিতার এ পর্বের বহু-লিখিয়ে কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ। সরব ঘোষণাতেই তিনি সব কথা বলেন। 'দক্ষিণায়নে' কিছুটা চাপাচাপি কাব্য কৌশল প্রবণতা তাঁর ছিলো। কিন্তু কাব্য সৌন্দর্যটা তাঁর কাছে বড় নয়— বক্তব্যটাই প্রধান। চারপাশের সমসাময়িক ঘটনা ও মানুষকে দেখে, জীবনের সুখ দুঃখ আশানিরাশাকে জীবন্ত মুখের ভাষায় প্রকাশ করেছেন। সবগুলো কবিতা না হলেও কিছু কিছু সত্যিই কবিতা—কবিতার চেয়েও বড় কথা বিমল ঘোষের মানুষের প্রতি আন্তরিকতা। কবিতা সংবাদ পত্রের বিষয় হয়েছে— বক্তৃতা হয়েছে, হোক না। কিন্তু এ সত্য ভাষণ—'চারদিকে স্থূলতনু বাধার পাহাড় / মনে হয় আত্মহত্যা করি / অসহ্য এ পলাতক আত্মার প্রলাপ'। অসত্য নয়—অকাব্য নয়। অন্যদিকে কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় কাল চেতনার কবি। দেশজ ঐতিহ্য ব্যবহার ও স্মৃতি সংস্কারের প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধ। মাঠঘাট গ্রামবাদার শহর শহরতলির কারখানার মানুষের যে যুগ জ্বালা—গণ মানুষের সেই জ্বালাকে এবং উত্তরণের যুদ্ধকে ভাষা দিয়েছেন মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ঃ 'পুড়ে খাক তবু আকাশে মশাল জ্বালাই / মনে রেখ আমি যুগান্তরের মানুষ'। মাটি মানুষের প্রতি সুগভীর মমতায় তিনি আবেগে যেন দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছেন আদিগন্ত মাটির পৃথিবীকে 'সবুজ ঘোমটায় ঢাকা স্নিগ্ধ সোঁদা মাটি! / অদম্য আদিম রুক্ষ পাহাড়! হে মরুভূমি! হে বন্য বর্বর বন্যা! / মাটি! / নগ্ন মাটি! / টানো / একবার, আর একবার আমাকে টানো। / লাখো লাখো বীজের গুঞ্জন অঙ্কুরের স্পন্দন তুমি ঝঙ্কার ঝন ঝন হও।' কামনার গভীরতা অনবদ্য।

মণীন্দ্র রায় একটা নির্দিষ্ট জীবন দর্শনের ওপর দাঁড়িয়ে কবিতা রচনা করেছেন। সার্বজনীন কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের উজ্জীবন কামনায়—লাঞ্ছিত

নিপীড়িতদের কান্নাকাল সমাপ্তির তাড়নায় তিনি বলতে চেয়েছেন 'পৃথিবী লাল হৃদপিণ্ডের সুরে / দেশে দেশে খোঁজে প্রাণের অঙ্গীকার'। তাঁর চোখে ধরা পড়েছে 'মাটির দাওয়ায় বিছানো কাঁথায় শিশুর মুঠিতে চাঁদ / রিক্ত শিমূল ডালে যেন জ্বলে পৃথিবীর আহ্লাদ'। শ্লোগানকেও সৌন্দর্য দেবার একটা চেষ্টা ছিলো মণীন্দ্র রায়ের। বক্তব্য প্রধান কবিতায়ও সত্যিকার কবিতার সৌন্দর্য প্রসাধন দিতে পেরেছেন তিনি : 'দেখ দেখ ঐ দৌপদী বাঁধে বেণী! / অজ্ঞাতবাসী ফিরে পায় স্বাধিকার। / অশ্বত্থামা ভেঙেছে তোমার শ্রেণী! / কাঁপে উদ্যত মুক্তির হাহাকার'। আত্মগত সুর তাঁর কবিতায় থাকলেও তা খুব একটা বড় হয়ে ওঠে নি। স্বচ্ছন্দ ছন্দেই তিনি কবিতা রচনা করেছেন। অনেক ক্ষেত্রেই প্রেরণার তাজা অনুভূতির স্পর্শ তাঁর কবিতাকে হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছে। তবে, কবিতা নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার ঝুঁকি তিনি বড় একটা নিতে চান নি। সমাজ ও সময় সচেতন থেকে মানুষের প্রতি একটা দরদী ও মরমী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি বলেছেন 'আমি সে মিলের স্পর্ধা নিয়ে / সবারই বুকের মাটি সরিয়ে দেখেছি প্রবাহিত / ভালোবাসা'। কিন্তু খুব বেশী রচনার মধ্যে থেকেও যাকে বলে নতুনতর কবিদের জন্যে জমি তৈরী করে দেওয়া, তা মণীন্দ্র রায়ের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে নি। তিনি নাস্তিবাদের কথা বলেন নি, কিন্তু অস্তিত্ব তোলপাড়কারী বৈপ্লবিক তেজও তাঁর কবিতায় প্রকাশ পায় নি। মোটামুটি ছিমছাম ভাষায় ছন্দের সারল্য নিয়ে অকৃত্রিম আবেগে অনেক কবিতা লিখে গেছেন। পাঠক তাঁর কবিতায় অনায়াস প্রবেশের আনন্দ পায় বটে, কিন্তু খুব ঘন এবং গভীর কোনো আবেদন তার অস্তিত্বে আঁচর কাটে না।

অন্যদিকে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ধারালো তলোয়ারের মতো প্রখর, নিরলঙ্কার স্পষ্টোক্তিময় কবিতাগুলো কঠিন ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। তিনি এ সময়ের প্রাণবন্ত কবি বক্তা—'ধনুকের মতো / বেঁকে চুরে যাওয়া পাপ ; নিজের বুকের রক্তে স্থির হয়ে শুয়ে থাকা পাপ।' তিনি লক্ষ্মীন্দরের মৃত্যুতে বেদনাহত —লক্ষ্মীন্দরকে মৃত মনুষ্যত্বের প্রতীক করে, তাকে জেগে উঠতে বলেছেন, রক্ত দেখেছেন সর্বত্র, মানুষের রক্ত। রক্ত বমন করতে দেখেছেন রক্ত করবীকে। তবু লক্ষ্যে স্থির—স্থির তার সংগ্রামী চেতনা। তিনি 'ভিসা অফিসের সামনে' দাঁড়িয়ে ধ্যানে দেখেছেন নতুন পৃথিবীর প্রতিচ্ছাপ। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত নিজেকে সবার মধ্যে সম্প্রসারিত করে দিতে চেয়েছেন, জগৎ-জীবনের একটা বড় পরিসরকে তিনি কবিতার পটভূমি করে বলেছেন, 'শুধু গতি দুরন্ত দুর্বার-

বেগে একটি পদ্ধতি / সৃষ্টির গোপন মূলে কাজ করে'। দীনেশ দাশের কবিতায় একটা সৌন্দর্যের আচ্ছন্নতা আছে। তাঁর লিরিক টিউন অন্তর প্রসারী। 'নিযুতি রাতের নেকড়ের মতো দৈন্য যখন গরজায় / বুঝি প্রেম আসে হৃদয়ের সিংদরজায়'—এর মধ্যে যেমন ব্যক্তিগত বিস্ময়বোধের দ্যুতি আছে তেমনি সামাজিক জীবনের যন্ত্রণা জ্বালার মধ্যেও তিনি প্রাণ প্রপাতের সাড়া পেয়েছেন, 'চূর্ণ এ লৌহের পৃথিবী / তোমাদের রক্ত-সমুদ্রে / গ'লে পরিণত হয় মাটিতে / মাটির—মাটির যুগ ঊর্ধ্বে। / দিগন্তে মৃত্তিকা ঘনায়ে / আসে ওই! চেয়ে গ্যাখো বন্ধু!' ব'লে তিনি উদ্দীপ্ত হয়েছেন। কৃষ্ণ ধর কাব্য সুরু করেছিলেন খুবই বলিষ্ঠ অঙ্গীকার নিয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে মানুষের উঠে দাঁড়ানোর ভঙ্গিটি তিনি দেখেছিলেন এবং মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারান নি। বহু দুঃখের মধ্যে থেকে তিনি উত্তরণ লাভ করেছেন, 'আকাশ মায়ের মত রাত্রিকে দেবে স্তন / ঘুমের রাজ্যে তখন শুরু হবে তোমার দেয়ালা / আমি জেগে থাকব।' এই সঙ্গে উচ্চারণ করতে হয় রাম বসুর নাম। জীবনের সাধনায় প্রকৃতিকে বাঁধার দুর্মর আগ্রহে, শব্দ ব্যবহারে বেপরোয়া হয়ে সুদূর প্রসারী অর্থময় প্রতীক যোজনার মধ্যে থেকে ফুটিয়ে তোলা স্পর্শকাতরতায় 'ধানের গোছার মতো জীবনকে কেটে নেয় কুটিল সময়' দেখে পরাণ মাঝিকে ডাক দিয়েছেন তিনি।

প্রবল প্রেরণায় স্নিগ্ধ ও কবিত্বময় ব্যঞ্জনায়, রোমান্টিকতার চেতনায় নিখিল চরাচরে ব্যাপ্ত বিশ্বচৈতন্যে উত্তীর্ণ হবার কামনায় ভরা অরুণ ভট্টাচার্যের প্রতীকী শব্দের আয়োজন, সতীন্দ্রনাথ মৈত্রের মৃদুবেদনা ও রক্তিম বিষণ্নতা ভরা লিরিকের মাধুর্য 'কথা কয়ে যাও, এখানে / অন্ধরাত্রি, এখানে / গান পুড়ে যায় খাঁ খাঁ মাঠে, সারা / দেশ মরে যায়! / কে আছো / একটা কথার প্রদীপ / জ্বেলে দিয়ে যাও / এখানে।' আর ধনঞ্জয় দাসের গভীর জীবন চেতনা, সমাজ মনস্কতা ও তীব্র আর্তি 'নতুন জন্মের এক বলিষ্ঠ ঘোষণা উৎকর্ণ হোয়ে শুনলো: / এই মাঠ-মাটি, ফসলের গান, এই মহুয়া মাতাল ভোর / আমার। / এই সমুদ্র-বিশাল যুবতীর অথৈ হৃদয়, / আমাদের / এই সহজ প্রকৃতি, বনরাজিনীলা বিচিত্র বর্তমান / আর মহৎ ভবিষ্যৎ / তোমার, আমার, সকলের।' জগন্নাথ চক্রবর্তী আনলেন জোয়ার যৌবনের আবেগ—কারার প্রার্থনা—'ভাঙবার'। 'বলো কত কাল আরো কত কাল লেখা লেখা খেলা খেলতে বলো / আরো কত কাল সন্ধ্যা সকাল এ ভাবে কলম ঠেলতে বলো' বলে ক্লান্তি প্রকাশ করলেন নীরেন্দ্র

নাথ চক্রবর্তী, এবং নরেশ গুহ-র সেই মিঠি কবিতা 'বসন্তের জানালায় মাঘের রাতের শীত / একলা পোহাই।'

স্বাধীনতার প্রাগমুহূর্তে সমস্ত সভ্যতার মার কাটিয়ে খাড়া হয়ে ওঠার একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছিলো। বুদ্ধদেব বসুর আপাত বাস্তব অথচ কলাকৈবল্যবাদ নরেশ গুহ, অরুণকুমার সরকার ছাড়া বড় আর কারুর কাছেই স্বীকৃত হয় নি। ব্যক্তিগত শুদ্ধ আত্মার মুক্তি কামনা এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতি নিয়ে কলা-বিলাস বস্তুতই পরিত্যক্ত হয়েছিলো। তরুণ অর্থাৎ স্বাধীনতার পূর্বে লিখতে শুরু করেছেন এমন কবিরা অনেকে যেমন সাম্যবাদী রাজনীতিতে কমিটেড থেকেই বিপ্লবকে কবিতার অন্বিষ্ট করেছিলেন. তেমনি অনেকে কোনো রকম কমিটেড না থেকে মোটামুটি সুস্পষ্ট বক্তব্য প্রধান জীবনবাদী কবিতা রচনা করেছেন। মুল ঝোঁকটা ছিলো মানবিকতার দিকে এবং উত্তরণের। কিন্তু কম্যুনিস্ট পার্টির (১৯৪৭-৫০) সস্তায় বাজীমাৎ করার ডাক হঠাৎই আধুনিক কবিতার একটা ঐতিহ্য হয়ে ওঠার মুখে অস্বাভাবিক কায়দায় তরুণ কবিমানসকে জ্বালিয়ে দিয়ে, রক্ত আর বিপ্লবের উত্তেজনাকে উসকে দিয়ে এবং তাকে আবার চকিতে হাউইয়ের মতো নিভিয়ে দিয়ে একটা থমথমে সময় হাজির করলো—নেতারা ওপর-ওপর ভাসা-ভাসা বিপ্লবের ঝুঁকি নিলেন কিন্তু সাহিত্য ও জীবনের দায়িত্ব নিলেন না। ফলে, স্বাভাবিক ভাবেই এসেছে দ্বিধা, সংশয় এবং পরাজিত মন্যতা। এই অপদস্থ সময়ের সুযোগ নিয়ে এবং 'স্বাধীনতা' শব্দের সহায়তায় একচেটিয়া মালিকানার এস্টাব্লিশমেণ্ট দ্বিধা বিভক্ত কবি সমাজের সাম‹ . ফেললো রূপালী টোপ এবং আমূল বদলানো বাংলাদেশে দিশাহারা কবিব্যক্তিত্বের আর্ত চিৎকার উঠলো 'নাই'। অতীত স্তব্ধ, বর্তমান বোঝা যায় না, সভ্যতা হাঙর, ভবিষ্যৎ নাই। অতএব অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলো নতুন কবিতা এবং গদ্য আন্দোলন। আমরা দেখলাম, এ-আন্দোলনের এফেক্টটাকে সমালোচনা করা হোলো তুমুল বিক্রমে কিন্তু কারণগুলোকে দায়রা সোপর্দ করা হোলো না। নেতারা তরুণ আন্দোলনের সাহিত্য সম্পর্কে ফতোয়া দিলেন 'এ নষ্ট সাহিত্য'; কবি গদ্যকাররা স্বধর্মে স্থির থেকে উত্তর করলো 'এটাই সত্য'।

প্রকৃত পক্ষে, স্বাধীন ভারতের বাস্তব পরিবেশ মন্থন করে যে বিষ উঠেছে তাকে ধারণ করার ক্ষমতা উপরোক্ত কাব্যধারা দুটির কোনটিরই শব্দ ছন্দ বাক্যের ছিলো না। একদা বিদ্রোহী কবিরাও নিজেদের লেখালেখিকেই শেষ শ্রেষ্ঠ কবিতা মনে করে তার আদর্শই (মডেল) তরুণদের ওপরে চাপিয়ে দিতে চেয়ে

এবং না পেরে এস্টাব্লিশমেন্টের কুক্ষিবদ্ধ হয়ে এঁদের আন্দোলনকে নস্যাৎ করতে চাইলেন। কিন্তু পারলেন না। যা অবশ্যই হবার হোলো। তরুণ কবিরা জেনেশুনেই কালপরিবেশ মন্থন জাত বিষ আকণ্ঠ পান করে বাংলা কবিতার নতুন মোড় ফেরানোর আন্দোলন শুরু করলেন—অস্বীকার করলেন পূর্ববর্তীদের কায়দায় কবিতা বানানোর খেলা খেলতে। এঁদের কবিতা 'লেখা লেখা খেলা' নয়, এঁদের কবিতাই রক্তাক্ত জীবনযাপন।

ফসল

[সাম্প্রতিক গল্পের বলিষ্ঠ মর্জি—মোড় ফেরানোর তেজী সাহিত্য আন্দোলনের বিরুদ্ধতা—অশ্লীলতা প্রসঙ্গ—পূর্বসূরী লেখকদের সাম্প্রতিক সময়ের লেখা-লেখি—এ লেখা কোনো প্রভাব বিস্তার করেনি নতুন লেখালেখির ওপর—ছোট গল্প নতুন রীতিব আন্দোলনের নায়ক বিমল কর তরুণ লেখকদের উৎসাহদাতা—তরুণ আন্দোলনের অর্জিত সম্পদ সংকলক সমরেশ বসু—বিদ্রোহী লেখক গোষ্ঠী—দেবেশ রায়, মতি নন্দী, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় নতুন গল্পের পঞ্চ পাণ্ডব—বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শংকর চট্টোপাধ্যায়ের বেপরোয়া লেখালেখি—এক স্রোত নতুন লেখা—'হাংরী জেনারেশন'এর গল্প, তরুণের বৃদ্ধের মস্তিষ্ক বাসুদেব দাশগুপ্ত ও উজ্জ্বল গল্পকার সুভাষ ঘোষ।

বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশবিভাগ সহকারে স্বাধীনতা—আধুনিক সাহিত্যের তৃতীয় পর্যায়ের আন্দোলন জাত লেখালেখির আলোচনায় এমনি কতকগুলো সমাজচিত্ত জখমকারী ঘটনার উল্লেখ করে যেমন তেমন একটা শীঘ্র সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হলেও, তা যেমন অবৈজ্ঞানিক তেমনি অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট, ভ্রমাত্মক অর্ধসত্যের পরিচায়ক। স্থানকালপাত্রের বিচার বিশ্লেষণের মধ্যে থেকে প্রাগস্বাধীনতা পর্বের জাতীয় আন্দোলন এবং জাতির সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও নৈতিক জীবনের স্খলিত স্বরূপের যে চিত্র পাওয়া গেছে—দেশ ও দেশবাসীর আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার যে সত্য আবিষ্কার করা গেছে, তা থেকে স্বাভাবিক ভাবেই প্রমাণিত হয় যে, এক্ষণে অর্থাৎ স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সাম্প্রতিক বাংলাসাহিত্য যা হয়েছে, তার ঠিক তেমনটি হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিলো না। বস্তুতই সাম্প্রতিক সাহিত্য 'অবক্ষয়ী সাহিত্য' আর তা-ই ভারতের 'জাতীয় সাহিত্যের অংশী 'বাংলা সাহিত্য'। পূর্বসূরী লেখকরা যেখানে স্বাধীনতা আন্দোলনের ওপর তলার বিপুল আবেগ ও প্রত্যাশায় জাতীয় চরিত্রের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতাগুলোকে

ধৃতরাষ্ট্রিয় অন্ধতায় উপেক্ষা করে বাহ্যিক ঘটনাকেই সমাজচিত্ত বিপর্যস্তার মৌল কারণ জেনে বিপন্নতা অনুভব করেছেন এবং নিজেদের আর্ত অসহায়তায় ভবিষ্যৎহীন রক্তহীন জীবনকথার বিবর্ণ পাণ্ডুলিপি রচনা করেছেন, সেখানে সাম্প্রতিক গল্প উপন্যাসকাররা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ন্যাকামি, নপুংসকত্ব ও বিশ্বাসঘাতকতার সামগ্রিক অভিশাপের উত্তরাধিকার বহন করে সমসময়ের সমাজ সভ্যতার তাবৎ বিষ আকণ্ঠ পান করে যুগ ও জীবনোপলব্ধির 'নির্মম সত্য' নির্দ্বিধায় প্রকাশ করেছেন। আর তার ফলেই, সাহিত্য হয়ে উঠেছে দেশ জাতি এবং ব্যক্তির অস্তিত্বের দর্পণ—প্রকাশ পেয়েছে সমাজ-জীবন ও রাষ্ট্রের নষ্ট, বিকৃত, নগ্ন, নিষ্ঠুর ও দগদগে বাস্তবের পরিচয়। অপ্রিয় সত্যভাষণের অভি-যোগে অবশ্যই তরুণ সাহিত্যকে অভিযুক্ত করা যায়!

অধুনার সাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের কিছুমাত্র পরিচয় আছে, তাঁরাই দেখেছেন, সাম্প্রতিক লেখকরা হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়ে এতকালের রাখাঢাকিটাকে সরবে মেকী বলে ঘোষণা করেছেন। স্বাভাবিক ভাবেই তা কায়েমী স্বার্থের লেখক, সমালোচক এবং তাঁদের পোষক এস্টাব্লিশমেন্টের সহ্য হবার কথা নয়। ফলে, তাঁরা সমবেত চীৎকারে তরুণদের লেখালেখিকে প্রথমে উৎকট ভাবে নাক সিঁটকিয়ে, ভুরু কুঁচকিয়ে 'ফ্যুঃ' শব্দে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন এবং পরে সাম্প্রতিকদের লেখাকে অস্বীকার অসম্ভব দেখে ভিত্তিহীন অভিযোগ এনেছেন—প্রয়োগ করেছেন দায়িত্বহীন কমেন্ট। অবশেষে 'বিদেশী মালমশলার নকলের নকল', 'অবক্ষয়ের কৃষ্টি', 'দুর্বোধ্য হিং টিং ছট', 'অধঃপতিত যুবকদের রোজ-নামচা' ইত্যাদি আক্রমণশীল চোখা চোখা শর নিক্ষেপ করেও যখন তরুণতরদের লেখালেখিকে ঘায়েল করা গেলো না, তখন তাঁরা সাহিত্যের ওপর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ একাঘ্নী বাণটি নিক্ষেপ করলেন—তরুণ ও তরুণতরদের রক্তমাংসের সৃষ্টির ওপর লটকে দিলেন 'অশ্লীল'।

ঠিক এ পর্যন্ত থাকলেও তাঁদের চরিত্রকে বাহবা দিতে বাধতো না, এমনকি তাঁদের কথা ও কাজের মধ্যে সততার ইঙ্গিতটুকু পাওয়া গেলে আমরাও হয়তো তাঁদের সঙ্গে কণ্ঠ মেলাতে পারতাম। কিন্তু অভিযোগকারীদের নিজেদের দুর্বলতা এত স্পষ্ট ও ন্যক্কারজনক যে নিজেরাই কোমর বেঁধে তরুণদের ওপর টেক্কা দেবার জন্যে যৌনতা সর্বস্ব কুচ্ছিৎ অপুস্তক (no book) রচনায় লিপ্ত হয়ে পড়লেন এবং বাঙলাদেশ তথা ভারতের সামগ্রিক কর্ম-তৎপরতাকেই বিকৃত যৌন কেচ্ছাচার হিসেবে প্রমাণ করতে চাইলেন। প্রকাশিত হোলো অজস্র যৌন

পত্রিকা এবং 'প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য' লেবেল দেওয়া এক ধরণের সাহিত্য ও সিনেমা সাহিত্য পত্রিকা। জায়গান্টিক লেখকরা সেগুলোর খোরাক যোগাতে যেমন শেষ শালীনতাটুকু বিকিয়ে দিলেন তেমনি ঐ সব লেখার জন্যেই 'এ্যাকাডেমী পুরস্কার' 'রবীন্দ্র পুরস্কার' প্রভৃতির দাবীদার হলেন। কারুরই নজর এড়াবার কথা নয়, এঁরাই বড় হরফে তরুণতর সাহিত্য আন্দোলনকে জব্দ করতে প্রতি-হিংসামূলক প্রচার চালিয়েছেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই ডুবে ডুবে জল গেলার মতো করে রগরগে যৌনটাকেই নিজেদের লেখালেখির মুখ্য বিষয় করে নিয়েছেন। প্রচারের জোরে তাই-ই গণ-পাঠকসমাজে 'বাস্তব সাহিত্য' হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তরুণদের প্রতি উষ্মা প্রকাশ করে পূর্বসূরী লেখকরা নিজেদের 'বড় লেখক' সুলভ অভিমান জাহির করতে এমন একটা ভাব দেখালেন যেন তরুণরা তাঁদের সামনে থেকে বাড়াভাত ছিনিয়ে নিয়ে খুবই হঠকারিতার পরিচয় দিয়েছে এবং এদের লেখালেখি কিছুই দাঁড়াচ্ছে না। বুঝি এ জন্যেই— আদত লেখা কাকে বলে তার দৃষ্টান্ত দেবার জন্যেই নামী দামী অগ্রজ লেখকরা ধারাপাত করলেন 'বিবর'-বাসী 'প্রজাপতি'-র 'পাতক'-ই 'স্বীকারোক্তি'-র ও কালো কোলকাতার কবন্ধ শক্তি বা বীজে-বিষ সমাজ ফসল উৎপাদনের জন্যে 'রাত ভরে বৃষ্টি'-র ষড়যন্ত্রে 'পাতাল থেকে আলাপ'-এর। এঁদের সজ্ঞান অন্ধ আক্রমণের নেশা বুঝতে চাইলো না যে তরুণদের লেখালেখিতে যৌনতা কোনো ফ্যাক্টরই না, জীবন যাপনের ও অস্তিত্বের অন্যান্য শক্তির মতো যৌনতাও একটা শক্তি—এদের কাছে যৌন সৃষ্টি ধর্মের একটা প্রতীক মাত্র। কিন্তু তরুণরা তা ব্যাপকভাবে সাধারণ্যে প্রচার করার সুযোগ পায় নি। কেননা, সর্বাধিক প্রচারিত বিজ্ঞাপন সাহিত্যের মনোপলি বাংলা সাহিত্য পত্রিকাগুলো বাঘা বাজারে লেখকদেরই যোগ্য মুখপত্র।

আগে বহুবার বলা হয়েছে আধুনিক প্রতিক্রিয়ার প্রচার যন্ত্র এবং এস্টাব্লিশ-মেন্ট জীবনের সত্য প্রকাশের জন্যে সাধারণ মানুষের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ নয়। ফলে খুবই বেপরোয়া ভাবে স্ব-ধর্মের জয়গান করে গেছে। বীজাণু বোমার মতো বিষ-সাহিত্য-শিল্প ছড়িয়ে গোটা জাতটাকেই দেহে মনে অস্তিত্বে পঙ্গু করে দিতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে তারা। স্বাধীনতার পর তাদের এই ভূমিকা খুবই নগ্ন ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বৃহৎ পুঁজিপতিদের মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকার রবিবারের বিশেষ পাতায় পরিবেশিত হয়েছে যাবতীয় সেক্স পারভারশনের ধারাবিবরণী, জগৎগুরু ও অবতারকাহিনীর ছলে সাম্প্রদায়িকতার

জিগির এবং উদ্দেশ্যহীন খুনোখুনির রাজনৈতিক সংকীর্তন। মর্ষকামের ছবি, সচিত্র 'হিপী' কর্ম, নানারূপী দাঙ্গার সচিত্র ভারতের মাঝখানে চকিতে গেরিলা-যুদ্ধের মহানায়কের কর্ম ও জীবনবাণী প্রচারকারী এই সব পত্র পত্রিকার বহুমুখী কার্যকলাপের কথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। অর্থের জোরে তারা শক্তিশালী লেখকদেরও তাদের দাসে পরিণত করে এক বিশেষ নোকর সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছে। নয়া এস্টাব্লিশমেন্ট ও তার পত্রিকা চীন ও পাকিস্তানের ভারত আক্রমণকে কম্যুনিস্ট বিরোধিতা ও রুজি রুটির আন্দোলন দমনের অস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করে ওই নোকর সম্প্রদায়ের লেখকদের দিয়ে যেমন গল্পপল্প লিখিয়েছে, স্বাধীন সাহিত্যসেবী হিসেবে তাঁদের পরিচিত করে প্রকাশ্য-বিবৃতি আদায় করে নিয়েছে এবং কোরিয়া, ভিয়েতনাম প্রভৃতি স্থানে মার্কিনী বর্বরতা সম্পর্কে সাধীন সাহিত্যিকদের ঠোঁট সেলাই করে পূর্ব জার্মানী নিয়ে, হাঙ্গেরী ও চেকোশ্লোভাকিয়ার আভ্যন্তরীণ গোলযোগকে প্রতিক্রিয়ার স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসেবে গ্রহণ করে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে তাদের দিয়েই নিন্দা করিয়েছে। অগ্রজ লেখকদের সংপ্রেরণা ও স্বাধীনতা কতখানি তা ওপরোক্ত নজির থেকেই বোঝা যায়। তাঁদের মনোগত বাসনাকেই লাভজনক ব্যবসার মশলা হিসেবে পেয়ে এস্টাব্লিশমেন্ট জীবনকেই যৌন করে তোলা এক ধরণের 'কিস্‌সা'-কে ক্ষুৎকাতর, অত্যাচার প্রপীড়িত, শোষিত ও উপদ্রুত মানুষের হাতের কাছে উত্তেজক পণ্য হিসেবে পৌঁছে দিয়ে গোটা জাতটাকেই পারভার্টেড করে তুলতে চেয়েছে। তরুণ সাহিত্যিক সমাজ রাজার এঁটো এই জাতির জীবনযাপনকেই শিল্প করে তুলতে আত্মনিয়োগ করেছে—তাদের মধ্যে থেকেই আকণ্ঠ বিষ পান করে সৃষ্টি করতে চেয়েছে সৎসাহিত্য। কিন্তু তা প্রচার পায় নি। জনতা-পাঠক সাহিত্য হিসেবে জেনেছে নোকর সম্প্রদায়ের লেখকদের লেখালেখিকেই, শুনেছে কোলকাতা পঁচিশ-এর সন্তোষ ঘোষের মাত্রাছাড়া উৎসাহের সওয়াল " 'যুগযন্ত্রণা', 'মূল্যহানি' ইত্যাদি অনেক হালে তৈরী সিকি আধুলি অধুনা হাতে হাতে চলে, অনেক বানানো বুলি মুখে মুখে ফেরে। সেই চেঁচানিতে অতিশয়তা আছে, কেননা কোন যুগে যন্ত্রণা ছিল না, আমি তো জানি না। আর পাপ-পুণ্যের ধারণা বরাবরের।........." ঠিকই, বাইবেলেও শয়তানের পরিচয় আছে। এ কারণেই বুঝি তরুণ সাহিত্যিকরা নতুন কিছু করেন নি বোঝাতে উত্তপ্ত হয়েছেন সন্তোষ ঘোষ, যিনি 'নানা রঙের দিন,' 'মোমের পুতুল' ও 'কিনু গোয়ালার গলি'রই লেখক সম্ভবত। তবে শুধু এইটুকু বলেই তিনি

তুষ্ট থাকতে পারেন নি। একটা তথাকথিত ডিস্টার্বিং বই হাতে তুলে—'দুর্গেশনন্দিনী' থেকে 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র পরে সেটিকেই দশম পুস্তক হিসেবে—ল্যাণ্ডমার্ক হিসেবে—উঁচিয়ে ধরে তাড়স্বরে বলে ফেললেন, "বুদ্ধদেব বসু একবার এই ধরণের একটা কথা লিখেছিলেন যে তাঁরা তখন যা লিখতে চেয়েছিলেন কিন্তু পারছিলেন না, রবীন্দ্রনাথ মৃদু হেসে কলম তুলে 'শেষের কবিতা' লিখে সেটা দেখিয়ে দিলেন। তেমনি এ কালেরও অনেক কুপিত (কেন যে কে জানে) ক্ষুধিত (কি না পেয়ে জানিনে) লেখক যা লিখতে চেয়ে পারছেন না, খালি আগাছার চাষ বাড়াচ্ছেন, তুলনায় বয়স্ক সমরেশও যেন তাঁদের দেখিয়ে দিতেই......" ইত্যাদি ইত্যাদি—অর্থাৎ তরুণ সাহিত্যের প্রতি বিজাতীয় ক্রোধ এবং সমরেশের সমরেশত্ব ঘোষণা। 'শেষের কবিতা' সম্পর্কে কটাক্ষপাত না করেও বলাবাহুল্য বুদ্ধদেব বসুরা লেখা ছাড়েন নি এবং রবীন্দ্রনাথের চেয়ে তাঁদের লেখালেখির মান কোনো অংশে ন্যূন বলেও স্বীকার করেন নি অন্তর দিয়ে, করলে বাঙলা দেশের এত কাগজ কালি ধ্বংস করতেন না। এ কথা কি ঠিক যে তাঁরা তাঁদের লেখক জন্ম ভর একেবারে আগাছা সৃষ্টি করেছেন ? তরুণরা তা মনে করেন না। অবশ্য তাঁদের অনেকের কাছ থেকেই এ সময়ের লেখকদের কিছুই প্রায় নেবার থাকে নি।

একথা সম্ভবত এখন না বললেও চলে যে, তরুণ লেখকদের অস্থি মজ্জা রক্ত মাংস মেধা ও হৃদয় দিয়ে নির্মিত সাহিত্য, যা চারাগাছের মতো কেবল উঠতে যাচ্ছিলো, তাকে সমূলে নস্যাৎ করার অন্তরালে অগ্রজ লেখকদের ভূমি হারানোর একটা ভয় ছিলো (ভয় মুখোস খসে পড়ার—সাহিত্যিক ভণ্ডামী দিয়ে আখের গোছানোতে ভাটা পড়ার এবং 'ক্ষমতাবান লেখক' এই বড়াই নষ্ট হবার) এবং তার জন্যেই দানবীয় পুঁজির রক্ষিতা পত্রিকা ও তার নোকর সম্প্রদায় জীবনার্জিত অভিজ্ঞতার সত্য পাণ্ডুলিপিকে অন্ধ জিঘাংসায় আক্রমণ করে তরুণদের আবিষ্কৃত সাহিত্যিক উপাদানগুলোতে প্রচুর পরিমাণে আবর্জনা ও রোগ বীজাণুময় জল মিশিয়ে খাঁটি দুধের মূল্য দাবী করেছে। তরুণদের সাহিত্য আন্দোলনকে দমিয়ে দেবার এ যেমন একটা পরিশীলিত কায়দা তাঁরা নিয়েছিলেন, তেমনি সরাসরি পুলিসী বলপ্রয়োগ এবং আদালতের সাহায্য নিয়ে সাম্প্রতিক সাহিত্যকে কয়েদ খাটানোর ব্যবস্থা করতেও কসুর করেন নি। সাম্প্রতিক লেখককে আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করে প্রতিষ্ঠিত করতে হোলো, যা সাহিত্য তা কখনোই অশ্লীল হয় না। ফ্রাস্ট্রেশন এবং পারভারশন দিয়েও সৎ সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে

যদি লেখক নির্দিষ্ট মানবিক লক্ষ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সততার সঙ্গে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাঁর অ্যাটিচিউড তুলে ধরতে পারেন। তবু তরুণ সাহিত্যিকদের সামনে হুঁশিয়ারীর মতো দৃষ্টান্ত হিসেবে জনৈক লেখকের শাস্তি হোলো। অভিযোগ অশ্লীলতা—সাহিত্যে অশ্লীলতা।

সাহিত্যকে ঘায়েল করার এই প্রাচীন এবং মোক্ষম অস্ত্রটি সম্পর্কে যুগ যুগেরই জিজ্ঞাসা 'অশ্লীলতা কী?' আন্তর্জাতিক পণ্ডিতেরা একসঙ্গে মিলে মাথার চুল শাদা করে এবং দিনের পর দিন তৈলাধার পাত্র না পাত্রাধার তৈল করেও কোনো সর্বজন স্বীকৃত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন নি। জনসাধারণের মধ্যেও সে সম্পর্কে কোনো স্বচ্ছ ধারণা নেই। তাছাড়া সাধারণ মানুষ বলতে যাদের বোঝায় এবং যাদের ভোটের জোরে গণতন্ত্র চলে এবং সব ব্যাপারেই যাদের দোহাই পাড়া হয় তারা অশ্লীলতা-শ্লীলতা নিয়ে বড় একটা মাথাও ঘামায় না। তবে, বাংলা সাহিত্য নিয়ে এই সাম্প্রতিক কালে কয়েকবারই খানিকটা হৈচৈ হয়ে গেছে বলে এবং অশ্লীল সাহিত্য নিয়ে পুলিস আদালতকে বেশ হিমসিম খেতে হয়েছে দেখে এখানে প্রসঙ্গটির সামান্য আলোচনা করে নিতে হচ্ছে।

অশ্লীলতা কি? জীবন ও জগতে বাস্তবিক কোনো অশ্লীলতা আছে কিনা? অশ্লীলতা ভাষায়, ভাবে, বিষয়ে না ভঙ্গিতে? সাহিত্যে অশ্লীলতা নিয়ে আদালতের —বিশেষ করে, সেপারেশন অব পাওয়ারহীন রাষ্ট্রের মহামান্য আদালতের— বিচার করার কোনো এক্তিয়ার আছে কিনা? সাহিত্য বিচারের অধিকারী পুলিস, নাকি পণ্ডিত অধ্যাপক, না সাহিত্যপাঠে অভ্যস্ত রসজ্ঞ পাঠক, না মহাকাল?—এমনি কতকগুলো প্রশ্ন নিয়ে কৃষক, মজুর, মধ্যবিত্ত, উকিল, ডাক্তার, সাহিত্যিক, কবি, বিবাহিত-অবিবাহিত নারীপুরুষ, বালবিধবা, মাতাল, স্মাগলার প্রভৃতি নানা ধরণের নাগরিকদের একটা অংশের মধ্যে সমীক্ষা চালিয়ে কতকগুলো উত্তর পাওয়া গেছে যা থেকে মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। সমীক্ষার কিছু ফলাফল এখানে উপস্থিত করা যাচ্ছে। তবে একথা বলাই বাহুল্য যে, সবাই সব প্রশ্নের জবাব দেন নি বা দিতে পারেন নি।

অশ্লীলতা কি প্রশ্নের জবাবে একজন রিক্সাচালক বলেছেন, 'ভদ্দর লোকের ছেলে হাঁটুর ওপর দোভাঁজ করা লাল লুঙ্গি গেঁড়ো দিয়ে পরে (একটা বালিকা বিদ্যালয়ের নাম) মেয়ে স্কুলে ঢুকলে, সেটা অশ্লীলতা'। একজন মাতাল (স্ত্রীকে হরবকত মারধোর করেন এবং কথায় কথায় তিনি গ্রাজুয়েট বলে বুক ঠোকেন) মুখ খিস্তি করে জানান, 'আমি যে বেঁচে আছি এটাই অশ্লীল—আমার বৌ

অন্তের সঙ্গে শুয়ে বাচ্চা বিইয়েছে আটটা'। জনৈক বৃদ্ধ কৃষক বলেছেন, 'বলতে পারবো নি। নাকের ওপর তিনবার করে তুড়ি ছুঁড়ে তালাক দিয়েছি ছয়বার। জেনাফেনা মালুম বাসিনি।' ফাইন আর্টসে খেতাব পাওয়া জনৈক তরুণ শিল্পী বলেছেন, 'নগ্নতাকে ঢাকবার অস্বাভাবিক প্রচেষ্টাই অশ্লীল।' ফ্যামিলি প্ল্যানিং সেন্টারের জনৈক এডুকেটর বলেছেন, 'সংগমবিহীন নগ্ন নারীদেহ অশ্লীল, কিন্তু সংগমকালীন নারীদেহ শুধু শ্লীলই নয়—শিল্প, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণও'। একজন কমিউনিস্ট এম. এল. এ এবং এম. বি. বি. এস. ডাক্তার জানিয়েছেন, 'অশ্লীলতা পৃথিবীর কোথাও নেই। অশ্লীলতা কণ্টেণ্টে নয়, ফরম-এ। বিষয়-বস্তুতে নয়, উপস্থাপনে। উপস্থাপনের অক্ষমতায় সুন্দর বস্তুকেও অশ্লীল বা কদর্য করে তোলা যায়'। পঁয়ষট্টি বছরের বৃদ্ধ শিক্ষক মারমুখী হয়ে বলে উঠেছেন, 'জিজ্ঞাসাটাই অশ্লীল। সবাই ঈশ্বর প্রাপ্তির সাধনা করেন, কেউ ব্রাহ্মসমাজের সভায়, কেউ মসজিদে, কেউ গম্ভীরায় বসে, কেউ বা শ্মশানের চিতার ছাইভস্ম মেখে নরবলি বা পশুবলি দিয়ে ন্যাংটো মেয়েমানুষের ওপর বসে উলঙ্গ ও বীভৎসদর্শনা মাটির মা-কে সামনে রেখে। কৃষ্ণ কেমন, যে যেমন। সাহিত্যও একেবারে ঠিক তেমনি।' একজন জজকোর্টের উকিল বলেছেন, 'আদালতে রমণীর মুখে রেপ কেসের ধারাবিবরণী শুনে এসে, বাইরে তা খবরের কাগজের আইন আদালত-এ ফিরে দেখাটাই অশ্লীল'। জনৈক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যের ছাত্র বলেছেন, 'রমণী শরীরে ইস্পাতের কাপড় পরিয়ে কামগন্ধহীন প্রেমের জয়গান করার উৎকট চেষ্টাটাই অশ্লীল—'বিদ্যাসুন্দর' থেকে 'প্রজাপতি' কোনোটাই আদৌ অশ্লীল নয়। লেডি চাটার্লিস লাভার বিলেতী জেলখানা থেকে মুক্তি পেয়েছে। বৃহৎ ব্যবসায়ীর সরকারের ওপর কম্যাণ্ড থাকলে শ্লীল অশ্লীল হয়, অশ্লীল শ্লীল হয়। বিচারপতি পিউরিটান না সহজিয়া ধর্মাবলম্বী তার ওপরও শ্লীলতা অশ্লীলতা অনেকখানি নির্ভর করে।'

সাহিত্য বিচারে শুধু পাঠকেরই অধিকার, পণ্ডিত সমালোচক বা আদালতের নয় বলে প্রায় সবাই-ই অভিমত প্রকাশ করেছেন। কেবল এক আধুনিক কবি বলেছেন, 'আমি অশ্লীলতাকে ভয় পাই।' আর জনৈকা ইংরেজী সাহিত্যের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীর জবাব, 'যারা নারী দেহটাকেই যৌন ক্ষুধার সামগ্রী বলে মনে করেন তাদের প্রকাশ্যে চাবুক মেরে গায়ে থুথু দেওয়া উচিত।' এবং এক অ্যাডভোকেট মহামান্য আদালতের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেন যা সুনীতিমূলক নয় এমন লেখালেখি ও চিত্রকলার বিরুদ্ধে।

প্রশ্নগুলো জনৈকা বালবিধবাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছেন, 'বিদ্যাসাগর এর সদুত্তর দিতে পারতেন।' অনেকেই বলেছেন, কোনো সাহিত্য পড়েই তাঁরা অশ্লীলতায় অভ্যস্ত হন নি। চিরকুমার এবং রোগ জর্জর অঙ্কের শিক্ষক জানান, 'অশ্লীলতা নিয়ে আলোচনাটা এত বাজে যে অঙ্ক কষে বলে দেওয়া যায়, ফল জিরো।' কেউবা জানিয়েছেন প্রাচীন সাহিত্যে বা ধর্মীয় সাহিত্যে কিছুই অশ্লীল বলে তাঁদের মনে হয় নি ; বর্তমানের কিছু লেখা হাতে ধরতেও ঘেন্না হয়।

মোটামুটি ভাবে সমীক্ষার মূল কথাগুলোর একটা সার সংকলন বলেই উপরোক্ত কথাগুলোকে ধরে নেওয়া হচ্ছে। বিষয়টা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ মনে হলে ছাপানো ফরম জনে জনের হাতে তুলে দিয়ে একটা পুরোদস্তুর জনমত সংগ্রহ করা যেতো। তবে এ কথা অভ্রান্ত যে পণ্ডিতী অভিমতই সব নয়। আলোচনায় তাঁদের পক্ষে নিরপেক্ষ থেকে কিছু বলা প্রায় অসম্ভব। নির্দলীয় থাকার বহুৎ সদিচ্ছা থাকলেও প্রায় সবাই-ই কুস্তি প্রতিযোগিতায় দু-পক্ষের কোনো না কোনো পক্ষে দাঁড়িয়ে এক তরফা সওয়াল করেছেন এবং তা মান্ধাতার আমল থেকে চলে আসা নীতিবাগীশ কপোল-কল্পিত একটা ভুল বিষয়ের ওপর। যুগযুগ ধরে সাহিত্যকে নিয়ে সমাজে এই অদ্ভুত স্নায়ুযুদ্ধ চলছেই। যাঁরা নিজেদের সাহিত্যপাঠক বলে দাবী কবেন তাঁরা হাতের কাছে যা পান উল্টে পাল্টে দেখে থাকেন। এক কেজি আটায় সাতশ' ভুষি খেতে অভ্যস্ত হয়ে বাজারে বেষ্ট সেলার মার্কা বইগুলো হজম করারও দুর্ধর্ষ সাহস রাখেন, আদালতী টোটকা খেয়ে তাঁরা বদ হজম সংক্রান্ত রোগের চিকিৎসার পরোয়া করেন না। কেননা, বদহজমের সঙ্গে বেঁচে থাকার হরিহর-আত্মার সম্পর্ক স্থাপন করে চালিয়ে যাওয়ার নামই জীবন। তবু বিতর্ক যখন উঠেছে এ সম্পর্কে বর্তমান লেখকেরও একটা তল্লাসী চালানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। কেননা, দেশে 'বিবর' প্রকাশের আগে দেশ-আনন্দবাজারের গরজে ১৯৬৫ সালের আনন্দবাজার দোল সংখ্যায় তিন লেখকের অশ্লীলতা সম্পর্কিত রচনার মধ্যে থেকে ঐ কোম্পানীর যে অ্যাটিচিউড প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৮ সালে দেশ সাহিত্য সংখ্যায় সে অ্যাটিচিউড প্রায় উবে গিয়ে তা অশ্লীলতার অ্যাডভোকেটের অ্যাটিচিউড হয়ে উঠেছে। তা হলেই বোঝা যাচ্ছে যে অশ্লীলতার ধারণা পরিবর্তনশীল এবং মূলত তা সমাজের কায়েমী স্বার্থের মর্জি নির্ভর।

কিন্তু এতেই বিতর্কের শেষ হয় না। জিজ্ঞাসা থেকেই যায় অশ্লীলতা— বিশেষ করে, সাহিত্যে অশ্লীলতা কি? অধুনা প্রকাশিত একটা কিতাব (লিটল

ম্যাগাজিনের লেখালেখিগুলো মুষ্টিমেয় পাঠকদের চিন্তা ও রসবোধে আলোড়ন তুলে নিজ সীমায় মুখ থুবরেই আছে) হাতে ধরে তিন জন (পাঁচ জন নয়) পাঠক 'তোওবা! তোওবা!' করে উঠেছেন। একেবারে আসর সরগরম করে দ্রুত অভিযোগ এনেছেন আদালতে। এ ধরনের অভিযোগ নতুন নয়। বিশ্ব সাহিত্য বাদ দিলেও, বাংলা সাহিত্যে মনুমান্ধাতার আমল থেকে ভূতের মতো এক শ্রেণীর পাঠকের কাঁধে চরিত্র ও সমাজ বিনষ্টির ভয় ভর করে আছে। একদিন গৌড়ীয় বৈষ্ণব কুলের 'কৃষ্ণেন্দ্রিয়' প্রীতি ইচ্ছা 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন'কে সম্ভবতঃ বর্জন করেছিলো ভোটের জোরে। কিন্তু সময় জাগ দিয়ে রেখেছিলো। ফলে, তা আবার ব্রাহ্মণ বাড়ীর গোয়াল ঘরের চালা থেকে চকিতে বেরিয়ে পড়লে ঘসে মেজে ঠিক হয়ে জাঁকিয়ে বসা বৈষ্ণবকুল ক্ষেপে গিয়েছিলেন। বৈষ্ণব জগতে সাহিত্যের এই তথাকথিত অবৈধ সন্তানকে বৈষ্ণব ব্রাহ্মের সম্মিলিত রুচিবোধ ও শুচিতা প্রত্যাখ্যান করার জন্যে কোমর বেঁধেছিলো। তবু শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন থাকলো। 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন বিতর্ক' পণ্ডিতদের পুস্তক থেকে মুখস্থ করে করে অধুনা উচ্ছৃঙ্খল (?) ছাত্ররা গলদঘর্ম হয়ে যাচ্ছে। ভাগ্যে জুটছে ডক্টরেটের খেতাব। এখন সেই সব পণ্ডিতরা যখন বলেন 'তাদের (সাম্প্রতিক তরুণ লেখকদের) রচনা পড়লে মনে হয় যে মানুষের কেবল মাত্র একটি ক্ষুধাই আছে, তা যৌন ক্ষুধা, তার মধ্যে অন্য কোন ধর্ম নাই'—আধুনিক লেখক-পাঠকরা তা মানতে বাধ্য নয়।

প্রাচীন সাহিত্যের কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেলো। কেননা, ওগুলোর সঙ্গে যে-সব দেবতারা বিশুদ্ধ স্বর্গীয় আবহাওয়ায় ক্লান্ত হয়ে ভালোবাসাকেই ধর্ম জেনে গোপনে পরস্ত্রী সঙ্গমের জন্যে মর্তে নেমে আসেন, তাঁদের 'কেলি মাহাত্ম্য' জড়িয়ে আছে। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের বিদ্যাসুন্দরের পালাটা সোজা সুড়ঙ্গসঞ্চারী রতিকান্ত হলেও না হয় একই কারণে 'পুণ্য বিছানার' জ্ঞানে অশ্লীলতার দায় থেকে তাকে অব্যাহতি দেওয়া গেলো—রামপ্রসাদ সেনের বিদ্যাসুন্দরকেও, কেননা তা সামন্ত এস্টাব্লিশমেন্টের চাপে বানানো বলে ধরে নিলে তর্ক অনেকখানি কমে যায়। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের 'জিনাস' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত থেকে সুরু করে দীনবন্ধু মিত্র, শরৎচন্দ্র, কল্লোল কালের লেখকরা, কৃত্তিবাস পত্রিকার লেখকরা এবং এই সেদিনের আদালতে অভিযুক্ত এবং পরে মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক অশ্লীলতার দায় থেকে রেহাই প্রাপ্ত লেখকরাও এ অভিযোগের সঙ্গে কব্জি কষেছিলেন। এঁদের বেলাতেও তাড়স্বর উঠেছিলো গেলো গেলো।

কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় কিছুই যায় নি।

আদত কথা, বানিয়ে তোলা রুচিবোধে অভ্যস্ত এক শ্রেণীর পাঠক চিরকাল কৃত্রিম পরিমণ্ডলের চার দেওয়ালের গণ্ডীর মধ্যে থেকে চীৎকার করে ওঠেন 'জীবন সত্যের' প্রকাশ দেখে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, সূর্পনখার নাক কান কাটার জন্যেই নিষ্ঠুর বাস্তব প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলো। রাবণ আক্রমণকারী নয়, সীতাকে সে ধর্ষণ করে নি। আধুনিক মানুষ বিশ্বাস করতে রাজী নয়, শুধু রামের পাদস্পর্শে অহল্যা ফসলধারণক্ষম হয়েছিলো (অবশ্য ধর্মের ক্ষেত্রে মহাপ্রভুর চিবোনো পান খেয়েও নারায়ণীর বৃন্দাবন দাস লাভ সম্ভব)। আদতে জীবনের নির্মম নিষ্ঠুর সত্যগুলোকে সহ্য করতে না পারলেই পাঠক অশ্লীল অশ্লীল বলে চেঁচিয়ে ওঠেন, আপন ভাষা-ভাব-স্বভাব-পরিবেশে লালিত মানুষ যারা কৃত্রিম আবেষ্টনীর বাইরে জীবনকে জীবনের মতো করেই ভালোবাসে, তারা গাঁ-মানুষ অথবা গাড়োল কিম্বা রাক্ষস। সাহিত্যে এঁদের উপস্থাপনও অশ্লীল ছিলো—এখন কৃত্রিম সমাজের মুখোশ ছিঁড়ে ফেলবার মুহূর্তে সাহিত্যিক যখন নিজের স্বাধীনতাকেই কবচ কুণ্ডল করে নিয়েছেন, প্রকাশ করছেন জীবনের ও সমাজের ভয়ঙ্কর নগ্ন স্বরূপ—যা সমাজের সুপারষ্ট্রাকচারে উঠে এসেছে—তার বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে উঠেছে শুচিবাইগ্রস্তদের আক্রমণ। রামের মতো সাময়িক ভাবে বিজয়ীও তাঁরা হয়ে থাকেন, কিন্তু মুরোদ তাঁদের শেষ পর্যন্ত সীতাকেও বিসর্জন দেবার মধ্যে। পরবর্তী কাল তাঁদের রায় মানে না।

মোট কথা, সভ্য হয়েছি জানার পর থেকেই—মানুষ সামাজিক হবার পর থেকেই—তার স্বাধীনতা কাটা পড়তে সুরু করেছে। সামাজিকতার নামে প্রতি পদক্ষেপে তার পায়ে পরিয়ে দেওয়া হয়েছে কঠিন শৃঙ্খল। সাহিত্যের মধ্যে মানুষের সেই হারানো সত্তারই প্রকাশ ঘটে থাকে। সাহিত্য মানুষের মৌলিক প্রকৃতির অন্বেষণ-জাত আবিষ্কার যা নিজেদের কাছে প্রকাশের মধ্যে থেকে একটা চিরকালীন আবেদন উপস্থিত করে।

বর্তমান সাহিত্যের কিছু কিছু গ্রন্থকে যাঁরা অচ্ছুৎ করে রাখতে সভা-সমিতিতে হড়হড় করে বমি করছেন, তাঁদের কাছে জিজ্ঞাস্য : ভারতীয় সাহিত্যে বা শিল্পে কি ঐতিহ্যে অশ্লীলতা বলে কিছু ছিল কি? কালিদাসের শকুন্তলা, কুমারসম্ভব কাব্য, বাৎসায়নের কামসূত্র (বিদেশে নিষিদ্ধ), কোনার্কের সূর্য-মন্দির—যেখানে সমগ্র পরিবারসহ সৌন্দর্য উপভোগ হচ্ছে এখনো—সে সব কি অশ্লীল? এ সবের বেলায় মহাকালের সঙ্গে লড়াইয়ে হেরে যাবার ভয়ে কিম্বা

পুরাতনের দোহাই পেড়ে তাঁরা যদিবা একটা আপোষ রফা করতে বাধ্য হয়ে থাকেনও, এ জিজ্ঞাসা অমূলক হবে না যে, বিদেশী সাহিত্যের বেলায় তাঁরা ততটা সরব নন কেন? লেডি চাটার্লিস লাভার, বেলআমি, ইউলিসিস, নানা, ললিতা, বঁজুর ত্রিস্তেস্, উয়োম্যান অব্ রোম অর্থাৎ যোনি যৌনের বে-আব্রু বিবৃতি ভরা বিদেশী লেখকদের বইগুলো বন্দরের ঘাটে ভিড়বার সঙ্গে সঙ্গেই কাঁদের টেবিল আলো করে, এটা ব্যক্ত করা বাহুল্য মাত্র। অথচ তাঁরাই বাংলা সাহিত্যের অশ্লীলতার আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছেন ভাবলে তাঁদের পাঠক চরিত্র সম্পর্কেই প্রশ্ন জাগে। এঁরা গান্ধীজীর আত্ম চরিতের প্রথম খণ্ড থেকে কয়েক পাতা শেলাই করে ছেলেমেয়েদের পড়তে দিতে পারেন, কিন্তু জাতীয় চরিত্র তাতে অবিশ্বাসের ওপরই গড়ে ওঠে—কু-এর দিক থেকে ভাবীকালের চোখ সু-এর দিকে ফেরানো যায় না বলেই বিশ্বাস। চাঁদ ভালো না মন্দ তা বিচারের ভার শিশুর বিচারবুদ্ধির ওপর ছেড়ে দিলেই তার নিজস্ব ধারণাটি বিনা প্রভাবে প্রকাশ পেতে পারে। সাহিত্যিককে সমাজবদ্ধ মানুষ ভাবাই বাধ্যতামূলক। তাঁরা সত্য প্রকাশে অঙ্গীকারবদ্ধ, সত্য চেপে যেতে নয়। আজ যখন সমাজের প্রত্যক্ষ চেহারা জামা কাপড়ের ঢাকনা ফাঁসিয়ে ঠেলে উঠেছে, অশ্লীলতার বিরুদ্ধে মহামহা পণ্ডিতদের সভাসমিতির খবর, সে বিষয়ে চিঠিপত্র ও সম্পাদকীয়র পাশাপাশিই (অন্যান্য বিদিকিচ্ছিরি ঘটনা তো আছেই) ফলাও করে ছাপা হয় 'পশ্চিমবঙ্গে এক বছরে ৬৫০টি হত্যাকাণ্ড' [যুগান্তর ৪।৮।৬৮] যার মধ্যে "অতীতের গোলযোগের জন্যে ১৪৫টি; স্ত্রীলোক ঘটিত ব্যাপারে ৮৫টি, জমির বিবাদ থেকে ৬২টি; হঠাৎ ঝগড়ার দরুন ৩৬টি; ডাকাতির জন্যে ২৭টি; দাঙ্গা হাঙ্গামার জন্যে ৩২টি; হঠাৎ উত্তেজনায় ২৬টি; স্ত্রীর চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহের জন্যে ২৯টি; কাম বাসনার জন্যে ২৩টি হত্যার ঘটনা (পুলিশের হাতে রাজনীতির জন্যে হত্যাকাণ্ড উহ্য)"। তা ছাড়া বিকলাঙ্গ সন্তানকে হত্যা করা হয়েছে এবং সন্তান চায় না বলে সদ্যজাতকে খুন করা হয়েছে, অবৈধ সন্তান প্রসব করে মারা হয়েছে। সংবাদ লেখক যখন এও জানান যে, ক্ষুধার জ্বালায় বনগাঁর জনৈক মানুষ গোটা পরিবারকেই হত্যা করেছে, যার ডাইরী নাকি পুলিশেও কাঁদতে কাঁদতে লিপিবদ্ধ করেছে, তখন—সমাজের এই পরিমণ্ডলে দাঁড়িয়ে সাহিত্যিককে যদি কেউ 'বিশুদ্ধ তুলসীপত্রে' (কামগন্ধ নাহি তায়?) সাহিত্য রচনা করতে বলেন, তিনি কোন নির্বোধের স্বর্গে বাস করছেন তা বুঝতে কষ্ট হয় না। এখানে সাহিত্যের কথাই বলা হচ্ছে—পুলিশের

চোখের জলের ডাইরী বা অপরাধী ধরার রোমাঞ্চকর বিবরণ বা কারুর সুনীতি কখন কি যৌন সংঘর্ষের ইতিহাস নিয়ে সাহিত্য-পাঠকের মাথা ব্যথা নেই।

প্রকৃত অর্থে একথা ঠিকই যে, পর্নোগ্রাফীর বিক্রী স্বদেশে কি বিদেশে কমেই যাচ্ছে। সেগুলো পাঠক সমাজে বড় একটা পিঁড়ি পায় না। প্রথমে এস্টাব্লিশ-মেন্টের ঢক্কা নিনাদে এবং ভাড়া করা সমালোচকের উস্কানিতে এক ধাক্কা কিতাব কাটে বটে, কিন্তু তার পরে সে বইয়ের বুকে সেপটিপিন দিয়ে চালানোর চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে যায়। একটা সহজ জিজ্ঞাসা তোলা যায়, বাৎসায়নের কামসূত্র (যদি পর্নোগ্রাফী হয়) এই ভারতেই বা ক'জন পড়েন? কিন্তু একটু নজর দিলেই কি দেখা যাবে না যে, ঐ জাতীয় জিনিসের মধ্যেই কিছুটা ভেজাল দিয়ে পাঠক-সংগ্রহের চেষ্টা চলছে? যে বিচারক আদালতে সাহিত্যকে অশ্লীল বলে রায় দেন, তিনি শেয়ালদা স্টেশন থেকে কালীঘাট কালীমন্দির কেওড়াতলা অব্দি রাস্তায় চিৎকরা সূচীপত্র থেকে শেলাই করা বইগুলো সম্পর্কে কি রায় দিচ্ছেন? কার না—কোন বালক বালিকার না চোখে পড়ছে ভিতের ওপরে হিন্দী সিনেমা বনিতাদের চেহারা প্রদর্শনী এবং জীবন যৌবন ফাটানো লালে কালোয় খাখা করা রমণীর ছাপ? সবারই জানা, অপ্রাপ্ত বয়স্কদের ডাকবার জন্যেই 'কেবলমাত্র প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য' কাষ্ঠ ফলক ঝুলিয়ে দেওয়া হয় সিনেমা হলের দরজায়। আর 'বিয়ের প্রথম রাত' মার্কা নানা ধরণের কিসসা ঘোরা ফেরা করে তের চোদ্দ বছরের ছেলে মেয়েদের হাতে হাতে। এর প্রচার বন্ধ করা যাচ্ছে না। যত দোষ নন্দ ঘোষের অর্থাৎ সাহিত্যিকদের।

শিল্প সাহিত্যের নামে বাজারে অনেক কিছুই চলে—চালানো হয়, যাকে কোনো সাহিত্য পাঠকই সাহিত্য বলেন না। কেননা জীবনের সত্য প্রকাশ সেগুলোর মধ্যে নেই। পাঠকের মর্মমূল ধরে টান দিতে পারে না এসব রচনা—একটা আলতো আঘাত দেবার ভান থাকে মাত্র। প্রতি সৎপাঠকের কাছেই ধরা পড়ে, ওগুলো বানিয়ে তোলা এবং কদর্য; উপস্থাপন বিকৃত। বাস্তব পৃথিবীর কোথাও কিছু অশ্লীল নেই। জীবনের আলো-আঁধারীই জীবনকে গতিশীল রেখেছে। 'হ্যাঁ' ও 'না'-এর কনট্রাডিকশনের মধ্যে থেকে সিনথেসিস হয়ে আত্মপ্রকাশ করছে অভিব্যক্তি। এর 'হ্যাঁ'-ও পূর্ণ সত্য নয়, 'না'-ও নয়। 'হ্যাঁ' ও 'না'-এর সঙ্গম সংঘর্ষ যেমন জীবনে সত্য, সাহিত্যেও তেমনি। এই সত্য—বাস্তব জগৎ এবং জীবনের সামগ্রিক অভিব্যক্তির সত্যকে সাবলীল ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারলেই তা সাহিত্য। না পারলে বড় জোর বলা যেতে পারে

তা সাহিত্য নয়—অশ্লীলতার প্রশ্ন ওঠে না। আর সেগুলো সম্পর্কে পাঠকের কোনো ঔৎসুক্য নেই। ছিলো না প্রাচীন কালেও। আধুনিক সময়ে মানুষ ভূষিমাল নিষ্ঠুর বাস্তবে এত দেখেছে এবং ঠকে ঠকে নিজের প্রাণকে এমনই বর্মে পরিণত করেছে যে, চরিত্র হননের সাধ্য বাজার চলতি পটাসিয়াম সায়নায়েড-এরও নেই।

তবে বিদেশে বেষ্ট সেলার মার্কা এক ধরণের বই সরবে প্রচার পেয়ে থাকে, যার মধ্যে দশ ভাগের এক ভাগে কিছু বস্তু থাকলেও বাদবাকী সবই আবর্জনা। এগুলো পাঠক ঠকানোর জন্যে সাজিয়ে গুছিয়ে প্রকাশ করে স্টলে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। সমালোচকরাও তার মধ্যে বাস্তবের গন্ধটুকু পেয়েই বিভ্রান্ত হন। এগুলো সাধারণত একটা ফরমুলায় ফেলা উপন্যাস। বাংলাদেশেও এমনি একটা ফরমুলা ইদানিং আবিষ্কার হয়েছে। এর বাইরেকার বইগুলো স্বাভাবিক ভাবেই ফ্লপ করছে। শ্রী সন্তোষ ঘোষ কথিত ল্যাণ্ডমার্ক বইটি এবং সে ধরণের অন্য বইগুলোর মধ্যে থেকে যে ফরমুলাটি পাওয়া গেছে, তা উল্লেখ করা যাচ্ছে: [এক] নায়ক উচ্চ মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। দু'বেলা খাওয়াটা ঠিক জুটে যাবে। দরকার মতো নেশার জিনিষ এবং মেয়েমানুষও। [দুই] সামাজিক অস্তিত্বকে সে অস্বীকার করবে (অস্তিত্ববাদের ভূত?)। [তিন] রগরগে ঘটনার ঘনঘটা এবং তা প্রায় রহস্য উপন্যাসের কাছাকাছি। [চার] যৌন মিলনের অতিদীর্ঘ বর্ণনা। [পাঁচ] নায়কের ভাবভঙ্গিতে কিছুটা বিদ্রোহী কালাপাহাড়ী ভঙ্গি থাকবে। [ছয়] অনুসর্গ হিসেবে থাকবে বাপ মাকে খিস্তি, সমাজকে খিস্তি, তথাকথিত ভালোবাসাকে খিস্তি, কমিউনিষ্ট পার্টিকে (যেহেতু অন্য কোনো দল এরও যোগ্য নয়) খিস্তি। [সাত] নায়কের মুখে থাকবে একটি তৈরী করা রোয়াকী ভাষা, যার মধ্যে 'শ্‌শালা', 'মামদো', 'শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর' বা 'আমি গুণ্ডা' ইত্যাদি শব্দের পুনঃ পুনঃ ব্যবহার থাকবে এবং যা প্রায় নীলদর্পণের নবীনমাধবের সংলাপের ভাষার মতোই হাস্যকর ও অশ্লীল। [আট] শেষ মুহূর্তে ভালোবাসার জন্যে একটা আকুলতাও থাকবে। [নয়] ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা এমন ভাবে উপস্থিত করা থাকবে যেন তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে। [দশ] আর যুগরোচক পদার্থ পাপবোধ।

ব্যাস! আবজলম্বিত উপন্যাস। বাংলাদেশে যে-ক'জন মানুষ বই কিনে পড়ার সামর্থ রাখেন এবং জীবনের কোনো গভীরতর সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামান না, একটা রগরগে কাহিনী পেলেই সন্তুষ্ট থাকেন; তাঁরাই অবসর ভরিয়ে

ভোলার তাগিদে উপরোক্ত ফরমুলার ছাঁচে ফেলা বইগুলো কিনে থাকেন। অশ্লীলতা নিয়েও এঁদের কোনো সমস্যা নেই।

বস্তুত, যেখানে অন্নচিন্তাই চমৎকার, সেখানে মাইলো হোক, ভুট্টা হোক, ভুষি কিম্বা খুদই হোক তাই দিয়ে পেটকে জামিন দেবার চেষ্টা করছে সাধারণ মানুষ। লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন খুঁজে পেতে পড়তে হয় বলে তা দূর—হাতের কাছে পায় বলেই ঐ সব ফরমুলা মাফিক বানানো কিতাবে চোখ বুলিয়ে যায়, সাহিত্য বলে গ্রহণ করে না। অশ্লীল নয়—গ্রাহ্যের নয় বলেই গ্রহণ করছে এবং যথারীতি ভুলেও যাচ্ছে। ক্রমাগত উত্তেজনার বজ্রাঘাত করে কিম্বা বেধড়ক শব্দ সংস্কার ফাটিয়ে পাঠকের চরিত্র স্খালন করতে পারে নি ঐ সব বই। অনেক ক্ষেত্রেই এ ধরণের বইয়ের কোনো আবেদন রাখার ক্ষমতাই নেই। যৌন আবেদন রাখার ক্ষমতাও একটা ক্ষমতা, বহু ক্ষেত্রেই তা জীবনযাপনের উদ্দীপনা সৃষ্টির কাজ করে—জাগিয়ে দেয় সৌন্দর্যানুভূতির শক্তি।

রিক্সাচালক যে অর্থেই ব্যবহার করুন না কেন, কথাটার মধ্যে একটা তাৎপর্য আছে। ভদ্রলোকের ছেলে হাঁটুর ওপর দুভাঁজ করা লাল লুঙ্গি গেঁট দিয়ে পরে মেয়ে-স্কুলে গেলেই সেটা অশ্লীল। অর্থাৎ তা স্বাভাবিক সত্য নয়। দীনবন্ধু মিত্রর তোরাপই 'নীলদর্পণের' নায়ক হবার যোগ্য। সেখানে বিষয়বস্তুতে, ভাষায়, ভাবে ও ভঙ্গিতে তার নায়ক চরিত্র হবার সবগুলো অঙ্কুরই ছিলো। কিন্তু নাট্যকারের অক্ষমতায় 'নীলদর্পণ' যা হতে পারতো, তা হয় নি। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে যেখানে শ্রীকৃষ্ণ দশ-এগার বছরের বালিকা রাধিকার কাছে তার ব্রহ্মাণ্ড-পতিত্ব জাহির করতে চেয়েছে সেখানটাই বিসদৃশ ঠেকেছে। আর সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিত জাঁহাবাজ রচনাকারদের অনেক গ্রন্থই অগভীর দৃষ্টি শক্তির প্রকাশ, অতিদীর্ঘ রহস্য রোমাঞ্চকল্প অসার্থক উপস্থাপনার উদাহরণ। তরুণ সাহিত্যিকদের ওপরে টেক্কা দিতে গিয়ে হাস্যকর রকমে ব্যর্থ।

সত্যের খাতিরে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, সাম্প্রতিক পরিবেশ পরিস্থিতিতে লিখতে আসা তরুণ অতি-তরুণ সাহিত্যিকদের সামনে পেছনে গ্রহণযোগ্য কিছুই থাকে নি। ঐতিহ্য হিসেবে তাঁরা ক্ষীণ ভাবে পেয়েছেন জীবনানন্দের জটিল জীবন জিজ্ঞাসা ও স্বপ্নাচ্ছন্নতা, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্লোগান বক্রকথা ও সহজ প্রতীকতা, সমর সেনের শহর মানসিকতার জ্বালা আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভয়ঙ্কর প্রদাহ। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পেয়েছেন ভরসা-হীনতা ; আর বর্তমান খণ্ডে যা পেয়েছেন তা তরুণ সাহিত্যিকদের যে অভিজ্ঞতা

দিয়েছে তার ফলশ্রুতিতেই তাঁরা ক্রুদ্ধ, ক্ষুধার্ত—। একটা ম্যাসকুলিন ভঙ্গিতে গোটা অপরাধ প্রবণ সমাজের সমস্ত মুখোশ হিঁচড়ে ছিঁড়ে ফেলে, কৃত্রিমতা এবং ভাঁড়ামোর বুকে লাথি বসিয়ে তাঁরা জীবনকে জীবনের মতো করেই ভালোবাসতে চেয়েছেন আর তারই অভিব্যক্তি আনতে চেয়েছেন সাহিত্যে। এঁরা অশ্লীলতা করেন নি। যারা অক্ষমভাবে যৌন-কেচ্ছাচার প্রচার করে অবমানসতার পরিচয় দিয়ে এসেছে এবং এস্টাব্লিশমেণ্টের সহায়তায় জাতীয় জীবনমানসকে প্রতারিত করে অর্থ, তথাকথিত কীর্তি এবং যশ লুটে এসেছে সেই সব লেখক আখ্যাধারীর চরিত্রহীনতার পরিচয় জন সমক্ষে তুলে ধরতেই খানিকটা কালাপাহাড়ী ভূমিকা নিয়েছেন বলে গ্রন্থকারের প্রতীতি জন্মেছে। পূর্বসূরী সাহিত্যিকরা যেখানে সামাজিক অশ্লীলতাকে অস্বীকার করে ব্যক্তিগত অশ্লীলতাকে কুৎসিতভাবে উপস্থিত করেছেন, সেখানে সাম্প্রতিক সাহিত্যিকরা সামাজিক অশ্লীলতাকে তুলে ধরার দায়ে অশ্লীল সাহিত্য করেই দেখিয়েছেন অশ্লীলতা কাকে বলে এবং সত্যিই অশ্লীল করতে পারলে সাহিত্য তার মহত্ব হারায় না। তাছাড়া রাজনীতির মধ্যেকার ফাঁপাপনা, স্বার্থসর্বস্বতা এবং ফ্রাষ্ট্রেশন দেখে, নিজেদের জীবনের কোনো গ্যারান্টি না পেয়ে, বেকারিত্বের জ্বালা, শিক্ষার মূল্যহীনতা, ভবিষ্যত সম্পর্কে আশাহীনতা প্রভৃতি কারণে নতুন সাহিত্যিক সমাজ তথাকথিত জীবনবাদী সাহিত্য ও সাহিত্যকারদের পানসেগন্ধ জীবনবাদিতাকে অস্বীকার করার মধ্যে থেকে পরিস্ফূরণ দিতে চেয়েছেন সত্যিকারের জীবন স্বরূপের, নিযুক্ত থেকেছেন মানুষের মৌলিক সত্য আবিষ্কারে। কে কতদূর এ ব্যাপারে সার্থক হয়েছেন এবং কে কতদূর এ আন্দোলনে এগোতে সক্ষম হয়েছেন তা তাঁদের সাহিত্যকর্ম আলোচনার থেকেই প্রকাশিত হয়ে উঠবে।

তরুণ সাহিত্য আলোচনার আগে আর একটা বিষয়ের অবতারণা করে নিতে হচ্ছে। কথা উঠেছে এই তরুণ সাহিত্যিক সমাজ পাশ্চাত্য জগতের অবক্ষয়ের পাঠশালায় শিক্ষানবিশী করে বাংলা সাহিত্যের পুণ্য বাজার অশুদ্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু জিজ্ঞাস্য, কোন বিষয়টা পশ্চিম থেকে আমদানি করেছে পঁচিশ থেকে ত্রিশ বত্রিশ বছর বয়সের ছেলেছোকরা সাহিত্যিকরা, PL 480 না যৌনরাহাজানি? আত্মহত্যার প্রবণতা না গা-গতরের আসবাবপত্র? কোলকাতার ফুটপাথে স্কাইস্ক্র্যাপারগুলোর বাথরুম এবং ল্যাভেটরীর পাইপে ঠেস দেওয়া যক্ষ্মা বা যৌনরোগগ্রস্ত ভিখিরীর স্ত্রীপুত্রকন্যাময় ক্ষুৎকাতর সংসারের সংখ্যা কত? তাদের জীবন কি অশ্লীল? মরণ? বিদেশের কোন দেশ থেকে

এদের আমদানি করা হয়েছে? কিম্বা উচ্চবিত্ত এবং উচ্চমধ্যবিত্ত—সেই টাটা বাটাদের কথা বাদ দিয়েই, যারা বড় পয়সায় অভিজাত, বাথরুমেও যাদের কালো টাকার লাখ খানেক পড়ে থাকে, ঘোড়া-ছাপাই বোতলের লিকার দিয়ে জলের তেষ্টা মেটায়, বারবণিতা নয় মন্ত্রীটন্ত্রীর পীরিতওলা সোসাইটি গার্ল বা বন্ধুবান্ধবের স্ত্রী-বোনের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে যারা নিজেদের স্ত্রীরা ভালোবাসতে জানে না বলে আক্ষেপ করে এবং বঙ্গসংস্কৃতির সভায় গিয়ে ইঙ্গমার্কিণ পোষাকের সিন্ধুইন্দুর ভাটিয়ালী বা জারি কিম্বা সিল্কের গেরুয়াধারী বাউলের কণ্ঠে ন্যাংটা জামাইয়ের গান শুনে হাততালি দেয় ও অবসর সময়ে অতিবিপ্লবী রাজনীতি নিয়ে উত্তেজিত আলোচনা করে, 'দেশটা গোল্লায় যাচ্ছে' বলে মন্তব্য প্রকাশ করে এবং শান্তি পাবার জন্যে ছুটিতে নানা মঠে বা দেওঘরে আধ্যাত্মিক মহিলাদের সঙ্গ দিতে যায়—এদের পশ্চিম থেকে পাওয়া গেছে নাকি? আর ঐ জন্ম নিয়ন্ত্রণের পোস্টারগুলো অত্যন্ত শ্লীলভাবে বালক বালিকা বিদ্যালয়ের দেওয়ালের গায়ে সেঁটে দিয়ে গেছে বুঝি ফরাসী হাতগুলো, ভোয়া থেকেই বুঝি কোলকাতা রেডিও সেণ্টারে জন্মনিয়ন্ত্রণের উপদেশগুলো প্রচার করা হয়ে থাকে! সাম্প্রতিক সাহিত্যিকদের কাছে এটাই দুর্বোধ্য যে কোনটা তাঁরা বিদেশ থেকে আমদানী করেছেন? বাস্তব জীবনটাকে যে নয় তা তাঁরা জোরের সঙ্গেই বলবার জন্যে লেখনী চালাচ্ছেন বলে বিশ্বাস করার কারণ আছে। তবে কিনা, বিদেশে যখন স্কুলের ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে HELP INDIA লেখা ফেস্টুন নিয়ে পথে বেরোয়, নিজেদের বাজে খরচের পয়সা পাঠিয়ে দেয় একটা জাতের ক্ষুধা শান্তির জন্যে, ফরাসী দেশের মানুষ জিজ্ঞেস করে যে-ভারতবর্ষের মানুষ আমেরিকার ভিক্ষার টাকায় বেঁচে আছে তারা আবার স্বাধীন সাহিত্য রচনা করে কি করে? —সাম্প্রতিক সাহিত্যিক তখন নিজেরই মুখ দেখেন এবং নিজেদের অস্তিত্ব তল্লাসে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। আর তক্ষুনি যখন রাষ্ট্রীয় মন্ত্রীদের কেউ ঝোঁকে বলেন 'বিদেশে ভারতের খুবই উচ্চ সম্মান—দেশের আমূল উন্নতি হইতেছে এবং পাঁচশালা পরিকল্পনার জন্য বিদেশ হইতে কয়েক শ' কোটি বৈদেশিক মুদ্রা ঋণ পাওয়া যাইবে' এবং তাঁর কথা লুফে নিয়ে ব্যানার হেডিং দিয়ে 'ক্ষুধার জ্বালায় সন্তান বিক্রয়', 'জনৈকা উদ্বাস্তু তরুণী ধর্ষণের দায়ে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী গ্রেপ্তার' 'কোলকাতায় খাদ্য মিছিলে পুলিসের কয়েক রাউণ্ড গুলিবর্ষণ ও দেড় শতাধিক লোক নিহত' 'ভারতীয় বিশ্বসুন্দরীর বড়দিনে ভিয়েতনামে মার্কিনী সৈন্যদের মনোরঞ্জনের জন্যে যাত্রা' 'শিল্পের এক লক্ষ টাকা তছরুপের জন্যে

ব্রহ্মচারী গুরু গ্রেপ্তার' 'দামোদর ভ্যালির সিমেন্টের বাঁধ ইঁদুরে গর্ত করে ধ্বসিয়ে দিয়েছে' প্রভৃতি খবরের পাশে ছাপিয়ে দেয়, তা দেখে শুনে সাম্প্রতিক সাহিত্যিকরা হো হো করে হেসে ওঠেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে বা হয়তো আর তাও পড়ে না। ঘৃণায় লজ্জায় আত্মহত্যার জন্যে খান পটাসিয়াম সায়নায়েড—ভেজাল, তাই মরেন না এবং সাহিত্য করেন। এটাই জীবন। জীবন যদি নেশা হয়, এঁরা সেই নেশাতেই বুঁদ। এঁদের ক্ষুদে বৃহৎ সংকলন এবং সাময়িক পত্রগুলোর মধ্যে থেকে উপরোক্ত কথাগুলোই জানতে পারা গেছে।

বস্তুত জীবনের নেশায় বুঁদ হবার ফলেই সাম্প্রতিক সাহিত্যকারেরা এই উদ্ভট সমাজ পরিবেশ থেকে পরিত্রাণেব উপায় খুঁজছেন। জাতীয় পুনর্গঠণ পরিকল্পনা বিশ বছর ধরে মুষিক প্রসব করলেও কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরী হয়েছে। আর হাজারো সংকটে পীড়িত মধ্যবিত্ত সমাজের মূলধন বলতে যেহেতু স্কুল কলেজের বিত্থা বই নেই, যে করেই হোক এঁদের বিশ্ববিত্থালয়ের ডিগ্রী অধিকার করতে হয়েছে। এই ডিগ্রী গ্রহণের সূত্রে এবং রাষ্ট্রনৈতিক আঁতাতের মাধ্যমে মানসিক পৃথিবীকে এপাড়া ওপাড়ার মতো করে নিয়ে বহির্ভারতীয় বিদেশের প্রত্যেকটি স্পন্দন, তার চিত্রচরিত্র ও মানবতার সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ট হয়ে উঠেছেন পশ্চিমবঙ্গের তরুণ সমাজ। আর গঙ্গার যে ঘাটে ভিক্ষার গম খালাস নেওয়া হয়েছে সেই ঘাটেই যেহেতু পাওয়া গেছে মান, জয়েস, কাম্যু, কাফকা, সার্ত্রে, ডষ্টয়েব্‌স্কির মহৎ রচনাগুলো এবং ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জার্মান ও মার্কিন মুল্লুকের বেস্টসেলার মার্কা বইগুলো, এঁরা ব্যাপকভাবে তা আস্বাদন করেছেন। নিজের দেশের সাহিত্য মানস থেকে ঐতিহ্য হিসেবে যা পেয়েছেন তা আধুনিক জীবন জিজ্ঞাসাকে সন্তুষ্ট করতে পারে নি বলেই হোক বা প্রায় সমস্ত পূর্বপর্যায়ের লেখালেখিকে পাশ্চাত্য সাহিত্যানুকরণ জাত বলে মনে করার জন্যেই হোক, তরুণ সাহিত্যকারদের মধ্যে ভারতের বাইরেকার প্রায়-আন্তর্জাতিক সাহিত্য মানসকে স্পর্শ করার একটা আন্তরিক ঝোঁক দেখা দিয়েছে।

এ কথা অস্বীকার করার মধ্যে সংকোচের কোনো কারণ নেই যে, অনুকরণের অনুকরণ থেকেই যেখানে পূর্বসূরীদের অনেকেই নিজ নিজ সাহিত্য মানসের মডেল খুঁজে নিয়েছেন, সেখানে ভারতের বাইরের বিভিন্ন দেশ জাতির ভাষার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করে আসলের স্বাদ পেয়ে ঐ সব সাহিত্য এবং সাহিত্য-কারদের অভিজ্ঞতা এবং আবিষ্কৃত জীবন সত্যের মধ্যে পরিবর্তিত পরিবেশে তরুণ সাহিত্যিকরা নিজেদের আন্তর সামীপ্য অনুভব করেছেন এবং সাহিত্য-

জীবনের প্রাথমিক পর্বে মডেলের প্রয়োজনে ঐ সব বিদেশী সাহিত্যের মধ্যে থেকেই কাউকে কাউকে বেছে নিয়েছেন। উপকরণও সংগ্রহ করেছেন। তবে আগেই বলা হয়েছে, স্বদেশ সাহিত্য থেকে যেটুকু যা গ্রহণ করার মতো হয়েছে, তাকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে আত্মস্থ করে নিয়েছেন সাম্প্রতিক লেখকরা। নিতে কুণ্ঠিত হন নি কিন্তু নতুন নির্মাণের জন্যে অস্বীকার করতেও ভীরুতা দেখান নি। প্রসন্ন থাকলে তো লেখালেখির দরকারই থাকে না। ঐতিহ্যকে এঁরা পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন বলে যাঁরা আক্ষেপ করেন তাঁরা অবশ্যই ভ্রান্ত। আন্দোলন ও পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে থেকে এঁরা নতুন পথেরই সন্ধান করেছেন ও করছেন এবং প্রত্যেকেরই কোনো না কোনো উত্তরাধিকার প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে গ্রহণ করেছেন তবে তা আন্তর্জাতিক প্রাণোৎক্ষেপের অংশ। উত্তরাধিকার মিশ্র জাতীয়। পূর্বসূরীদের এঁদের মতো এত বড় পরিসর ছিলো না।

এ অধ্যায়ের সুরুতে তরুণ সাহিত্য সম্পর্কে অগ্রজ লেখকদের অ্যাটিচিউডের সামান্য উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্যই সবাইকে এক গোত্রের করা যায় না। তবে পুরোনো নতুনে যে দ্বন্দ্ব স্বাভাবিক তা ছিলোই। সাম্প্রতিক সাহিত্য আলোচনা করার আগে তরুণ সাহিত্যের কালকেতুদের দিনে দিনে বেড়ে ওঠার পাশে পাশে ধর্মকেতু কালের সাহিত্যিকরা কী সৃষ্টি করে চলছেন তার কিছু পরিচয় এখানে উপস্থিত করে নিতে হচ্ছে। কেননা, তাঁদের নির্জীব রক্তহীন সাহিত্যকর্ম এবং একই বিষয়ের চর্বিতচর্বণ একটা সমাজের জড়াচলস্বরূপকেই উপস্থিত করেছে। প্রায় বারো আনা ক্ষেত্রেই বয়োজ্যেষ্ঠ লেখকদের অসততা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক ভাবে প্রকাশিত বলে সৎ পাঠক মাত্রেরই মনে হতে বাধ্য। প্রকৃতই, কোনো লেখক যখন বছরে পাঁচ থেকে ন' খানা বড় উপন্যাস, কয়েক গোছা ছোট বড় গল্প, ন্যূনতম গল্পও কিছু গাঁথেন, তখন সে লেখকের সততা সম্পর্কে সন্দিহান না হয়ে উপায় থাকে না। অথচ বয়োজ্যেষ্ঠ সাহিত্যিকদের অনেকেই এস্টাব্লিশমেন্টের হুকুম সামলাতে এবং অর্থের নেশায় শরমের সীমা ডিঙিয়ে, ডবল সিফ্‌টে মগজে প্লট বানিয়ে আবর্জনাস্তূপে ছাপিয়ে তুলেছেন সাহিত্যের বড়বাজারের ডাস্টবিন। সাহিত্যিক সততা বজায় রাখতে গিয়ে কোলকাতার ফুটপাথে মুখ থুবরে পড়েছেন মাণিক-জীবনানন্দ, তাঁর সাধের পল্লীপাঁচালীর অপমৃত্যু স্বচক্ষে দেখে যেতে হোলো না বিভূতিভূষণকে ; অত্যন্ত ম্যাসকুলিন ভঙ্গিতেই বহু আগেই কলম বন্ধ করে দিয়েছেন সমর সেন। এঁদের কথা সশ্রদ্ধ স্মরণীয়।

কিন্তু গদ্যের বিবর্ণ-শ্রী ও পেলব পেলব ত্রিকোণ প্রেমের গল্প নিয়ে এখনো যাঁরা বহাল তবিয়তে বহমান, তাঁদের মধ্যে স্বাধীন (?) সাহিত্য আন্দোলনের প্রবক্তা অথচ প্রকৃত উত্তরাধিকারহীন বুদ্ধদেব বসু সস্তা আকর্ষণী সিনেমাগ্রাহ্য বিষয় এবং যৌন জীবনের বিস্তৃত বিবরণ, সেই সঙ্গে ভাঙা মূল্য বোধ ও বর্তমান অবক্ষয়ের চিত্রচরিত্রকে গভীরে প্রবেশ না করে অত্যন্ত সুচতুর ভাবে তুলে ধরেছেন, পরিবেশন করেছেন একটা সস্তা রোমান্টিকতা। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত পরমহংস-সারদামণি-বিবেকানন্দ সিরিজে বুঁদ, 'যৌবন জ্বালা' ও 'প্রকৃতির পরিহাস' এর লেখক অন্নদাশঙ্কর রায় প্রাবন্ধিক হিসেবে সফল হলেও তাঁর এ সময়ের গল্প উপন্যাসে তরল ভাবালুতা ও কল্পনাবিলাসের মাত্রা কিছুটা বেশি। তবে গদ্যের মধ্যে অনেক পরিমাণে পদ্যের রস আনবার জন্যে যে ব্যাপক ভূমির নানা জাতি নানা ভাষা ও নানা মর্জির নর নারীর চারিত্র্যস্পর্শ তিনি পেয়েছেন --পেয়েছেন প্রাণের উত্তাপ—তাকে কোনো সস্তা মোহে বা প্রলোভনেই হারান নি। সঙ্গীত সাধনার মতোই তিনি বিচিত্র মানুষকে ঐকতানে পরিণত করার সাধনা করেছেন। আর এ জন্যেই তাঁর গল্প উপন্যাসের ভিত্তি তীব্র ভালোবাসা। জেগেছে জিজ্ঞাসা প্রেমের পরিশুদ্ধতা কিসে, কোন পূর্ণতায়? যুগল প্রেমের অভিপ্রায় কি? মানবতার মুক্তি কি জ্ঞান মার্গে, না, প্রেম মার্গে? আর এ সব প্রশ্নের উত্তর সন্ধানের ভাবনা দুরূহ দার্শনিকতায় ও কবিতাকল্প ভাষায় বিশ্বমনস্ক প্রবীন কথাসহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর উপস্থিত করেছেন তাঁর উপন্যাসে। এ প্রসঙ্গে 'বিশল্যকরণী'র নাম মনে পড়ে। যুদ্ধ ও শান্তির সঙ্গে প্রেম অঙ্গাঙ্গী ভাবে, না রক্তধারার মতো, যুক্ত হয়ে শিল্প-সংস্কৃতির অত্যুচ্চ পরিবেশে পরিবেশিত হয়েছে এখানে। পরিবেশ রচনার ক্ষমতা তাঁর এখনো অসামান্য। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও বনফুল এখনো নিঃসন্দেহে পরিশ্রমী মানবতাবাদী—জীবনের একটা উজ্জ্বল দিগন্ত তাঁদের ভাবনেত্রে বর্তমান। কবিতায় বিষ্ণু দে এবং গদ্যে তারাশঙ্কর নিজ নিজ অন্বিষ্ট ছুঁয়ে ফেলেছেন বলেই মনে হয়। তাই সাম্প্রতিক কালে তারাশঙ্কর যাই লিখছেন না কেন তাই-ই একরকম ভাবে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। তবু এ কথা বলতেই হবে যে, তারাশঙ্কর তাঁর ভাবের মুদ্রাদোষে বহু ক্ষেত্রেই পুরোনো বিষয়বস্তুকে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হাজির করে যাচ্ছেন। এখন তিনি বিশ্বসত্য ও মানবসত্যের ব্যাখ্যাতা হিসেবে একটা দূরস্থানের উঁচু বেদী থেকে সব কিছুকে দেখছেন। ফলে, তাঁর রচনায় সাম্প্রতিক মানুষের রক্তদাহ ক্লান্তি অবসাদ জ্বালা আর অসহায়তা প্রায় অনুপস্থিতি এবং তা অধুনার আইডেনটিটি

তল্লাসকারী পাঠকের মনে খুব একটা দাগ কাটে না। বনফুলও তাঁর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা হারিয়ে ধর্মানুসন্ধানে লিপ্ত। সাম্প্রতিক জটিলতার জট ছাড়ানোর প্রয়াস তাঁর লেখার মধ্যে আগের মতো নেই। তবে গল্পের তীক্ষ্ণতা ও ভাষার জোর বা চরিত্র চিত্রণের নৈপুণ্য এখনো বনফুলকে চিনতে অসুবিধা ঘটায় না।

অতিকায় রচনা যদি একটা গুণ হয় পঁচিশতলা বাড়ি আর 'মিনির' যুগে গজেন্দ্র মিত্র, বিমল মিত্র, প্রমথনাথ বিশী, রমাপদ চৌধুরীদের তারিফ না করে উপায় নেই—পুরস্কার পদবী এবং শিরোপাও এঁদের দিতে হয়। কিন্তু সাহিত্য বিশালত্ব মেপে গুণাগুণ বিচার করে না—ডায়নোসোরের শিল্পত্ব প্রাগৈতিহাসিক যুগের পর শুধু বিস্ময় রসই কোনোমতে জাগাতে পারে। এবং আমাদের উল্লেখিত লেখকরাও অনেকে ইতিহাস ব্যাপারে এত কেয়াবলেসলি কেয়ারফুল যে অতি সুবিশাল গ্রন্থ রচনা করে 'মুদ্রা'র অঙ্কে তার দাম নির্ধারণ করেছেন। এঁদের ভাষা গপ্পো বানানোর খুবই উপযোগী। বহু বিচিত্র মানুষ, নানা পরিবেশ, বোষ্টম বেশ্যা, নবাব ফকির, সামন্ত জমিদার নিপীড়িত প্রজা, যুদ্ধ দাসত্ব প্রভৃতি এলাহি কাণ্ড জড়ো হয়েছে উপন্যাসে। এবং আছে প্রেম দেহ ও দাহ। গোলগাল গল্প। গজেন্দ্র মিত্রর 'কলকাতার কাছেই' খুব নাম-ডাকওয়ালা উপন্যাস, 'উপকণ্ঠে', 'নীলকণ্ঠী', 'একদা কি করিয়া', 'আমি কান পেতে রই' প্রভৃতিতে বেশ জমাট করে গল্প ফেঁদেছেন ১৫, ১৬, ২০, ২২ টাকায় যেগুলোকে মাপা যায়। প্রমথনাথ বিশী তো কবি, সমালোচক, নাট্যকার, কথাসাহিত্যিক, সাংবাদিক, ব্যঙ্গকার। 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার', 'চলন বিল' ঠেলে এসে 'জোড়াদীঘির উদয়াস্তে' ঠেকেছেন। জমিদার বংশী দাপট প্রেম প্রীতি, হিংসা প্রতিহিংসা, স্বার্থপরতা ও ঘৃণা এবং তথা কথিত সামন্ততন্ত্রী আত্মত্যাগ সবই আছে এ সব উপন্যাসে। বেজায় খুশি নিয়ে পঁচিশ পৃষ্ঠা অন্তর এক পৃষ্ঠা পড়েও গল্প বুঝতে অসুবিধা হয় না। এবং 'লালকেল্লা'ও তাই। রমাপদ চৌধুরী ছোট গল্পে তাঁর সময়ের লেখকদের মধ্যে একটা বিশিষ্ট স্থান দখল করতে পেরেছিলেন। শহুরে পরিবেশের সভ্যতার কালগ্রাসের বাইরেকার মানুষকে তিনি তাঁর আদিমতা সমেত তুলে ধরতে যেমন চেষ্টা করেছেন তেমনি শহুরে মধ্যবিত্ত জীবনে মানসে যে ধ্বস নেমে এসেছে তার স্বরূপটিকেও তিনি তুলে ধরেছেন আপন হৃদয় যন্ত্রণা দিয়েই। বিদ্রূপাত্মক এবং মনস্তত্ত্বপ্রধান গল্পও তাঁর বেশ কয়েকটিই আছে এবং আছে বিচিত্র প্রেমের করুণ মধুর কিছু গল্প। গল্পের ব্যাপারে তিনি পাকা হাতেরই পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু উপন্যাসগুলো

প্রায় সবই ফ্লপ করেছে। 'প্রথম প্রহর', 'এই পৃথিবী পান্থনিবাস', 'দুটি চোখ দুটি মন', 'বনপলাশীর পদাবলী', 'লালবাঈ', 'এখনই' প্রভৃতি উপন্যাসে রমাপদ চৌধুরী তেমন কোনো বিশেষ দক্ষতা দেখাতে পারেন নি। সবটাই যেন মামুলি। তবে 'জনৈক নায়কের জন্মান্তর'এ কিছুটা নতুনত্ব আছে। এবং, বিমল মিত্র দিস্তা দিস্তা কাগজে ঐতিহাসিক মালমশলা টুকে এনে তাকেই উপন্যাস করতে ব্যস্ত থেকেছেন। কিছু যুদ্ধ কিছু প্রেম। পেলবিত ভাষা ও রোমান্টিক নরনারীর সুডৌল গল্প -এই দিয়েই তিনি সাধারণ পাঠকদের ভুরি ভোজের ব্যবস্থা করে যাচ্ছেন। একের পর এক এসেছে 'কড়ি দিয়ে কিনলাম', 'একক দশক শতক', 'চলো কলকাতা' এবং অতিকায় ও সু-অতিকায় ঐতিহাসিক উপন্যাস 'বেগম মেরী বিশ্বাস'। নিকট দূরের ঐতিহাসিক বিমল মিত্র 'সাহেব বিবি গোলাম'এর লেখক।

অতিকায় ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভিড়েও তবু গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর সম্পন্ন কিছু লেখকের লেখা এ সময়েই প্রকাশিত হয়েছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভিত্তিতেই বাঙলা ও বাঙালী ছিলো বলে এবং একটা সংগ্রামী চেতনা থেকেই তাঁর সাহিত্য-বোধ জন্মেছে বলেই দেশ জাতির টানটি তাঁর লেখার মধ্যে অনুভব করা গেছে। মানুষের মধ্যে তিনি যেমন বন্যহিংস্রতা ও প্রেম ভালবাসার উদ্দীপ্ত শিখাকে প্রত্যক্ষ করেছেন তেমনি ধনতান্ত্রিক বিকাশের ফলে উদ্ভূত সমস্যাকে গভীর দৃষ্টিতে দেখে তিনি তার সমাধান চেয়েছেন। স্বাধীনতার পরে বাস্তব সমাজচিত্র তাঁকে পীড়িত করেছে আর তার ফলে তিনি একটি তীব্র অন্তরমুখী টান অনুভব করেছেন। কিছুটা রোমান্টিকও তাই তাঁকে হয়ে পড়তে হয়েছে। এ সময়ে খুব একটা দাগ কাটার মতো তাঁর রচনা প্রকাশিত না হলেও তিনি বিচিত্র ধরণের সব লেখালেখি বা পাত্রপাত্রী ও বিষয় উপস্থিত করেছেন এবং সব লেখার যা গুণ তা হচ্ছে লেখকের মানুষ-মমত্ব ও মানুষের সংগ্রামের দিকটাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখার দৃষ্টি। সৈয়দ মুজতবা আলী এই সময়েই আবার আড্ডা ইয়াকি উইট স্যাটায়ারে আসর মাতিয়ে তুলেছেন—অবশ্য 'শবনম্' বাদে। তা ছাড়া পাঠযোগ্য কিছু কিছু উপন্যাস রচনা করেছেন প্রাণতোষ ঘটক, সন্তোষ কুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ও শংকর প্রমুখ লেখকরা। প্রাণতোষ ঘটকের 'আকাশ পাতাল', 'তিন পুরুষ'এর উল্লেখই যথেষ্ট। গল্পের পটভূমি বিস্তৃত। সন্তোষ কুমার ঘোষ চলতি সমাজের, অবক্ষয়িত সভ্য সামাজিক মানুষের চলচ্ছবি আঁকতে চেয়েছেন। এক সময়ে খুবই ক্ষমতার সঙ্গে জীবনের

মূল্যবোধ রক্ষার জন্যে মধ্যবিত্তদের আপ্রাণ সংগ্রাম ও তার ব্যর্থতাকে বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে সন্তোষ ঘোষ ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমানে যেন শুধু সস্তা এবং দগদগে পাশ্চাত্ত্য বেস্টসেলার মার্কা লেখা লিখতেই সিদ্ধহস্ত হতে চাইছেন। তবে তিনি পাঠক সম্পর্কে কোনো দিনই বড় একটা ভাবেন নি—এখনও উদাসীন। তাঁর লেখায় ঘটনা খুব প্রাধান্য পায় না, চরিত্রের দিকেই তাঁর দৃষ্টি। তাঁর এ সময়ের লেখার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'জল দাও' যার মধ্যে কিছুটা বিস্তার আছে। সমাজের আত্মহননের পরিচয় বহন করে এনেছে এর পাত্রপাত্রী। সর্বত্র লেখকের অবিশ্বাসটাই প্রকট। কিন্তু এখানে 'কিনু গোয়ালার গলি'র সন্তোষ ঘোষকে খুঁজে পাওয়া যায় না। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় বা শংকর-এর সমস্ত রচনায় মিষ্টি আবহ সৃষ্টির দিকটিই আকর্ষণীয়। বিভূতিভূষণের লেখার মধ্যে মরমী ভাব আছে। গভীর ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় 'কত অজানারে' সৃষ্টি করে শংকর পরে হোটেল রেস্তোরাঁর দিনরাত নিয়ে এসেছেন সাহিত্যের জগতে, এঁরা দুজনেই উপভোগ্য কাহিনীকার। নরেন্দ্রনাথ মিত্র এক সময়ে উদ্বাস্তু জীবন ও মধ্যবিত্ত জীবন নিয়ে বেশ কয়েকটি ভালো গল্প লিখেছেন। সে গল্পের মূল সুর ছিলো গভীর মমত্ববোধ। যুগ-লক্ষণের কিছু কিছু ছাপ নরেন্দ্র মিত্রের রচনার মধ্যে আছে। কিন্তু তিনি নতুন সময়ের আবর্তকে ধরতে পারেন নি। বুদ্বুদ দেখে নতুন সময়ের ভিন্নতর পরিবেশকে 'চেনামহল' ভাবা অসম্ভব। তা ছাড়া কতকগুলো প্রতিষ্ঠিত সর্তে নরেন্দ্র মিত্রের বিশ্বাস বদ্ধমূল। 'সূর্যসাক্ষী' করে জীবনের স্তব করার প্রবণতায় স্নেহ প্রেম দয়া প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত গুণকে তিনি আঁকড়ে ধরেছেন। ফলে যুগের তীব্র ভাঙচুর তাঁর লেখায় দাগ কাটে নি। পরবর্তী কালের রচনা তাই প্রায়ই হয়ে পড়েছে সস্তা প্রেমের জোলো বিন্যাস। তাঁর লেখায় যুগলক্ষণ কিছু কিছু ধরা পড়লেও তা খণ্ডিত। চরিত্রগুলো তাৎক্ষণিকের সমস্যায় আলোড়িত এবং আত্মকেন্দ্রিক—জন্মসূত্রে পাওয়া মানবিক অধিকার নিয়েই তারা তুষ্ট---খুব একটা কেউ অসহায় বোধ করে না। তবু একথা বলতেই হবে যে, নরেন্দ্র মিত্র সহৃদয় আন্তরিকতায় জীবনকে দেখেছেন এবং বিশিষ্ট আবেগ ও মমতা দিয়ে দেহ ও মনের বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তুলেছেন। বহু ভালো গল্পের সঙ্গে তাঁর 'তিন দিন তিন রাত্রি' উপন্যাসের নামও মনে পড়ে।

অগ্রজ লেখকদের মধ্যে যেমন গাব্দা ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখে হাততালি কুড়োনোর প্রতিযোগিতা লেগেছিলো, তেমনি ভৌগোলিক সীমা বাড়িয়ে সাহিত্য করতেও। সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিনারায়ণ

চট্টোপাধ্যায়, নারায়ণ সান্যাল, প্রফুল্ল রায় প্রমুখ লেখকরা শুধু বাঙলা দেশটাকেই বাংলা সাহিত্যের চৌহদ্দি মনে করলেন না। সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় মূলতঃ কাহিনী লেখক। 'দূরের মিছিল' 'অন্য নগর'এ সুধীরঞ্জন সুদূর দেশকেও স্বদেশ ঐতিহ্য দিয়ে দেখবার চেষ্টা করেছেন। জন্ম ও জন্মভূমির জটিলতা উন্মোচনের প্রয়াস দেখা গেলো তাঁর মধ্যে। শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়ে এলেন নির্জন সাগর, দ্বীপ, জাহাজ ও জাহাজী আর দাক্ষিণাত্য প্রদেশের অপরিচিত জগৎ। সৃষ্টি হোলো তাঁর গল্প 'সাগর বলাকা' 'মৎস্য কন্যা' 'জাগুয়ার' ইত্যাদি। দাক্ষিণাত্যের পাহাড়পুরীর সেবাদাসীকে নিয়ে উপন্যাস হোলো 'জনপদ বধূ'; টোডা জাতিকে তার আচার ও সংস্কারসহ উপস্থিত করলেন 'সীমান্ত শিবির'এ। হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় দূরকে আপন মাটির কাছাকাছি নিয়ে এসে বাঙলার মানসিক আবহাওয়ায় অপরিচিতকে পরিচিত আত্মীয়তায় বেঁধে রচনা করলেন 'ইরাবতী' 'আরাকান' 'অন্য দেশ অন্য দাহ'। তাঁর লেখা ব্রহ্মদেশ ও মালয়কে নিয়ে এসেছে বাংলা সাহিত্যে। হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় অভিজ্ঞতার গণ্ডীকে কখনোই অতিক্রম করতে চান নি। ছকে বাঁধা গল্পে অতি-আবেগ দিয়েই তিনি পাঠককে তৃপ্ত করতে চেয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের দিগন্তকে প্রসারিত করতে চেয়েই নারায়ণ সান্যাল রচনা করেছেন 'নীলিমায় নীল' ও 'দণ্ডক শবরী'। আর অতিরিক্ত বিস্ময় রস জোগান দিয়ে প্রফুল্ল রায় রচনা করলেন নাগাদের চিত্র-চরিত্র এবং দুর্জ্ঞেয় পাহাড়ী প্রকৃতির আলেখ্য 'পূর্বপার্বতী' এবং তাঁর হাত দিয়েই বেরোলো 'নোনা জল মিঠে মাটি'। ভূগোল-ভ্রমণ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলেও সুবোধ চক্রবর্তীর 'রম্যাণী বীক্ষ্য' সিরিজ অবশ্য সাহিত্যের মধ্যেই পড়ে না।

একদিকে কল্লোল যুগীয় কায়দায় বাঙলার জল জলাভূমি যেমন রুক্ষ বঙ্গের (পশ্চিমবঙ্গের) মাটির সাহিত্যে উপস্থিত হোলো—সৃষ্টি হোলো অমরেন্দ্র ঘোষের 'দক্ষিণের বিল' 'চর কাসেম', মনোজ বসুর 'জল জঙ্গল', যজ্ঞেশ্বর রায়ের 'পলি-মাটি নোনা জল', রমাপদ চৌধুরীর 'দ্বীপের নাম টিয়ারঙ'; তেমনি কয়লাখনিকে কেন্দ্র করে রমাপদ চৌধুরীর 'দরবারী' গল্প, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের 'ইস্পাতের স্বাক্ষর'। এখানে যেমন প্রাকৃতিক চৈতন্য ফুটিয়ে রচিত হয়েছে প্রভাত দেব সরকারের 'ওরা কাজ করে' 'সন্ধ্যা মালতী'—আঞ্চলিকতাকে জীবন্ত করার প্রচেষ্টা যেমন দেখা গেছে এ উপন্যাসে, তেমনি শিল্পাঞ্চলের চরিত্র, তার বাস্তব ঘটনা ও সংঘাতকে সাহিত্যে মূর্ত্ত করে তুললেন অমল দাশগুপ্ত তাঁর 'কারানগরী' উপন্যাসে। জনমুখী চিন্তা চেতনার মধ্যে থেকে এ সময়েই সৃষ্টি হয়েছে গণ

সংগ্রামের উপন্যাস। গ্রামের কৃষকদের সংগ্রামী এবং দৃঢ় দার্শনিকতাকে সাহিত্যে রূপায়িত করেছেন গুণময় মান্না তাঁর 'লখিন্দর দিগার' উপন্যাসে, কলকারখানার শ্রমিক আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত হয়েছে তাঁরই উপন্যাস 'জুনাপুর ষ্টিল।' এই জোয়ারেই গাঁ-মাটির সাদামাটা জীবনের মরমী ছোঁয়া, পল্লী প্রকৃতির ধুলো মাটির স্বাদ নিয়ে এসেছে গোলাম কুদ্দুসের 'বাঁদী' 'মরিয়ম' এবং ননী ভৌমিকের সচেতন বাস্তবতার নিদর্শন 'ধূলামাটি'। এর পাশাপাশি এসেছে 'রূপদর্শীর নক্সা'র লেখক গৌরকিশোর ঘোষের 'কথায় কথায়' ধরণের কিছু নক্সা রচনা আর তাঁর 'জল পড়ে পাতা নড়ে'র মতো উপন্যাস, যেখানে সহজ সরল চিন্তা ভাবনার অসীম মমত্বের মানুষ ফুটে উঠেছে। যশোহরের আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার এবং গ্রামীণ আবহাওয়া ফুটিয়ে তোলার দিকে তাঁর তীক্ষ্ণ নজর সতীনাথ ভাদুড়ীর কথা মনে পড়িয়ে দেয়। তবে ততটা গভীর নয় এ উপন্যাস। একেবারে শেষের দিকে তিনি আধুনিক জীবন সমস্যাকে কেন্দ্র করে পরীক্ষামূলক এক উপন্যাস রচনা করেছেন—'লোকটা'। কিন্তু তা কালের যৌনতাকে বদ-হজমের দোষে উদ্গার করার প্রবণতারই ফলশ্রুতি, কিছুটা স্থূল। অগ্রজ লেখকদের মধ্যে বরেন বসু একটা নতুন স্বাদ এবং মেজাজ নিয়ে এসেছিলেন তাঁর 'রং রুট' উপন্যাসে। সৈনিক জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে লেখা এবং কিছুটা ম্যাসকুলিন উপন্যাস। সাহিত্যিক হিসেবে আদৌ উল্লেখযোগ্য না হলেও, সাম্প্রতিক বাংলা গদ্যের নানামুখী প্রবণতা দেখানোর জন্যে একদা আলট্রা কমিউনিস্ট (?) দীপক চৌধুরীর নামোল্লেখ প্রয়োজন। দেশীয় এস্টা-ব্লিশমেন্টের প্রভুরা কমিউনিস্ট বিরোধিতাকে একটা 'চল' হিসাবে চালানোর যে চেষ্টা চালিয়েছিলো, দীপক চৌধুরী তারই শিকার হয়ে 'আমি যখন কমিউনিস্ট ছিলাম' মার্কা জবানবন্দী 'পাতালে এক ঋতু'র অবতারণা করেছেন যা আসলে হয়ে উঠেছে গভীরতাহীন ভঙ্গীসর্বস্ব সাম্যবাদ বিরোধী কুৎসার স্টান্ট। এঁর অন্য উপন্যাস 'শঙ্খবিষ' বা 'দাগ বাংলা সাহিত্যের ইত্যাদি-প্রভৃতির মধ্যে পড়ে।

লেখিকাদের মধ্যে প্রতিভা বসু, আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী বা বাণী রায়ের লেখা সম্পর্কে কোনো বিশিষ্ট তাৎপর্যর উল্লেখ করা হচ্ছে না। মহিলারাও তাঁদের গার্হস্থ্য জীবনকেই মাত্র রসায়িত করে উপস্থিত করতে পেরেছেন কেবল এটুকু স্মরণের জন্তেই তাঁদের কথা বলা দরকার। প্রতিভা বসু বুঝি তাঁর স্বামীর শিক্ষাতেই শিক্ষিত। নারী সুলভ দুর্বলতা নেই তাঁর রচনায়। তিনি ভীরু ভঙ্গুর নমনীয় হতে নারাজ। তবে লেখার মধ্যে তাঁর কিছু কিছু অবাস্তব কল্পনা

আসে হামেশাই। 'অতল জলের আহ্বান' 'আলো আমার আলো' প্রভৃতি পুস্তক পাঠকেরই তা জানা। আশাপূর্ণা দেবীর চরিত্র চিত্রণে একটা স্বাভাবিক দক্ষতা আছে। কোথাও কোথাও নায়ক নায়িকা চিত্রণ তাঁর অসামান্য। একান্নবর্তী পরিবারের সুখ দুঃখের কাহিনীই তিনি সহজ ভাষায় পরিবেশন করেন। গোলগাল সুখপাঠ্য উপন্যাস তাঁর 'অবগুণ্ঠিতা' 'দিগন্তের রং' 'তিন ছন্দ' ইত্যাদি। মহাশ্বেতা দেবী স্বল্প পরিসর গার্হস্থ্য জীবনের বাস্তব ধর্মী লেখা লিখেছেন কয়েকটি। সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিতে লিখেছেন 'অমৃত সঞ্চয়'।

ঘর থেকে বাংলা, বাংলা থেকে ভারত ও ভারতের বাইরেকার এপ্রান্ত সেপ্রান্ত—বাংলা সাহিত্যের পরিধি বাড়লো। কিন্তু সাহিত্য হোলো কতটুকু? এ প্রশ্নের উত্তর পেতে সম্ভবত মাইক্রোস্কোপ ধরতে হবে। কেননা, সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রের যে উত্থান কাম্য ছিলো যে উৎসাহ নিয়ে দেশ গঠনের ক্রিয়াকাণ্ড শুরু হবার কথা ছিলো, তা শাসক শ্রেণীর অবিমৃষ্যকারিতায় পরিত্যক্ত হয়েছে। যাও বা ছিটেফোঁটা দেশ গঠনের প্রহসন হয়েছে তাকেও সাহিত্যিকরা, এক কথায়, প্রায় প্রত্যাখান করেছেন। শুধু তাই নয়, এ সময়ের জ্বলন্ত সমস্যা—উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়েও তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য লেখালেখি হয় নি। বাঘাবাঘা জাতীয়তাবাদী, মানবতাবাদী, জীবনবাদী সাহিত্যিক, যাঁরা নিজেদের বাংলা সাহিত্যের বলিষ্ঠ লেখক বলে দাবী করেন, মনে করেন যে তাঁদের জন্যেই বাংলা সাহিত্য বিশ্ব সাহিত্যের পাতে বাখা যাচ্ছে, তাঁদের চোখের ওপর দিয়েই দাঙ্গার রক্তে বিভীষিকাগ্রস্ত মানুষের অশ্রু শোণিতের প্লাবন বয়ে গেলো, মা মেয়েদের ইজ্জৎ ও সতীত্ব দিবালোকে তছরূপ হয়ে গেলো, এ দেশ থেকে কর্পূরের মতো উবে গেলো মনুষ্যত্ব, শেয়ালদা সহ পশ্চিম বঙ্গের ছোট বড় রেল স্টেশনগুলোতে ট্রানজিট ক্যাম্পগুলোতে—গোটা ভারতে বিংশ শতকীয় সভ্যমানুষ আদিম মানুষে পরিণত হয়ে গেলো। অথচ, তারাশঙ্কর বনফুল-বুদ্ধদেব বসু'রা এবং স্বাধীনতাপূর্বকালের ছোট-বড় লেখকরা তা নিয়ে কোনো মেজর লেখাতেই হাত দিলেন না। যাও বা ছিটেফোঁটা লেখা হয়েছে তাও যৌন-মাত্র-পুঁজি অসহায় উদ্বাস্তু মেয়েদের তবিল তছরূপ করার জোলো রিবংসা ছাড়া কিছু নয়। ভাবতে লজ্জা করে এঁরা সাহিত্যিক বলে বড়াই করেন। স্মরণাতীত কালের মধ্যে ভারতে এত বড়ো নিষ্ঠুর ঘটনা ঘটেছে বলে ইতিহাসের সাক্ষ্য নেই। বিদেশে এমনটি ঘটলে কোনো সৎ লেখক তা কোনোদিন এড়িয়ে গেছেন বলেও শোনা যায় নি, সেখানে অন্তত পাঁচ সাতখানা দুরন্ত উপন্যাস কি ছোট বড় গল্প লেখা

হোতোই। কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ ভরা কোলকাতা এ ব্যাপারে আশ্চর্য রকম নীরব থেকেছে। তরুণ সাহিত্যিকরা যদি তাঁদের পূর্বস্থরী লেখকদের ঘৃণা করেন কিম্বা সাহিত্যিক মর্যাদা দিতে অস্বীকার করেন বা বলেন যে ওঁরা কেবল বানিয়ে তোলা প্রেম ভালোবাসার জন্যে বানিয়ে তোলা পরিবেশ রচনা করে বাংলার অর্ধশিক্ষিত মুষ্টিমেয় পাঠককে ধোঁকা দিয়ে পয়সা রোজগার করেছেন, তবে তার বিরুদ্ধে সম্ভবত কারো কিছু বলার থাকবে না। আর কিছুই বলার থাকবে না যদি বলি যে, যারা রেল স্টেশনে, ট্রানজিট ক্যাম্পে, উদ্বাস্তুদের জবর দখল কলোনীগুলোতে সহানুভূতি দেখানোর নামে নির্বিচারে নারী ধর্ষণ করেছে, সরকারী অর্থ উপদ্রুত মানুষের নাম করে নিয়ে নিজেরা আত্মসাৎ করেছে, এবং যে সব সরকারী আমলা অসহায় নারী দেহ নিয়ে প্রায় সরকারী ভাবেই মধুচক্র রচনা করে মদ ও নারীমাংসের হুল্লোড়ে রজনীর অন্ধকারকেও লজ্জিত করেছে, তাদের সম্পর্কে সিনিয়র সেমি-সিনিয়র সাহিত্যিকরা চুপ করে থেকে শেষাবধি পরোক্ষে ঐ সব ক্রিয়াকাণ্ড সমর্থনই করেছেন মাত্র। একমাত্র 'বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্প' (নারায়ণ সান্যাল) দিয়ে এ দৈন্য ঢাকা যায় না। মানুষ হিসেবেও এঁদের কোনো বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ওঠে নি কোনো লেখালেখির মধ্যে। কুকুর বেড়ালের মতো বেঁচে থাকার জন্যেই যে সংগ্রাম ছিন্নমূল মানুষগুলো করে যাচ্ছিলো তাদের জীবন সংগ্রামের কোনো সত্য-চিত্র বাংলা সাহিত্য দিতে পারে নি। তবে খুব একটা নাম ডাক নেই এমন কিছু কিছু জুনিয়র বা মাইনর লেখক এবিষয়ে কিছু কিছু ছোটগল্প রচনা করেছেন। কিন্তু তা অতবড় জাতীয় কল্লান্তের তুলনায় কিছুই না।

স্বাধীনতা এবং তার পরিহাস নিয়ে - অবক্ষয়িত সমাজে মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন সংকট নিয়ে স্বল্প-পরিচিত লেখকরা কেউ সহানুভূতি ও দরদভরা কলমে, কেউ বক্র আক্রমণের ভঙ্গীতে কিছু কিছু ছোটগল্প রচনা করেছেন। এসব লেখকরা মূলত সমাজতন্ত্রী আদর্শে উদ্বুদ্ধ। কিন্তু তত্ত্ব ও জীবনকে যুক্ত করতে না পেরে অনেকেই তাঁদের লেখালেখিকে শ্লোগানসর্বস্ব নতুবা নেতিবাচক করে ফেলেছেন। যুদ্ধ দাঙ্গা স্বাধীনতা ও দেশ বিভাগকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে রমেশ সেনের 'কাজল' 'কুরপালা'। মিহির সেনের গল্পের মধ্যে আশাবাদ, সংগ্রাম ও শ্লোগান থাকলেও গভীরতা দেখা যায় নি। সত্যপ্রিয় ঘোষের মধ্যে দেখা দিয়েছে একটা জ্বালা বোধ; তিনি তীব্র ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের কষাঘাত হেনেছেন সমাজের ওপর। সংগ্রামী কৃষক মধ্যবিত্ত শ্রমিকের তেজী দিকটাতেই তাঁর

আকর্ষণ। বীরেন্দ্র নিয়োগীর 'কানা গলি', 'পর্দা', 'জোয়ারের কান্না', 'ক্রুশ' প্রভৃতি গল্পের মধ্যে ধরা পড়েছে জীবনবাদী লেখকের সামগ্রিক সহানুভূতি। উদ্বাস্তুজীবন নিয়ে তাঁর দু একটি গল্প সে সময় খুবই আলোড়ন তুলেছিলো। মিহির আচার্য খুবই সংবেদনশীল লেখক এবং লিখেছেনও প্রচুর। গ্রাম-গাঁয়ের মানুষ প্রকৃতি বা খেটে খাওয়া মানুষের অর্থনৈতিক আন্দোলন, মধ্যবিত্ত জীবনের ছোট ছোট দুঃখ ব্যথা এবং প্রেম ভালবাসাকে তিনি নিটোল গল্প করেই উপস্থিত করেছেন। খুব গভীরে যাবার চেষ্টা তাঁর নেই, নিছক একটা গল্প বলেই তাঁর তৃপ্তি। তপোবিজয় ঘোষের 'পাথর বাটি', অমল দত্তর 'এই সীমান্তে' সত্য গুপ্তর 'নোনা জল ঘোলা জল', 'বিছা হার', দুর্গা বসুর 'কমপেনসেসন' ইত্যাদি সমসাময়িক প্রগতি ধারণার ওপর ভিত্তি করে রচিত গল্পগুলোতে কিছুটা তাজা স্বাদ আছে বলতেই হবে। চিত্তরঞ্জন ঘোষের দৃষ্টি মূলত প্রগতিধর্মী চিন্তায় জাড়িত। তাঁর লেখায় ইউনিয়ন, শ্রমিক আন্দোলন ইত্যাদি যেমন আছে তেমনি আছে বিশিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদের প্রতিফলন। প্রেম সম্পর্কিত ধারণা নিয়েও তাঁর জিজ্ঞাসা ও উত্তর সন্ধানের প্রয়াস লক্ষণীয়। 'দৃশ্য ও দৃশ্যান্তর' নামে উপন্যাসে তিনি সার্থক ভাবেই অভিশপ্ত কলোনী জীবন চিত্রিত করেছেন। ছোট বড় অনেকেই দু-হাতে লেখালেখি করেছেন—গল্প উপন্যাস কিছু কম লেখা হয় নি এ সময়ে, কিন্তু কী লাভ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, 'জরাসন্ধ', শক্তিপদ রাজগুরু কিম্বা স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম শুধুমাত্র উল্লেখের জন্যে উল্লেখ করে? অতি তুচ্ছ শোক দুঃখ কান্না হাসি নিয়ে যে সীমাবদ্ধ জীবনের গণ্ডী তাই দিয়ে ছোটগল্প এবং ছোটগল্পকে টেনে বাড়িয়ে ভুরিভুরি উপন্যাস করা হয়েছে এসময়ে। সমাজ সচেতন হয়ে কিছু টাইপ চরিত্র এঁকে নানা সমস্যায় ভারাক্রান্ত হয়েছেন নগরমন্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। সমাজের নানা ধরনের চরিত্র তাঁর লেখায় এসে ভীড় করে। কিন্তু যাযাবর-এর স্মার্ট ভাষায় লেখা 'দৃষ্টিপাত' 'জনান্তিক'এর পাত্রপাত্রীদের মত সে টাইপ চরিত্রগুলো শুধু ঝকমকই করে, গভীর জীবনবোধে পাঠককে টেনে নেয় না—দিক দেখায় না। 'শীতে উপেক্ষিতা' ও 'অন্যপূর্বা'র সমর্থ লেখক রঞ্জন-এর উত্তরসূরী জরাসন্ধ-র 'লৌহ কপাট' ইত্যাদি লেখার মধ্যে কিছুটা অপরিচিত বিষয়ের যে স্বাদ তাই-ই মাত্র আছে, অবশ্য তার সংগে আছে মনস্তত্ব বিশ্লেষণ করে চরিত্র ফোটানোর একটা মরমী মন—তার বেশী কিছু নয়। স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় সমসাময়িক সময়ের দারিদ্র্য, হতাশা এবং মুল্যবোধের পতনশীলতার ওপর কাহিনী নির্মাণ করেছেন। পাত্রপাত্রীদের মধ্যে থেকে

একটা সুস্থ জীবন বোধ ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে। ডজন ডজন উপন্যাস লেখক শক্তিপদ রাজগুরু শোবার ঘরে বা মেয়েস্কুলের ষ্টাফরুমে ম্যাটিনি আইডল ছাড়া কিছুই হতে পারেন নি। আর তথাকথিত তান্ত্রিক লেখক 'অবধূত' ধর্মক্ষেত্রকে ঘিনঘিনে যৌনক্ষেত্র বানিয়ে মানুষের কামকে সুড়সুড়ি দিয়েছেন— নিজে পেয়েছেন অর্থ। সৌভাগ্য যে, এই শ্রেণীর লেখকের তন্ত্র সাধনায় বাংলা সাহিত্য মোক্ষ লাভ করে নি, যেমন বেকসুর খালাস পায় নি নীহার রঞ্জন গুপ্ত-র হাতে বা ইন্টারন্যাশনাল হয় নি চানক্য সেন-এর কল্যাণে। আসলে, সাম্প্রতিক লেখকদের দাদাস্থানীয় রচনাকাররা এমন কিছু জবরদস্ত সৃষ্টি করেন নি যা কিনা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে পারে, এমন কিছু লেখেন নি যা যুগাভিজ্ঞতাবাহী অনুজ গল্পকারদের অতিজটিল জীবনযাপনকে শিল্প করে তোলার প্রাথমিক প্রেরণা বা মডেল হতে পারে। এ সব লেখকদের মধ্যে 'কল্লোল' সময়ে গড়া রীতি, আঙ্গিক, ঐতিহ্য ভেঙে বেরিয়ে আসার চেষ্টা কিছুমাত্র পরিলক্ষিত হয় নি, কিম্বা তাঁরা নিজেরাও কোনো সাহিত্যিক ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে পারেন নি। নানা দিকে মনঃক্ষেপন হয়েছে বটে, কিন্তু বড় গলায় বলার মতো কিছু হয় নি। এঁরা মূলত কল্লোলীয় ঐতিহ্য ভাঙিয়েই আসর জমিয়েছেন। প্রগতিপন্থী লেখকদের বাঁধাধরা গৎ, ছকে বাঁধা জীবন-যন্ত্রণা বিন্যাস ও সব রাস্তা রোমে যাওয়ার মতন প্রায় সব কাহিনীর ময়দানমুখী সমাপ্তি একটা একঘেয়েমি এনে দিয়েছে। প্রগতি-শীল তরুণ লেখকরাও সে-পথ ধরে মিছিলময়দান-সর্বস্ব রচনায় বিস্বাদ অনুভব করেছেন। বলতে গেলে, ধূল-পরিমাণ ব্যতিক্রম ছাড়া এ পর্বের বয়োজ্যেষ্ঠ প্রায় সমস্ত লেখকের কাছ থেকেই বাংলা সাহিত্যের প্রত্যাশা চূড়ান্ত ঘা খেয়েছে। বহু বিক্রয়ের প্রত্যাশায় এঁরা ছোট গল্পকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে বড় গল্প, বড় গল্পকে বাড়িয়ে উপন্যাস করেছেন, এবং যেনতেন প্রকারে একটা কিছু খাড়া করে— বহু পাঠকের কাছে 'নাম' ছড়ানোর জন্যে - এন্তার মাসিকে-ত্রৈমাসিকে উপন্যাস গল্প এমন কি কবিতাও ছাপিয়ে গেছেন।

এ পর্বের দু'জন লেখক সম্পর্কে, গত অধ্যায়ে আলোচনা করা হোলেও, কিছু বিশেষ কথা বলার আছে। বিমল কর এঁদের একজন, অন্যজন সমরেশ বসু। বিমল করের ওপরে বাংলা সাহিত্যের প্রত্যাশা ছিলো প্রচুর। তাঁর স্ব-সময়ের তিন স্তর 'দেওয়াল', তথা মধ্যবিত্ত সমাজ ধ্বসে পড়ার কান্না এবং সেই পতন ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা ও ব্যর্থ হওয়ার ঘটনা তিনি যেমন সত্যসন্ধ চোখে দেখেছিলেন, তেমনি জোড়ালো ভাবেই বিবৃত করেছিলেন তা। সৎ শিল্পীর মতোই উপস্থিত

করেছিলেন 'গ্রহণ' উপন্যাস। কিন্তু হাল আমলের রচনায় তিনি সে প্রত্যাশাকে চুরমার করে, মানুষের বাস্তব অস্তিত্বের অনুসন্ধিৎসা স্তব্ধ করে তার ব্যক্তিত্বের সীমা অব্দি মুছে ফেলে 'ইন্টারনাল স্টোরী' উপস্থাপনে সচেষ্ট হয়েছেন। 'খড়কুটো' 'বালিকা বধূ' প্রভৃতি রচনার বিষয় কল্পনা অভিনব সন্দেহ নেই কিন্তু তা জীবনসত্য আবিষ্কার না-হয়ে বিমূর্ত মানুষের বিচ্ছিন্নতা বোধে বিমর্ষ দার্শনিকতার পরিচয় দিয়েছে মাত্র। চরিত্রগুলোর কোথাও এই চিত্তবিশৃঙ্খল সমাজের কোনো ছাট লেগেছে বলে মনে হয় না। ভাষার পরিশীলিত প্রকাশ এবং সুনির্বাচিত পরিস্থিতির মধ্যে বিশেষ মানসিকতার একটি মানুষকে উপস্থিত করে তার আবহ রচনা যদি বা কখনো অনুভূতিকে নাড়া দেয়, তা খণ্ডিত বাস্তবেরই অসমাপ্ত প্রত্যয় সঞ্জাত। এ সব রচনায় উপদ্রুত বাংলার প্রত্যক্ষ কোনো আবেদন নেই। মানুষের আন্তর স্বরূপ উদঘাটনের সর্তভঙ্গ করে এক ধরনের মিষ্টি প্রেমের মেজাজে বুঁদ হয়ে প্রাণ স্পন্দন ও গতি রহিত চরিত্রের অবতারণা করে, বালিকা ও বালকের প্রেমবোধ নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন আর গল্পের পরিমণ্ডলের মধ্যেই বদ্ধ হয়ে থেকেছেন। তবে নিজে এগোতে গররাজী থাকলেও, সম্ভবতঃ নিজের সামর্থের সীমা ডিঙোতে না চেয়েই, ছোটগল্প এবং উপন্যাসের নতুন রীতি গঠনের তাগিদ তিনি অনুভব করেছিলেন এবং তরুণ লেখকদের পৃষ্ঠপোষকতা করে তাঁদের নিজেদের সাবালকত্ব অর্জনের আন্দোলনে নিজেকে সামিল করেছিলেন। আর এ জন্যেই তরুণ সাহিত্য আন্দোলনের ইতিহাসে তিনিই প্রথম উচ্চার্য লেখক। এও ইদানিং ভয়াবহ পারিপার্শ্বিকে 'জননী' গল্পের লেখক বিমল করের আগ্রহ জেগেছে—হয়তো যুগ সমস্যাকে গভীর ভাবে ভাবতেও চেয়েছেন তবু রোয়াকী মস্তানদের নিয়ে লেখা 'যদুবংশ' তেমন কিছু দাঁড়ায় নি ; এ গ্রন্থে সম্ভবত তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে পাপই বিগ্রহ হয়ে উঠেছে এবং 'যদুবংশ'-এ প্রজাত হয়েছে 'লোহার বাটি'। এবার পতন। বিকৃতি, তরুণ তরুণীদের যৌনাসক্তির বাড়াবাড়ি ও অরাজকতার বাস্তব পরিবেশটা দেখাতে চেয়েছেন বিমল কর। জানি না তিনি সমরেশ বসুর 'প্রজাপতি' কেলেঙ্কারীতে উৎসাহিত হয়েছেন কিনা। তাঁর 'যদুবংশ'এর চরিত্রগুলোকে প্রায়ই বানানো বলে মনে হয়েছে। চরিত্রদের তিনি চরিত্রানুযায়ী বিকশিত হতে দেন নি—। ভাষাও কৃত্রিম। ভাষা দেখে রকের ছেলেরা সম্ভবত হাসাহাসি করেছে—ভেবেছে সাহিত্যিকদের সাহায্যার্থে তারা একটা অভিধান সংকলন প্রকাশ করবে। সে দিক থেকে সমরেশ বসুর ভাষা চোস্ত।

সেখানেও অবশ্য কৃত্রিমতা—খানিকটা কষ্ট কল্পনা আছে। সমরেশ বসুর ভাষাটা প্রায়ই এ সব বইতে খিস্তি হয়ে উঠেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক লেখকদের সৃষ্ট চরিত্র তাদেরই নিজেদের বাস্তব জীবন। ভাষা সেই জীবন জ্বালার প্রকাশ। 'যদুবংশ' গ্রন্থেও লক্ষণীয় হয়ে আছে বিমল করের স্বভাব—তাঁর চিরবস্তু তল্লাসী মানসতা। এখানেও তিনি তাঁর আপন লক্ষ্য ও সীমা ডিঙোতে চান নি।

বিমল কর যে কারণে নিজ সামর্থের সীমা ডিঙোতে চান নি, ঠিক তার বিপরীত কারণেই সমরেশ বসু এ পর্বের মধ্যে উচ্চারিত হচ্ছেন। আপন অভিজ্ঞতার যে বিপুল ঐশ্বর্য নিয়ে সমরেশ বসু সাহিত্য ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছিলেন, সাহিত্যিক সততা বজায় রাখতে পারলে তাই খাটিয়ে হয়ত সিদ্ধিতেও পৌঁছোতে পারতেন। কিন্তু সে পথ পরিত্যাগ করে সস্তায় বাজিমাৎ করতে আদাজল খাওয়া পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। যৌন ইৎরামিতে বরাবরই তাঁর উৎসাহ ছিলো, ছিলো রোমহর্ষক ও পাপ প্রলুব্ধ চরিত্রে আকর্ষণ এবং একটা এ্যাডভেঞ্চারইজ্‌ম্। এই সঙ্গে সাহিত্য জীবনের প্রথমেই সৃষ্টি করে নিয়েছিলেন একটা বাউল বাউল রোমান্টিক ও সেন্টিমেণ্টাল নায়ক (শরৎচন্দ্রের সমস্ত উপন্যাসের নায়কের যেমন শ্রীকান্ত-র ঢং চাল চলন চরিত্র ও স্বভাব এবং মুদ্রাদোষ)। বি. টি. রোডের ধারে, জি. টি. রোডের ধারে, কারখানা বস্তিতে, গঙ্গার পাড়ে মাতাল স্মাগলারদের মধ্যে, ডালহৌসির অফিস পাড়ায়, রকে সর্বত্র সেই একটি মাত্র চরিত্রই যাত্রাদলের নায়কের মতো পোষাক পালটে পালটে ফিরছে। সে প্রায় সব ক্ষেত্রেই যেমন একটু আধটু পাপ বোধে ভুগেছে বা একটু আধটু ঈশ্বর খোঁজাখুঁজি করেছে, তেমনি জীবনটা যে শেষাবধি অনিত্য এ ভাবনাও সমরেশ বসু তার মগজে বসিয়ে দিয়েছেন। প্রথম প্রথম, যতক্ষণ নিজের পুঁজি ভাঙাচ্ছিলেন বেশ-ই মনে হয়েছিলো—না, ভালোই লাগতো। কিন্তু বর্তমানের রচনাগুলো তাঁর অর্জিত জীবন বোধের ফসল নয়। বরং বদহজম। এগুলোকে রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজের বললেই বেশ মানায়। কিন্তু উপন্যাস বললেই আপত্তি ওঠে। আগে দেখানো ফরমুলায় গেঁথে তোলা কাহিনীটিকে যতদূর সম্ভব উত্তেজক করে তুলে পাঠককে সুড়সুড়ি দেবার পরিকল্পিত চেষ্টায় সমরেশ বসু এতই মত্ত হয়ে উঠেছেন যে, নিজের সাহিত্য ধর্ম পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছেন। আবিষ্কার তল্লাস ইত্যাদি বর্জন করে নিছক সংকলক হয়ে উঠেছেন, তাঁর সাম্প্রতিক উপন্যাসগুলোতে চোখ বুলিয়ে অনেকেরই একদল সাম্প্রতিক-অতিসাম্প্রতিক কবি ও গল্পকারের গোষ্ঠীগত আন্দোলন এবং বিক্ষিপ্ত রচনাগুলোর কথা বারবার মনে হয়েছে। প্রশ্ন জেগেছে,

নতুন কি পরিবেশন করলেন সমরেশ বসু? ডস্টয়েভ্স্কি সাত্রে´ নয়—তাঁদের সাধনা সাফল্য এবং ধ্রুপদীত্ব কোনো বাঙালী লেখকের সঙ্গে আদৌ তুলনীয় নয়—সমরেশ বসুর সাম্প্রতিক উপন্যাসগুলো পড়ে স্বাভাবিক ভাবেই লিট্‌ল ম্যাগাজিন পাঠকের মনে হতে বাধ্য যে, এই অতিগ্রন্থগুলোতে উপস্থিত বাক্য রাজি, অত্যন্ত সক্ষম ভাবে উপস্থাপিত এবং জীবন নিঙড়ে অর্জিত ও উচ্চারিত সাম্প্রতিকতম সাহিত্যিকদের বাক্যের চয়ন মাত্র। কি ভাষায়, কি বিষয়বস্তুতে আর কি উপস্থাপনের কায়দায়—সব দিক থেকেই সমরেশ বসু উৎকট ভাবে তরুণদের লেখালেখি থেকে যথেচ্ছ গ্রহণ করে নিজেকে মৌলিক বিষয়ের আবিষ্কারক হিসেবে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু লেখকের বিশিষ্ট জীবন দৃষ্টি-- ওয়ার্‌ল্ড আউটলুক—থেকে লেখা না হলে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির ভেতরকার ফাঁকটাই বড় হয়ে ধরা পড়ে। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। সমরেশ বসুর সাম্প্রতিকতম লেখালেখির প্রায় কোনোটিই একটা সমগ্র ভাবনার এফেক্ট সৃষ্টি করতে পারে নি। তা ছাড়া, সমরেশ বসুর হাঁক ডাক তোলা কয়েকটি বই পড়তে পড়তে খুব কম ক্ষেত্রেই সমরেশ বসুকে মনে পড়েছে—অর্থাৎ এসব বইতে সমরেশ বসুর অ্যাটিচিউডের বদলে প্রায় সর্বত্র ভেসে উঠেছে এক-জোয়ার তরুণ অতিতরুণ লেখক কবির লেখালেখির ভাব ভঙ্গিমা বিষয় অভিজ্ঞতা (একই সময় পরিবেশে লালিত পাশাপাশি লিখে চলা লেখকদের মধ্যে যে মিল তা আর এর মধ্যেকার মিল এক কথা নয়)। কিছু উদাহরণ দিলেই পাঠক মিলিয়ে দেখতে পারবেন যে 'বিবর' থেকে 'পাতক' অব্দি সমরেশ বসু আসলে ১৯৪৯ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত লেখা তরুণ কবি গল্পকারদের রসদ-গুলোকে খাপছাড়া ভাবে সাজিয়ে এক একখানা উপন্যাস করে তুলেছেন :

১।...'সমসাময়িক / নগরে, বৃষ্টির দিনে, নরনারী পুত্রার্থে ধেয়ায় / দোতলার লাল মেজে হাঁটুতে বিস্তৃত করে বল, / অভ্যাস বশতঃ মদ্যপান হয় রতিক্রীড়া শেষে / ...হায় / বেশ্যার নিকট গিয়া বলিল না, সম্ভ্রম উঠাও / দেখি হে তদ্‌বির-ভরা দেহখানি; কিম্বা কম্যুনিষ্ট- / পার্টিতে যোগ দিলে পাবে পুরুষানুক্রম যজমানি।' (ক্ষুৎকাতর, যৌনকাতর নয়—শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

২। 'ভগবান একটা উদ্‌বৃত্ত তহবিল। কারণ ব্যাপারটা ভূমিষ্ঠই হয় নি। ঈশ্বর শব্দটি তানপুরায় টোকার মত গম্ভীর। আমার মাঝে মাঝে ঈশ্বর বলতে, ভগবান বাবু বলে চেঁচাতে, জীবন মশাই বলে ধমকাতে ইচ্ছা করে। এই শব্দগুলি আবিষ্কার করেছি। কিন্তু আমার আবিষ্কার কোনোদিন শরীর নেয় না।

যা নেই আমি তাই আবিষ্কার করি। আমি চতুর; এখনও চালাকি করছি, নিজের সঙ্গে করছি।.....আছে সেই বিচিত্র উপলব্ধি, যা তাকে ক্লান্ত করে। কিছু আগে এতটুক আলো, অস্পষ্ট শব্দেও তার স্নায়ু উত্তক্ত হচ্ছিল। আর এখন, এবং এই মুহূর্তে, জগদীশ্বরের দুনিয়ায় বিরাট নিস্তরঙ্গ শান্তি তাকে ঈর্ষায়, বিতৃষ্ণায় অস্থির করেছে। তার ঘেন্না জাগছে। যেখানে ঈশ্বর নেই, সুধাময় নেই, সুধা নেই—সেখানে ঘেন্না জাগে।' (চর্যাপদের হরিণী—দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

৩। (কামে উন্মত্ত হয়ে প্যারালাইজড পিতার প্রেমিকা নার্সের প্রতি কামার্ত পুত্র) 'সুব্রত মুখ এগিয়ে আনল। শান্তা মাথা সরিয়ে নিল / শান্তা চল আমার সঙ্গে।. বিশ্রি বিশ্রি লাগছে অণুকে। একতাল কাদা পোজ যেন আমায় নোংরা করে দেয়।..দপদপ করতে থাকে সুব্রতর কপালের দুপাশ। চোখের কোল ফুলে উঠেছে, গালের পেশী শক্ত / দূরে—দাদুর দিকে তাকিয়ে শান্তা বলল 'আমার এখনো অনেক কাজ বাকি আছে।' / ও বুড়োর জন্যে আবার কাজ কি! / বাঃ খাওয়াতে হবে না।, খুব দরদ দেখছি যে। খেতে একটু দেরী হলে মরে যাবে না, বুড়োর জান ভীষণ কড়া। / উনি তোমার বাবা। / সুব্রত গোটা শরীরে এমন ভঙ্গি করল যেন বলতে চায়, সে আবার কি? শান্তা মুখ টিপে হাসল।' (টুপু কখন আসবে—মতি নন্দী)

৪। 'নষ্ট শশা, পচা চাল কুমড়োর মতো এই মেয়েমানুষের শরীরটাকে যে পুরুষটি সব চেয়ে বেশী দাম দিয়েছিল ভয় ভক্তি শ্রদ্ধায় সে মানুষটার পায়ে মাথা মুড়িয়ে দিয়েছিলো মেয়েটি।..নীল আলো ঘরের ভেতরে। দেখে চিৎকার ক'রে উঠলাম। ঘৃণায়, লজ্জায়, আতঙ্কে ছিটকে বেরিয়ে এলাম। দুটো জীবন্ত প্রাণী। অনেকটা কোনার্কের সূর্য মন্দিরের গায়ে খোদাই করা রতি দৃশ্যের ভঙ্গিতে একটি পুরুষ এবং একটি নারী।..আমি সেই মুহূর্তে চিনে নিলাম। একটি স্বাস্থ্যবান বৃদ্ধ পুরুষ। আমি কি আমাকেই দেখলাম? (কোন এক লেখক বন্ধুকে—অমলেন্দু চক্রবর্তী)

৫। 'অফিসের ছুটি হয়ে গেছে। রামাধার সেলাম করল। দু-তিনটে ফাঁকা হল পেরিয়ে বিজন ঢুকল বড়বাবুর ঘরে। বড়বাবু নিঃশব্দে তার হাতে ভারি ও মোটা পার্সোনাল ফাইলটা তুলে দিলেন। বিজন ওলটাতে ওলটাতে দেখল তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ফাইলে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এটা আবার জি. এম-এর কাছে সই হবার জন্যে যাবে।—অফিসে এতদিন ধরে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

হয়েছে অথচ সে তা জানতে পারে নি। (বিজনের রক্তমাংস—সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়)

৬। 'সেদিন কি আব আছে! আর আসবেও না। আমি এখন মেয়ে তৈরীর নিয়ম জানি।' (অনিলের পতুল—শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়)

৭। 'তাছাড়া ছাখো, জীবনে কিছুটা স্থিরতা বা নিশ্চয়তা পাওয়ার মধ্যেই কি জীবনের সব পাওয়া লুকিয়ে আছে? তা' হলেই কি তুমি সুখী হ'তে পারো? সুখ ঠিক ওভাবে পাওয়া যায় না। জীবনে টিকে থাকার জন্য তোমাকে প্রতিদিন সংগ্রাম করতে হয় আর সুখ যা পাও সেটা তোমার উপরি পাওনা। সুখ চাই, সুখ চাই বলে, সারাজীবন কেঁদে মরলেও, সুখ তুমি পেতে পার না।...এক হিসেবে অনিন্দ ওরা কিন্তু বেশ সুখী। দৈনিক সকালে কাগজ পড়ে, দুপুরে অফিসে থাকে, আর বিকেলে আড্ডায় এসে নাটক কিংবা রাজনীতি সিনেমা, আজকের আবহাওয়া সব কিছু নিয়েই বিতর্ক করে। অথবা তাসের আড্ডায় সময় কাটায়,—আজ আর একটু হলেই বিধান রায়ের আকস্মিক মৃত্যু নিয়ে যথারীতি শোক প্রকাশ করে দিতো,—বাঙলাদেশ আজ কাণ্ডারী শূন্য হ'লো, ...এই অবস্থায়, আমি যদি হঠাৎ মরে যাই, মেয়েটা বুঝতেও পারবে না। তারপর এক সময় অনুভব করবে আমার সমস্ত শরীর অসার আর ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, এবং নিজের মুখে গরম রক্তের স্পর্শ অনুভব করে, মেয়েটা আতঙ্কে শিউরে উঠবে।..কৌশিক অস্থিরভাবে ওর বুকে মুখ ঘসতে থাকলো। (আবর্ত —আশিস ঘোষ)

৮। 'প্রকাশ যে ফনি বোস এ পর্যন্ত বিশ বৎসরে চারজন স্ত্রীর সহিত বসবাস করেছে। সংখ্যাটি পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয় এই কারণে যে, যে ফটিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (বর্তমান বয়স সত্তর) এই সংখ্যা জানিয়েছেন, (তিনি বরাবরই ফনি বোসের প্রতিবেশী) তাঁর চোখেরও দেখার কিছু গোলমাল থাকতে পারে। কেন না ফনি বোস তার কোন স্ত্রীকে কোন সময় বাইরে আসতে দেয় না। এবং স্ত্রী সর্বদা ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকে। আইন ও ধর্ম উভয় কর্তৃকই অসিদ্ধ ফনি বোসের এই গৃহস্থ জীবনে অন্তঃপুর সম্পর্কে সে বুঝি কিছু 'সততা' রক্ষা করে।' (একটি উপকথার নায়ক—দেবেশ রায়)

৯। 'সেই স্পর্শকাতরতাও তোমার আর নেই। তুমি অনুভব কর তুমি কখনো বিধর্মী, কখনো তুমি ধর্মদ্রোহী—তাই তোমার মধ্যস্থ অলৌকিক এখন তোমার ভিতরে মাঝে মাঝে ত্রাসের সঞ্চার করে। আর তোমার যা আছে—

তোমার ধর্মহীন ক্রিয়াকাণ্ড, বোধ ও প্রবৃত্তি—এ সবই তোমার কাছে তুচ্ছ। আপাদমস্তক তুমি তোমার কাছেই গুরুত্বহীন ও সামঞ্জস্যশূন্য। সুতরাং বিপদে কে তোমাকে রক্ষা করে, একাকিত্বে কে তোমাকে সঙ্গ দেয়? আবার তোমার বিশ্বাস এই যে তুমি স্পষ্টতই এক ধারাবাহিকতার সূত্রে গ্রথিত আছ—তুমি প্রকৃত। তুমি অনেকের দ্বারা রক্ষিত, তুমিই আবার অনেকের রক্ষাকারী। (ক্রীড়াভূমি—শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়)

১০। 'প্রধান লম্পটের মত উদাসীন স্বরে নিশানাথ বলে, 'দশ'।...এরপর নিশানাথ অবুঝের মতো টের পায় কমলার গা থেকে আগুনের হলকা উঠছে; মদের গন্ধ ভাপের মত ক্রমশ ঘরের বাতাস দূষিত ক'রে স্তম্ভের মত উঠে যায়। কমলার দৃষ্টি স্থির নিস্তব্ধ মনে হলে পর বোঝা যায় সে নিশানাথের দিকে তাকিয়ে নেই, কোন কিছুর দিকেই তাকিয়ে নেই, মুখের হাঁ যথাসম্ভব প্রসারিত করে দম বন্ধ হওয়ার মত ক্রমাগত বাতাস শোষণ ক'রে যাচ্ছে। তার সমস্ত অবয়বে সুনিশ্চিত অবহেলা প্রকাশিত হয় বলে নিশানাথ ক্রোধান্বিত হয়ে ওঠে, কমলার চুল থেকে পানের গন্ধ আসে বলে নিশানাথের তাকে পুরাতন বহু ব্যবহৃত বোধ হয় ও ঘনিষ্ট ভাবে শ্বাস নিতে গিয়ে সে ন্যাপথলিনের গন্ধ পায়। (সন্দিগ্ধ শবযাত্রী—শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়)

১১। '...খাঁটি / অন্ধকারে স্ত্রীলোকের খুব মধ্যে ডুব দিয়ে দেখেছি দেশলাই জ্বেলে---/(ও গাঁয়ে আমার কোনো ঘরবাড়ি নেই।) /...আমি শোবার ঘরে নিজের দুই হাত পেরেকে / বিঁধে দেখতে চেয়েছিলাম যীশুর.কষ্ট খুব বেশী ছিল কিনা; / আমি ফুলের পাশে ফুল হয়ে ফুটে দেখেছি, তাকে ভালবাসতে পারি না। / আমি কপাল থেকে ঘামের মতন মুছে নিয়েছি পিতামহের নাম, / আমি শ্মশানে গিয়ে মরে যাবার বদলে, মাইরি, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ...... পাপ ও দুঃখের কথা ছাড়া আর এই অবেলায় / কিছুই মনে পড়ে না। আমার পূজা ও নারী হত্যার ভিতরে / বেজে ওঠে সাইরেন। নিজের দু' হাত যখন নিজেদের ইচ্ছে মতো কাজ করে / তখন মনে হয় ওরা সত্যিকারের।' (আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)

১২। '...তুমি কার, তুমি কার, তুমি কা..র? / এ ভাবে চীৎকার করছে মানুষের থেকে ন্যূনতম মেয়েমানুষেও / ...ন্যায্য ও অন্যায্যভাবে কুটতর্ক করছে তাপ তমসার আকাশের বাতাসের স্বাধীনতার অধিকার নিয়ে/ তোমায় আজিকে তার হতে হবে / কিছুটা বাবার প্রতি হতে হবে / কিছুটা পত্নীর প্রতি হতে হবে/

কিছুটা পাঠশালার প্রতি হতে হবে / কিছুটা কংগ্রেসের প্রতি হতে হবে / কিছুটা কম্যুনিষ্টের প্রতি হতে হবে / এভাবে অনেক হওয়া যোগ করে তার থেকে সুদে / আমানতী কারবার ফাঁদা যাবে'। (বিদায়বেলা—শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

১৩। 'প্রত্যেক দম্পতি পরস্পরকে ঘৃণা করে, এমনকি আগোচরে উভয়ের মৃত্যু কামনা করে। মিলন অর্থই অভিযোজন। ..এই বাধ্যত সমর্পণের অন্তরালে স্বাধীন চৈতন্য অবিরত বিদ্রোহ ঘোষণা করছে সে তার মৌলিক চরিত্রে ফিরে যেতে চায়।' (স্বগত সংলাপ - আলোক সরকার)

১৪। 'অথচ আমার নীচে চিৎ চোখবোঁজা অবস্থায় / আরামগ্রহণকারিনী শুভাকে দেখে ভীষণ কষ্ট হয়েছে আমার / এরকম অসহায় চেহারা ফুটিয়েও নারী বিশ্বাসঘাতিনী হয় / ...ঘরের প্রত্যেকটা দেয়ালে মামুখী আয়না লাগিয়ে আমি দেখেছি / কয়েকটা ন্যাংটো মলয়কে ছেড়ে দিয়ে তার আত্ম প্রতিষ্ঠিত খেয়োখেয়ি .' (প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার মলয় রায়চৌধুরী)

১৫। 'দক্ষিণেশ্বর শিবমন্দিরের ভিতরে গিয়ে গলায় আঁচল জড়িয়ে বিগ্রহের সামনে নত হবার সময়ই সহসা তার বিশাল পাছার উত্থান আমি দেখি, তার জঙ্ঘা ও কুন্তল ও স্তন ও নিতম্ব ও গ্রীবা মুহূর্তে একাকার হয়ে যায়, তার জঙ্ঘা-কুন্তলস্তননিতম্বগ্রীবা ও আমার ধর্মাধর্ম-বোধের বিপুল ধাক্কা ও উপর্যুপরি ফাটার শব্দে আমার শরীরময় সমস্ত জীবন বিধ্বস্ত হতে থাকে, তার জঙ্ঘা ও তার কুন্তল ও আমার ধর্ম ও আমার অধর্ম ও তার স্তন ও তার নিতম্ব ও আমার যৌনবোধ ও তার গ্রীবা—আমার এতদিনের এই সব আমার চোখের সামনে একাকার হয়ে যেতে দেখে নতজানু হয়ে ভেঙে পড়ে তার বিস্তীর্ণ শ্রোণী আমি দু'-হাতে জড়িয়ে ধরি ..আমাদের প্রগাঢ় যৌনচুম্বন তাকে টেনে তোলে, ঠোঁট ছিঁড়ে ছাড়িয়ে নিয়ে আমার বুকে সেও উপর্যুপরি চুম্বন করতে থাকে, তার জঙ্ঘা কুন্তল স্তন নিতম্ব ও গ্রীবা আমার বুকের উপর সমূলে ভাঙতে থাকে। .পুলিশে পিছু নিয়েছিল বলে মন্দিরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে চুম্বন করা ঠিক কি হয়েছিল ? ঠিক হয়নি, ঠিক হয়নি, ঠিক হয়নি। পাপ হয়েছিল। ..জীবনে নারীসংক্রান্ত সমস্ত দাবী ছেড়ে দেব কি করে ? (আত্মবিজ্ঞপ্তি—কৃত্তিবাস—সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়)

১৬। 'মেয়েদের ঘাড়ে দাঁত ফুটিয়ে আমি কোন শান্তি পাচ্ছি না, ঘুমুচ্ছি জড়িয়ে ধরছি, পাথরের মত মসৃণ পাছা, একেবারে ফ্রেস্কোর মত, চুপচাপ অবস্থার মধ্যে মিউজিয়ামে তলিয়ে থাকতে পারি, আশ্চর্য।'...'আমার রক্তের মধ্যে ঘাপটি মেরে আছে, আমার পাশবিকতার সাক্ষী, ভুলতে পারছে না আমার

হাজার নপুংসকতা ও চুরুটে আসক্তি, জুয়া খেলতে খেলতে হঠাৎ বমি করে ফেলা ও তার পরিণতি, অজানতে আমার নখের সঙ্গে তার সর্বশেষ যোগাযোগ ঘটে যায় .' (প্রদীপ চৌধুরী)

১৭। 'নিজের পায়ে হেঁটে নিজের ক্রুশে চড়ার নাম জীবন' 'মানুষই মানুষকে শেখাচ্ছে খুন আর সেবা করার কায়দা কানুন / অথচ, আমি সুস্থতা চাই / কেননা, আমার বেঁচে থাকার মানে আমি জানতে চাই / স্বাধীনতা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিপদ। (শৈলেশ্বর ঘোষ)

১৮। 'এরপর রোড এভিনিউ ছুটতে সুরু করবে, যাবতীয়, লেন বাইলেন গলি বো রাস্তা রোড মিলে তৈরী হবে মোটে কয়েকটা রোড, সেই কয়েক রোড মিলে তৈরী হবে মোটে একটি রোড, সে ছাড়া আর কেউ-ই থাকবে না ; এরপর বাড়ি ছোট বড়, বস্তি, একতলা দোতালা ছুটতে সুরু করবে, যাবতীয় বাড়ি মিলে তৈরী হবে মোটে একটি স্কাইস্ক্রেপার, সে ছাড়া আর কেউ ই থাকবে না।... রোগা পাতলা খাটো, আণ্ডার ক্যালোরী, আণ্ডারস্ট্রেংথ, লাল কালো যাবতীয় মানুষ দিয়ে তৈরী হবে মোটে কজন মানুষ, সেই কজন দিয়ে তৈরী হবে শুধু একজন মানুষ, সে ছাড়া আর কেউ-ই থাকবে না।' (রেড রোড সুভাষ ঘোষ)

সম্ভবতঃ সমরেশ বসুর হৈ হৈ তোলা বইগুলোর মুখ্য বিষয়গুলোর প্রায় সব কোটেশনই এখানে উদ্ধার করা হোলো। সহৃদয় পাঠককে শুধু একটু কষ্ট করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সাজিয়ে নিতে হবে এবং বাল্যকালের বিদ্যালয় ল্যাভেটরিতে দেখা ইচিরমিচির হাতের লেখায় কাঠ পেনসিলে দাগানো উত্তেজক ও বালক বালিকার যৌন বোধ প্রদাহের জ্বালায় বিবৃত শব্দগুলো মিশেল দিয়ে নিতে হবে মাত্র। আর 'বিবর' পড়তে নিতান্তই যদি অক্ষম পাঠক তবুও হয়, এখানে তার সুবিধার্থে বাসুদেব দাশগুপ্ত-র 'বসন্তোৎসব' গল্পের স্কিমটি তুলে দেয়া যাচ্ছে ঃ

একদিন ভোরবেলা ঘুমন্ত নায়ক স্বপ্ন দেখে যে, উলঙ্গ শরীরে নায়িকা তাকে গিলতে আসছে। ঘুম ভেঙে যাবার পর কামার্ত নায়ক নায়িকার কাছে ছুটে যায়। গিয়ে দেখে নায়িকার ঘরের তালা খুলে অবিকল তারই মতো একজন লোক নায়িকার সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত রয়েছে। তার পরেও নায়ক তার সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত হয়। মনিকা, অর্থাৎ নায়িকাকে যখন সে আন্তরিক ভাবেই আদর করতে থাকে তখন দেখতে পায় তার মুখে মৃদু চাপা হাসি। এরপর নায়ক তাকে খুন করে......"একটু বাদে দুই হাতে আলতো করে ওর গলা চেপে ধরি।...অল্প অল্প চাপ দি।...নিজের জিভটা কেমন শুকনো শুকনো মনে হয়। ..ঘড়ির টিক

টিক শব্দ ছাড়া ঘরে বাইরে আর কোন সাড়া নেই।...এমনকি নিজের নিঃশ্বাস পতনের আওয়াজটুকুও পর্যন্ত আমি শুনতে পাইনে।...এক সময় মনিকা 'উঃ' বলে আর্তনাদ করে উঠলে সঙ্গে সঙ্গে আমি ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি।... চৌকিতে একটা শব্দ ওঠে মচাৎ, মনিকাকে উল্টে ফেলে দুই হাঁটু গেড়ে আমি ওর পিঠের ওপর চেপে বসি—কোন এক সম্রাটের মতো নতজানু ভঙ্গিতে। প্রচণ্ড শক্তিতে বালিশের মধ্যে ঠেসে ধরি মনিকার মুখ।......ঘরের মাঝখানে আমি দাঁড়িয়ে ছিলুম। মনিকার দিকে তাকালে মনে হয়, ও বালিশে মুখ ডুবিয়ে শুয়ে আছে। দেহের সামান্য স্পন্দনটুকুও নেই। কেমন শান্ত আর নিস্তব্ধ এই ঘর—মনিকা আর আমি। বিছানায় ছড়িয়ে পড়েছে ওর কালো এলোচুল। কালো চুলের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় ওর ফরসা ঘাড় আর পিঠের অংশ। গোটা উলঙ্গ শরীর দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে পড়ে আছে। দুই হাত আর পা দিয়ে বুঝি প্রাণপণে বিছানাটাকে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করেছিলো। বাঁ হাতের তীক্ষ্ণ সুচোলো নখ ঢুকে গেছে বিছানার তোষকে। গায়ের লেপটা পড়ে আছে মেঝেতে। মনিকার মুখ দেখা যায় না।" এটুকুকেই 'বিবর' মেরামতী দিতে সমরেশ বসুর লাখখানেক ইতর শব্দ লেগেছে। আহা ল্যাণ্ডমার্ক! কত যৌন উত্তেজক বাক্যরাজিতে, নগ্ন শরীরের ফেনিল বিস্তারেই না সমরেশ বসু এ প্রকাশ করেছেন! এর মধ্যে থেকে কোনো মমত্বই প্রকাশ করেন নি নিহতের প্রতি। কোন পাপবোধই প্রকাশ পায় নি। অথচ বাসুদেব দাশগুপ্তর লেখায় ফুটে ওঠে: "বিছানার কাছে এগিয়ে গিয়ে চুমো খাই, ফিস ফিস করে ডাকি— 'মনি, মনি আমার! আমার ডাকে মনিকা কোন সাড়া দেয় না। শুধু ওর শরীরের চির পরিচিত ঘ্রাণ আমার দেহের ভিতর প্রবেশ করে।...পিছন ফিরে তাকিয়ে ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় (সমরেশ বসু এ আয়নাটিকেও সরাতে পারেন নি!) আমার মুখ আমি দেখতে পাই। ভয়ানক রোগা লাগে নিজেকে। চোখ বসে গিয়েছে।" ইত্যাদি ইত্যাদি। এর পর অত্যন্ত পরিশীলিত ভাবে পলায়ন। পলায়ন মনিকার কাছে লেখা চিঠির প্যাকেট নিয়ে। তারপর নায়ক এক বন্ধুকে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করে। অবশেষে হাতের রক্ত মুছে এমন এক উৎসবের আবহাওয়ায় হারিয়ে যায় যেখানে কচি কচি শিশুদের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে ফেলে। ছোটরা সুর করে গান গায় 'আমরা চলি আলোকে'। ছোট্ট মেয়ে তাকে ফুল উপহার দেয়। আর ফুলের গহনা পরা পরী তাকে ডাকে, 'এসো তুমি। আমাদের কাছে এসো'। মনে হয় নায়ক যেন নরক থেকে

স্বর্গের দিকে না গিয়ে জীবনের দিকে পায়ে হেঁটে চলে গিয়েছে। প্রেমিকাকে খুন বা বন্ধুকে ব্ল্যাকমেল করার জন্যে নায়কের কোনো অনুতাপ নেই। সে আগেই জানিয়েছে অবিকল তারই মতো একটি লোক নায়িকার সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত থেকেছে। তা সত্ত্বেও চূড়ান্ত ভাবে সে অ্যাডজাষ্ট করার চেষ্টা পেয়েছে। পারে নি। তাই এ নিষ্ঠুরতা। এবং এখানে ঘটেছে নির্মম সাম্প্রতিক বাস্তবের সত্য উদ্‌ঘাটন। আর পাপবোধ বলা হয়েছে 'তিনিই আমাদের পথ দেখাবেন' এমন একটা বাক্যের মধ্যে গল্পটির শেষ হয়েছে বলে। কিন্তু সমরেশ বসু দেবস্থান থেকে পুলিশের কাছে ন্যাকামি করতে নায়ককে বাউল বানিয়ে নিয়ে এসেছেন এবং দু বছর বাদে শিশু কেঁদেছেন, 'প্রজাপতি'র পিছেধারী এবং ইজের ছেঁড়াছেঁড়ি। একটা চূড়ান্ত অসৎ সাহিত্যিক চরিত্র উপস্থিত করে ভয়াবহ আবহ সৃষ্টি করলেও তা সাহিত্য হিসেবে আমাদের কাছে কিছুমাত্র আবেদন রাখছে না। তাঁর এই সাহিত্যিক অসাধুতা এবং দায়িত্বহীন যৌনকেচ্ছাচারের উদ্‌গার 'বৃহৎ লালমূলা' সম্বলিত বটতলার গুপ্তি পুস্তক বলেই মনে হওয়া স্বাভাবিক। তাঁর ইদানিংকার রচনায় রক্তক্ষরণজাত স্বকীয় অভিজ্ঞতার চিহ্ন নেই—নেই আবিষ্কার। সাহিত্যজীবনের ভিত্তিমূলে সততা থাকলে অবশ্যই সংগ্রাম করার মনোবৃত্তিটুকু তিনি হারাতেন না এবং তাঁর চরিত্ররাও শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম করতো।

তাছাড়া 'প্রজাপতি'তে সুখেনের স্বগত সংলাপ 'আমি কেন এই পৃথিবীতে —আমি নিজের ইচ্ছায় পৃথিবীতে আসিনি।...আমার একদম আসার ইচ্ছা ছিল না।...আমি কি জন্যে পৃথিবীতে এসেছি, আমার কী-ই-বা করবার আছে, আমি বুঝতেই পারছি না নিজেকে নিয়ে কী করব।—আমি ইচ্ছা করে পৃথিবীতে আসিনি, অথচ স্‌সাহ্‌ বেঁচে থাকাটা আমার দায়,—। তখন আমার মনে হয়েছিল, গলায় দড়ি দিই, কিন্তু সেটা দিতে পারছিলাম না বলেই তো গোলমাল লাগছিল, কারণ আমি ইচ্ছা করে মরতেও পারছিলাম না।'—এর একমাত্র 'স্‌সাহ' শব্দটিই সমরেশ বসুর নিজস্ব। বাদবাকি শব্দ এবং বোধ—সাম্প্রতিক অস্তিত্বের সমস্যা—সবটাই তরুণ কবি-গল্পকারদের হাতে বহু ব্যবহৃত হয়ে ডাস্টবিনের মাল হয়ে উঠেছে। নতুন তাৎপর্য দিতে পারলে অবশ্য এ ভাবনাও নতুন স্বাদ দিতে পারতো। কিন্তু সমরেশ বসু শুধু কোটেশান মার্ক ছাড়া এগুলোকে সুখেনের গায়ে আঠা দিয়ে সেঁটে দিয়েছেন বললে কিছু বেশি বলা হবে না। (এই সমরেশ বসুই ১৯৬৯এ কি প্রক্রিয়ায় 'মানুষ' হয়ে উঠলেন এবং তারও পরে 'মানুষ রতন' তা দেখবো আমরা এ গ্রন্থের পরিশিষ্টে।)

শুধু সমরেশ বসু কেন, বয়স্ক বুদ্ধদেব বসুও এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। তাঁর 'পাতাল থেকে আলাপ' পড়তে পড়তে মতি নন্দীর 'টুপু কখন আসবে' গল্পটি যাঁর পড়া আছে, তাঁর সে কথা মনে পড়তে বাধ্য। প্রায় সমরেশী পদ্ধতিতে মতি নন্দীর পঙ্গু প্যারালাইজড মানুষটিকে বুদ্ধদেব বসু ক্যানসার রোগগ্রস্ত সিনেমা নায়ক করে বেমাত্রা যৌনাচারের ইতিহাস লিখে লেখকের স্বাধীনতা হেঁকেছেন মাত্র। 'পাতাল থেকে আলাপ'এ নতুনত্ব বলতে যা কিছু তা সিনেমা লাইনের খবরাখবর। রাজীব নায়ক ছিলো—তার লুপ লাইনের ক্লেদ কলতানি আলোকে এনে বুদ্ধদেব বসু আধুনিক পাপের চিত্র ফোটাতে চেয়েছেন বুঝি সিনেমার জন্যেই। অথচ মতি নন্দীর রচনাটি সামান্য পরিসরের মধ্যেই তীব্র জীবনার্তির প্রকাশ দেখিয়েছে—দেখিয়েছে পিতা-পুত্রের একই নায়িকার সঙ্গে কামবাসা ; পাপে গ্লানিতে যন্ত্রণায় ক্ষোভে অথর্ব নায়ক তবু আশ্রয় ও শুদ্ধতা খুঁজেছে শিশুর কাছে—চেয়েছে উদ্ধার, সে নতুন মানুষ হয়ে দাঁড়াতে এবং অথর্বতা ও শারীরিক অক্ষমতাকেও পরাস্ত করতে শেষ বারের মতো সংগ্রাম করেছে।

* * * *

তরুণ সাহিত্যকর্ম কতদূর কি হয়েছে না-হয়েছে সে সম্পর্কে শেষ কথা বলে দেবার সময় আসে নি—বলাও যায় না। সাম্প্রতিক সাহিত্যিকদের এ কেবল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় পর্ব। এই সব লেখকদের বেশিরভাগ রচনা পত্র পত্রিকার পাতায় নিজ নিজ পরীক্ষানিরীক্ষার সাক্ষী হয়ে পড়ে রয়েছে। কুল্যে এক আধটা করে চটি বইও হয়তো বের করেছেন এঁরা এবং বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে বিনি পয়সায় বিলি করেছেন, দু-চারটে বিক্রি হলেও হয়েছে। তবে এই সব লেখালেখিই বুঝিয়েছে, জীবনের জন্যে, লেখার জন্যে, অতিদ্রুত পরিবর্তনশীল পরিবেশে কোনো একটা আবিষ্কৃত সত্যের পরমুহূর্তে বুদ্‌বুদ পরিণাম। এঁদের অসহায়তা সীমাহীন। এই সব লেখকেরা নিজেদের অস্তিত্বেই অস্থিরতা অনুভব করেন--ভুল বিশ্বাসকে আবার বেঠিক জানার বেদনায় প্রতিক্ষণেই অস্বস্তিতে ভরে আছেন। জীবনের প্রতিকূলতার মারে এক-আধজন জিতলেও অনেকেই হেরে যাচ্ছেন। কেউ বা পরাজয়ের গ্লানিতে চীৎকার করছেন। এঁদের নায়ক 'গোপাল'—যে চাকরী খুইয়ে আত্মহত্যাই শ্রেয় সাব্যস্ত করে। কিন্তু সে আত্মহত্যা করে নি—সারা কোলকাতা চষে শেষবেলা ফাঁদে আটকা পড়ে মরতে বাধ্য হয়েছে। সাম্প্রতিক লেখকদের ম্যাচিয়োরিটি অর্থাৎ জ্ঞান ও ভয়াবহতার বিষগ্রস্ত অনুভূতিই নিজের ভেতরে নিজেকে গুটিয়ে আনার মনোবৃত্তি সৃষ্টি করেছে। এবং শৈশবকেই

শেষ সত্য জেনে অনেক লেখকই শিশু হয়ে থাকার রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। ফলে অনেককেই কেবল তাঁদের—নিজের একার কথা বলতে শামুকের খোলার মধ্যে থেকে ভয়ে ভয়ে নিজেকে বের করে এনে হিম-সংলাপ শোনাতে হয়েছে। পরিবেশ ও সামাজিক দস্যুতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে হেরে যাওয়া চেতনা হয়েছে আত্মহননেচ্ছু। কিন্তু এই জীবনকে শিল্পে রূপান্তরিত করতে এঁরা ভাষাকে করেছেন তেজী এবং ধারালো। প্রায় সব লেখকই সক্রোধে অক্ষমের কাছে শক্তি-শালী সংগ্রামের পরাজয়ের প্রতিবাদে দুর্মর হয়েছেন, দেখেছেন জটিল এ গোলক ধাঁধার সব কিছুকে খুঁটিয়ে—পাকে পাকে নিজেদের জড়িয়ে ফেলে। বুঝেছেন, কোথাও সরল নেই, সহজ নেই, সবই অস্পষ্ট। এই অস্পষ্টতাকে সত্যমূর্তি দিতে যে অন্য ভাষা নির্মাণ করতে হয়েছে, তা স্বাভাবিক ভাবেই মানিক তারাশঙ্করদের থেকে আলাদা। ভাষা যে আদতে সিম্বল, সে কথাটি সজ্ঞানে সামগ্রিকভাবে জেনেই তরুণ লেখকরা প্রচলিত সিম্বলকে 'ন্যাড়া রাজার চকচকে খাঁটিরুপোর টাকা'র মতই অচল জেনে পরিত্যাগ করে নতুন ভাষা-সিম্বল আবিষ্কার করে তা নিজেদের জটিল চিন্তা চেতনা-অনুভূতির বাহন করে নিয়েছেন। এঁদের স্ব ভাষা শারীরিক ইন্দ্রিয়ের মতোই সহজাত। অনুভূতিকে এঁরা দুঃসাহসিক তীক্ষ্ণ করে সমগ্র সত্তা দিয়ে অর্জন করতে চেয়েছেন। আর পৃথিবীর সর্বকৌণিক উপলব্ধিকে এবং বুদ্ধিকে প্রখর করে তাঁরা কোনো কিছুকেই শেষ-সত্য বলে মেনে নিতে অস্বীকার জানিয়েছেন। আজ এঁদের সমস্ত কিছুতেই সন্দেহ, সমস্ত ঘটনাতেই জিজ্ঞাসা এবং তৎসহ বিশ্বাস করার আপ্রাণ চেষ্টা। জীবনকে উপভোগ করার জন্যেই এঁরা জীবন উৎসর্গ করে নিজেদের অস্তিত্বের সঙ্গেই লড়াই জুড়েছেন।

এ সময়ের লেখকরা কেউ স্বপ্নোদ্ধারে বা বিস্ময়ের শেষ স্তর সন্ধানে লিপ্ত, কেউ বাস্তবকে বাস্তব হিসেবেই অপরিবর্তিত অবস্থায় উপস্থিত করে সত্য চেহারা দেখাতে ব্যস্ত। লেখক তাঁর ক্রোধপাপপুণ্য তথাকথিত অশ্লীলতা যাবতীয় সব কিছুকেই ক্রোধক্ষিপ্ত চেতনার অভিব্যক্তি দিয়ে উপস্থিত করে নিজের ব্যক্তিগত বাঁচার ছাপ তথা রক্তচিহ্ন লাঞ্ছিত শিল্প করে তুলেছেন। লেখক নিজে বাঁচতে চাইছেন, ভালোবাসতে চাইছেন, পাপ গ্লানি অসহায়ত্ব থেকে মুক্তি পেতে চাইছেন। যৌন সভ্যতা, বুর্জোয়া সভ্যতা থেকে মুক্ত হয়ে শৈশব শুদ্ধতায় অনন্ত ময়দানের মতো স্বাধীনতার 'অনন্ত নক্ষত্র বীথি' তলে আলোকের ঝর্ণাধারায় ধুয়ে যাওয়া সন্তানের উৎপন্ন চুলের 'পরে হাত রাখতে চাইছেন—এ জন্যে সংগ্রাম জন্ম-লেখকের শরীরে, বুকের ভেতরে যেমন আগুন। সংগ্রামের প্রকাশও

তরুণতর লেখকদের লেখায় ছিলো। যাঁদের প্রতি আজকের ভৎর্সনা, তাঁদের প্রায় সবাই-ই কমিউনিষ্ট ক্যাম্পে জড়ো হয়েছিলেন, লেখক-জীবনের পা রেখে-ছিলেন, 'পরিচয়', 'সাহিত্যপত্র' বা অন্যান্য প্রগতিশীল মাসিক ত্রৈমাসিকে। কিন্তু ভূমিকম্প হলে পাদপীঠও ধ্বসে পড়ে। এ জন্যে তরুণতর লেখকদের দোষারোপ করা যায় না। সাচ্চা লেখার সংগ্রাম যদি হঠকারী সংগ্রাম হয়ে থাকে তার জন্যে কে দায়ী তা অনুসন্ধান করা বাঞ্ছনীয়। কমিউনিষ্ট শিবির সেদিন সাহিত্যক্ষেত্রে এক বিপজ্জনক প্রোহিবিটিভ নীতি নিয়েছিলো। ফলে একে একে দূরে ছিটকে পড়েছিলেন তরুণ লেখকরা--কেউ প্রলোভনে, কেউ স্বাধীন নিঃশ্বাসের জন্যে। কিন্তু বাস্তব ভূমি যে প্রতিকূল তা বুঝতে খুব বেশি দেরী হয় নি তাঁদের। মার খেতে খেতে এক সময় কোনো রকম কাজ করতেই জেগেছে অনীহা, জেগেছে উপদ্রুত অভিশপ্ত পরিবেশ ত্যাগ করে চলে যাবার জন্যে আত্মহত্যার ইচ্ছা। ব্যক্তিগত কথাকেই তাঁরা সমস্তের কথা করে তুলতে কেবলমাত্র অস্তিত্বের সমস্যার কথাই বলেছেন। মানুষ হয়ে উঠেছে রক্তমাংসঅস্থিমজ্জাহীন কেবল বোধ; ভাষা হয়ে উঠেছে সাংকেতিক এবং দুর্ধর্ষ রকম নতুন। ফলে তোফা-থাকা পাঠকের কাছে তা হয়ে উঠেছে দুর্বোধ্য। মনে রাখতে হবে এঁরা কেউই বিচ্ছিন্ন নন—একই কাল পরিস্থিতির সূত্রে গ্রথিত স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের মালা। অ্যাংরী হাংরী হঠকারী যাঁরা তাঁদের সাধনাও নতুন ভবিষ্যতের জন্যে—প্রত্যেকের আইডেনটিটি বজায় রাখার জন্যে। কাল পরিণতিই মহৎ চৈতন্যকে সুস্থতার দিকে নিয়ে যাবে জেনে যা হয়েছে তাকেই স্বীকার করে নিতে হবে—এ সব লেখাকেই সাহিত্য নিয়তির অমোঘ টানের ফলশ্রুতি মনে করে মমত্বময় অধিকার দিতে হবে। কেননা, আর কিছু না হোক এর মধ্যে থেকেই সাম্প্রতিকতার সত্যমূর্ত্তি প্রকাশিত। সুর আছে শুদ্ধতা আছে ক্রোধ আছে চীৎকার আছে অস্পষ্টতা আছে হঠকারিতা আছে পুরোনো সব কিছুকে ভাঙার দুঃসাহসিক অভিযান আছে। ভাষা স্বতন্ত্র—কখনো প্রলাপের মতো কখনো প্রচলিত অর্থের সঙ্গে মেলে না কখনো ঘিনঘিনে কখনো আপাতক্লান্তিকর কখনো অজানা, কখনো শীৎকার কখনো শিহরণ কখনো নাহংস·নির্জীব রক্তহীন কখনো বা ছোরা বিঁধিয়ে দেওয়া রক্তের হল্কা। সব মিলিয়েই সাম্প্রতিক সাহিত্য। পাণিনির সঙ্গে মিল না থাকলে আশ্চর্য হলে চলবে না, বিশ্বনাথ হাডসনদের সঙ্গে মিল না দেখে বিস্মিত হওয়া ভুল। ইংরেজী বাংলা সংস্কৃত অর্ধতৎসম তদ্ভব বিদেশি দেশি সব অলঙ্কার ব্যাকরণ রসশাস্ত্রের প্রচলিত মান্ধাতাসংস্কার ভেঙেই

এর আত্মপ্রকাশ। কোনো লেখকেরই গোটা শিল্প মূর্তির উপস্থিতি আশা করা বৃথা। দু-একজন ছাড়া প্রায় কেউই জাঁহাবাজ সম্পাদক পান নি, পান নি পাব্লিশার। অনেকে বন্ধুবান্ধবের ক্ষণস্থায়ী লিটল ম্যাগাজিনগুলোতে দু-একটা গল্প বা অর্ধসমাপ্ত উপন্যাস লিখে ঘরসংসার করতে লেগে পড়েছেন—সম্ভবত ঘাড় গুঁজে। অথচ এঁদের শক্তি এবং প্রয়াস দুর্ধর্ষ। উপস্থিতি প্রেমিকার সামনে জেলভাঙা হাতকড়া ছেঁড়া কয়েদীর মতো এবং ক্রোধে মমত্বে দিশাহারা চোখে জলছাপা শুদ্ধতার আলোক। আর অনুযোগ যে এ সমাজ তাকে সম্পূর্ণ অন্যায় ভাবে কয়েদী করেছে, সে কয়েদী হতে চায় নি। কয়েদী হতে বাধ্য করে কয়েদ দিয়েছে।

১৯৫০'র মাঝামাঝি থেকে 'দেশ', 'পরিচয়', 'নতুন সাহিত্য', 'অগ্রণী' প্রভৃতি পত্রপত্রিকার মাধ্যমে বাংলাগদ্যের বিশেষ করে ছোটগল্পের একটা নতুন ধারা সৃষ্টি করার চেষ্টা হতে থাকে। কয়েক বছর বাদে 'ছোটগল্প' নামে একটা পত্রিকা তরুণ ছোটগল্পকারদের মুখপত্র হয়ে আত্মপ্রকাশ করে এবং একটা আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। আর এই সময়েই বিমল কর সম্পাদিত 'ছোটগল্প নতুন রীতি' নামে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের 'বিজনের রক্তমাংস', মিহির গুপ্তর 'অনাম্য' দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জটায়ু', বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কালবেলা', জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'দুঃস্বপ্ন' প্রভৃতি পুস্তিকা এবং চিত্তরঞ্জন ঘোষ ও মৈত্রালী রায়চৌধুরী সম্পাদিত 'কথামালা' প্রকাশিত হয়। 'ফসল' প্রভৃতি পত্রিকা যেমন সমর্থন দিতে এগিয়ে আসে তেমনি এস্টাব্লিশমেন্টের মুখপত্র 'দেশ'-এ ছোটগল্প-গুলোর ওপর দুর্বোধ্যতার আঘাত হেনে বহু পাঠক পাঠিকার অভিমত অভিযোগ বাদ প্রতিবাদ প্রকাশিত হতে থাকে। 'ছোটগল্প' 'পরিচয়' প্রভৃতি পত্রিকাতেও এমনকি নতুন রীতির গল্পপুস্তিকাগুলোতেও ছোটগল্প সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয় বিমল কর সম্পাদিত 'এই দশকের গল্প' নামে তরুণ ছোটগল্পকারদের একটি সংকলন, যেটাকে একটা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের বাস্তব ফলন হিসেবেই গ্রহণ করতে হবে।

এ গ্রন্থের মধ্যে বিমল কর যে সব লেখকদের গল্প সন্নিবেশ করেছিলেন তাঁদের অনেকের লেখাই সাধারণ পর্যায়ের ওপরে উঠতে পারে নি। কারুর কারুর গল্প পড়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র, নরেন্দ্র মিত্র, বিমল কর বা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর কথা মনে পড়ে যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। এঁদের মধ্যে অনেকেই শুধু সুন্দর নিটোল গল্পই উপস্থিত করেছেন এবং নতুন ধারা বা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অর্জনের

আগেই অনেকের কলম থেমে গেছে। তবে, যা লিখেছেন এঁরা তা বাংলা ছোটগল্পে পুরোপুরি নতুন হিসেবে উল্লেখের দাবী যদি না-ও বা করতে পারে, প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কলম শানানোর গুরুত্বে এঁদের নাম অবশ্যই উল্লেখ্য। 'এই দশকের গল্প'য় যাঁদের লেখা সংগৃহীত হয়েছিলো তাঁরা হলেন অজয় দাশগুপ্ত (ফানুস), অমলেন্দু চক্রবর্তী (কোন এক লেখক বন্ধুকে), দিব্যেন্দু পালিত (দুঃসময়), দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (অশ্বমেধের ঘোড়া), দেবেশ রায় (দুপুর), প্রবোধবন্ধু অধিকারী (নকল নক্ষত্র), বরেন গঙ্গোপাধ্যায় (তোপ), মতি নন্দী (চোরা ঢেউ), যশোদাজীবন ভট্টাচার্য (প্ল্যাটফর্মের গল্প), রতন ভট্টাচার্য (পিঞ্জর), শংকর চট্টোপাধ্যায় (যৌবন), শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (আমার মেয়ের পুতুল), শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় (তুষার হরিণী), সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় (দশ বছর পরে একদিন), সোমনাথ ভট্টাচার্য (হাউই) এবং স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (জলপোকা)।

স্বাভাবিক ভাবেই এঁদের প্রত্যেকের মধ্যে থেকে একটা স্বাতন্ত্র্যের অঙ্কুরোদ্গম হয়েছিলো। কয়েকজনের মধ্যে তো দুর্ধর্ষ ক্ষমতার পরিচয়ই সম্প্রকাশিত। কিন্তু প্রত্যেকেই আলাদা চরিত্রের। সতর্ক অপকট তীক্ষ্ণধী-অন্তরঙ্গতা ; তত্ত্বাশ্রিত পরিবেশ তন্ময়তা ; বুদ্ধিপ্রধান নাগরিকী সংযম ও আন্তরিকতা, চিন্তা, মানবিক আদর্শকে অনাহত রাখার আকরিক বিশ্বাস ; অনুভূতিময়তা ; আত্মাস্তিত্বের উন্মোচন অগ্রাধিকার প্রবণতা, বাস্তব বিন্যাস ; স্বতস্ফূর্ত বিশ্বাস ; গোপনোদ্ধার পিপাসার স্বাভাবিক নৈরাশ্য বেদনা এবং সাবল্য ও আবেগ-প্রবণতার বিভিন্ন অভিব্যক্তি এঁদের গল্পগুলোয় দেখা গেছে। এঁদের অনেকেই সমকালে লিখছেন। কয়েকটি গল্প পাঠক চিরকাল স্মরণ রাখবে বলেই আমার বিশ্বাস। রতন ভট্টাচার্যের 'কৃষ্ণকীর্তন' ; সোমনাথ ভট্টাচার্যের 'প্লাবন', 'হাউই' ; অজয় দাশগুপ্তের 'আমার আত্মহত্যা' ; প্রবোধবন্ধু অধিকারীর 'নকল নক্ষত্র' ; দিব্যেন্দু পালিতের 'দুঃসময়', 'শীতগ্রীষ্মের স্মৃতি' ; যশোদাজীবন ভট্টাচার্যের 'মা', 'শবসাধনা' ; শংকর চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রিয়তোষের গোপন সফর' দুর্বার গতিতে পাঠককে গল্পের মধ্যে টেনে নিয়ে সুদূর বিস্তৃতিতে পৌঁছে দেয়। তবুও ঐ সময়েই ছোটগল্পে এঁদের চাইতে বিমল কর বা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী কি আঙ্গিকে কি বিষয়ে সমসাময়িক কালকে সঠিক ভাবে ধরতে পেরেছিলেন অনেক বেশী। বিমল করের 'এই দেহ অন্য মুখ', 'মানসাঙ্ক' বা জ্যোতিরীন্দ্র নন্দীর 'বনের রাজা', 'পঙ্গু', 'হিংসা' প্রভৃতি গল্প ঐ সময়েই আলোড়নকারী রচনা হয়ে উঠেছিলো।

এসময়ে যাঁরা নিজেদের শক্তি সামর্থের বলিষ্ঠ প্রকাশ নিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, মতি নন্দী, দেবেশ রায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় অস্থির যুগের মৌলিক চরিত্র ধরেই টান বসিয়েছিলেন। প্রেরণায় প্রবল এবং প্রাণবন্ত ভাষার গাঁথুনিতে রক্তআর্ত-অশ্রুবিষণ্ণ চরিত্র উদ্ধার করে বাংলা সাহিত্যে তাঁরা অবশ্য-অম্লান। বেশ আগে থেকে লিখতে সুরু করলেও কিছুকাল পরে যাঁর গল্পে একটা বলিষ্ঠ জীবন চেতনা এবং ভাষা আঙ্গিকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছে তিনি হলেন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। তার 'এক বর্ষার গল্প' বা 'হৃদয় একমাত্র বাহক' এ উক্তির সত্যতাই প্রমাণ করবে।

সুস্থ জীবন চেতনাই দেবেশ রায়ের লেখার মূল বৈশিষ্ট্য। পরিবেশ রচনায় এঁর দক্ষতা অসাধারণ। বস্তুবাদী চেতনা বিশ্বাস এবং বিরাট ক্যানভাস নিয়ে সুদক্ষ শিল্পীর বর্ণাবলেপনের মতো প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ রঙের আঁচড় দিয়ে তিনি গভীরে—বস্তু ও চরিত্রের উৎস সত্তায় নিয়ে যেতে চান পাঠককে। তাঁর রচনা যেন একটা পর্বত শ্রেণী। নানা ভাঁজ, সূর্যরং, বরফধারচাঁদ, জঙ্গল গুহা সবকিছু নিয়ে সসম্মানসম্রাট উপস্থিত। সমকালীন মধ্যবিত্ত সমাজ, ক্ষয়, অবক্ষয়, হতাশা, যন্ত্রণা ও পঙ্গুত্বকে তিনি নতুন আঙ্গিকে প্রকাশ করেছেন 'পা', 'স্মৃতিজীবী', 'দুপুর', 'আহ্নিক গতি ও মাঝখানের দরজা' প্রভৃতি গল্পে। পরবর্তী কালে আঙ্গিকের মাত্রাতিরিক্ত পরীক্ষানিরীক্ষার জন্যে কিনা জানিনা—এঁর গল্পের প্রাণশক্তি ও বিষয়ের যেন অভাব দেখা দিয়েছে। 'মর্ত্যের পা' গল্পে এক শিহরণ জাগানো বর্ণনা এবং বাস্তব মানুষের ভয়ঙ্কর উপস্থাপন বিস্ময়কর সন্দেহ নেই। তাঁর 'কলকাতা ও গোপাল' গল্পে যুগ-জরা এবং জীবনের অচরিতার্থতার বোঝা বয়ে অস্তিত্বের অবলোপকে তীব্র ব্যঞ্জনায় উপস্থিত করেছেন দেবেশ রায়:

****গোপাল যেন আবার কলকাতাকে যাচিয়ে নিতে চাইল। তাই চারপাশে চলমান মানুষের স্রোতে, সে, স্রোতের মাঝখানে হঠাৎ আটকে-যাওয়া কোনো কাঠের টুকরোর মতো স্থির হয়ে রইল, আর স্রোত তার গায়ে ধাক্কা দিতে লাগল। সমরের কাছে বিষের কথাটা বলবার জন্যে মানসিক প্রস্তুতি, মরীয়া হয়ে বলে ফেলা, চলন্ত ট্রাম থেকে লাফ দিয়ে নামা ও শেষে চিৎকার করে 'যাবো' বলা এ সব কিছুর একটা শারীরিক প্রভাব পড়ল তার ওপর, সে উত্তেজিত হল। আর সে কারণে সমরের ঘরে বসে ও সমরের সঙ্গে থাকার সময় যে একটু এড়িয়ে চলা ভাব জন্মেছিল, তা উধাও হয়ে গেল। যেখানে গোপাল দাঁড়িয়ে সেখানে ছায়া,

বিপরীত ফুটে রোদ, উত্তেজনা। সমুদ্রে জলস্তম্ভ মরণ আনে, মরুভূমিতে মরীচিকা —আর কলকাতায়, অপরাহ্নের কলকাতায় কয়েক ফুট দূরে রৌদ্র ঝলসিত কলকাতা গোপালকে কী কথা বলছে ?—এ প্রশ্নের উত্তর পাবার আগেই আরো একটা বিস্ময় গোপালকে আরো উত্তেজিত করে দিল—"এখনো, এখনো আমি মরবার বিষ জোগাড় করতে পারলাম না।" যেন বিষ জোগাড় করবার জন্যই সে চারপাশে একবার চাইল। .....সমরের প্রতিহিংসায় নাকি নিজেকে বড় ভাবার ইচ্ছায়—সমরও তার পেছনে, বেশ পেছনে, তাদের বাড়ি থেকে রওনা হয়েছে মরবার জন্য, সমরকেও মরতে হবে, তার আগে গোপালকে। কিন্তু কলকাতা তো ব্যক্তির। সমর তো ব্যক্তি। ..আমি মরব—কেননা, আমি কলকাতার নই, আমি পরিবারের। সমর মরবে। কেন, এ জবাবটার বদলে কিছুটা যেন অভিশাপ হয়ে গেল কথাটা।......ওভার ব্রিজ আর মাটির মাঝখানের শূন্যতার মধ্যে পড়ে যাবার ঠিক পূর্বের হ্রস্বতম মুহূর্তে সে ভেবেছিল—"আমার মরবার কোনো মানেই হয় না।" আর, বাক্যটা পুরোপুরি উচ্চারণ করতে পারার আগেই ইঞ্জিনের ধাক্কায় সে চাকার তলায় চলে গিয়েছিল।****

যেমন যুগ তারুণ্যের গভীর অনুভব, তেমনি নোকর সম্প্রদায়ের এবং সর্ববিশ্বাসহীন শামুক অস্তিত্ব নিয়ে রুটির জন্যেও যারা কাজ করতে অনিচ্ছুক, সেই সব লেখকদের থেকে দেবেশ রায়ের পার্থক্য রচনা করেছে তাঁর সুতীক্ষ্ণ জীবন বোধ ও সংগ্রামী চেতনা: 'জীবনের সিংহদ্বার ভেঙে-চুরে চুরমার, খান্‌খান্‌, ইঁটের সে ভগ্নস্তূপে 'জীবন' আজ প্রত্নের সংবাদ। মৃত্যু, মৃত্যু, মৃত্যু। খিড়কি দোরের সেই ওঁৎপাতা গুপ্তঘাতকের করদ রাজ্যে জন্ম তাই প্রত্যাখ্যাত, কেউ বাঁচবে না, জন্ম নিতে চায় না।'

দেবেশ রায়ের 'মর্ত্যের পা' গল্পে দেখি:

****হঠাৎ সেই উলঙ্গ নারীদের শোভাযাত্রা উঠে দাঁড়াল। তাদের কেউ একদিন, কেউ দশমাসের পোয়াতি। তাদের কারো নাভিতল উঁচু কিনা বোঝাই যায় না, কারো গর্ভ এতো স্ফীত যে মনে হয় সে গর্ভের ভারে এক্ষুনি হুমড়ি খেয়ে পড়বে। কারো কারো প্রসব বেদনা উঠেছে। তারা দাঁড়িয়ে উঠে দুই হাতে নিজেদের চুল ছিঁড়ছে। কোনো কোনো নারীর চোখের মণি প্রায় আড়ালে চলে গেছে। কারো কারো স্তন ঝুলে পড়েছে, কারো কারো দুধের বোঁটার পাশে ঘন ছাই রঙের ছোপ ধরেছে। আবার কারো কারো স্তনে দুধ এতো বেশি জমেছে যে ফোঁটা ফোঁটা দুধ তার ফোলা পেটের ওপর পড়ে গর্ভের

শিশুটিকে ঢেকে রাখা চামড়ার ওপর দিয়ে গড়িয়ে দুই উরুর মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল, যেন গর্ভের শিশুটি জন্মেই যাতে সাঁতার কাটতে পারে সেজন্য রমণী দুধ-নদী রচনা করেছে।......সেই অগণ্য অসংখ্য পেটমোটা নারীরা ধীরে ধীরে একটি মাত্র দেহ, একটি মাত্র চরিত্র হয়ে উঠেছিল।... ..তারপর সেই পেটমোটা ন্যাংটা পাহাড় দুনিয়ার সমস্ত অজাত শিশুকে গর্ভে ধারণ করে সিংহবাহিনী দুর্গার মতো নতুন অসুর বধ করতে চলল। ****

খুবই সুগভীর ও অন্তরঙ্গ দৃষ্টিতে জীবনের দূরতর বিস্তারকে অনুভব করেছেন দেবেশ রায়। অতিশয়তা নেই। প্রায় সব গল্পেই একটা প্রবন্ধের ঢং—যুক্তি তর্ক মেধা হৃদয় আর গভীরতর বোধের প্রকৃষ্টরূপে বন্ধন পাঠকের মনে নানা রসের বিচ্ছুরণ ঘটায়। কিন্তু তাঁর সাম্প্রতিকতম গল্পগুলো অনেক ক্ষেত্রেই খবরের কাগজের রিপোর্ট বলে মনে হয় কিম্বা আদালতী দলিল দস্তাবেজ। ভাষার জটিল রীতি ও সেন্টিমেন্টাল অসংযমী প্রকাশও তার গল্পকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। 'যযাতি' উপন্যাসেব চেয়েও 'সপ্তর্ষি' পত্রিকায় প্রকাশিত 'কালীয় দমন'এ তিনি সার্থকতা দেখাতে পেরেছেন বেশী। তাঁর 'অজুর রক্ত' গল্পটি আঙ্গিক রীতি কসরৎ ব্যাপারে একটু ন্যূন হবার জন্যেই যন্ত্রণাধর্ষিত মানুষকে সহজে উপস্থিত করতে পেরেছে। দেবেশ রায়ের সামর্থ্য অসাধাবণ, পাঠকের প্রত্যাশা তাঁর কাছে কম না।

'চোরা ঢেউ' দেখেই চেনা গিয়েছিলো মতি নন্দীকে। 'বেহুলার ভেলা' বা 'উৎসবের ছায়ায়' গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাগ ধরেছিলো বটে কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তিনি তা সারিয়ে তুলে একটা স্বকীয় রীতি আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'বাসা' গল্পটি অবশ্যই স্মরণ করতে হবে। এখনও তিনি লিখে চলেছেন। ভাষার শাণিত শক্তি, বিদ্রূপের তীক্ষ্ণতা এবং বিষয় উপস্থাপনের বিশেষ ধরণ এই সব নিয়ে মতি নন্দী সমসাময়িক লেখকদের অন্যতম যাঁর লেখায় বিষয় ও আঙ্গিকের একটা সুষ্ঠু সমন্বয় সম্ভব হয়েছে। তিনি যে ঢঙে শ্লেষ এবং বিদ্রূপের ব্যবহার করেন তা অন্যের লেখায় অনুপস্থিত।

অন্যান্য তরুণ লেখকদের মতোই মতি নন্দী মধ্যবিত্ত জীবনের দুর্জ্ঞেয় জগতের আন্তরাংশের বহুবিচিত্র অনুভূতিকে দক্ষতার সঙ্গে তুলে এনেছেন। নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের একটি অতি প্রিয়জনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রচিত বিশ্লেষণ-প্রধান গল্প 'স্তপের শীর্ষ'তে এ সময়ের ভয়াবহ নিঃসঙ্গতা ভাষা পেয়েছে :

****মরাটা কি ঠাট্টা? তাই যদি হয় তাহলে বাঁচাটাও কি তাই? ঠাট্টা

মানুষ ভুলে যায়। বাঁচাও কি ভোলে? তা হলে কি আমি বেঁচে নেই?..... চমকে উঠলো সন্তোষ। গাড়িটা একটা গর্তে পড়েছিল। ঝনঝন করে উঠেছে পেছনের বাক্সটা। তালু দিয়ে পিঠের টিনের পাতটা সে ছুঁল। কনকনে ঠাণ্ডা। এর মধ্যে একটা মড়া আছে। মড়াটা ঝাঁকুনিতে নিশ্চয় নড়ে উঠেছিল। এর মধ্যে ঠাট্টা কোথায়। মৃত্যুর অস্তিত্বই কি বুঝিয়ে দেয় জীবন আছে? চির জীবন কি মড়াটাকে পিছনে নিয়ে আমায় বুঝতে হবে যে বেঁচে আছি? [এর-পর শ্মশানভূমে দাঁড়িয়ে নায়কের নির্মম অনুভূতি, সন্তানের সঙ্গে লুকোচুরির মধ্যে থেকে মৃত্যু ও জীবনের সত্যোদ্ধারের চেষ্টা—সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মৃত স্ত্রী ও পুঁটুলি করা মৃত নবজাতক একটা সাংকেতিক জগতের দিকে পাঠককে টেনে নিয়ে যায়। রিক্ততা ও নিঃস্বতা বোধ নষ্ট করে দেয় জাগতিক জীবন উপভোগের ঈপ্সা। শুধু এই মৃত্যুসর্বস্ব বাস্তব অস্তিত্বের মধ্যে রিনরিন করে কাঁপতে থাকে:] মাটিতে সোঁদা গন্ধ। ঘাম জমেছে কপালে। আমি মরে যাচ্ছিলুম। আমি বেঁচে উঠেছি। এমনি ভাবে মাটি আঁকড়ে শুয়ে থাকতে ভালো লাগছে। এই মাটি কত যুগ আগে তৈরী হয়েছে? এই মুহূর্তগুলো অতীত হয়ে যাচ্ছে। মাটি মানুষের জন্ম মুহূর্তের সঙ্গে এক হয়ে যাচ্ছে। বিরাট অতীত আমায় ছুঁয়ে রয়েছে। আমি হারিয়ে যাচ্ছি। এতবড় অতীতের মধ্যে খুঁজে পাব কি করে? দাঁড়াব কোথায়?.....নাড়ুর মার চিতাটা বোধ হয় নিভে গেল। আমার মেঘ হতে ইচ্ছে করছে। সারা আকাশ জুড়ে থাকতে ইচ্ছে করছে।... ..সন্তোষ নিঃশব্দে কাঁদতে শুরু করল।****

চেতনা প্রবাহের মধ্যে থেকে আধুনিকতার অন্যতম লক্ষণ 'মৃত্যু চেতনা' একেবারে চাক্ষুষ রূপ নিয়েছে মতি নন্দীর দক্ষ উপস্থাপনে। তাঁর 'বস্তিনাথের সংসার' গল্পও মধ্যবিত্ত জীবনের ট্র্যাজিক সত্যকেই প্রকাশ করেছে। আর প্রথম জীবনের ব্যাভিচারী নায়ক প্যারালাইজড্ হয়ে কাম এবং যমের দোটানায় বেঁচে থাকার দুঃসহ স্বীকারোক্তি করেছে 'টুপু কখন আসবে' গল্পে। একই সঙ্গে শোক, দুঃখ, কাম, জ্বালা, ঈর্ষা, পাপবোধ আর সেই সঙ্গে শারীরিক অক্ষমতা সব মিলিয়ে একটা অনুভব শরীর নিয়ে পাঠকের সামনে উপস্থিত হয়েছে এ গল্পে, যার চতুর্দিকেই অন্ধকার আর সেই ঘন অন্ধকারের মধ্যে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মতো অগ্নিচক্ষু কুকুর 'লুলা'কে—নাকি ধর্মকেই নির্দয় মূর্ত্তিতে—প্রহরী রেখেছেন মতি নন্দী। ছোট গল্পের পরিসরেই আধুনিক মানুষের চিন্তা স্রোতকে তীব্রতা ও জীবন মৃত্যুর সুদূর প্রসারী ব্যঞ্জনা দিয়েছেন তিনি।

'ফেরারী' উপন্যাসের মধ্যে কিছুটা বিদেশী লেখকদের ছোঁয়াছিটা থাকলেও এবং এখনো মেধা থেকে কামু ও সার্ত্রে'র ওজন পুরোপুরি নামাতে না পারলেও একথা বলতেই হবে যে মতি নন্দীর 'দ্বাদশ ব্যক্তি' বাংলা উপন্যাসে একটা উল্লেখযোগ্য সংযোজন। কিন্তু এস্টাব্লিশমেন্ট যে কেমন করে একজন লেখকের লেখক সত্তাকে হত্যা করে, সম্ভবতঃ তার প্রমাণ দিয়েই মতি নন্দী প্রায় এক ক্ষমতার শহীদ। বাংলা গদ্য এই সতর্ক ও অকপট লেখকের ক্ষমতার বহুলাংশ নির্জীবত্বে হারিয়েছে অনেকখানি। তাঁর ক্ষমতা যে কতখানি ছিলো, এখনো, 'নায়কের প্রবেশ প্রস্থান'এর মধ্যে তার স্বাক্ষর। জয়রাম মিত্র লেনের অবক্ষয়ী অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যবিত্ত জীবন চূড়ান্ত ধ্বংসের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রামে মরতে মরতেও মরণটাকে একেবারে শেষ করে দিতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চায়—আর তাকেই ভাষাশিল্পে রূপ দিতে চেয়েছেন মতি নন্দী।

মানবতার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস ঐ সময়ের লেখকদের থেকে আলাদা ভাবে চিহ্নিত করেছে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তাঁর 'জটায়ু', 'চর্যাপদের হরিণী', 'নরকের প্রহরী' ইত্যাদি গল্প বিষয় ও আঙ্গিকে অভিনব। যে মানুষের শুধু বর্তমান পরিবেশ পরিমণ্ডলই সবটা নয়, অতীত আছে বা আছে ভবিষ্যৎ বিকাশ, সেই দ্বন্দ্বময় বিকাশের মানুষকেই উপস্থিত করেছেন দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'ভাসান'এর মধ্যেকার একটি বাক্যে প্রকৃতিকে যেমন তিনি দেখেছেন তেমনি ভয়ঙ্করস্রোত সাম্প্রতিক সময়কেও ফুটিয়ে তুলেছেন বললে অত্যুক্তি হবে না। "ডাঁসা বৌ তার পলকা ভাতারকে যেমন গিলে খায় তেমনি ম্যাঘনা সতীও চাইছে সবশুদ্ধ গ্রাস করতে।" সত্যিই তো এ এক প্রথম সত্য উচ্চারণ সাম্প্রতিক সময় সম্পর্কে। জীবনের স্বপ্নোত্তরণ আকাঙ্খার ফলশ্রুতি হিসেবে উপস্থিত হয়েছে তাঁর 'ঘাম', তিনি দেখেছেন 'নরকের প্রহরী'র আশপাশের "সবাই নিঃশ্বাস নেবার জন্যে আকুপাঁকু করছে"। বর্তমান সভ্যতার মর্মগভীরের অসম্মান ও স্বৈরী অত্যাচারের বিরুদ্ধে কর্তিত ডানা 'জটায়ু'র মত জীবনকে তিনি অনুভব করেছেন। প্রতীক চিন্তা করে গল্প ফাঁদেন নি, গল্পই সেই মহাকাব্যিক প্রতীকে দুর্নিবার টানে পৌঁছে গিয়েছে: "বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে। সব সময় কি একটা ষড়যন্ত্র চলছে। আমি জানি, আস্তে আস্তে এখানেও তার জাল ছড়াবে। আস্তে আস্তে এখানেও জাল ছড়াবে। আস্তে আস্তে ছড়াবে। আমি জড়িয়ে যাব।" এ উক্তি বিশ্বাত্মার দর্পণের স্পন্দন ছাড়া আর কি হতে পারে! তবু 'ফুল ফোটার গল্প'র নায়ক শুনেছিলো দৈববানীর মতো:

****বোলো সকলকে আমার মে দিবসের অভিনন্দন।......যুবকটি আচ্ছন্নের মতো বাইরে এল। সে ভুলে গিয়েছিল। এই দুর্গ, এই অত্যাচার, নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে এই উদাসীন মৌনতা তাকে সকালটার তাৎপর্য ভুলিয়ে দিয়েছিল।......যুবকটি এক নতুন উপলব্ধি নিয়ে ফিরল। শুধু ঔদাসীন্য বা নীরবতা নয়, বিশ্বাস। যাকে সে সান্ত্বনা দিতে, প্রেরণা দিতে গিয়েছিল—তার কাছ থেকে ইতিহাসের সমর্থন নিয়ে যুবক তার শহরে ফিরল।......যুবকটি মানুষকে মরতে দেখেছে—অসুখে, দুর্ঘটনায়, অত্যাচারে। শরীরের যন্ত্রণা সে দেখেছে—অসুখে, দুর্ঘটনায়, অত্যাচারে। কিন্তু তার সমস্ত স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার বাইরে যুবক-যন্ত্রণার নতুন এক চেহারা দেখল—যা নিছক জান্তব আর মর্মান্তিক। আর দেখল অবহেলা। [এই গল্পেই ঠিক মন্ত্রের মতো দীপেন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছেন যে ইচ্ছে করলেও তিনি সাধারণ হয়ে হেরে যেতে পারেন না। আর ইচ্ছে থাকলেও অভিমানে জীবন থেকে মুখ ফেরানো তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। ফলে দার্শনিকের মতো বলেছেন :] আর জীবনের প্রতি আমাদের অভিমান কত প্রবল। আর, জীবনের প্রতি আমাদের দাবী কত বেশি। আর, আদর্শের সঙ্গে বাস্তবতার যে কোন সংঘাতে আমরা কি সহজে হতাশ হই, বিষণ্ণ হই, একা হই। আর যে সত্যকে ধ্রুব বলে জেনেছিলাম, আজও জানি, তা ফুল হয়ে না ফুটলে কত তাড়াতাড়ি আমরা অধৈর্য হয়ে গোটা বসন্তকে অস্বীকার করি। নিজের কাছেই নিজে একটা সমস্যা হই।......অথচ বলেছিলাম বাঁচতে হবে। আর ফুল দিয়েছিলাম। হায়রে, তখন কি জানতাম সময়ের সঙ্গে লড়াই করতে করতে কোন অসতর্ক মুহূর্তে সময়েরই শিকার হয়ে যাচ্ছি? [বুঝি কালের—নতুন কালের ঠিকানাই এলো নায়কের হাতে ; এবং স্বগতোক্তি :] আমারও তো পালাবার পথ নেই। আমাকেও তো সমস্ত হতাশা, গ্লানি এবং নৈরাজ্যের ভেতরে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে। ..আমি একটি ফুল দেখলাম। ****

কিন্তু জাতীয় জীবন ফলবান হয় নি। সম্ভাবনা সম্পর্কে অধৈর্য হয়েই কি দীপেন্দ্রনাথ যন্ত্রণাকে রঙ দিয়ে ফুটিয়ে তোলার অঙ্গীকার ভঙ্গ করলেন? 'কাটা মুণ্ডু'র চোখে জঙ্গ দেখেছেন যিনি, তিনি কি নারকীয় পাশবিকতা মুক্ত জীবনের দিকদর্শন রচনায় স্তব্ধ থাকবেন? তাঁর 'স্টাডি'কে অয়েল পেন্টিং হিসেবে দেখার আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত রেখেই দীপেন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন কোনো লেখালেখি করছেন না। তাঁর 'গগন ঠাকুরের সিঁড়ি'ও একটি দুঃসাহসিক রচনা। আন্তর্জাতিক সময় এবং আধুনিক মানস চেতনা দীপেন্দ্রনাথকে সৃষ্টি বিলোপ কারী

ষড়যন্ত্র সম্পর্কে যেমন সচেতন রেখেছে তেমনি সংগ্রামে আস্থাশীল করেছে। এর ভিত্তিতে তাঁর মার্কসীয় তত্ত্ব বিশ্বাসই কার্যকর হয়েছে। কিন্তু নিজের বিশ্বাসকে তিনি প্রতীকের মধ্যেই ধরে রাখতে চেয়েছেন। প্রায় অধিকাংশ গল্পেই তিনি প্রতীকের ব্যবহার করেছেন বা প্রতীক তন্ময়তায় গল্পের বক্তব্যকে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এই প্রতীক-প্রীতিই তাকে শেষ পর্যন্ত স্তব্ধ করেছে। প্রতীকে জড়িয়ে পড়েই তা থেকে নিজেকে আর ছাড়িয়ে আনতে পারেন নি।

দীপেন্দ্রনাথের 'তৃতীয় ভুবন' তিন পৃথিবীর কথকতা—এক পৃথিবী অতীতের, একটি বর্ত্তমানের আর একটি পৃথিবী ভবিষ্যতের। উজ্জ্বলতম তীক্ষ্ণ ভাষায়, প্রথম শ্রেণীর গল্পকার আগামী পৃথিবীর নান্দীমুখ রচনা করেছেন কয়েক ঘণ্টার পরিসরে কাহিনী গড়ে। বিভিন্ন রঙে কয়েকটি আঁচড় কেটে তিনি অনেকগুলো চরিত্রকেই সুস্পষ্ট এবং সুগভীর দ্যোতনায় করে তুলেছেন। নায়িকা জয়তীর বাড়িস্কুলকলেজ-বিস্তারী সত্তাই লেখকের মুখ্য দৃষ্টি পেলেও পটভূমির প্রতিটি ব্যক্তিত্বকেই তাজা রঙে আঁকতে তিনি সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন সর্বক্ষণ। তবু একথা বলতেই হবে যে, প্রতীকের প্রতি তাঁর অতিমনস্কতা এ উপন্যাসেও সরাসরি কমিউনিকেশনের পক্ষে বাধার সৃষ্টি করেছে। নায়িকার মানস স্রোতের সমস্ত খুঁটিনাটির উপস্থাপনা বহুক্ষেত্রে অনর্থক মনে হয়েছে। কিন্তু বক্তব্যের গভীরতা সে ত্রুটিকে ধুয়ে দিয়েছে বললেই ঠিক বলা হবে। এসব লেখায় যে বোধ দীপেন্দ্রনাথ পরিবেশন করেছেন, তাকেই অতি বিশাল ক্যানভাসে কয়েকটি নিপুণ আঁচড় দিয়ে মহাকাব্যের দ্যোতনা এনেছেন তাঁর—বুঝি পরিব্যাপ্ত জোয়ারের শেষ মেজর লেখা—'উৎসর্গ'তে। আনবিক যুদ্ধ ও বীজাণু যুদ্ধের আশঙ্কার যুগে মানুষ, সবুজ ও কীটপতঙ্গের নিঃশেষে ছাই হয়ে যাবার মর্মান্তিক আশঙ্কাকেই আন্তর্জাতিক মানুষের একজন হয়েই উপস্থিত করেছেন শক্তিধর লেখক। খবরের কাগজের টুকরো টুকরো সংবাদের ওপর আলোকপাত করে গর্ভস্থ ভ্রূণ নিয়ে আতঙ্কিত মায়ের, বিশ্বমাতৃত্বের, চোখের সামনে তিনি মেলে ধরেছেন : " 'আর যুদ্ধ নয়' গ্রন্থে মার্কিন বৈজ্ঞানিক লিনাস পলিং বলেছেন, সম্ভাব্য আনবিক যুদ্ধের বলি অন্ততঃ আশি কোটি মানুষ। অর্থাৎ যুদ্ধের প্রথম ধাক্কাতেই এক তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আর যারা প্রাণে বাঁচবে তারা মরণাতীত যন্ত্রণা ভোগ করে ব্যধিগ্রস্ত শরীরে মনে মৃত্যুর অপেক্ষা করবে। তেজস্ক্রিয়ার স্পর্শ বাঁচাবার জন্যে মার্কিন দেশে ভূগর্ভে যে আশ্রয় শিবির স্থাপন করা হয়েছে—তার আশ্রয়প্রার্থীরা কবে যে আবার দিবালোকের স্পর্শ পাবে তা

অজানা। কারণ মাটি ও বাতাস সেই আনবিক যুদ্ধের ভস্মপাতে সম্পূর্ণ বিষিয়ে যাবে। আরশোলা, কেঁচো এবং কেন্নো জাতীয় কীটপতঙ্গ সেই বিধ্বস্ত পৃথিবী জুড়ে রাজত্ব করবে। আর কিছু মানুষ মৃত্তিকাগর্ভে গোপনে প্রাণ বাঁচাবে—সূর্য বাতাস ও বৃষ্টির স্পর্শবিহীন সেই জীবন প্রকৃতপক্ষে হবে আবশোলারই জীবন।" জঁা পল সাত্র্ প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য লেখকদের সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক স্থাপন করে জোলিও কুরি প্রমুখ বিজ্ঞানীদের সঙ্গে বোধের ঐক্য স্থাপন করে 'ভারতবর্ষের প্রতিনিধি' দীপেন্দ্রনাথ বললেন, "আর নয় এবার আমাদের প্রত্যক্ষ প্রতিরোধে অগ্রসর হতে হবে।'' বিশ্বের বিপুল যে পিতৃত্ব "তার সমগ্র অস্তিত্ব তখন উৎকর্ণ হয়ে আছে এক অজ্ঞাত শিশু কণ্ঠের আশ্চর্য ক্রন্দন শোনার জন্য।" দীপেন্দ্রনাথই বুঝি নায়ক অনিমেশ যে তার বই "সেই কান্নাকে উৎসর্গ করেছে।" আশ্চর্য ক্ষমতা নিয়ে এই লেখা হাজির করে দীপেন্দ্রনাথ প্রায় চুপ করে গেছেন। একেবারেই লেখেন নি কিছু। সম্ভবত বর্তমান সময় পরিবেশ ও মানুষের মধ্যে তিনি সেই বিশ্বাস এবং আস্থা খুঁজে পাচ্ছেন না যার জোরে 'অশ্বমেধের ঘোড়া'র লেখক জীবনের ও শিল্পের সেই অন্বিষ্ট জয় করে এনে দিতে পারেন, যা সত্যি-কারের 'তৃতীয় ভুবন'এর ফলবান বৃক্ষের দ্যোতনা নিয়ে আসবে এবং যা আক্ষেপ তুলবে না 'দর্পণ, বয়স বাড়ছে, প্রতিবিম্ব কিছুই ধরছে না', যার মধ্যে পাঠকও শুনতে পাবে 'টোরী', শুনতে পাবে 'অন্য ধ্বনি তরঙ্গ', পাবে 'অন্যগন্ধ' ; দেখবে 'অন্য রং' আর অনুভব করবে 'পৃথিবীটা উদ্যান। হরিণ এল, হরিণী এল।' দীপেন্দ্রনাথ লিখছেন না, কিন্তু আসন্ন সম্ভাবনাময় পৃথিবী কি গর্ভবতী নয়?

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় এ সময়ের মুষ্টিমেয় আশ্চর্য ক্ষমতাসম্পন্ন লেখকদের অন্যতম। প্রধান না, প্রাইমা ইন্টার প্যারিস। কবিতা বুঝি দু' একটা লিখেও থাকবেন, অর্থাৎ ভাব-ভাঙা পঙক্তি-সাজানো লেখা। না লিখলেও কিছু যায় আসে না—সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় কবিতার চেয়েও সূক্ষ্ম অনুভূতির ও ব্যাপ্তির গদ্য রচনা করেছেন। কবিতা ও গদ্যের মধ্যে নিজের রক্তধারা বইয়ে দিয়ে তিনি যে ভাষা শিল্প গড়ে তুলেছেন, তা গদ্যের পুরোনো ট্রাকচারটাই ভেঙে দিয়েছে। সমাজ ও আত্মসমীক্ষার তীক্ষ্ণ চিন্তা ও উপলব্ধি ধারণক্ষম এই ভাষাই তাঁর প্রথম সারির লেখক হিসেবে ছাড়পত্র। বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ঐতিহ্য থেকে আলাদা হয়ে একটা বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে সম্পূর্ণ নতুনত্ব নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন বলেই সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয় নন, স্বয়ংপূর্ণ ও একক—একক বিষয়বস্তুতে ও যুগপরিবেশকে সম্পূর্ণ চিনে ফেলতে পারার ক্ষমতায়। আমাদের

অনুভূতির জগতকে তিনি নিখুঁত ভাবে তুলে ধরতে পেরেছিলেন অবলীলাক্রমে। এই প্রথম বাংলা সাহিত্যে লেখক স্বয়ং সামগ্রিকভাবে উপস্থিত হয়েছেন আর সম্পূর্ণ একক উপলব্ধির কথাই অকপটে বলতে চেষ্টা করেছেন সমস্ত গল্পে। 'ক্রীতদাস ক্রীতদাসী'তে একই নায়ক বিজন তার পাপহীন গ্লানিহীন জীবনটা মহিলাকে ভালোবেসে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছে দ্বিধাহীন আক্রহীন কণ্ঠে এবং তার কথা লেখক গভীর আন্তরিকতায় ভরে তুলেছেন। মরা পৃথিবীর জীবনের গন্ধ লেগে আছে 'ক্রীতদাস ক্রীতদাসী'তে—প্রতিটি শব্দই কুঁদে কেটে তৈরী। তবু আঙ্গিকের জটিলতাজনিত ব্যর্থতা আছে 'ক্রীতদাস ক্রীতদাসী' গল্পটিতে। কিন্তু 'দশ বছর পরে একদিন' এবং 'বিজনের রক্তমাংস' বলিষ্ঠ হাতে বাংলা ছোটগল্পের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে।

গণিকাপল্লী বিহার আর যৌন তাড়না নিয়ে গল্প বাংলাদেশে নতুন নয়। 'অম্বাপালি' থেকে তা ভারতীয় সাহিত্যে ছিলোই। বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র তো সতী গণিকাদের নিয়ে পুরো একটা সাহিত্য বিপ্লব জাগিয়ে 'দেবী'দের মুখে ভালোবাসা ও নারীত্বের দাবী তুলে দেবদাসদের পুরো সেন্টিমেন্টাল নির্বোধ করে ছেড়েছিলেন। কিন্তু সাম্প্রতিক গল্পকারেরা প্রেমিকাদের মধ্যে নিজেদের প্রতিচ্ছাপ ফেলে হয়তো নিজেদের বিবাহ হারা যৌবনের প্রেমহীনতাকেই প্রত্যক্ষ করেন। কোনো অসত্য ভাষণ নেই, ভান নেই—অনুকরণও যে নেই তা এ গ্রন্থের শুরুতে বহুবার বলা হয়েছে। লেখক সরাসরি নিজের ব্যক্তিগত কথাবার্তা বলেন—অভিজ্ঞতার বাস্তবকে বানিয়ে বলেন না—সত্য করে বলেন। ন্যায়নীতি সমাজহিত এসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মেপে মেপে সাহিত্য করার মধ্যে থেকে অর্ধসত্যকেই উপস্থিত করা হয় জেনে সাম্প্রতিক লেখক নিজের অভিজ্ঞতার মধ্যে থেকে একটা মাত্র সাম্প্রতিক মানুষ চরিত্রকে, অর্থাৎ নিজেকেই—তারই মতো করে সাহিত্যে উপস্থিত করতে বদ্ধ পরিকর। আর সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় এই সাম্প্রতিকতার—সাম্প্রতিক চরিত্রের—নির্লজ্জ ও নির্ভিক ভাষ্যকার। এ সময়ের মেট্রোপলিটান বোধকে পুরোপুরি তিনিই আত্মসাৎ করেছেন এবং তার আক্রমণেই তিনি বিধ্বস্ত হয়ে সমস্ত রকম কাজ থেকে হয়ে পড়েছেন দূর—সাহিত্যও তাঁর কাছে একটা কাজ। এবং এ জন্যেই, তিনি যত না লিখেছেন, কিংবদন্তী হয়েছেন তাঁর চেয়ে ঢের বেশী।

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের 'ক্রীতদাস ক্রীতদাসী'র চার গল্পের নায়কই বিজন—বাংলাদেশ ভরা কোলকাতার সূক্ষ্ম অনুভূতি ও মেধাময় যুবক চরিত্র। পাপহীন

গ্লানিহীন জীবন বিজনের, তার বেঁচে থাকা প্রিয়তর—সে রমণীর কাছ থেকে চায় প্রেম এবং সরাসরি প্রেরণা। নিজেকে নিয়ে, নিজের কামনা বাসনা নিয়ে তার গবেষণার অন্ত নেই। যক্ষ্মারোগগ্রস্ত বিজন তার ইচ্ছে মতো বাঁচতে চেয়ে রক্তে অস্তিত্বে ধারণ করে আছে নিজের হত্যাকারীকে—ভালোবাসার অন্তরেও সে-ই নিষ্ঠুর খুনী। নিঃসঙ্গতাকেই নিয়তি করে সে শুধু ভুল স্বপ্ন দেখেছে, ভুল স্বপ্নও ভেঙে গেলে তার অস্তিত্ব এক অস্বস্তিতে ভরে উঠেছে। আন্তরিক আত্মভাষণের মধ্যে থেকে বিজন নিজেকে, তার ক্লান্তিকে উন্মোচিত করেছে। সাহিত্য তো আত্মোন্মোচনেরই নামান্তর—সে তো হৃদয়ের ও অস্তিত্বেরই দর্পণ। কোনো বক্তব্যকেই তিনি উপস্থিত করতে না চাইলেও সন্দীপনের বক্তব্যহীনতাই একটা বক্তব্য হয়ে উঠেছে। তাঁর 'সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বী' গল্পের শেষ অংশটুকু প্রত্যক্ষ বক্তব্যের থেকেও শক্তিশালী বললে অত্যুক্তি হয় না। তার ব্যঞ্জনা সুদূর প্রসারী। যে বালিকা নারী হয়ে উঠে নিজেকে প্রেমিকের হাতে সঁপে দিতে প্রস্তুত হচ্ছিল, তাকে পুরুষ কেন ধর্ষণ করলো? কেন 'কুঁড়ি' ভাঙলো? ফুল বা কাঁটা কোনোটিকেই ভালোবাসতে না পারার দুর্বলতাই এই পাশবিক অত্যাচারে উস্কানি দিয়েছে—এই কথাটিই লেখক বোঝাতে চেয়েছেন সম্ভবত। যৌন মিলনের আর্তি শীৎকার এ সব লেখালেখিতে খুবই আছে। আপাতদৃষ্টিতে তাই ই মনে হবে। কিন্তু একথা খুবই ঠিক যে, সন্দীপনের মেধার সঙ্গে লিঙ্গের কোনো যোগ নেই। এমনটি হাংরী গল্পকার বাসুদেব দাশগুপ্ত ছাড়া আর প্রায় কোনো লেখকের ক্ষেত্রেই ঘটে নি। সন্দীপনের ভাষার গায়ে গায়ে যে কান্না ও দুঃখের সুর জড়িয়ে আছে—সঙ্গীতময় হয়ে দেখা দিয়েছে যে স্বপ্ন—তাই-ই অজস্র মারের সাগরের মধ্যে একজন সৎ লেখকের বাঁচার অবলম্বন ও বিজনের রক্তমাংস—না সন্দীপনের রক্তমাংসের সৃষ্টি।

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের এ সব রচনার পাশে 'নলিনী শাটার নামিয়ে দেয়' গল্পটি পড়লে খুবই জোলো মনে হবে। দীর্ঘদিন তিনি লিখছিলেন না, কেন সেই পুরোনো বিষয় আশয়কে জলের মূল্যে বাজারে ছাড়তে এলেন। এ গল্পের মধ্যে ফ্যাণ্টাসী করে ভারতীয় মাইথলজিকাল ফিগার বামন-কে এনে তিনি পাপ ও দুঃখের পৃথিবীতে আর একটা পা রাখার জায়গা খুঁজেছেন :

****এর পরে নলিনীকে একটা বেঁটে বামন তাড়াতে দেখা যায়। নলিনীই ছাখে নলিনীকে তাড়াতে। প্রথমে সে ছাখে যে নলিনী ও বামন সিঁড়ির যে কোন বাঁকে চিরাচরিত ধারায় দাঁড়িয়ে—বামন মাথা উঁচু করে, নলিনীর মাথা নীচু—

তারা পরস্পরকে চাক্ষুষ দেখেছে। সে কে, নলিনী টের পেয়েছে বৈ কি, তাকে বলে দিতে হয় না। তার বুক একদম ঠাণ্ডা ও মাথা ধোঁয়ায় ভর্তি হয়ে যায়। তার নাককান ও চোখমুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে দেখা যায়। কিছুটা তফাতে দাঁড়িয়ে নলিনী ছাখে। সে বুঝতে পারে যে বামনের ও-রকম সামনে সম্পূর্ণ পরাস্ত সে (নলিনী) যা বলতে চায় তা হল ভয়ার্ত, 'একী! তুমি!' কিন্তু তার মুখে ভাষা জোগাচ্ছে না, এ কী সর্বনাশ হয়ে গেল নলিনীর, হায় সে ভাষা ভুলে গেছে বোঝা যায়। বামন এবার তার ডান-পা তোলে। নলিনী জানে এর মানে কি, এর মানে, 'কোথায় রাখব?' দূরে দাঁড়িয়ে থাকলেও নলিনী সব বুঝতে পারে। বামনের সামনে সে এখন চাইছে বেঁকে নিচু হয়ে যেতে, মাথা পেতে দিতে চাইছে, অথচ তার শরীর সটান চিমনির মত দাঁড়িয়ে আছে। সে নত হতে পারছে না। নলিনীর মাথা দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। তার সামনে বামন। বামন এক-পা তুলে দাঁড়িয়ে। তার মাথা উঁচু। যেন সে বলতে চায়, 'আর কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকব?' নলিনীও চায় মাথা পেতে দিতে। কিন্তু, ওহ্ হো, এ কী অদ্ভুত, তবু তার চোখে পলক পড়ে না। তার হাঁটু ভাঙে না। তফাতে দাঁড়িয়ে নলিনী ছাখে। এ জিনিশ দেখা যায় না। শাস্তির পরিমাণ দেখে বোঝে পাপ কত বেশি হয়েছিল। সহ্যের অতীত অ-বর্ণনীয় পীড়নের মধ্যে দিয়ে তার শরীর বেঁকে যেতে থাকে, তবু, বামনের-সামনে-নলিনীর যায় না।.....এ ভাবে সময় যায়। তারপর, সহসা, এক-সময়, যে-কোনো সময় "গেট-আউট!" অবিশ্বাস্য নিচু স্বরে বামনের সামনে দাঁড়িয়ে নলিনী বলে। যত নিচু গলায় বলে, বলেই তৎক্ষণাৎ পরে তত জোরে সে চিৎকার করে ওঠে, "আই স্যে গেট আউট!"****

একটা বিস্ফোরণ! আর, সব কিছু এবং সব আত্মীয় পর বন্ধু বান্ধবের জন্যে গেট চিরদিনের মতো বন্ধ হয়ে যেতে দেখেছে নায়ক—না লেখক। ত্রুটি থাকলেও, গল্পটিতে সাধা-কলমের ও দর্শনের স্বাক্ষরটুকু আছেই। একদিন সম্ভবতঃ, এরপর যা লিখবেন তা তাঁর পূর্ব রচনার ঐতিহ্যকে নষ্ট করে দেবে ভেবে সৎ লেখক অত্যন্ত সততার সঙ্গে লেখা বন্ধ করে দিয়েছিলেন, কিন্তু এখন লিখে বুঝিবা আবার পরখ করে দেখতে চাইছেন শিল্প মরে গেছে কিনা। তবে নিঃসন্দেহে সন্দীপন মোড় নিয়েছেন। নলিনীকে ঠিক কোথাও স্থাপন করা না গেলেও রাজমোহনকে বিজন-এরই এক যুগ পরে, নতুনতর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশে যা হওয়া উচিত তাই বলেই মনে হয়। অবশ্য দু'বারের* বেশি

*'নিদ্রিত রাজমোহন' এবং 'বিপ্লব ও রাজমোহন'

এখনো আমাদের রাজমোহনকে দেখা হয় নি, বলাও শক্ত যে তাকে অর্থাৎ ভিন্নতর সন্দীপনকে আমরা গোটা অবয়বে দেখতে পাবো কিনা।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রথম দিকে প্রতীক ধরণের কয়েকটি ক্ষমতার চিহ্নবহ গল্প লিখে পাঠকের প্রত্যাশা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। 'আমার মেয়ের পুতুল', 'ডুবুরী' প্রভৃতি গল্পে একটা ডুবো ভাবনা এবং অতি-অনুভূতির স্পর্শ পাঠককে তলিয়ে নিয়ে যায় আত্মভাবনার মধ্যে। তাঁর হালের রচনা আরও বেশী পরিণত এবং পরিশীলিত। প্রাত্যহিক জীবনের গ্লানি, জীবনের তথাকথিত সুখ শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যকে অতিক্রম করে অন্যতর কোনো কিছুর জন্যে প্রার্থনা, আমাদের প্রতি-দিনের চোখে দেখা জগৎটা যে সব নয়—এর বাইরেও যে একটা রহস্যময় জগৎ আছে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গল্পে তার উদঘাটন। সামান্য ঘটনার আঘাতেই নায়ক এই সব দূরবর্তী রহস্যের সামনে উপস্থিত হয়। তাঁর 'স্বপ্নের ভিতরে মৃত্যু', 'আত্মপ্রতিকৃতি', 'ক্রীড়াভূমি', 'সুখের আড়াল', 'তোমার উদ্দেশে', 'আমি সুমন' ইত্যাদি গল্পে তিনি এ কথাই বোঝাতে চেয়েছেন। গল্পগুলোতে প্রায়ই দেখা যায় একটা দার্শনিক ভঙ্গিমা। দুজ্ঞের্য়তার প্রতি তাঁর এক স্বাভাবিক ঝোঁক যেমন আছে তেমনি আছে একটা মিষ্টিক উপলব্ধি। তাই-ই তাঁকে স্পিরিচুয়াল ও ভাবমার্গী করে তুলেছে। গল্পে একটা অস্পষ্ট ছায়া-জগতের ক্রিয়াকাণ্ডের আভাস নিয়ে আসতেই শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহ :

****বুড়োটা হাঁফাচ্ছিল। দুটো চোখ খোলা। মৃণাল ওর হৃৎপিণ্ডের শব্দের মতো একটা ধুক ধুক শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। হাত বাড়িয়ে মাটির ওপর কি খুঁজছে লোকটা। মৃণাল অবাক হ'য়ে দেখল লোকটা অদ্ভুত ভাবে তার দিকে তাকিয়ে শুয়ে আছে।.....ছেলেটা কাঁদতে কাঁদতে দাঁড়িয়ে ওর দাদুকে দেখছিল। বুড়োটা কী যেন খুঁজছে, কিম্বা কিছু খুঁজছে কি? না, লোকটা যেন কাউকে বাধা দিতে চাইছে—এমন ভাবে, যেন কারা ওর অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে। কোমর থেকে টেনে নিচ্ছে তার তলোয়ার, কাঁধ থেকে টেনে নিচ্ছে ধনুক।.....তীব্র ভয়ের সঙ্গে মৃণালের মনে হল লোকটা ম'রে যাচ্ছে। তাকিয়ে দেখল ঘন জমাট অন্ধকার দিকশূন্য প্রকাণ্ড মাঠ, দূরে দূরে ঝুপসি ঝুপসি নিশ্চুপ গাছ—সব স্থির। কারা যেন বুড়োর বুক থেকে বাতাস টেনে নিচ্ছিল, মৃণাল তার শো শো শব্দ শুনতে পাচ্ছিল।.....রাত্রিবেলা—অনেক রাত্রে—খুব অস্বস্তি নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ার আগে মৃণাল বুঝতে পেরেছিল সে অনেক দুঃস্বপ্ন দেখবে। সে ভেবে ঠিক করতে পারল না সত্যই বুড়োটা মরে গেছে কি না।

মরেনি—ভাবতে তার ভালো লেগেছিল। আর যদি সত্যিই মরে গিয়ে থাকে তবে এখন অনেকদিন ওই রাস্তা দিয়ে একা একা ফিরতে তার ভয় করবে।****

এ যেমন 'সেই বুড়োটা' গল্পে, তেমনি 'মৃণালকান্তির আত্মচরিত' গল্পেও একটা ছাড়াছাড়া চিন্তার স্বপ্নচ্ছাপ সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। চেতনা প্রবাহে ভেসে ফিরেছে অজস্র সুরেলা ছবির বুদ্‌বুদ।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস 'ঘুণপোকা'। সমাজ-অস্তিত্ব ও ব্যক্তি-জীবনের মূলেই যে আজ ঘুণ—নষ্ট মূল্যবোধের ওপরকার ঢাকনাও যে তার থাকছে না। বাস্তবের এই সত্যই হয়তো সাহিত্যের সত্যে রূপান্তরিত করতে চেয়েছেন লেখক। কিন্তু 'ঘুণপোকা' দৃঢ়বদ্ধ নয়। ছাড়াছাড়া। একটানা এক ঘেঁয়ে একটা সুর। এ উপন্যাস তাঁর নিজের রচিত কতকগুলো গল্পেরই সমাহার বলে পাঠকের মনে হতে পারে। নির্বোধ এবং বুদ্ধিহীনের মতো তাঁর উপন্যাসের নায়ক তৃপ্তিদায়ক সুখগ্রহণের পরেও সেই গণ্ডী কেটে বেরিয়ে আসতে চায়। কখনও মৃত্যুর মুখোমুখী এসে দাঁড়িয়ে নায়কের উপলব্ধি—অনিবার্যভাবেই এই ভোঁতা জীবনের মায়া ও স্বপ্নজাল ছিঁড়ে পড়ছে। শেষ পর্যন্ত অজানা কারুর উদ্দেশে জেগে ওঠে নায়কের প্রত্যাশা ও অপেক্ষা—যে তার উজ্জ্বল উদ্ধার। কিন্তু শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের মূলে কোনো বাস্তবতার সমগ্র নেই ; যে পটভূমির ওপর তিনি তাঁর তত্ত্বকে উপস্থাপিত করেছেন তাতে আধ্যাত্মিকতার কংক্রিট থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে নি। নায়কের আচার আচরণ অনেকক্ষেত্রে অসংলগ্ন ও দুর্বোধ্য বলে মনে হয় ; তার এই মানসিকতা অনেকটাই লেখকের কষ্টকল্পনা অথবা অতি-ব্যক্তিগত ভাবানুষঙ্গ। উদাহরণ স্বরূপ 'ঘুণপোকা'র অনেক অংশই তুলে ধরা যেতে পারে। কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। শ্যাম ও লীলার লুকোচুরি খেলা পাঠকমাত্রেরই দৃষ্টিগোচর হবে বলে বিশ্বাস। এ উপন্যাসে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় একটা মিঠেমিঠে মানুষ তৈরী করতে চেষ্টা করেছেন। নায়কের সঙ্গে বাস্তবের সমস্যাক্লিষ্ট মানুষের আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই। তবে একটা বিষয় লক্ষ্য করার এই যে, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সত্তাতেই যে স্পিরিচুয়ালিজমের স্রোত প্রথমে দেখা গিয়েছিলো, তাই-ই ক্রমশ গভীর ও ঘন হয়ে তাঁর লেখালেখিতে আত্মপ্রকাশ করতে চাইছে। কিন্তু এদিকটাতেই তাঁর এত ঝোঁক যে সাম্প্রতিক সময়ের যন্ত্রণা ও সংগ্রামকে তিনি এড়িয়ে গিয়ে দূর ভুবনের তল্লাসে ব্যস্ত থাকছেন। এবং এটাই তাঁর আধুনিক লেখক হিসেবে চিহ্নিত হবার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। কেননা,

অসহায়ের ঈশ্বর বিশ্বাস যে আধুনিকতা তার বাইরেও একটা অতিব্যাপ্ত ও গতিশীল আধুনিকতা আছে এবং তা লড়াই করে বাঁচা এবং বেঁচে থেকে সুন্দর সৃষ্টি করা। মানুষের এই সংগ্রাম এবং আত্মপ্রত্যয়ের দিকটিতে দৃষ্টি না পড়ার কোনো কারণ নেই। কেননা, স্বচ্ছ দৃষ্টি ও শানিত কলম তাঁর দুই-ই আছে। আশা করা গিয়েছিলো পরবর্তী রচনায় হাত দিয়ে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর লেখালেখিতে একটা জীবন-গভীরতা এবং দৃঢ় বাঁধুনি আনতে পারবেন। কিন্তু 'পারাপার' উপন্যাসেও তিনি তাতে সমর্থ হন নি। ইতস্ততঃ ছবি আঁকার এবং রিনরিন বেদনার ছড় টানার ব্যাপারে তাঁর মুন্সিয়ানা অনেক সময়েই বিমল করকে স্মরণ করিয়ে দেয়, হয়তো ছাড়িয়েও যায়। চরিত্রগুলোতে কোনো জ্বালা নেই, আছে নীল হিম বেদনার আভাস। একটা ছোট গল্পের কথাকেই —একটা লিরিক চিন্তার স্রোতকে—উপন্যাস করতে গিয়ে বহু ক্ষেত্রেই তিনি তাল ঠিক রাখতে পারেন নি বলে মনে হয়েছে।

নগর জীবনের অসুস্থ মানসিকতা, প্রেমহীনতা, প্রাণহীনতা প্রকাশ পেয়েছে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে উপন্যাসে। এদিক থেকে মতি নন্দী বা সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের তিনি খানিকটা সমগোত্রীয়। তাঁর 'বৃহন্নলা' ও 'অনিলের পুতুল'এ শহরের মধ্যবিত্ত সমাজের যুবক যুবতীদের মানস বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তিনি যে নির্মমতার পরিচয় দিয়েছেন তা এর আগে বাংলা সাহিত্যে দেখা যায় নি বললে অত্যুক্তি হবে না। 'অনিলের পুতুল'এ তিনি গুটি কয়েক ষ্টিলের নিবের আঁচড় দিয়েই সামাজিক চল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত সু-্গ শুদ্ধতা, সুনীতি নামীয় ভণ্ডামীগুলোকে ছিঁড়ে ফেলে দেখিয়ে দিয়েছেন সমসাময়িক মানুষের আসল চেহারাটা। কারুর চেহারায় দেখেছেন 'ধর্মযাজক'-এর ছাপ কারুর বা 'সমাজ হিতৈষিণী'র এবং তাকে হ্যাঁচকা টানে হাট করে ধরেছেন :

****'দিদিমনি ভাগ্যবতী—', সেজো একবারে বেশী বলতে পারল না। অনিল জানে সেজো আর কি বলত। 'এই আমরাই শুধু টিকে থাকব—যাদের কোন দরকার নেই।'—এরকম কিছু কিম্বা 'দিদিমনি কত লোকের উপকার করেছে—কতগুলো দুঃস্থ সংসারকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।' সেজো যখনই তার দিদি তরঙ্গিনীর কথা বলে তখনই তা এমন সবার হয়ে ওঠে। যেন তার নিজের বড় দিদির কথা বলছে না—তরঙ্গিনী নামে কোনো সমাজ-হিতৈষিণীর কথা বলছে। একটা কথা ভুললে চলবে না—এদের বাবা ছোট বেলায় অনেক ঘি দুধ খাইয়েছে এদের, ভদ্রলোক গ্রীক পুরাণে যে সব মহিয়সীর

কথা পড়েছেন মেয়েদের কাছে তা গল্প করে বুঝিয়ে বলেছেন। উচ্চ চিন্তা, ভাল স্বাস্থ্য ইত্যাদি গড়ে তোলার জন্যে মনের ভেতরে কড়া ইঞ্জেকশন দিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য ভদ্রলোক অধ্যাপনা করে একটি বইও লেখেন নি। সুবিধে বুঝে ধনী অসচ্চরিত্রকে টাকা দিয়ে তহবিল তছরূপের দায় থেকে বাঁচিয়েছেন —আর নিজের নামে দশখানা পাকা বাড়ি লিখিয়ে নিয়েছেন। মৃত্যুর আগে দশ বছর তিনি অর্শ আর ভগন্দরের মত দু-দুটো ফোর্থক্লাস অসুখে খুব বেগ পান। আসল কথা উচ্চাকাঙ্খা, লোভ, অতিরিক্ত কাম, সঞ্চয় প্রকৃতি, ব্যবসায় বুদ্ধি ইত্যাদি নিয়ে তিনি মানুষ ছিলেন। তারই বড় মেয়ে তরঙ্গিনী। তরঙ্গিনীর সেজো বোন অনিলের মা।****

কোনো দ্বিধা রাখেন নি চরিত্র উপস্থাপনে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। উৎস বিশ্লেষণ করে চরিত্রের দিকদর্শন এবং উপস্থাপনের মধ্যে থেকে বাস্তবের সত্য চিত্র খুবই দক্ষ হাতে এঁকেছেন তিনি। এর পর বহুদিন তাঁর লেখনী স্তব্ধ হয়ে ছিলো। মাঝে মাঝে দু' একটি গল্প যা লিখেছেন তা তাঁর শক্তি সামর্থের প্রকৃত প্রকাশ হয়ে উঠতে পারে নি। কিছু পরে 'গনেশের বিষয় আশয়' লিখে একটা ধাক্কা দেবার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। কিন্তু এ গ্রন্থে নতুন পরিবেশের স্বরূপ খানিকটা উঠে এলেও, তাঁর লেখার যে ধার পাঠককে আকর্ষণ করতো, তা অনুপস্থিত। একে কোনো উল্লেখযোগ্য রচনার সূচনা হয়তো বলা যায় না, তবে-একেই পরিবর্জিত, পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ করতে গিয়ে 'কুবেরের বিষয় আশয়'এ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় দেখাতে চেয়েছেন সেই মানুষকে, যার গায়ে টাকা উড়ে এসে বাজছে কিন্তু তাকে সহ্য করতে পারছে না। অর্থাৎ টাকার কুমীর হওয়ার মধ্যে যে অসহনীয় বোধ এবং পীড়িত মানসিকতা তাকেই এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু করে নিয়েছেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর বাস্তবনিষ্ঠ দৃষ্টির আঁচ এ গ্রন্থেও দুর্লক্ষ্য নয়।

বাংলাদেশের গ্রাম জীবনকে নিয়ে সাদামাটা ভাষায় কিছুটা উপকথার ঢংয়ে কয়েকটি চমকপ্রদ গল্প লিখেছেন বরেন গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর 'বজরা', 'তোপ', 'কালবেলা' প্রভৃতি গল্প শ্রদ্ধান্বিত মননের ও অনুভূতির সাক্ষ্য বহন করে। কিন্তু তাঁর উপন্যাস 'পাখীরা পিঞ্জরে' সাধারণ উপন্যাসের পর্যায়কে অতিক্রম করতে পারে নি, সদ্য প্রকাশিত 'নিশীথ ফেরী'-ও তাই। সাম্প্রতিক রচনাগুলোর মধ্যে 'জাদুই রুমাল,' 'সহবাস,' 'দ্রৌপদী' প্রভৃতি গল্প হিসেবে ভালো হলেও তাঁর পূর্ব ক্ষমতার স্বাক্ষর এগুলোতে ম্লান। কিন্তু তাঁর 'গোলকধাম,' 'দধীচির হাড়' অবশ্যই

পাঠককে দ্বিতীয়বার তা পড়তে আগ্রহান্বিত করে। নিজস্ব সীমার বাইরে দাঁড়িয়ে 'সীমার বাইরে' গল্পটি লিখতে গিয়েই তিনি পাঠককে হতাশ করেছেন। কি দরকার ছিলো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অহিংসা'র খুদে ও জোলো সংস্করণ প্রকাশ করার ? কি নতুনত্ব আছে যখন তিনি বলেন :

****স্বামীজী (প্রার্থনা সভায়) আমাদের সবাইকে অবাক করে দিয়ে বলে দিলেন, গাছে ওঠার মধ্যে এতটুকু দোষের নেই। বিশেষত মেয়েদের গাছে উঠতে পারাটাই আশ্চর্যের।...আমাদের দেশের মেয়েরাই এখনো পিছিয়ে।...স্বামীজীর কথা শুনে আমরা সকলেই বোধহয় এক জাতীয় প্রেরণা পেয়েছিলাম। মেয়ে হয়ে জন্মেছি তাতে দোষ কি ? কিন্তু দু' এক মুহূর্ত পরেই বুঝতে পেরেছিলাম স্বামীজীর কথায় বিরাট একটা ফাঁক থেকে গেছে। স্বাবলম্বী হতে চাইলেই হওয়া যায় না, বিশেষ করে এই আশ্রমে। আশ্রমের আইনকানুন এমন ছিল যে আমাদের পলে পলে মনে করিয়ে দিত আমরা অনাথ। আশ্রমের আইন কানুন এমন ছিল যে প্রতি মুহূর্তে আমাদের মনে করিয়ে দিত স্বামীজীর দাক্ষিণ্যে আমাদের বেঁচে থাকা ছাড়া গতি নেই। আমাদের মনে হত আমাদের সকলকেই স্বামীজী এক দৃষ্টিতে দেখেন না। নইলে মায়া পালিতের অসুখ হওয়ার পর উনি রাতের পর রাত সজাগ ওর পাশে বসে রইলেন কি করে।****

এ লেখার কোনো দরকার ছিলো না। আধুনিক সমস্যা ভাবনার মধ্যে জড়িয়ে থেকেও শুধু নোকর সমাজের কলেবর বাড়াতে গিয়েই সম্ভবতঃ বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, আরো অনেকের মতো, চরিত্র ভ্রষ্ট হচ্ছেন :

শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মূলত কবি। কিন্তু ছোটগল্প ও উপন্যাসের ক্ষেত্রেও তাঁদের গতিবিধি সমধিক। শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রকৃতি এবং লিরিকে আশ্রিত—সেখানেই তাঁর মানস স্ফূর্তি। তাঁর 'কুয়োতলা' উপন্যাসে প্রকৃতি সজীব হয়ে উঠেছে সুরে গন্ধে—জেগে উঠেছে বয়ঃসন্ধিক্ষণের একটি কিশোরের পাপপুণ্য বোধের দ্বন্দ্ব। সেই সম্পর্কিত অবসেশনকে কেন্দ্র করে লেখা এ উপন্যাসটি অসাধারণত্বের দাবী রাখে। ভাষার ভেতরে মাটির গন্ধ ও প্রকৃতি এবং ইতর শব্দের সুচতুর ব্যবহারও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। 'বিষাদসিন্ধু' গল্পে তিনি এ যুগের ধর্মাধর্ম ও তা থেকে সৃষ্ট মৌলিক বিবাদকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। এর সবকিছুই পাঠকের অতি পরিচিত, তবু এ সেই ভুল ঠিকানা— "যা চাওয়া হয়—যা পাওয়ার, তার চিহ্ন আছে কিন্তু সে নেই। ভুল ঠিকানা ললিত আপন মনেই বলতে থাকে। বারান্দায় এমন কি, দেখে তার বাড়িল

চটি পড়ে আছে—অর্থাৎ বাড়িতে যা পরে ও, সকালেও পরেছিলো।” শক্তি চট্টোপাধ্যায় মরমী তাঁর সব গল্পেই। কিন্তু সব গল্পেই সার্থকতা আশা করা যায় না। অতিক্রান্ত লিরিক কবিতার পাঁচ লাইনে ফাটিয়ে দেওয়া সম্ভব হলেও, গল্পে পাঠককে তত সহজে কায়দা করা যায় না। এ কথাটা ভুলে যাবার জন্যেই বুঝি সময় সময় বেমক্কা হিজিবিজি কথার চিত্তির কেটে এক ধরণের গল্প রচনা করে ফেলেন :

****হনু-জাগা মুখে গালের মেচেতার দাগ যেন দেখতে পাওয়া যায় না আর। রুক্ষ চামড়া ভারী কোমল হয়ে এসেছে। কাঁচের পিছনে পাংশু আর প্রভাহীন চোখ দুটো জ্বলে উঠলো নাকি? দিন এলো। ঝমঝমিয়ে এলো বৃষ্টি। প্ল্যাটফর্ম ধুয়ে গেলো অকালের জলে। হাওয়া জোর। লোকজন হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়েছে স্টেশনের শেডের মধ্যে। কিশোরীমোহন আর মৃণ্ময়ী শুধু দাঁড়িয়ে। নির্বাক, করতল মুঠি ভরে কিশোরী, হয়তো সামান্য চাপ দিয়েই বলে, 'সত্যি মৃণ্ময়ী, এসো একদিন—ভারী আনন্দিত হবো।—বহড়ু ইস্টিশনে নেমে যাকে আমার নাম বলবে সেই তোমায় দেখিয়ে দেবে—আসবে তো?'... ওদিকে ট্রেন ছেড়ে দেবার জন্য হাড়িকাঠের মতন লোহার ঘণ্টা উঠলো বেজে। কিশোরী এগুলো--মৃণ্ময়ী হঠাৎ বলে ওঠে, 'আরে আমিও তো যাবো।'...'যাবে তুমি?' চমকে ওঠে কিশোরী। [এর মধ্যে আছে একটু প্রেমের আমেজ, স্মৃতি চিন্তা চকিত অভাবিত পূর্ব উপমা এবং কবিতা] স্বপ্ন তাড়িতের মতো হাঁটে তারা। লম্বা আর নরম ঘাসের ব্লেডগুলো থেকে শিশির নাকি বৃষ্টির জল ঝরে পড়ে। মৃণ্ময়ীর শাড়ীর প্রান্ত ভিজে থমথমে হয়ে উঠে হাঁটতে থাকে। ইতি উতি তাল গাছ। তার পাতায় দোল খায় মাছ রাঙা।****

লিরিক কবির যা দোষ তাই ই শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ছোটগল্প ও উপন্যাসে আছে—কঠিন কাঠামো নেই গল্পের শরীরে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, যেখানে তাঁর কবিতার শেষ সীমা, সেখান থেকেই তাঁর গল্প শুরু করেছেন। গল্পের মধ্যে একটা জোরালো কাব্য চেতনা তাঁর আছেই। তবে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতাই মেট্রোপলিটান শহর সত্যকে সমূলে উদ্ধার করেছে এবং তাই-ই আকর্ষণীয়। তাঁর 'রাণী ও অবিনাশ' বেশ সাবলীল ভঙ্গীতেই উপস্থাপিত। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের একটা নিজস্ব স্টাইল গড়ে উঠেছে। গতি তার স্বাভাবিকের চেয়েও একটু দ্রুত—এর প্রমাণ পাওয়া যায় 'মুখাগ্নি' গল্পে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস একটা নতুন পরীক্ষা নিয়ে উপস্থিত। যদিও রীতি কাঠামোটা রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ-র ঢঙের, 'যুবক-যুবতীরা'

আদতে নতুন। এর মধ্যে যেমন নাটকীয়তা আছে, তেমনি আছে প্রখর গতিময়তা। কিন্তু 'আত্মপ্রকাশ' সে তুলনায় নির্জীব ও ক্লান্তিকর। 'যুবক-যুবতীরা' উপন্যাসেরই বিষয়বস্তুর নবীকরণ বলে 'আত্মপ্রকাশ'কে মনে করা হলে কিছু ভুল হবে না। এ উপন্যাসে নূরজাহান-ভ্রমণ ব্যাপারটা একেবারেই অবান্তর। অনেক আধুনিক ব্যাপারই আছে এ উপন্যাসে, আছে সাম্প্রতিক যুবকদল—না, সত্যিই ক্রুদ্ধ যুবা সম্প্রদায়—নারীর ভালোবাসার জন্যে কাঙাল, যেমন কাঙাল আর সব কিছু পাবার জন্যে। কিন্তু পায় না, তাই ছিনিয়ে—অত্যাচার করে পেতে চায় :

****না, আমি (মণীষা) কিচ্ছু বুঝতে পারি না। এই রাত দুপুরে আপনাকে বোঝাতেও হবে না।......আমার (নায়ক) ধৈর্যের সেখানেই শেষ। আমার ভালো হওয়ার চেষ্টার সেখানেই শেষ। আমার পথ বদলাবার চেষ্টারও সেখানেই শেষ। প্রায় এক হ্যাঁচকা টানে আমি মণীষাকে টেনে এনেছিলাম আমার বুকের ওপর। এত জোরে যে, ওর মাথায় আমার থুতনি ঠুকে যায়। দানবের শক্তিতে আমি ওকে আঁকড়ে ধরলুম, একটা হাত ওর পিঠে এমন দৃঢ় যে ওর নরম পিঠে যেন আমার পাঁচটা আঙুল বসে যাচ্ছে, মটমট করে এক্ষুনি ভেঙে যাবে ওর পাঁজরা, অন্য হাতে আমি জোর করে মণীষার মুখটা তুলে, মণীষা প্রথমে ঠোঁট খুলতে চায় নি, কিন্তু আমি বুলডোজার চালানোর মতো দুই ঠোঁটে যতক্ষণ না আমার নিঃশ্বাস ফুরিয়ে দম বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল—ততক্ষণ চুমু খেয়েছিলাম। দেখা যাক, এই ভাষা ও বোঝে কিনা। [শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়ালো ভালোবাসার ভাষা। কিন্তু তা সত্ত্বেও নির্মম প্রত্যাখ্যান। তাই অন্য মেয়ের খোঁজ। বালিকা(?)র মধ্যে ভালোবাসার অন্বেষণ :] তোমার মুখে অন্য কোন ছেলের নাম শুনতে আমার ভালো লাগে না। কারণ, আমি তোমাকে ভালোবাসি কিনা।......ক্যাথিড্রালের পাশে নির্জন রাস্তায় থমকে দাঁড়িয়ে যমুনা আমার মুখের দিকে তাকালো। চোখের মধ্যে একটা অসহায়তা ফুটে উঠলো। মেয়ে তো, ভালোবাসার ব্যাপার বুঝুক না বুঝুক ছেলেবেলা থেকেই ভালোবাসা কথাটা শোনার জন্যে প্রস্তুত থাকে। শুনলে চিনতে পারে। একবার যেন শরীরটা দুলে উঠলো ওর। চোখের পাতা দুটো যেন ক্ষণিক ভারী হয়ে উঠে পলক ফেললো, স্বাভাবিক ভাবে পলক উঠতে যেটুকু সময় লাগে, তার চেয়ে একটু বেশি সময় পরে চোখ খুলে ম্লান কণ্ঠে যমুনা বললো, আপনি আমায় ভালোবাসেন ? সত্যি ? কি করে ভালোবাসেন ?...আসলে সেই বিয়ে বাড়িতে

সিঁড়ির ওপর তোমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই আমি তোমাকে ভালোবেসেছি। এতদিন একথা আমার মনে ছিল না—তাই জীবনের অনেক কিছু নষ্ট হয়ে গেল, এখন মনে পড়ছে।...সেদিন তুমি বলেছিলে, আমি জোরে জোরে কথা বলছি, তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে আমার চোখ লাল কেন? মনে আছে? সেদিনও আমি মিথ্যে কথা বলেছিলাম। আসলে সে দিন আমি মদ খেয়েছিলাম।...আপনি মদ খান বুঝি? কেন খান?****

এর পর ভিখিরি ভিখিরি খেলা। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় গানটা শুধু করেন নি 'ভালোবাসা মোরে ভিখারী করেছে ..'। একটা স্মার্ট সমাপ্তি তারপর। কিন্তু পাঠকের জিজ্ঞাসা নায়ক ও তার বন্ধুরা কেন জুয়া খেলে? কেন মদ খায়, কেনই বা নেশা করার জন্যে রাস্তার মদের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে মদের পয়সা ভিক্ষা করে? কোন জীবন যন্ত্রণায় বা জীবন বোধ থেকে এগুলো করা হয় তা আদৌ স্পষ্ট নয়। উপন্যাস কবিতা নয় যে একটা আঁচড়েই পাঠক বুঝতে পারার দিকে উড়ে যাবে বা বিষয়ের মর্মে পৌঁছে যাবে। আর তা ভাবাটাও ঔপন্যাসিকের অলীক ভাবনার নামান্তর। তারা কি শিল্পের জন্যে এগুলো করে? যে কথা 'যুবক যুবতীরা' উপন্যাসে তিনি স্পষ্ট করে বলতে পেরেছিলেন? সম্ভবতঃ তাই। কিন্তু বক্তব্য এই যে, এযুগে কেউ শিল্পের জন্যে আত্মত্যাগ করে না, জীবন থেকেই শিল্প বেরিয়ে আসে। নায়ক বালিকার মধ্যে পবিত্র প্রেম খুঁজেছে। ব্যাপারটাই অসম্ভব এবং অবাস্তবতার সাক্ষী। এ কেমন বালিকা যে টেনিস খেলে, পর পুরুষ বন্ধু আছে যার এবং তার সঙ্গে গজিয়ে ওঠা বয়সের সব আধুনিক অভিজ্ঞতা—শারীরিক স্বাদ লাভ আছে?

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সমস্ত উপন্যাস গল্পে ভাষার মুন্সীয়ানাকে সেলাম দিয়েও বলতে হয় যে তাঁর বাদবাকি উপন্যাস যা আছে তার প্রায় সবই বিশুদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টির জন্যে বা পাঠকের জন্যে রচিত নয়। 'প্রতিদ্বন্দ্বী', 'অরণ্যের দিন রাত্রি', 'সুখ অসুখ' ধরণের উপন্যাসগুলোয় আপন যুবককাল আসার বয়সে ব্যক্তিগত ও বন্ধুবান্ধবের মধ্যে যে দুর্বিসহ জ্বালাময় দিন যাপনের তোলপাড়, আত্মপ্রকাশ ও আত্মানুসন্ধানের ব্যাকুলতা অসহায়তা, অন্ধকারে জীবনের সুস্থতা ও স্থিরতা হাতড়ে বেড়ানোর যন্ত্রণা এবং অভিমানক্ষুব্ধ অস্তিত্বের ওপর পরিবেশ ও সভ্যতার ধর্ষণের বিরুদ্ধে সক্রোধ উত্থান তাকেই সহজ ও অন্তরঙ্গ ভঙ্গীতে তুলে ধরার চেষ্টা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের। কাহিনী মর্মান্তিক এবং আবহ সংকেতময় ঠিকই কিন্তু লেখক এর মধ্যে কোনো গভীর তাৎপর্য ফুটিয়ে তুলতে

পারেন নি। কবিতায় তাঁর যে সুগভীর মেট্রোপলিটান মানসিকতা ছিলাটান ভাবে উঠে আসে এ সব উপন্যাসে তা অনুপস্থিত। 'সুখ অসুখ' তো 'চতুষ্কোণ'-এরই প্রতিবিম্ব। ছাড়াছাড়া আধুনিক জীবন সমস্যাকে ত্রিকোণ প্রেমের ফিচারের সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়েছে। হাল্কাপাঠ্য গল্পের বই হিসেবেই এগুলো পড়া যায়।

বাংলা সাহিত্যে স্বাধীনতা পূর্বকালের লেখকদের মধ্যে ভূগোল বাড়ানোর যে চেষ্টা দেখা দিয়েছিলো তার উত্তরাধিকার নিয়েই অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য করছেন। কল্পনা ও রোমান্স রস পরিবেশন করার দিকেই তাঁর ঝোঁক। নায়ক তাঁর প্রায়ই নাবিক। নৌজীবনের অভিজ্ঞতাকে, অতিরসে জারিত করে তিনি উপস্থিত করেন। অভিনবত্ব এইটুকু যে প্রায় সব পাঠকই জাহাজী জীবন সম্পর্কে অন্ধকারে এবং সেই সুযোগে তিনি ভৌগোলিক বর্ণনা ও জাহাজী কর্মধারার খুঁটিনাটির বিবরণ দিয়ে পাঠককে বিস্ময় রসে ভুলিয়ে দেন। তবে অভিজ্ঞতাকে হৃদয়স্পর্শী করে তোলার মতো সহজ এবং অনাড়ম্বর ভাষায় অকপটভাবে তিনি কাহিনীকে বিবৃত করেন। 'সমুদ্র মানুষ' উপন্যাসে মোবারক আলীর যন্ত্রণাজর্জর ও স্মৃতিক্লান্ত জীবনকে তিনি বেশ চাক্ষুষ করে তুলেছেন। তাঁর গল্পে এই সমুদ্র নুনের জ্বালা ও আস্বাদ যুগপৎ উপস্থিত। অনেক গল্পেই ব্যাপ্ত ভূগোলের কথা। ইদানিং 'হা অন্নের ছবি'তে যুগ নৈরাজ্যের মধ্যে থেকে তিনি উদরের জ্বালায় ঘর ভাঙার ছবিটি স্পষ্ট করে তুলেছেন। তিনি অস্তিত্ববাদী। গ্রামবাংলার সুস্থ ও দুঃস্থ ছবি তিনি সুচিত্রিত করেছেন তাঁর 'বৃষ্টির আগে' গল্পেও। প্রকৃতিকে প্রাঞ্জল করার দিকেও তাঁর লক্ষ্য। কিন্তু ভাষার মধ্যে কোনো সচেতন স্বাক্ষর রাখতে পারেন নি অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়।

কবি শংকর চট্টোপাধ্যায়ও গল্পকার হিসেবে কিছুটা স্বীকৃতি দাবী করেন। যদিও নতুন রীতি নতুন আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাঁর গল্পের কোনো গুরুত্বই নেই। তিনি সমসময়ে বসবাসের জন্যে বোধের রেশটুকুই পেয়েছেন এবং তাকে সাধ্যমত ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তাঁর সে সব লেখা আদৌ অপাঠ্য নয়। সৎভাবে লেখার চেষ্টাই তাঁর গল্পের মৌলিক সম্পদ। 'অশুভ আলোয়', 'সিঁড়িতে অন্ধকার', 'আত্মভুক', 'প্রিয়তোষের গোপন সফর', 'সন্দিগ্ধ শবযাত্রী', 'আত্মহননের ভূমিকা' প্রভৃতি গল্পের প্রত্যেকটিতেই স্বাতন্ত্র্য আছে, আছে যৌবনের আবেগ ব্যঞ্জনা, গঠন শৈলী এবং প্রতীক নির্মাণ দক্ষতা। প্রত্যেক গল্পই একটা নির্দিষ্ট পরিণতিতে পৌঁছোয়। কিন্তু তা হলেও এ সব গল্প খুব একটা ঝাঁকুনি দিতে পারে না। তিনি তাঁর 'সত্তাধিকার' গল্পে নায়কের অপ্রকাশের বেদনা

বোধ তুলে ধরে তাকে কামবাসার জগতেই নিক্ষেপ করেছেন। অভিব্যক্তি নয় —অস্তিত্বের মোচড় দেখানো নয়, একটা রহস্যময়তার জগতেই তাঁর লেখক সত্তার টান অনুভব করা যায়। বক্তব্যকে তীব্র করে পাঠক হৃদয়ে পৌঁছে দিতে তিনি কখনো কখনো দক্ষ শিল্পীর পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর 'আততায়ী' গল্পটি তারই পরিচয়বাহী। এবং সে জটিলতাহীন শুধু গল্প—গল্প 'ভাত'এর মতো।

এক বাড়িতে মানুষ হওয়া ছেলেমেয়েদের ওপর পারিবারিক আবহাওয়া যে কাজ করে প্রবোধবন্ধু অধিকারী বা দিব্যেন্দু পালিতের ওপর এই সময়, এই সমাজ এবং এ যুগের সাহিত্য চেতনা ঠিক সেই কাজই করেছে। এঁদের লেখা পড়লে যুগলক্ষণ অনায়াসেই নজরে পড়ে কিন্তু বিশেষ ভাবে চিহ্নিত হবার মতো তেমন কোনো স্ব-লক্ষণ ধরা পড়ে না। এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি গল্পের বই ও উপন্যাস লিখলেও এই হালফিলে প্রবোধবন্ধু অধিকারীকে একটা নিজস্ব চেহারায় দেখা গেছে 'ধলেশ্বরী'তে। আঞ্চলিক ভাষাপ্রধান এই উপন্যাসে একাধারে ভয়ঙ্করী ও জীবনদাত্রী ধলেশ্বরী নদীকে একটা তাজা মানুষের চরিত্র দিয়েছেন লেখক। এবং তার সঙ্গে তুলে ধরেছেন জলের এবং পাড়ের জীবন যা নদীর মতোই নাব্য।

খানিকটা ভয়ঙ্কর সৃষ্টির প্রবণতা দিব্যেন্দু পালিতের লেখালেখিতে দেখা যায়। তাঁর 'দুঃসময়' জাতীয় গল্পগুলি পাঠককে বেশ কিছুক্ষণের জন্যে ত্রস্ত ও বিহ্বল করে দিলেও তার বেশী আর কিছুই রাখতে পারে না। 'সেদিন চৈত্রমাস'উপন্যাস স্বাদে বা বস্তুতে তেমন কিছু না হলেও তার থেকে খানিকটা বেশি কিছু পাঠক পেতে পারে তাঁর 'ভেবেছিলাম' উপন্যাসে।

'এই দশকের গল্প'য় অচিহ্নিত অথচ শক্তিশালী লেখক চিত্ত সিংহ, নিখিল চন্দ্র সরকার ও পূর্ণেন্দু পত্রী। এঁরা বেশ কিছু ভালো গল্প লিখেছেন, উপন্যাসও। চিত্ত সিংহের মধ্যে একটা রোবাস্ট অ্যাটিচিউড আছে। তাঁর, 'সুধন্য ও সেবারের বর্ষা' প্রত্যেক পাঠককেই সচকিত করে বলে বিশ্বাস। চিত্ত সিংহ লেখার ব্যাপারে কিছুটা বেপরোয়া এবং উদ্দাম। কিন্তু উপন্যাসে হৈচৈ করার মতো কিছু নেই। তাঁর 'নিষাদ' মানব মনের অন্ধকার গুহা আবিষ্কারের ফসল—সংকেত নিয়ে পরীক্ষায় নতুন। নিয়তির টানে এবং চেতন ও অবচেতনের দ্বিরূপ মানুষের দ্বন্দ্বে ব্যক্তি অম্বিষ্টে গিয়ে আলো ধরে দেখলো তার অবচেতনা নেই। বহুতর পার্সোনাল সিম্বল, সংকেত ও দুর্বোধ্য রেখাছবি দিয়ে একটা জটিল ভাষায় তিনি এ উপন্যাস রচনা করেছেন, দক্ষ পাঠককেও এটা বহু ক্ষেত্রে ক্লান্ত করে।

নিখিল চন্দ্র সরকারের 'পতঙ্গের মৃত্যু', 'সময়' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গল্প।

ভাষা ও ভাবের দিক থেকে তিনি ট্র্যাডিশনাল। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাংশের পটভূমিতে রচিত হয়েছে তাঁর 'মরা কোটাল' গল্পটি। জলাভূমির মানুষের কথা বলতে গিয়েও তিনি এখানে প্রাণের ছোঁয়া আনতে পারেন নি। কখনো তাঁর গল্প ঘুমোবার ঔষধের কাজ করে। এবং এমন একটি গল্প 'বনবাস'।

ছোটখাট গল্পগুলো থেকে 'দাঁড়ের ময়না' ও 'মানুষের মুখ' উপন্যাসেই পূর্ণেন্দু পত্রী বেশি চিহ্নিত। ব্যক্তিগত জীবনের চিত্রকর—তাঁর লেখালেখিতেও চিত্রময়তা ও আর্টিষ্টসুলভ রোমান্টিকতা এবং বাস্তব বোধ সুপরিস্ফুট। তার সঙ্গে মিলেছে নাগরিক তির্যকভঙ্গী যা তাঁর প্রথমোক্ত উপন্যাসটিকে বৈশিষ্ট্য দিয়েছে।

এদিক থেকে স্বাতন্ত্র্যে স্বাদে আলাদা জগতের লেখক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। মাটি আর ঘাসগাছালির সঙ্গে তাঁর শুধু নিজেরই যে যোগ আছে তাই নয়, পাঠককেও নোনা উত্তেজনায় জলাবনবাদারের দার্শনিক জীবনবোধে উদ্দীপ্ত সাধারণ পল্লীবাসীর মর্ম অব্দি পৌঁছে দেবার সক্ষমতায় তিনি অনন্য। 'ভালোবাসা ও ডাউনট্রেন', 'জাতীয় মহাসড়ক', কিংবদন্তির সিন্দুক', 'পদ বাউরীর কথা', 'ফিরাব কেমনে' প্রভৃতি গল্প প্রত্যেক পাঠককেই আকর্ষণ করে। একটা আসর জমানো ভাব আছে তাঁর গল্পের মেজাজে। কিন্তু এই মরমী ছোঁয়াটা বাদ দেবার জন্যে তিনি কোথাও কোথাও ষ্ট্রীম অব কনসাসনেস রীতি ধারণ করে অযথা গল্পকে জটিল করে ফেলেন। এ প্রবণতা গল্পকে খানিকটা কৃত্রিম হতে বাধ্য করেছে। অথচ গ্রাম বাংলার রক্ত সম্পর্কটি তিনি তুলে ধরতে পারেন।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ মূলত স্বাশ্রয়ী লেখক। নিজ ব্যক্তিত্বের চিহ্নেই চিহ্নিত তাঁর ভাষা। তবে ভাষা ব্যবহারে প্রায়ই তিনি অ-সতর্ক। তাঁর গল্পে যে মানুষ এবং প্রকৃতি বিচিত্রিত, তা গাঁ মানুষের বাংলা। সাধুভাষা সেখানে চরিত্র ফোটাতে অনেকখানি অসমর্থ, তাই একটা ভাঙা ভাঙা অমার্জিত ভাষাকে সিরাজ শক্তি দিয়েছেন নিজের ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি দিয়ে। 'কীটনাশক মহৌষধ' গল্পে মানুষের যৌবন যন্ত্রণার বজ্রকীটকে তিনি হত্যা করার উপায় দেখেছেন বয়সকে মহৌষধের মতো প্রয়োগ করে। 'কালবীজ'ও যৌবন পিপাসার অস্থিরতার কথা ব্যক্ত করেছে। তবে তা নারীর। এসব গল্পে যেমন একটা কাহিনী বিন্যাস আছে তেমনি আছে একটা বৈঠকী চাল।

বহু লেখার দিকে ঝোঁক দেখা দিয়েছে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের, যেমন ছোট গল্প তেমনি উপন্যাস লিখে যাচ্ছেন। ফলে বাজারে হয়ে পড়ছেন ক্রমশ যদিও তাঁর 'কিংবদন্তীর নায়ক' উপন্যাস এখনো প্রাণের তাজা গন্ধ আনে।

সমাজতান্ত্রিক চিন্তাচেতনা ও জীবনবোধের বলিষ্ঠতা নিয়ে এ সময়ে যে কয়েকজন লেখক গল্প উপন্যাসে হাত দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে চিত্ত ঘোষাল অ্যাটিচিউডের দিক থেকেই আলাদা। একটা তির্যক দৃষ্টিকোণ থেকে জীবন ও পরিবেশকে তদন্ত করে চিত্ত ঘোষাল তাঁর লেখায় বাস্তবতার দাবী রক্ষা করতে সচেষ্ট। 'পতন', 'বন্ধুকৃত্য', 'সংবাদ', 'একটি খুনীর বৃত্তান্ত', 'আলোর চোখ', 'পলায়নপর' প্রভৃতি গল্পে তিনি যেমন অ্যানালিটিক, র‍্যাশনাল ও প্রগ্রেসিভ অ্যাটিচিউডের পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি জীবনের অসংগতিগুলোকে ব্যঙ্গ করে তার স্বরূপ একটা জটিলতাহীন স্বচ্ছন্দ সরল ভাষায় প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন। বক্তব্যপ্রধান লেখালেখিতেই তাঁর উৎসাহ। সাম্প্রতিকতার নগ্ন অত্যাচার তাঁর অসহ্য। চিত্ত ঘোষালের লেখার আঙ্গিক প্রকৃতি পুরোণো ঐতিহ্যের খাত ধরে এলেও গল্পের মধ্যে নাটকীয়তা সৃষ্টি এবং সংলাপের তীক্ষ্ণতা তাঁর রচনাকে একটা চারিত্র্যচিহ্ন দিতে পেরেছে।

'এই দশকের গল্প'য় অন্তর্ভুক্ত হয়েও যে সব গল্পকার মাঝখানে থেমে গিয়ে বা অল্পসল্প লিখে আবার কিছু কিছু চোখে পড়ার মতো লেখা লিখতে শুরু করেছেন তাঁদের মধ্যে অমলেন্দু চক্রবর্তী খানিকটা স্বতন্ত্র সুর শোনাতে পারছেন। তাঁর লেখায় যুগ জটিলতা একটা গতিশীল গল্পের মধ্যে থেকে আত্মপ্রকাশ করে। 'বিপন্ন সময়' ও 'অদ্ভুত আঁধারে' গল্পে তিনি তাঁর সময়মানসিকতা দক্ষতার সঙ্গেই তুলে ধরেছেন। শহর নয়- স্বাধীনতা লাভের পরে শহরে উচ্ছিষ্ট হওয়া আধুনিকতার মশলা গ্রামে পৌঁছে গ্রামীণ সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার যে নতুন চেহারা দিয়েছে, সাধারণ মানুষের মধ্যে যে স্ব বোধ জেগে উঠেছে এবং নিরক্ষরতা সত্ত্বেও রাজনৈতিক চেতনার যে জাগরণ, তা বিভিন্ন চরিত্র ও ঘটনার মধ্যে থেকে উঠে আসতে চাইছে অমলেন্দু চক্রবর্তীর রচনায়। 'সেদিন রবিবার'এ শহরের অত্যাচারে অভিশপ্ত যৌবনের শহর ছেড়ে যাবার মানসিকতা তুলে ধরেছেন। কিন্তু গ্রাম সম্পর্কে শহরবাসীর যে ইলিউশন তা যে নিছক অজ্ঞতাপ্রসূত—এটা বুঝতে বিলম্ব হয় নি তাঁর। গ্রামীন 'টাউট'দের নিঃসংকোচ কাজ কারবার এবং বড় মানুষ ও ধনিকশ্রেণীর লোকদের রূপ স্বরূপ চিত্রচরিত্র তিনি অত্যাচারিতদের পাশে দাঁড়িয়ে দেখে সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের শহর মনস্কতার মধ্যে খানিকটা অন্য সুর তুলতে চেষ্টা করেছেন বলে মনে হয়।

কোনো কোনো তরুণ লেখকদের গ্রাম সম্পর্কে উৎসাহ দেখা দিলেও তা সাহিত্যে বিশেষ কার্যকরী হয় নি। অনেকের মতো থেমে থেকে আবার লিখতে

এসে যশোদাজীবন ভট্টাচার্য বা সোমনাথ ভট্টাচার্য বহু ব্যবহারে বর্ণহীন নৈরাশ্য-বাদকেই তাঁদের লেখায় চোলাই করে উপস্থিত করেছেন। মনস্তাত্বিক কৌতূহল ও জিজ্ঞাসায় ব্যক্তির অবচেতন মনের প্রবৃত্তিগুলোর অসংগতি উদ্ধারেই যশোদা-জীবন ভট্টাচার্যের উৎসাহ। সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি বা ধর্ম আধুনিক মানুষকে যে কোনো আশ্বাসই দিতে পারে না, এ কথাটাই অনেকের মতো তাঁর লেখাতেও আর্তনাদ হয়ে ওঠে। "চাবি, ঘরের চাবি আমার। ডুকরে ওঠে হৃদয়।" 'ঘরের চাবি'র এই হাহাকার থেকেই এসেছে নিষ্ঠুর নির্লিপ্ততায় 'শব সাধনা'। সোমনাথ ভট্টাচার্য আরো ভয়াবহ রূপে জীবনের বিবর্ণতাকেই স্পষ্ট করে তুলেছেন 'গিরগিটি ও নীলমাছি'তে। পিতা গিরগিটিতে রূপান্তরিত এবং কন্যা নীল মাছিতে। খাদ্য খাদকের সম্পর্ক। গিরগিটি পিতা নীল মাছি কন্যাকে খেয়ে ফেলতে ছুটেছে—এই বৃত্তান্ত। অন্যান্যদের তুলনায় কিছু বেশি লেখালেখি করলেও অজয় দাশগুপ্ত র 'যন্ত্রণা থেকে' শুনতে পাওয়া যায় "শহর টোপ ফেলেছে —কামনার টোপ। প্রাগৈতিহাসিক অরণ্য থেকে আবার সে সভ্যতার রাজ্যে সকলকে নিয়ে এসে নাকানি চোবানি খাওয়াচ্ছে। সব মেয়েপুরুষ প্রাণপণ যুঝছে। আমার সব চিন্তা আচ্ছন্ন হয়ে এল। চাবুকের সঙ্গে ঘুমের অনুভূতি ছুটল। তাড়া খেয়ে কোটরে ফিরে পিঠ বাঁচাতে গিয়ে মনে হল আমি ক্লান্ত। শহরের হাতে মার খেয়ে তার ছেড়ে দেওয়া পোষা সভ্যতা নামক জন্তুর সামনে ধরা পড়ে আবার জেগে উঠব।" স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যেও দেখা দিয়েছে জীবন সংকটের দৃশ্য উন্মোচনের প্রয়াস। তাৎক্ষণিককে তিনি নতুন তাৎপর্য দিয়ে স্মরণীয় করে তোলেন। 'অস্থি' নামের গল্পে তিনি আবেগঘন ভাষায় "মনিময়ের বাড়ি চুরি" হয়ে যাওয়া তুলে ধরেছেন। আর, অজয় গুপ্ত 'অনুচ্চারিত শব্দগুলি' 'একজন দ্বার-রক্ষীর স্বপ্ন' প্রভৃতি গল্পে কোনো জটিলতা না এনে শ্মশান ও কবরের ভূমিতে দাঁড়িয়ে প্রেম আর পাপ বিষয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। "ওর (জানালার মেয়েলোক) হাত ধরে কাল রাত্রে পাপ ঢুকেছে কবরখানায়"—বাক্যটিতে হাসি-কান্না জড়িয়ে অজয় গুপ্ত একটা গভীর বোধের দ্যোতনা এনেছেন।

মৃত্যুচিন্তা, উদ্দেশ্যহীন জীবন, যন্ত্রণাদগ্ধ হৃদয়, নিঃসার নিরাপত্তাহীন অবলম্বনহীন ও পরিচয়হীন মানুষের দুর্দশা থেকেই বহমান এক্ষণের সাহিত্য। পরবর্তীরা আনতে পারছেন না বিশেষ কোনো পরিবর্তন—তেমন জোরও নেই অনেকের লেখায়। তবু প্রলয় সেন, সুভাষ সিংহ, মিহির মুখোপাধ্যায় এবং কবিতা সিংহ 'আজকের গল্প'য় চিহ্নিত। প্রলয় সেনের 'দুর্ঘটনার আগে' এবং

'তাল পাতার বাঁশি' নামের বই দুটি নিতান্ত মামুলি না হলেও তেমন বিরাট কিছু দাগ রাখার মতোও নয়। ছোটগল্পে তিনি হালফিলের অসহায়ত্বের বোধকেই প্রকট করে তোলেন। 'অনুসন্ধান'-এ ধরা পড়ে যে-জীবন তা হোলো "অনেক রাত্রে নির্দিষ্ট চায়ের দোকানে নির্দিষ্ট বন্ধুদের সঙ্গে যুগপৎ গভীর তত্ত্বালোচনা এবং অনর্গল খিস্তি দেবার পর বাড়ি ফিরে চোরের মত মাথা গুঁজে খাওয়া শেষ করে সেই ক্রমশ ঢাল হয়ে আসা সিঁড়ির নিচেকার অনতিপ্রশস্ত ঘরে ঢুকে বিছানায় টানটান হয়ে শুয়ে অনেক কিছু ভাববার চেষ্টা করতেই চারদিকের উদ্ধত অসহ্য নীরবতার অর্ধজাগ্রত বোধের মত ভেতরকার ব্যথাটা কিলবিল করে উঠে তার দোমড়ানো দেহটাকে, তার বুকের ডানদিক বাঁদিক পার্শ্বস্থ যন্ত্রণাকে, তার শক্ত মাথার খুলির অভ্যন্তরস্থ অমসৃণ স্নায়ুগুলোকে ধীরে ধীরে নিস্তেজ করে ফেলে। আর তখন রজতের শরীরের ভেতরকার ব্যথাটা তাকে সময়ের অন্ধকারে শুইয়ে রেখে সারা ঘরময় উল্লাসে নৃত্য করতে থাকে।" প্রলয় সেনের 'অবেলা'তে সন্তান জন্মের মধ্যে থেকেই নারীর জীবনে যে বার বেলা নেমে আসে—সে কথাটিই সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। 'পাশাপাশি' গল্পটিতে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন একটা গতিবেগ ও প্রবল হৃদয়ার্তি।

জীবন যন্ত্রণায় বিকৃত এবং পরিবেশের মারে রক্তাক্ত ব্যক্তির আত্মপ্রতিকৃতি হয়ে উঠেছে সুভাষ সিংহের 'আমার মুখ'। আরশিতে যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ অচেনা হয়ে যায় তারই জীবন কান্না ধ্বনিত হয়েছে এ লেখায়। তাঁর গল্পের জগতে আছে 'পিপাসা'। "কি অসীম আকাঙ্খা তার, যদি সেই কিশোরকে একবারে হাত দিয়ে স্পর্শ করতে পারে। কিন্তু যতবার সে এগিয়ে গেছে প্রবল বাসনা চোখে মুখে ছড়িয়ে, নিষ্ঠুর সেই রূপসচেতন কিশোর, ততবার আরক্তিম চোখে তার দিকে তাকিয়ে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেছে।"—সময় সহবাসের অভিজ্ঞতা থেকেই অন্যান্যদের মতো সুভাষ সিংহ জেনেছেন পাওয়ার বস্তু দুরাশা —সে ছলনা। 'পদ্মভোজী' গল্পে বিধ্বস্ত জীবনের অসহায় একাকিত্বকে অদ্ভুত ব্যঞ্জনা দিতে পেরেছেন সুভাষ সিংহ। 'সন্ধান', 'খাদ', 'পতন'—গল্পের নামকরণই লেখকের জীবন দৃষ্টির পরিচয় বহন করে। 'ধূসর আকাশ' উপন্যাসও তাঁর এই বোধ থেকেই জাত। সুভাষ সিংহের গল্পে ভাবনার দিকে যত লক্ষ্য, ভাষার জোর আনতে ততোটা নয় বলেই অনেক গল্প ঢিলেঢালা হয়ে গেছে।

সমকালীন অবক্ষয় ও সমস্যা প্রপীড়িত সমাজচিত্র আঁকতেই উৎসাহ বোধ করেন মিহির মুখোপাধ্যায়। 'কালপুরুষ' নামের উপন্যাসে তিনি কোনো কোনো

চরিত্র চিত্রনে দক্ষতা দেখাতে পারলেও এ উপন্যাসে দেশ কালের চিত্র খানিকটা আবছাই থেকে গেছে। ছোটগল্পে খুব একটা বিশেষত্ব দেখাতে পারেন নি তিনি, তবে বহু গল্পই পড়বার মতো—বারবার পড়া যায় 'ছোট বিবির রন্নানি'। এই সঙ্গেই কার্তিক লাহিড়ী ও আনন্দ বাগচীর নাম করতে হয়। ভাষা নিয়ে কার্তিক লাহিড়ী কোনো জটিলতার খেলা খেলেন না। অল্প দু-চারটে গল্প যা লিখেছেন তা গল্পই, যদিও বিষয় নির্বাচনে অভিনবত্ব আছে। 'অপেক্ষা', 'অস্তিত্ব' প্রভৃতি গল্প বেশ সাবলীল ভাবেই লেখা। কবিতায় আনন্দ বাগচীর নাম সবিশেষ থাকলেও গদ্যে তাঁর হাত ন্যূন নয়। তাঁর 'চকখড়ি' বেরোনোর সংগে সংগেই নবীন পাঠক মহলে এবং নতুন রীতির সাহিত্য রসিকদের মধ্যে তা সাড়া জাগায়। বেশ অনেকদিন ধরে ইনি টুকটাক লিখে চলেছেন কিন্তু কোনোটাই তেমন কিছু রিমার্কেবল হয়ে উঠছে না। অন্তরঙ্গ এবং ঝরঝরে লেখা এঁর সহজেই আসে, কিন্তু এক্সপেরিমেন্টের ব্যাপারগুলোয় মনে হয় বেশ দ্বিধান্বিত লেখক। ফর্ম নিয়ে পরীক্ষার নজীর তাঁর কাব্যোপন্যাস 'স্বকালপুরুষ'।

এ পর্বের সাহিত্যে আরো অনেক কিছুর অভাবের মধ্যে এক বড় অভাব গদ্য লেখিকার। কবিতা সিংহ ছাড়া উল্লেখ করার মত কোনো নাম নেই, চোখেও পড়ে না। এক দিক থেকে দেখলে অব্যবহিত আগের সাহিত্যে বা পুরোণো ধারার যে সাহিত্য এখনো সমান্তরাল চলে আসছে তাতে, লেখক ও লেখিকার সাহিত্য কর্ম স্পষ্টতই দুই জাতের হলেও এ সময়ে সে ফারাকটুকু আদৌ নেই। নাম চাপা দিয়ে কবিতা সিংহের উপন্যাস 'পাপ পুণ্য পেরিয়ে' বা ছোটগল্প 'সব হিসেবের বাইরে' পড়লে ধরা যায় না রচনাকার মহিলা কি পুরুষ। যে সমাজে নারীপুরুষের ভেদাভেদ ভালো এবং মন্দ উভয়তই লোপ পেয়ে আসছে সেখানে প্রকৃত দর্পণ হিসেবে সাহিত্যকর্মে লেখক না লেখিকা এই রং উবে যাওয়াই হয়ত স্বাভাবিক। যুগলক্ষণের এই একটি বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন হিসেবে কবিতা সিংহের লেখা অবশ্যই উচ্চারিত হবে। "একটি পুরুষ একটি মেয়ে। পাঁচ বছর আগে তাদের যখন ঈশ্বরের বাগানে রাখা হয়েছিল, তকতকে নতুন ছিল। সুন্দর ছিল। অম্লান মর্মর। বেশ পবিত্র দেখাত। আদর্শ দেখাত।... তারপর ঝড় জল বৃষ্টি গেছে। শ্যাওলা পড়েছে। ছোট ছোট ফুটো, টুকরো খসে গেছে। বসন্তের দাগের মত যেখানে যেখানে পাথরে দুর্বলতা ছিল, ঝুরো ঝুরো বালি খসে পড়েছে। সুন্দর পুরোণো হয়ে, একটু পোড় খেয়ে তারা দুজনে

সেই ঈশ্বরের বাগানে দাঁড়িয়ে আছে। সব গেছে। কেত্রে শুধুমাত্র এখনো কোনো চিড় ধরে নি।"—এই রচনাংশই প্রমাণ করে ওপরোক্ত বক্তব্য।

* * * *

বাংলা গল্প উপন্যাসের প্রবাহে এই একেবারে এখন ভাঁটা লেগেছে বললে অত্যুক্তি হবে না। এক দিকে তথাকথিত সাহিত্য পত্রিকাগুলো 'সর্বজন পাঠ্য' গল্প উপন্যাসে যৌনতার জোরালো মশলা দিচ্ছে, অন্যদিকে পিন-বন্দী যৌন পত্রিকাগুলো যৌনবিজ্ঞানের (?) সংগে ভেজাল দিচ্ছে বিপ্লব নামক আরেক উত্তেজক পদার্থের। এ দুয়ের মাঝখানে হাংরী জেনারেশন আন্দোলনের জন্য কয়েক গদ্যকারের লেখালেখি ছাড়া কোনো গল্পকারই পাঠকদের নাড়া দেবার মতো বিশেষ কিছু রচনা করতে পারেন নি। এ সময়ে গল্প নিয়ে পরীক্ষারই বাড়াবাড়ি দেখা দিয়েছে, নিরীক্ষা নেই। তবে, 'শাস্ত্রবিরোধী' লেখালেখিতে উৎসাহ পেয়ে কিছু লেখক যেমন গল্প থেকে শব্দ বাদ দিতে চেয়েছেন বা দাঁড়ি কমার ভিড় এনেছেন কিম্বা ভেঙে ভেঙে শব্দ সাজিয়েছেন অথবা দাঁড়ি কমার উচ্ছেদ ঘটিয়ে কেবল অঙ্কিত শব্দের প্রবাহ দিয়েছেন, তেমনি শাস্ত্র মেনেও ভেতর থেকে পরিবর্তন এনে কোনো কোনো লেখক গল্পে নতুনত্ব আনতে চেষ্টা করেছেন। এই দুই ধারার লেখালেখির মধ্যে থেকেও তবু কিছু লেখা বেরিয়ে এসেছে, যা লেখকদের শক্তির পরিচয় দেয়—জানায় তাঁদের তীব্র অনুসন্ধিৎসার কথা। শাস্ত্র বিরোধী লেখালেখির ফতোয়া দিয়ে যাঁরা গদ্য লিখতে শুরু করেছেন, রমানাথ রায় তাঁদের মধ্যে প্রধান এবং এ ধরনের আন্দোলনের সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকেও তিনি কিছুটা নতুনত্ব দেখাতে পেরেছেন। গল্পে কোনো তর্ক বা তর্কশাস্ত্রীয় ক্রম অনুসরণে তাঁর অপছন্দ এবং তা আমদানীও করেন না। রমানাথ রায় রচনাকে সমস্ত দার্শনিকতা ও সাহিত্যিকতা থেকে মুক্ত করতে চান। তাঁর মতে 'সাহিত্য শুধু শব্দের ওপর শুধু বাক্যের ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে। সাহিত্য শব্দের বৈজ্ঞানিক সমাবেশ ছাড়া কিছু নয়।' তিনি তাঁর গল্পের মধ্যে টাইম এ্যাণ্ড এফেক্ট রক্ষার দিকে বিশেষ ঝোঁক দিয়ে একটা মুহূর্তের অবস্থার মধ্যে চলে যেতে প্রয়াসী। যন্ত্রণা জটিলতার বিরুদ্ধে কি যেন অন্য কিছু বলার তাগিদ, পরিবেশের দুঃস্বপ্ন ছাড়িয়ে যাবার ব্যাকুলতা, বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা, ইঙ্গিত ধর্মী শব্দে ও কাটা কাটা উক্ত-পুনরুক্ত সংলাপের মাধ্যমে রীতিমত একটা ক্লান্ত মানসিকতা তাঁর রচনাকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। তাঁর 'ঝাড় লণ্ঠনের তেকোণা কাঁচ', 'সামনের

সাতাশ', 'ক্ষত', 'আহ্বান', 'দুর্বোধ্য', 'কেকো' প্রভৃতি গল্প বা লেখা দৃশ্যতই নতুন—এ সবে তিনি শৈশব, মৃত্যু, সত্য ও সমকালের বোধ উপস্থিত করেছেন। রচনায় মুন্সীয়ানা রমানাথের আছে কিন্তু যে কথাটা এক লাইনে প্রকাশ করা যায়, সেটাকে তিনি ভেঙে ভেঙে সাজিয়ে গোটা গোটা পৃষ্ঠা ব্যয় করে বলেন। এ ব্যাপারটা একধরণের এফেক্ট সৃষ্টি করতে পারলেও, আসলে তা একটা চালাকী বলেই মনে হয়। এবং এ জাতীয় ব্যাপারকে পাঠক বেশিদিন সহ্য করবে বলে মনে হয় না। "কোকো! /–কি? /—মই-টই কোথায়? /–বিনুকে জিজ্ঞেস কর। /—বিনু কে? /–তিনুকে জিজ্ঞেস কর। /–তিনু কে? /–দিনুকে জিজ্ঞেস কর। /—দিনু কে? /—চিনুকে জিজ্ঞেস কর। /–চিনু কে? /—চেন না? /—না। /—কাউকে না? /—না।" ইত্যাদি এবং শেষে "—তাহলে? /—কোকোকোকোকোকোকোকোকোকো ../–কিকিকিকিকিকিকি-কিকিকি..."। ব্যস। গল্প।

অবশ্য রমানাথ রায় অত্যন্ত সততার সঙ্গেই আপন বিশ্বাসে তথাকথিত শাস্ত্র বিরোধিতায় কিছুটা সার্থকতা দেখাতে পারলেও তাঁর আন্দোলন সঙ্গীদের অনেকেই শুধুমাত্র চালাকী পুঁজি করে এগোতে গিয়ে অন্ধকারে চিৎকার করেছেন। আশিস ঘোষ এবং শেখর বসুও প্রথামুক্তির আন্দোলনে সহযাত্রী। এই সময়ের ক্লান্তি, অর্থহীনতা, বিতৃষ্ণা, অনিশ্চয়তা এবং বিমর্ষ ও বিস্বাদ জীবন আশিস ঘোষের 'স্বাদ', 'আমি', 'যদি', 'অলক্ষ্য', 'সময়', 'হয়ত', 'ি‍ন্তু' প্রভৃতি গল্পে বেশ ভালোই ফুটে উঠেছে। শেখর বসু গল্পের কাঠামোতেই গল্প বলেন কিন্তু চরিত্র বা ঘটনাকে তিনি পরোয়া করেন না। অ্যাকশনের ডিটেলে তাঁর আশ্চর্য নজর—রচনার অন্ত ইঙ্গিত ধর্মী। 'অনন্তর', 'অথচ', 'মুখ', 'সমতল', 'দৌড়', 'শেষে' প্রভৃতি গল্পে উৎকণ্ঠা, ক্লান্তি, জিজ্ঞাসা, জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা ইত্যাদি শব্দে শব্দে বুনে যাওয়া হয়েছে। "ছেলেটা দৌড়োচ্ছে ...দৌড়োচ্ছে .. / ছেলেটা না ছেলেটার মত! চারদিকে গাঢ় অন্ধকার। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। না আমাকে না অন্যকিছু। শুধু সামনের গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে আরও গাঢ় অন্ধকার, ছেলেটার মাপের একটা অন্ধকার, এক্কার পেছন পেছন একটানা ছুটে আসছে।"—একটা কবিতার মতো ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে শেখর বসুর অনেক রচনা। অমল চন্দ, বলরাম বসাক, সুব্রত সেনগুপ্ত প্রমুখ গল্পকারের রচনা প্রায় গোষ্ঠীচর্চার চর্বিত চর্বণ হয়ে উঠেছে। অথচ স্বকীয়তা অর্জনের ক্ষমতা অনেকেরই আছে। অমল চন্দর 'এগোতে লাগল', 'বলরাম

বসাকের 'নাগরদোলা', সুব্রত সেনগুপ্তর 'বাইরে' তাঁদের সম্ভাবনারই চিহ্নবহ।

এ সময়ের তরুণতর লেখকদের রচনাকে ছোটগল্প, উপন্যাস কি বড় গল্প এসব ভাগে বিভক্ত করে দেখা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। কেননা দেখা গেছে একটা খুদে রচনার মধ্যে যেমন উপন্যাসের ব্যাপ্তি আছে, তেমনি তুষার রায়ের 'শেষ নৌকা'-র মতো বড়গল্পেও আছে ছোটগল্পের স্বাদ। আবার কোথাও কোথাও রচনাটা কবিতা না গদ্য এ নিয়ে সংশয় জাগে। তাই এ সময়ের রচনাকে হয় গদ্য নয়ত কবিতা হিসেবে চিহ্নিত করার নীতি নিলে মোটামুটি ভাবে খানিকটা তফাৎ বুঝতে পারা যাবে। এখন বৃহদাকারের আদি-মধ্য-অন্ত সম্বলিত কাহিনী, নায়কনায়িকা এবং ঘটনার ঘনঘটা ভরা লেখায় তরুণদের উৎসাহ প্রায় নেই বললেই চলে। প্রায় সবাই-ই অস্তিত্বের অভিব্যক্তিকেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপ রেখায় ফুটিয়ে তুলতে চাইছেন—গদ্যটাকেই করে তুলতে চাইছেন শরীরী অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার প্রতীক। যদিও এর উৎস দীপেন-দেবেশ-সন্দীপন প্রমুখ অগ্রজ লেখকদের রচনায়, তরুণতরদের অনেকেই অনুকৃতির মধ্যে থেকে একটা স্বকীয়ত্ব অর্জন করতে পারবেন বলেই আশা করা যায়। কেননা 'স্বরান্তর' 'উত্তর তরঙ্গ' 'মধ্যাহ্ন' 'এই দশক' 'পঞ্চতন্ত্র' 'লেখা ও রেখা' 'কলকাতা' প্রভৃতি ক্ষুদে সাহিত্য পত্রিকা এবং 'পরিচয়', 'চতুষ্কোণ', 'এক্ষণ', 'সাহিত্যপত্র' 'গল্পকবিতা', 'শুকসারী'-প্রভৃতি অবাজারে বিশিষ্ট সাহিত্য পত্রপত্রিকার পাতায় বহু তরুণের উল্লেখযোগ্য গল্পের প্রকাশ তারই সাক্ষ্য বহন করছে। মফঃস্বল থেকে প্রকাশিত ক্ষুদে পত্রিকাগুলোর পাতাতেও উঁকি দিচ্ছেন বহু সম্ভাবনাপূর্ণ গদ্য লেখক। সকলের নাম উল্লেখের সময় এখনই না হলেও সত্যেন্দ্র আচার্য, উদয়ন ঘোষ, রঞ্জিত রায়চৌধুরী, রবীন্দ্র দত্ত, বেলাল চৌধুরী, শুদ্ধশীল বসু, যিশু চৌধুরী প্রমুখ গদ্যকার ইতিমধ্যেই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছেন।

রঞ্জিত রায়চৌধুরী কিছু কিছু কবিতা লিখলেও গদ্যেই উল্লেখযোগ্য অবস্থান করে নিয়েছেন। গল্পকে তিনি অনিয়ন্ত্রিত খেয়ালে বাঁধেন না। সময়ের মারে পর্যুদস্ত জীবনের অভিপ্রকাশ তাঁর লেখায় আছে। মানুষের সংগ্রামের প্রতি তিনি আস্থাশীল যদিও শৈশববিলাস তাঁর মধ্যে দেখা যায়। 'শত্রুঘ্ন', 'ড্রয়ার', 'দুর্ঘটনা', 'জলযান', 'পদাতিকের গল্প' প্রভৃতি রঞ্জিত রায়চৌধুরীর শক্তি সামর্থ্যের সাক্ষী। লেখকের কথাতেই বলা যায় গল্প লেখাটা তাঁর দায় "......সব খোঁজা-খুঁজি সব জানাজানির পরেও একটা জায়গা থাকে যেখানটা একেবারে না দেখে শুনে পাওয়ার চেষ্টা করতে হয়। না হলে গল্প গল্প হয়ে ওঠেনা।...গল্পটার জন্ত

আমার অমরতার দাবী নেই। তবে এটা বলার দায় আমার আছে। কেননা আমি ভীষণভাবে গল্প বলার জন্য—যে হেতু কবে কখন বলা শুরু করেছিলাম একদিন, দায়বদ্ধ।"

তুষার রায় কবিতার ব্যাপারে যেমন বোল্ড, গদ্যের ক্ষেত্রেও পরীক্ষা করতে বেমক্কা ঝুঁকি নিয়ে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। তিনি খানিকটা হুড়মুড় করে লেখেন। পদে পদে বিস্ময়রসের জোগান দিয়ে, নতুনের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিতেই তাঁর উৎসাহ। সমসাময়িক লেখকদের জীবনযাত্রা প্রণালী তাদের প্রেম-প্রেমহীনতা, পাপপুণ্য, অসহায়তা, নিরাপত্তাহীনতার বোধ, কান্না এবং সজোরে আমদানি করা আনন্দ এবং আনন্দ ভাঙার অবসাদ বেদনা নিয়ে হালে তুষার রায় একটি বড় গল্প লিখেছেন 'শেষ নৌকা'। চিত্র গন্ধ স্বর আর গতিবেগময় এ লেখা গোত্রে সর্বৈব নতুন। আপাত দৃষ্টিতে বিষয় বস্তু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম দিকের কোনো উপন্যাসের কথা স্মরণ করালেও 'শেষ নৌকা'র জাত চরিত্রই আলাদা। লিপি কৌশল এবং অ্যাটিচিউডের বলিষ্ঠতার জন্যে যে লেখা একটা দাগ রেখে যাওয়ার মতো উপন্যাস হতে পারতো, ধৈর্যের অভাব এবং অতি খেয়ালিপনার জন্যে তিনি নিজেই তাঁর বিঘ্ন হয়ে উঠেছেন। তবু তাঁর একগুঁয়েমিই এ রচনার শেষ রক্ষা করতে পেরেছে। 'তিমির তলপেটে সুখ', 'সময়ানুপাতিক নামচা' প্রভৃতি গল্প সম্পর্কে তুষার রায়ের নিজেরই একটা বাক্য উদ্ধার করা যেতে পারে, "আমার মেধা এসময়ে এক মদেলু নেশায়, অশ্লীল জরাক্রান্ত হয়ে হয়ে বিচিত্র সব যৌন চিন্তায় ওতোপ্রোত ও ভারাবনত হচ্ছে।"—আর সেই মেধারই ফসল এ সব।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে অতি সাম্প্রতিককালে কবিরা গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রেও চলাফেরা করছেন, সম্ভবতঃ তাঁদের সঠিক প্রকাশ মাধ্যমটি খুঁজে পাওয়ার জন্যে। কেউ কেউ দক্ষতা দেখাতেও পারছেন। 'লোহারিয়া' ও 'পদধ্বনি-প্রতিধ্বনি'র লেখক রবীন্দ্র গুহ কিম্বা সত্যেন্দ্র আচার্য, বেলাল চৌধুরী, দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এ সময়ের গদ্যকারদের অনেকেই গদ্য পদ্য উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষমতার নয়া পরিচয় দিচ্ছেন। রবীন্দ্র গুহর 'মাত্রাবৃত্তের শিশু' গল্পে কিন্তু কাব্য নেই আছে বেগ। এবং এই বেগই তাঁর 'অবিরাম চতুর্দিকে' গল্পে শুনিয়েছে "আমার জানা ছিল না হৃদয়ের আগুপিছু এমন অনেক হৃদয় আছে যা নামগোত্রহীন।" সত্যেন্দ্র আচার্য গদ্যের মধ্যে দৃশ্যতঃ একটা সূক্ষ্মতা নিয়ে আসেন। 'ত্রিলোকদর্শনের জন্য স্বপ্ন' এবং 'পরমপুরুষ এবং স্বপ্নের রেলগাড়ি'

গল্পে তিনি স্বপ্ন এবং বাস্তবে মাখামাখি করে একটা প্রতীকী ভাষায় মানুষের কথাই বলেছেন। "আমরা সবাই আমাদের গন্তব্যে চলেছি। নারী আর পুরুষ। এই দুই শ্রেণীর জীব আমরা চলেছি লোকালয়ে।"—মানুষ ছাড়া সত্যেন্দ্র আচার্যর গল্প ভাবনা যে অসম্ভব তা তাঁর বিভিন্ন লেখার মধ্যেই স্পষ্ট। অথচ বেলাল চৌধুরীর অভিজ্ঞতা "ভাঙা উনোন, কয়েকটা পোড়া কাঠ, এখানে ওখানে ঘর বাঁধার চিহ্ন সবই যেন গুনগুন করে বিলাপের স্বরে বলছে এখানে একদল মানুষমানুষী ছিল যারা এখন আর নেই—এখানে যারা আসে কেউ থাকে না।"—'একান্ত ব্যক্তিগত' এ উপলব্ধি একটা নির্লিপ্ততার মেজাজই নিয়ে আসে।

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় কবি হিসেবেই অতি তরুণ সাহিত্যে নিজেকে পরিচিত করিয়েছেন। কিন্তু ছোটগল্পেও ইতিমধ্যে তিনি হালফিলের লেখা-লেখির মালমশলা কব্জা করে নিয়ে তার মধ্যে ব্যক্তিগত অনুভূতির সূক্ষ্মতা জুড়ে স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর শোনাতে পারছেন। 'হাওয়া ওড়ায় চুল', 'মনোরমা নিকেতন' গল্পে এর সাক্ষ্য আছে। 'বঙ্গসুন্দরী'তে তিনি মানুষের মৌল আকাঙ্খাটিকেই সজোর বিশ্বাসে ব্যক্ত করেছেন, "মনে হয় ভালোবাসার জন্যে মানুষ কোটি বছর বাঁচতে পারে। সে ভালোবাসার জন্যে উন্মুখ প্রতীক্ষায় থাকে। ভাবে, ভালোবাসা পেলে একাকীত্ব কেটে যাবে। তাই হয়—নিঃসঙ্গতা আর থাকে না।"—দেবাশিসের এ প্রত্যয় তরুণতর লেখালেখির মধ্যে এক অন্য স্বাদ।

সাম্প্রতিকতম গল্পের মৌলিক লক্ষণ নির্লিপ্ততা, কৌতুক বোধ এবং আপন আইডেনটিটির সমস্যায় তাবৎ কিছুর সঙ্গে মোকাবিলা করার তাগিদ। প্রায় সব ক্ষেত্রেই নায়ক লেখক নিজে। আত্মপ্রতিকৃতি রচনা ও স্বীকারোক্তি দিতেই প্রায় সবার উৎসাহ—বিমূর্ত বোধকেও গল্পের চরিত্র করে নেয়া হয়েছে এ সময়ে। নিকট অগ্রজ লেখকদের ভাব বস্তু বোধ থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টির জোর প্রয়াস থাকলেও এখনো স্পষ্ট পার্থক্য খুব একটা দেখা যায় নি অনেকের লেখায়। উদয়ন ঘোষ 'অবনী বাড়ি নেই', 'অবনীর মণিমুক্তা', 'অবনী চরিত' অর্থাৎ অবনী সিরিজের গল্প কটিতে খুবই সূক্ষ্ম অনুভূতির ছড় বুলিয়েছেন। একটানা ঘন গৎ-এর মতো—দীর্ঘ দীর্ঘ বাক্য, তার তীব্র গতি। তরাসে অবনীর বাড়ি ফেরা যেন পাঠকেরই বাড়ি ফেরা। "তার স্ত্রী ময়ূরের মতো ভয়ার্ত চীৎকারে চৌচির হয়ে গেল, 'কে?' উদয়ন ঘোষের লেখার কৌশলে 'কে' এই প্রশ্ন পাঠককে সচকিত করে তোলে। তাঁর 'শান্তনুর হাত পা—মানুষের চূড়ান্ত অসহায়ত্বের বোধ থেকে জাত। "সে (শান্তনু) দুনিয়ার রাজা, অথচ তার হাত পা খসে গেল"।

এমনি উপক্রত বোধ থেকেই রবীন্দ্র দত্ত গল্প লিখতে শুরু করেছিলেন। 'শব্দভ্রান্তি', 'অরাজকতা', 'শহীদ স্মৃতি' প্রভৃতি গল্পে তিনি দমবন্ধ জটিল ও আলোহীন পরিবেশকে ধোঁয়াসা জমাট করে উপস্থিত করেছেন। গোপালের জীবন দিয়ে তিনি তাঁর চাপা ও গুমোট স্বভাবের প্রকাশ এনেছেন। 'সীমান্ত' গল্পে এই গুমোট অস্বস্তি ফেটে পড়েছে, 'মৃত্যু আলো কি? না, অন্ধ বিষাক্ত মানুষ সকল? তা হলে আমি থাকবো না'। এই মানসিকতাই বুঝি তাঁকে লেখায় থেমে যেতে বাধ্য করেছে।

আগেই বলা হয়েছে অতিসাম্প্রতিক গল্প সাহিত্য খুব একটা জমাট কিছু হয়ে ওঠে নি, সবে এদিক সেদিক থেকে উঁকিঝুঁকি মারছে কিছু কিছু মুখ। নতুন লেখকরাও বেশিদূর অনেকেই অগ্রসর হতে পারছেন না। দেখেশুনে গল্প উপন্যাস সম্পর্কে খানিকটা হতাশ হবারই মতো। তবু ওর মধ্যে যেমন শুদ্ধশীল বসুর 'অতর্কিতে হঠাৎ অমলা' 'নিষিদ্ধ শরীর' 'সত্য প্রসন্নর প্রথম ও শেষ, ; কল্যাণ সেনের 'ঘুমের আগে' 'জবানবন্দী' 'সমুদ্র' প্রভৃতি ন্যূনতম গল্প আছে ; তেমনি আছে শৈলেন্দ্রনাথ বসুর ইতর শব্দ রহিত এবং বেপরোয়া ভঙ্গীতে লেখা 'ঘোড়া', 'আত্মঘাতী জ্যোৎস্না' 'রৌদ্রশাসন'; সুখেন্দ্র ভট্টাচার্যর 'অন্ধকারে মৃত্যুর স্বাদ' ; 'জন্ম' যিশু চৌধুরীর 'এম্ব্রয়ডারী' 'ঘোড়া পূজা' প্রভৃতি সম্ভাবনার দিক-নির্দেশক গল্প। এ ছাড়াও আরো বহু নতুন মুখ দেখা যাচ্ছে। 'থাবা' ও 'বিচারক' গল্প অনেককেই সম্ভবত অরুণেশ ঘোষ সম্পর্কে উৎসুক করেছে। সমীর রক্ষিত, অসিত ঘোষ, শঙ্কর ঘোষ বা চণ্ডী মণ্ডল যদি ঠিক মতো লিখে যেতে পারেন তবে একদিন আলোচ্য হবেন বলেই বিশ্বাস। সংগ্রাম সংঘর্ষ চলছে। চলছে মোড় ফেরানোর চেষ্টা। চারদিকের চলমান জীবনের রিপোর্টকে একটা অভিনব ভঙ্গীতে পরিবেশন করা হচ্ছে। এবং তাই নিয়ে লেখা হয়েছে কল্যাণ চক্রবর্তীর 'যদি জানতেম' উপন্যাস। বিষয় ভাবনা ও চরিত্রের মধ্যে মামুলিত্ব বর্জন করে নতুন লেখালেখির এই সমবেত প্রয়াসের মধ্যে হাংরি জেনারেশনের আন্দোলন সবিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে এবং তা স্বতন্ত্র আলোচনার দাবী রাখে।

* * * *

১৯৬১ ৬২ সালে কলকাতার শিল্পী সাহিত্যিকদের মধ্যে 'হাংরি জেনারেশন' নামে একটা আন্দোলন বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। প্রথম প্রথম এ আন্দোলন তেমন কিছু দানা বেঁধে উঠতে পারে নি কিন্তু বেশ জোরদার হয়ে ওঠে ১৯৬৩-৬৪ সালে যখন বাসুদেব দাশগুপ্ত, শৈলেশ্বর ঘোষ, প্রদীপ চৌধুরী, সুবো আচার্য,

সুভাষ ঘোষ, মলয় রায়চৌধুরী, সুবিমল বসাক প্রভৃতি শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সমীর রায়চৌধুরী প্রমুখ হাংরি আন্দোলনের প্রথম উদ্যোক্তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র ভাবে আন্দোলন শুরু করেন। অশ্লীলতার দায়ে এঁদের বিচারের প্রহসন হয়ে গেছে। বাংলা সাহিত্য এই আন্দোলন থেকে পেয়েছে কয়েকজন অতি শক্তিশালী কবি ও গল্প লেখক। এই সব গল্প লেখক সাহিত্যে সম্পূর্ণ একটা নতুন ধারার সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। এতদিন পর্যন্ত প্রতীকী জগৎ এবং বাস্তব জগৎ ছিলো আলাদা—প্রতীক ভাবনা নিয়ে অল্প বিস্তর পরীক্ষা হলেও তা তেমন কিছু হয়ে উঠতে পারে নি; এবারে বাস্তব এবং প্রতীকী জগৎ আর বিচ্ছিন্ন রইলো না। বাস্তব, স্বপ্ন, অবচেতন সব একাকার হয়ে 'এক-'এ পরিণত হোলো। বাস্তব সত্যরূপ পেয়ে পরিণত হোলো লেখকের রক্তমাংসে। অতি-বাস্তব স্বাভাবিক ভাবে তাঁর মেধা অধিকার করলো। বিমূর্ত দৃশ্য রচনায় এলো নির্ভীক দক্ষতা। বাস্তব ও বিমূর্তকে অতি সূক্ষ্মভাবে মেলানোর চেষ্টা ও সফলতাও দেখা গেলো কোনো কোনো লেখকের মধ্যে। এতদিন গল্পকে কবিতার কাছাকাছি নিয়ে আসার যে চেষ্টা চলছিল তাকে এঁরা পরিণতি দিতে পারলেন বলে মনে হয়। শুধু ভাষা, আঙ্গিক বা শব্দ দিয়ে নয়, খাঁটি কবিতার বিষয়কেই এঁরা তুলে নিয়ে এলেন গল্পে।

কি ফর্মে, কি বিষয়বস্তুতে, কি ভাষায় একটা অদৃষ্টপূর্ব নতুনত্ব নিয়ে এসে বাংলা গল্পকে এঁরা নতুন চরিত্রের করে তুললেন। এর পাশে এখন নতুন রীতির শ্লোগান কেমন যেন মিইয়ে এসেছে। ভাষা ব্যবহারের কৌশলই এঁদের অনন্য।

হাংরি গল্পকারদের মধ্যে সমীর রায়চৌধুরী প্রধানত কবি, কিন্তু কয়েকটি গল্পও তিনি লিখেছেন। তিনি দেখেছেন "অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া ছোটে সীমান্তের দিকে। একত্রিত অনিমেশ দ্রুত নিক্ষেপে শরীর ফুঁড়ে ছিটকে বেরোয় বাইরে। একটা স্তব্ধ মুহূর্ত। বার্তা পৌঁছয়।" 'জলছবি' গল্পে তাঁর গল্প শৈলীর কিছুটা পরিচয় ফুটেছে। কিন্তু হাংরিয়ালিষ্ট গল্পকার হিসেবে বাসুদেব দাশগুপ্তই শ্রেষ্ঠ এবং নিঃসন্দেহে শক্তিশালী। এঁর 'রন্ধনশালা' গ্রন্থ প্রকাশের পর সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় সম্ভবত তার 'বমন রহস্য' গল্পটি আলোচনা করেই 'জামালের জন্যে ভূমিকা'-এ লিখেছিলেন, এঁর লেখা বাংলা ইমাজিনেটিভ সাহিত্যে অচিরেই একটা অপ্রত্যাশিত ভূমিকা নেবে ; আর বিমল রায়চৌধুরীরা 'জলসা'-এ হয়ত ঠাট্টা করেই বলে থাকবেন 'উঠতি সামুয়েল বেকেট'। এ উক্তির যথার্থ কাল বিচার করবে।

তবে সন্দেহ নেই বাসুদেব দাশগুপ্ত পূর্ববর্তীদের সঙ্গে জাতে সম্পূর্ণ আলাদা। নতুন আঙ্গিকে, নতুন ভাষায়, ক্রুড বিষয়বস্তুকে ভয়ঙ্কর ক্রুড করে তুলে কখনো বা অপরিসীম নির্লিপ্ততার সঙ্গে বাস্তবকে ফ্যান্টাসি করে প্রকাশ করেন। কখনো তাঁর লেখা হয়ে ওঠে ক্রুর নিষ্ঠুর কখনো বা অদ্ভুত দরদময় সাংগীতিক। এণ্ডারসন, লুই ক্যারল এবং ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়কে আত্মসাৎ করে, সমস্ত পরিবেশকে চিবিয়ে খেয়ে, হজম করে (হাংরি দর্শন অনুযায়ী), রাজনীতির কুৎসিত ন্যাকামি, সমাজের অন্তর্নিহিত পাপ, অশ্লীলতা, অবক্ষয়, মানুষকে হত্যা করার ক্রনিক ষড়যন্ত্র ও কর্মতৎপরতা, হিংসা, ঈর্ষা, লোভ, নৃশংসতা, নিষ্ঠুরতা, বীভৎসা ও তার চতুরতা প্রভৃতিকে ঘৃণা করে নির্দয় আঘাত করেন বাসুদেব দাশগুপ্ত। মানুষের মৌলিক অসঙ্গতিগুলো দেখে তিনি যেমন কৌতুক অনুভব করেন, তেমনি মহৎ নাম নিয়ে যে সব নীতি স্বাধীন মানুষকে শাসন করে আসছে, যে শক্তির সামনে মানুষ প্রতিনিয়ত অসহায় হয়ে আসছে, নপুংশক হয়ে পড়ছে এবং ভেড়ার পালের মতো যুথবদ্ধ নির্জীব পশু জীবন ভোগ করছে, সেই নীতি ও শক্তির মুখোশ ছিঁড়ে ফেলে, চিত্রচরিত্র প্রকাশ করে নির্মম ও নিষ্ঠুর সত্য পরিবেশন করেছেন তিনি। তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে সমাজশক্তির খাদ্য সরবরাহ করার এবং রাষ্ট্রশক্তির ভূমি পরিধি বাড়ানোর যুদ্ধে বলি দেবার জন্যেই মানুষকে প্রতিক্ষণে সন্তান উৎপাদন করতে হচ্ছে এবং রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োজন নেই বলে বাধ্যতামূলক ভাবে কনট্রাসেপটিভ ব্যবহার করতে হচ্ছে অর্থাৎ ব্যক্তির মেধালিঙ্গহাতপা—তার অস্তিত্বই রাষ্ট্রীয় আইন তথা বিশেষ এক শ্রেণী স্বার্থের হাতে তুলে দিতে হচ্ছে। লেখক বাসুদেব মানুষের এই পরাধীন অস্তিত্বের প্রকৃত মুক্তির আর্তি ফুটিয়ে তুলেছেন বিভিন্ন লেখার মধ্যে। তিনি দেখেছেন, মানুষ তার প্রকৃত স্বাধীনতা হারিয়ে একটা উপক্রত অঞ্চলে প্রেম ভালোবাসা পুণ্য এসব কিছুকে ধর্ষণ করে যাচ্ছে এবং জন্ম দিয়ে যাচ্ছে স্থবির মরণ। বেঁচে থাকার জন্যে পশুশ্রমী সেই মানুষের স্বপ্নসাধ, প্রকৃত ভালোবাসা, পুণ্যপবিত্রতার আকাঙ্খা, জীবনকে জীবনের মত করে পাবার ভয়ঙ্কর আগ্রহকে তাঁর লেখায় তিনি যেমন রূপায়িত করতে চেয়েছেন, তেমনি সমাজের রাষ্ট্রের ও মানুষের মুখোশ খুলে ফেলে মাঝে মাঝে কৃষ্ণচন্দ্রের মহারাজসভার প্রভাবশালী ভাঁড় গোপালের মতো যুগযুগ সঞ্চিত ভণ্ডামিকে উপহাস করেছেন। মমত্ব ও নিষ্ঠুরতাকে অভিন্ন আত্মায় জড়িয়ে প্রকৃত অর্থেই বাসুদেব পৃথিবীর সঙ্গে উদাসীন সঙ্গমের অভিজ্ঞতাগুলোকে পরিবেশন করেছেন। অঙ্কুরেই এতখানি ক্ষমতা পূর্বসূরীদের

খুব অল্প কয়েকজনের মধ্যেই দেখা গেছে।

আট-ন' বছরে বাসুদেব দাশগুপ্ত আট-ন' খানার বেশী গল্প লেখেন নি। 'রন্ধনশালা' নামে গল্পগ্রন্থে মাত্র চারটি গল্প সংগৃহীত। 'রন্ধনশালা' নামের গল্পটিতে নির্মম ভাষায় জীবনের চূড়ান্ত ষণ্ঠ অবস্থার অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিকে প্রকাশ করে আহরিত খাদ্য অর্থাৎ রচিত শিল্পকে ভবিষ্যতের জন্যে তুলে রাখা হয়েছে—তুলে রাখা হয়েছে নতুন মানুষের জন্যে। সম্পূর্ণ লিরিক ধর্মী—কবিতা ও রূপকথার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক সৃষ্টি করা হয়েছে 'রতনপুর' গল্পটি। এ গল্পে আছে একটা আত্মনিষ্ঠ তন্ময়তা। একটা অমোঘ আঁচড়ে তিনি সমাজের ও সময়ের চেহারাটা তুলে দেখিয়েছেন। পুরোনো ফুটপাথী বই কিনতে যায় নায়ক। দাম পাঁচ টাকা চাওয়ায় দোকানীর সঙ্গে দর কষাকষি। দোকানী জানায়, 'এখন হয়তো পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু দেখবেন বাবু, এ বই আবার ছাপা হবে...একটু দেরী হবে হয়ত, কিন্তু এ বই আবার ছাপা হতে বাধ্য। ঘরে ঘরে ছেলেরা মুখ শুকনো করে বসে আছে অথচ এ বই যারা বার করেছিলো তারা এখন ছাপাচ্ছে অঙ্কের বই। ভেবে দেখুন কি নিষ্ঠুরতা!' এমনি ভাবেই দেখা হয়েছে সব কিছুকে। এর পরেই সম্পূর্ণ অভিনব কায়দায় স্রেফ ইয়ার্কির ভাষায় সমাজের একটা কুচ্ছিৎ স্বরূপকে প্রকাশ করেছেন 'বমন রহস্য' গল্পের মধ্যে। গা ঘিনঘিন করা অশ্লীলতাকে প্রখরভাবে চিত্রিত করে অশ্লীলতা করেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বমনের মধ্যে দিয়ে তা হয়ে উঠেছে অনবদ্য। তাঁর 'বসন্ত উৎসব' গল্পের অন্বিষ্ট শুদ্ধতা। এ গ্রন্থে কিছু আগে সে সম্পর্কে বলে আসা হয়েছে। গল্পটির প্রভাব তাঁর সমসাময়িক লেখকদের মধ্যেও ক্রিয়াশীল। পরবর্তী সময়ে সেক্সকে রিডিকিউল করে 'রিপু তাড়িত' নামে যে গল্পটি রচনা করেছেন তিনি তা বাংলা সাহিত্যে একক নজির বলেই মনে হয়। 'রিপুতাড়িত'কে একটি ক্ষুদে ক্ল্যাসিক রচনা বললে ভুল হবে না। একেবারে বদমাইসী ভরা পাকা বুড়োর মাথা নিয়ে বাসুদেব এ গল্পে যৌনযন্ত্রণায় কাতর রিপু তাড়িতদের উপহাস করেছেন। জীবনের যে সব ব্যাপারকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে দেখা হয়, সেগুলোও যে যৌন ও যৌন সম্পর্কিত ব্যাপারের চেয়ে উঁচু পর্দার, সে কথাই ফুটে উঠেছে এ গল্পে।

একেবারে চলাফেরার ভাষায় জীবনের প্রাত্যহিকতাকে অবিরাম করে তুলতে চেয়েছেন বাসুদেব দাশগুপ্ত। তাঁর 'অভিরামের চলাফেরা' একেবারেই নতুন টেকনিকে লেখা। পূর্বসূরীদের মধ্যে এমন লেখার কোনো নজির নেই। গোটা জীবনযাত্রাকেই বহমান গল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার ভাবনা থেকেই সম্ভবত এ

ধরণের লেখা এসেছে। নিছক হাল্কা বিষয়, না বিষয়হীনতা নিয়ে লেখা 'লেনি ব্রুস ও গোপাল ভাঁড়কে' পড়ে এ কথাই বলা যায় যে, এমন গল্প বাসুদেবই লিখতে পারেন। (ভাঁড়ামোকে শিল্প করতে উনিশ শতকের গদ্যকারদের কেউ কেউ জানতেন।) এর পরের লেখা 'দেবতাদের কয়েক মিনিট'। টাইম স্পেস এবং ব্যক্তির আইডেন্টিটি চুরমার করে এক দুঃসাহসিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন তিনি।

আট ন' বছরে খুবই সামান্য লিখেছেন বাসুদেব দাশগুপ্ত। কিন্তু লক্ষ্য করার যে, প্রত্যেকটি গল্পের ভাষা, বিষয় এবং অ্যাটিটিউড সম্পূর্ণ অন্য। একের সঙ্গে অন্য গল্পের পার্থক্য এত দূরের যে একজন লেখকের লেখা হিসেবে গ্রহণ করাই সাধারণ পাঠকের পক্ষে অসম্ভব। একটা রচনা বেরিয়ে গেলে দীর্ঘ দিন শেষে তাঁর লেখার নিষ্ঠুর সমালোচকদেরও সমস্ত আন্দাজ জল্পনা নষ্ট করে কল্পনাতীত নতুন কিছু উপস্থিত করেন বাসুদেব দাশগুপ্ত। বাংলা গদ্য সাহিত্য তাঁর কাছে প্রচুর আশা করতে পারে। তবে, নিহিলিষ্টিক দর্শন বিশ্বাস নিয়ে তাঁর চিন্তা চেতনা যেখানে গিয়ে পৌঁছোচ্ছে—যে কালো জগতে তিনি জড়িয়ে পড়েছেন, সেখান থেকে তাঁর উত্তরণ কতদূর সম্ভব, তা কাল প্রমাণ করবে।

আজকের পৃথিবীতে মানুষের কোনো আইডেনটিটি নেই এবং ভয়াবহ ধনতান্ত্রিক সভ্যতার করাল গ্রাসের মধ্যে ঢুকে পড়ে সবাই চলছে ফিরছে, গভীর আতঙ্কে ঘুরে বেড়াচ্ছে—যে কোনো মুহূর্তে পতন হতে পারে, আর সে পতন শব্দ কারুর কানে গিয়েই পৌঁছুবে না—এই ভয়, আতঙ্ক ও অসহায়ত্ব বোধকে তীব্র সম্মোহনী ভাষায় সুভাষ ঘোষ তাঁর 'আমার চাবি' গ্রন্থের গল্পগুলোর মধ্যে প্রকাশ করেছেন। এ গ্রন্থের তিনটি গল্প খুবই উল্লেখযোগ্য। 'হাঁসেদের প্রতি', 'রেড রোড' এবং 'ব্যাণ্ড ডাইরীর পাতা' প্রভৃতিতে ভাষা কতদূর স্মার্ট হতে পারে, তাকে কতদূর সাংকেতিক করে তোলা যেতে পারে তার পরিচয় দিয়েছেন সুভাষ ঘোষ। এই সাংকেতিকতা ও স্মার্টনেসের উৎস কিছুটা সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় আছে। তাকেই চূড়ান্ত রূপ দিতে পেরেছেন।

মাংসময় পৃথিবীকে প্রচণ্ডভাবে ধর্ষণ করার কামনা ফুটে উঠেছে 'হাঁসেদের প্রতি' গল্পে। "আমি কত উপায়ে কত বেশি সংখ্যক উপায়ে তাদের থেকে কত ডিম, কত বেশি সংখ্যক ডিম আদায় করে, তাদের পালকহীন রুগ্ন মলিন করে, কখন কত সময় বাদে তাদের পদ্মদিঘী থেকে ঘাড় টেনে বের করে দেবো এবং আমি নিশ্চিত তা করবো—আমার এই প্রতিজ্ঞা—এই একমাত্র প্রতিজ্ঞা—ক্রমাগত, ক্রমাগত জেগে ওঠে প্রপাতের শব্দে, টারবাইন ব্লেডে।"—বুর্জোয়া

ব্যবস্থার এই নিষ্ঠুর চিন্তা সুভাষ ঘোষ কমিউনিষ্ট সুলভ মনোভঙ্গীতে চিত্রিত করেছেন এবং হাংরিরা মনে করেন তাঁরাই 'রিয়েল কমিউনিষ্ট'। অস্তিত্ব বিনাশী সভ্যতা ও মানুষের আইডেনটিটি খুঁজে না পাওয়ার জ্বালা ও বেদনায় চীৎকার দিয়েছেন 'রেড রোড'এ। 'ব্যাণ্ড ডাইরীর পাতা'র নায়ক প্রকৃত পরিচয় দিতে না পারার জন্যে রেশন কার্ড করতে পারে না এবং এ নিয়ে তার যে হাস্যকর অথচ মর্মান্তিক অবস্থা তাকে নিপুণ ভাবে পরিবেশন করেছেন সুভাষ ঘোষ। '২৯ ধারা এবং আমার পরিণতি'তে তো নায়ক একটা শহরে সমস্ত সময় ঘুরে বেরিয়েও তার প্রকৃত রহস্য খুঁজে পায় না এবং অপরিচিত কতকগুলো মানুষের কাছে ধরা পড়ে, যারা এই সভ্যতার বদরক্ত ঢুকিয়ে দিয়ে তার সব কিছু ভুলিয়ে দেবে বলে তৎপর। এবং এটাকেই লেখক দক্ষতার সঙ্গে উপস্থিত করেছেন। এ গল্পের শেষের দিকে তিনি কিছুটা সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের লেখার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন বলে মনে হয়। সুভাষ ঘোষ অনেক ক্ষেত্রেই প্রতীকী জগৎ ও বাস্তবকে ঠিক মতো মিলিয়ে দিতে পারেন নি ; একই লেখার মধ্যে প্রতীক ও বাস্তব আলাদা আলাদা চলেছে। কোথাও বা আপাত অসম্ভব ঘটনাগুলো এসে গেছে। তাছাড়া, অনেক গল্পের ক্ষেত্রেই পুলিশ বা ঐ জাতীয় লোকের চড়াও হওয়াটা কিছু একঘেয়েমি দোষে দুষ্ট হয়ে পড়েছে। তবে, তাঁর সাম্প্রতিক উপন্যাস 'যুদ্ধে আমার তৃতীয় ফ্রণ্ট' একটা নতুন ধরণের রচনা। লেখার মধ্যে বেশ মুন্সিয়ানা লক্ষ্য করা যায়। এখানে তিনি ডাইরীর ফর্মে—প্রতীকের অপেক্ষা না রেখেই সরাসরি ভাবে এবং তীব্রতার সঙ্গে নিজস্ব চিন্তাকে উপস্থিত করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর 'কামরূপ' আশ্চর্যজনক ভাবে একটা নতুনত্বের স্বাদ নিয়ে এসেছে। লেখাটির মধ্যে খানিকটা সুদূরতার সংকেত অনুভব করা যায়। লেখাটি পুরোপুরিই ইরটিক।

'ছাতামাতা' গ্রন্থের লেখক সুবিমল বসাক আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহারে খানিকটা নতুন সম্ভাবনা নিয়ে এসেছেন। আঞ্চলিক ভাষার শব্দ ও ধ্বনি 'ছাতামাতা'র গেঁয়ো, হ্যাংলা সভ্যতার ছল চাতুরী দেখে বিহ্বল নায়কের মানসিকতাকে প্রকাশ করতে অদ্ভুত ভাবে সাহায্য করেছে। লেখকের বোধ, সমস্ত জগৎ তাঁর সঙ্গে শয়তানি করছে। শয়তানির চেহারা দেখার জন্যে সে উন্মুখ। আর এর সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্যে তিনি প্রস্তুত। কিন্তু শয়তানের কোনো আলাদা চেহারা নেই, পৃথিবীর প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে সে লুকোনো, অদৃশ্য থেকে শয়তান তার তীব্র বিষ নিঃশ্বাসে পুড়িয়ে খাক্ করে দেবে সব কিছু। এবং মানুষ

ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়লেও কোনো দিনই তাকে খুঁজে পাবে না। তাই "ঘুমে ঢইল্যা পড়নের আগে চোক্ষু খওইয়া দেখতে পাই—অল্পদূরে আমি খাড়ইয়া আছি। রাস্তা বিচড়াইয়া পাই না, একই জায়গায় বারবার অন্ধকারে ঘুইর‍্যা মরত্যাছি। বেবাক কিছু বেঠিক উল্টাপুল্টা বেজায়গাসির হইয়া আছে। কিছু আর গুছগাছ নাই। আমার চোখের হুমকে আন্ধার আইয়া খাড়ায়। আমিও অসময়ে ঘুমাইয়া পড়ি।" তবে এ গ্রন্থের কোনো কোনো অংশে হাংরি গল্পকার সুভাষ ঘোষের ছাপ লক্ষ্য করা যায়---হয়ত বা তা গোষ্ঠীচর্চারই প্রভাব।

সুবিমল আঞ্চলিক ভাষায় সাহিত্য করতে চেয়েছেন কিন্তু যে ভাষাটি বেছে নিয়েছেন তা বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকার বিশেষ এক শ্রেণীর মুখের ভাষা, চলতি কথায় তাকে 'ঢাকাই কুট্টি ভাষা' বলে। সমগ্র অঞ্চল মানুষের ভাষা নয়। তাই এর প্রকাশ ক্ষমতার একটা সীমা আছে এবং তা খুবই সংকীর্ণ। প্রথম প্রথম এই ভাষার খোসাটা খানিকটা চমক দিতে পেরেছিলো, কিন্তু এক নাগারে সমস্ত লেখালেখিতে এই ভাষার প্রয়োগ একটা একঘেয়েমির সৃষ্টি করেছে এবং বিশেষ কোনো এফেক্ট সৃষ্টিতে অক্ষম হয়ে পড়েছে। ঢাকার কুট্টিদের রসাল এবং তীক্ষ্ণ ভাষা ব্যঙ্গ বিদ্রূপের ক্ষেত্রে খুবই উপযোগী, কিন্তু সিরিয়াস কিছু তা দিয়ে লেখা কতদূর সার্থক করা যায় তা গবেষণার বিষয়। ভাষার ঐ জামাটা খুলে ফেলে সুবিমল বসাক কি ভাবে যুগ ও জীবনবোধকে পরিবেশন করবেন তা দেখতে অনেকেরই আগ্রহ।

'শবযাত্রার প্রথম চীৎকারকারী' দেবী রায় যদিও ভাষা ও বিষয়ের দিক থেকে পূর্বজ লেখকদের বিশেষ কিছু অতিক্রম করতে পারেন নি, তবু তাঁর আন্তরিকতার অভাব নেই। 'কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে' 'শুভাশুভ' ইত্যাদি তাঁর রচনা। এখানে বলা প্রয়োজন যে, 'ছোটগল্প নতুন রীতি'র আন্দোলনের একটা সুদূর প্রসারী প্রভাব যেমন ছিল, হাংরি জেনারেশন আন্দোলন তেমন কোনো প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় নি। বিচ্ছিন্ন ভাবে যাঁদের নাম চড়াগলায় উচ্চারণ করতে হয়, তাঁরা হাংরি জেনারেশনের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও, সাম্প্রতিক সাহিত্যে উচ্চারিত হতেন। অন্যান্য নতুন যাঁরা হাংরি গল্প নিয়ে লড়ছেন 'এই দশক'এর তরুণ লেখকদের মতোই তাঁরাও আপন গোষ্ঠীর বড় লেখকদের ভাঙিয়ে কসরত করছেন। এবং হাংরি আন্দোলনের যৌথ শক্তিও আজ প্রায় নিঃশেষিত।

সাম্প্রতিক

[নতুন কবিতার পটভূমি—অগ্রজ কবিদের সাম্প্রতিক কাব্যকৃতি—ম্লান অবশেষ—অস্বীকারের যুগান্তকারী কবিগোষ্ঠী—অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সিদ্ধেশ্বর সেন, শংখ ঘোষ, উৎপল কুমার বসু, তরুণ সান্যাল, বিনয় মজুমদার, অমিতাভ দাশগুপ্ত প্রমুখ—আবরণহীন, স্পষ্ট, ঋজু, ডেলিবারেট কবিতা—নতুন তৃষ্ণায় স্ফুটনোন্মুখ কবিকুল—পবিত্র মুখোপাধ্যায়, রত্নেশ্বর হাজরা, পুষ্কর দাশগুপ্ত, তুষার রায়, গণেশ বসু প্রমুখ—স্পর্ধিত, অস্বীকারে উন্মুখ, টানাদোটানায় দিশাহারা বিড়ম্বিত কবিতা—নৈরাজ্যের কুলপুরোহিত হাংরি জেনারেশন—শৈলেশ্বর ঘোষ, সুবো আচার্য, মলয় রায় চৌধুরী প্রমুখ—বহু বিতর্কিত, পুলিশী দাপটে সন্ত্রস্ত, বহুনিন্দিত কাব্য প্রয়াস—বিচার, পুনর্বিচার, মূল্যায়ন ও ক্রান্তিকালীন সংকটলগ্নের দলিল চিত্র।]

সদ্যপ্রকাশিত সাপ্তাহিক খবরের কাগজে মুড়ে 'জীবন যৌবন' নিয়ে যে ভদ্রলোক আর পাঁচজনের লোলুপ চোখ ব্যর্থ করে বাসের সিটটা দখল করলেন, তাঁর আপাদকণ্ঠে এ্যাংলোমার্কিনী পোষাক, চোখে পুরুকাঁচের কালোফ্রেমের চশমা। ধস্তাধস্তিতে কোটটা কুঁচকে গেছে। বিরক্তি বোঝালেন। খানিক (বুঝি সিটটা জবরদখলের ধকল সামলাতে) উদাস ভঙ্গিতে বাইরে তাকিয়ে দেখলেন দ্রুতগতি যানবাহনের শোভামিছিল, লোক আর লোক। হঠাৎ বাসটা ব্রেক কষায় হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিলেন। মুখ বিকৃত করে বললেন 'স্কাউণ্ড্রেল—বাঁচতে দেবে না'। কথায় কথায় জানালেন, পুজোর ছুটিতে 'দেওঘর' গিয়েছিলেন। বললেন, চাক্ষুষ 'গড' দেখে এসেছেন। খবরের কাগজটার 'ব্যানার হেডিং'-এ দেখা গেলো রক্তাক্ত বিপ্লবের কী একটা ভয়ঙ্কর আওয়াজ। আর ডানদিকে শকুনের কার্টুনের নীচে বড় অক্ষরে লেখা 'বিশ্বাস-ঘাতকের কবলে বাংলাদেশ...যুক্তফ্রন্ট ভাঙার ষড়যন্ত্র।' 'জীবন যৌবন' এ আঙুল বসানো পৃষ্ঠাটা চট করে খুলে পড়তে সুরু করায় খাদ্যমন্ত্রী উল্টে গেলেন।

ভদ্রলোক একাগ্রমনে যৌনচিত্র সম্বলিত পৃষ্ঠাটা .(সম্ভবত) পড়তে থাকলেন। বাসটা বিকট শব্দ করে চলমান। চারদিকে অন্ধকারের সঙ্গে আলোক কষছে ইলেকট্রিকবাল্‌ব। স্কাইস্ক্রেপার। প্রত্যেক স্টপেজে ভীড় করছে ছেলেকোলে হাতপাতা ক্ষুধার্ত ম্যাডোনা। বগলবুকনাভিপ্রকাশ লেডিসসিটের ফ্যাসান প্যারেডের সামনে অনিবার্য পুরুষসমাগম। ভদ্রলোক ঠনঠনিয়া কালীবাড়ির প্রতি হাতজোড় করলেন। খানিকবাদে কোটের পকেট থেকে বার করলেন রুমাল ও কন্‌ট্রসেপটিভের প্যাকেট। সিট থেকে একটু উঁচু হয়ে সেগুলোকে হিপ পকেটে রেখে অর্ধনগ্ন মেয়েমানুষের ছাপওয়ালা প্রচ্ছদটা আড়াল করে কোটের পকেটে রাখলেন। পেছনের মলাটে দেখা গেল 'বিনা অস্ত্রে সুলভে গর্ভপাত করানো হয়' ..ধরণের একটা বিজ্ঞাপন বাক্য। তিনি খবরের কাগজটায় চোখ বোলাতে বোলাতে উচ্চারণ করলেন, 'হারামজাদা, তোমার চামড়া খসিয়ে নেয় নি উগ্রপন্থীরা এই ঢের।' স্বগতোক্তির সায় পান নি অন্য কারুর—কারুর 'কিউরিওসিটি' নেই। তিনিও সম্ভবতঃ সায় চান নি কারুর। বাস চলছে। তিনি একসময় চোখ বুঁজেছেন। খবরের কাগজের শিথিল দশা। খানিকটা পায়ের ওপর—দু'এক পাতা খসে পড়েছে নীচে। কেউ তুলে দিলো না। দায় নেই। ভদ্রলোক আচমকা নেমে গেলেন 'আর, জি, কর' মেডিকেল কলেজের সামনে। কাগজের কয়েকটা পাতা পড়ে রইলো বাসে। জগদ্ধাত্রী প্রতিমা বিসর্জনের মিছিল যাচ্ছে। তাসা পার্টি। টুইস্ট নাচ। মাইকভাঙা হিন্দী গান। ভদ্রলোক হারিয়ে গেলেন। ট্রাফিক জাম। হাসপাতাল থেকে 'হরিবোল' দিতে দিতে বেরিয়ে এলো শবযাত্রা।—১৯৬৭ সালের ১০ই নভেম্বর—একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ডাইরীর পাতা। স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী সময়ের শহর মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতার এ একটা খণ্ড দিক মাত্র; কিন্তু একটু চিন্তা করে দেখলেই দেখা যাবে, শহর জীবনের মুখ্য ব্যাপারগুলো এর মধ্যেই প্রকাশিত। ভদ্রলোকের পারিবারিক জীবন, চাকুরী জীবন, আনন্দবেদনাউত্তেজনা, স্নায়বিক দুর্বলতা, আধিব্যাধিময় সমগ্র অস্তিত্ব, এমন কি আন্তরগুহাভ্যন্তরের শব্দচিত্র পর্যন্তও 'এক্‌স-ওয়াই-জেড'দের প্রত্যেকের-সঙ্গে হুবহু এক।

পূর্বপূর্ব অধ্যায়গুলোতে একথা বরাবরই বলে আসা হয়েছে যে, কালপরিবেশ শহর মানুষকে এদিকে যেমন রমনী ও রজনীতে সমর্পিত করেছে, দিয়েছে মত্তুমত্ততায় স্বপ্রকাশোপলব্ধির শেষশহরসংস্করণ দুঃস্বপ্ন; ক্লান্তি আর অবসাদগ্রস্ত স্বয়ংক্রিয় প্রলাপ; জানিয়েছে, আজীবন জীবন-যাপনের অভ্যাসে মানুষ যন্ত্রই

মাত্র ; তেমনি অসহায় ব্যক্তিত্বের নির্জীবত্ব হনন করেছে আত্মবিশ্বাস, চিন্তা-ভাবনার ক্ষমতা, মানবিক অনুভূতি—এখন ব্যক্তি শুধু উচ্চমানবিকবোধনষ্ট সংবেদনরহিত সংগ্রামবিমনস্ক যান্ত্রিকতায় পর্যবসিত নির্লিপ্ত ও নির্বিকার অস্তিত্ব ; সে শুধু প্রাত্যহিকতার গড্ডলিকা প্রবাহে বহিরাগতমন্যতায় অভিশপ্ত, নির্যাতিত নির্বাসিত—অবাঞ্ছিত জন্মের জন্যে স্ববিকৃত। দৃশ্যত সমস্ত কিছু তার কাছে পাপের ফলন, ক্লেদজকুসুম ; হৃদয় মন 'ইকনমিক গুডস্'-র অন্তর্ভুক্ত নয় বলেই ডাষ্টবিনেও লাঞ্ছিত ; রক্ত শহীদত্বেই পুরস্কৃত—নারীরক্ত তিনদিন অসহনীয়। একটা অটোমেটিক পদ্ধতিতে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের প্রভু নিজে ক্রীতদাস—নিজের জালেই বন্দী—বিচ্ছিন্ন। পরস্পরের সঙ্গে ব্যবধান নোনা ঘামের সমুদ্র। দিবা-লোকে নিজের কোনো খবর নেই। চতুষ্পার্শ্বস্থ বাস্তব নালানর্দমা সানের রাস্তা, বিরক্তিকর গিজগিজে লোক, অবিশ্রাম ডিজেল পেট্রোল পোড়া গন্ধ, লোহা আর রবারের চাকার শব্দ, যন্ত্রের ঘর্ঘর, বিজ্ঞান বাহার ; খুন, রাহাজানি, বেশ্যারও শ্লীলতাহানির আদালত সংবাদ আর ভারতের ক্ষুধার ভিক্ষা জোগাবার জন্যে আন্তর্জাতিক শীর্ষসম্মেলনের খবর ; চেনা মানুষের অভ্যাসবশতঃ জিজ্ঞাসার উত্তর —'এই আছি।' অন্য খবর নেই। নেই খবরের কাগজে। নেই ব্যক্তি রহস্যের উন্মোচন। দুর্ভাবনা নেই সে জন্যে। বমন রহস্যই স্পষ্টগ্রাহ্য। বমন একচেটিয়া মুনাফাশিকারীর হুঙ্কারজনক ক্রিয়াকাণ্ডের জন্যে, জন্ম নিয়ে বাপমায়ের দুরভি-সন্ধিমূলক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবার জন্যে, অনিচ্ছাকৃত নবজাতকের প্রতি রাষ্ট্রীয় মনোভাবের জন্যে ; বমন প্রতি রাজনৈতিক দলের ত্রিভঙ্গ মূর্তি দেখে, দেখে তথাকথিত রাজনৈতিক দেশপ্রেমিকের স্বার্থপরতা, দলাদলি এবং লোভ আর বিশ্বাসঘাতকতা। নিজের জীবনে কোনো গভীরতা নেই ; আছে অর্থনৈতিক এবং ব্যবহারিক সুখের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। একটা অসারতা সর্বব্যাপ্ত। টিঁকে থাকার তাগিদে সংঘবদ্ধ হবার বাধ্যবাধকতা এবং একটা অভ্যাসবশতঃই শ্রেণীগত মানুষের স্বপ্রতিষ্ঠার জন্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং পৌর অধিকারের দাবী সম্বলিত দিশাহারাত্ব। পুলিশী প্রতিরোধ। জেলহাজত—বিনাবিচারে আটক। আর তালুর ঘায়ে পাগল কুকুরের মতো ক্ষুধার ক্ষতে খুন হতে মানুষ ছোটাছুটি করছে মিছিলে ময়দানে—সানের শহরে ছরবেছর ছড়িয়েছিটিয়ে থাকে এতোল-বেতোল জুতো, চাপচাপ রক্ত আর লাশ। মানুষ তবু নিরুত্তেজিত। কিছুই দাগ কাটে না। তার শুধু দৈনিক বেঁচে থাকা। ডিভিশন অব লেবারের কল্যাণে একটা বিশেষ অংশে (এবং অঙ্গে) মাত্র পারদর্শিতা। তার পৌণপৌণিকতার

টিঁকে থাকার রসদোদ্ধার—অবসাদ। সমস্ত কিছুই অটোমেটিক। ক্রমশ উর্দ্ধগামী উত্তেজিত হতে হতে স্নায়বিক নিস্তেজতা। কোনো কিছুতেই কিছু এসে যায় না মনোভঙ্গিতে সর্বস্বকংক্রিটের ফাটলে 'ইনটিউশান' পরিচালিত। 'সিফট্' নিয়মে খাটুনি। 'ওভারটাইম' খাটুনি। 'ইনটক্সিকেটেড' হয়ে অর্থলাভ। আর তাতেই বেশ্যাবাড়ি বা সোসাইটি গার্লের ফ্ল্যাটে খানিক রাত কাটিয়ে টলতে টলতে বাসায় ফেরা। পথে চলতে চলতে হয়তো স্কাইস্ক্র্যাপারের তলায় পায়ে ঠেকে ফুটপাথের সংসার (যার সংখ্যা সর্বশেষ আদমসুমারীতে পাঁচলক্ষ) কিম্বা সংকর লাগা নারীপুরুষ অথবা আপাতজননীজাত শিশুর লাশ। সংঘবদ্ধ মানুষ থেকে আলাদা করে দেখলে এই-ই ব্যক্তিজীবন এবং তার সাম্প্রতিক শহরবাসের ইতিকথা। পরের কথা—দিনগত পাপক্ষয়, পাপগত দিনক্ষয়। সব ব্যাপারেই সে নির্লিপ্ত। হাল্কা আনন্দে চরিতার্থ, হাল্কা ব্যাপারে ঝোঁক। রহস্যরোমাঞ্চ গোয়েন্দা কাহিনী আর বিকৃত যৌনতা ও সমকামিতায় দুরারোগ্য নায়কের বেশ্যার বুকে কান রেখে ঈশ্বরের শোকে ক্রন্দমান অনুতাপ বিধৃত পুস্তকের বাছাই করা পৃষ্ঠাগুলোতেই সাময়িক সহৃদয়ত্ব আরোপ এবং সেখানেই অনুভূত হয় 'মমেতি'। 'ন মমেতি' অনুপলব্ধ থাকার জন্যে সে অসহায় এবং উল্লিখিত ভদ্রলোকের মত হঠকারী বিপ্লবে বিশ্বাসী, ধর্মে ও ঈশ্বরে বিশ্বাসী, ধর্ষণে এবং সংঘর্ষে আগ্রহী, অসহিষ্ণু, যৌনকাতর, ঘুমকাতর (ক্ষুৎকাতর তো সংকীর্ণ ও ব্যাপক অর্থেই) আর অবলীলায় পরিত্যাগ করে যেতে পারে মোটে-না-সমাপ্ত খবরের কাগজের মতো অসমাপ্ত জীবনটাকেও। যন্ত্র সত্য। তাব কাছে যান্ত্রিকতাই সত্য। আর এই সত্য উদ্ধার করেছেন সাম্প্রতিক সাহিত্যিক কবিরা। তবে তাঁরাও এই সর্বস্বকংক্রিট শহরের সঙ্গে 'মমেতি' বোধে একাকার। দুর্ধর্ষ শক্তিও তাই বোধের দুর্বলতায় দুষ্ট। 'জাতীয় সাহিত্য' রচনা কবলেও প্রায় সমস্ত কাব্যের আয়ু দশ বছর। এখানেও কম্পিটিশন বহিরঙ্গের। কম্পিটিশন কেবল আঙ্গিকের, সিম্বলের, শব্দ যোজনার কায়দার। শব্দের পর শব্দ চলছে। এখানেও অটোমেটিকত্ব। চোখ চামড়া জিভ নাক কানে পাওয়া বিষয়ই কাব্যের স্বভাবজ পণ্য। এখানেও বিচ্ছিন্নতার নির্বিকারত্ব। অন্যজনের সঙ্গে কমিউনিকেটেড হতে অসমর্থ শব্দমণ্ডলী কখনো চিৎকারের পরিভাষা; কখনো নিঃসঙ্গ অসহায়ত্বের হাহাকার; কখনো ক্রোধ, জিঘাংসা, হত্যা, আত্মহত্যার গড়গড়ানি, কখনো বা তা যৌন উন্মত্ততায় নারীদেহে রাহাজানির সরব ঘোষণা। হাতড়ে ফিরছে ঈশ্বর; খুঁজে মরছে শ্যামলা প্রকৃতি ও তার সহজ মানুষ; নারী চাইছে, কিন্তু পেয়ে

ব্যবহারিক দ্রব্যের মতো ঘেঁটেছিঁড়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়—সমস্ত কিছুতেই একটা সার্থকতাহীনতা—ক্লান্তি। আর তাই সমর্পিত হচ্ছে লিরিকে—অতি সহজেই যেখানে কক্ষে পাওয়া যায়। সামান্য মাত্রাজ্ঞান ও একটু চতুরতা থাকলেই পাঠক-বিজয় কাব্য করা যেখানে সম্ভব। কেননা, চর্যা থেকে রবীন্দ্রকাব্য পর্যন্ত গীতি কবিতাটা বাঙালীর পাকাপোক্ত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তাই অনেক যুগন্ধর কবিও এদিক সেদিক করে এসে, দুর্দাম শক্তিতে তুলকালাম করে এসে, ক্লান্ত হয়ে, হতাশ হয়ে সম্মোহনীয় গীতিকবিতা রচনা করছেন। ফুরিয়ে যাচ্ছেন দশ বছর না যেতেই। জোর করে রেখে দেবার চেষ্টায় তাই নিজেদেরই উদ্যোগী হয়ে প্রকাশ করতে হচ্ছে 'এই দশকের কবিতা'[১] 'সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা'[২] আর ছ'-এর কোঠা ফুরোবার ঢের আগেই 'ষাটের কবিতা'[৩]। এটা নিমেষ মূল্যবোধের যুগ। তাৎক্ষণিকের সত্যকেই যথার্থভাবে তুলে ধরেছেন সাম্প্রতিক কবিরা। এখনো পর্যন্ত সাম্প্রতিক কবিদের সঠিক আদমসুমারী হয় নি। তবে প্রায় সমস্ত জেলাতেই ন্যূনপক্ষে একটা 'কবিতা পত্রিকা' আছে এবং ১৩৭৩ সালে বৈশাখ থেকে আশ্বিন এই পাঁচ মাসে 'ঘুণধরা বাংলা দেশে কবিদের পপুলেশন এক্সপ্লোশন—শতকরা তিনশো ; কবিতার নিন্দুক বৃদ্ধি শতকরা পঞ্চান্ন, কবিতার পাঠক শতকরা পাঁচ'[৪]। বাক্যটিতে ঠাট্টার সুর থাকলেও মূলত অসত্য নয়। আর এভাবে নিজেদের সমস্ত শক্তিসামর্থকে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেবার সক্ষমতাতেই ঐতিহ্য স্থাপনের আন্দোলন চালাতে এবং সরাসরি জীবনের মধ্যে থেকে কথা বলতে পেরেছেন সাম্প্রতিক কবিরা। তবে এক্ষুনি এই কবিদের কবিতার গুণগত পরিবর্তনের সামগ্রিক চেহারা তুলে ধরা প্রায় অসম্ভব। এ ক্ষেত্রে যথাসাধ্য নিরপেক্ষ থেকে স্থান কাল পাত্র ও তার আন্দোলনের মুখচ্ছাপটিই তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে :—

'বয়োভারনত পিতা যে রকম শেষবারের মতো / হাটের ভিতরে খোঁজে মানুষ, অবশেষে / না পেয়ে মেয়েকে নিয়ে ক্ষতস্থানে চলে গিয়ে বাঁচে, / সেই মতো মেয়েটিকে বুকে নিয়ে এক চিলতে রোদ / আমার সকাশে এসে আবার অদৃশ্য হয়ে যায়।'[৫] 'উপার্জিত হৃদয় সঞ্চয় / অপসৃত। দুঃখ, আরো দুঃখ জ্বলে ঘৃণা করবার যন্ত্রণা।'[৬] 'আমার করোটি নেই, চিন্তা নেই ব্রহ্মতালু জুড়ে / স্তিমিত

১। শংকর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ২। গৌরাঙ্গ ভৌমিক সম্পাদিত ৩। আশিস সান্যাল সম্পাদিত ৪। কৃত্তিবাস ২০ সংকলন; শরৎকাল ১৩৭৩ ৫। সে—অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ৬। পাহাড়—আলোক সরকার

চৈতন্য কাঁদে ছিন্নমস্তা আশা / আশাবাদী নই, কেননা আশাই / অতীতের অন্ধস্তুতি—বর্তমান সনাতন জ্ঞানে / ভবিষ্যৎ নির্ব্বিশেষে বিকৃতি'[৭] 'এ যদি হয় সত্তা তবে অস্তিত্বের মানে / থাকা, কেবল থাকা, তুমি বিশ্বগোচর থাকো।'[৮] 'গন্ধর্ব ও পিতৃলোকেও ছায়া / সময় ধরেছে দর্পণ / তোলো মুখ / ও কী বিবিক্ত / ফেরে এক হারা, / উদয় অস্তে আমরাই উৎসুক / ঘন মেঘ ধরে অনিশ্চিতের কায়া'[৯] 'এত যে বানানো দুঃখ মানুষের...মন এক পুরো ধাপ্পাবাজ'[১০] 'তিন কপি সংবিধান, গণতন্ত্র, আত্মার নির্যাস / ইত্যাদি সকল কিছু, বিশুদ্ধ রসদ কিছু, / লুট করে ক্ষিপ্ত আততায়ী'[১১] 'ললাটের ক্ষত / সর্বক্ষণ বিজ্ঞাপিত করে রাখে আমাদের অধুনা সময়। / আমি মগ্ন হতে চাই, ছায়া স্রোতে, অস্তিত্বের ধূসর দীক্ষায় / তবে কি ঈশ্বর স্তবে ফিরে যাব? অলৌকিক রহস্য ভিক্ষায়?'[১২] 'পৃথিবী গভীর ব্যস্ত, নানাবিধ ধূমে / দুই চোখ জ্বলে যায়। রক্তে ও বসনে / বস্ত্র কলুষিত থাকে।'[১৩] 'রঙিন দস্তানা খুঁজে আমার ঘরের বাইরে কোথায় দাঁড়াবো / ভালবাসতে বাসতে আমি মরে যাবো'[১৪] 'তবু আমি মনে মনে একনিষ্ঠ স্বকাল পুরুষ, / কৃত্রিম যৌবন জুড়ে ব্যভিচার, রিপুভয় সমস্ত উৎসবে। / দেয়ালে ঠেস দিয়ে ধুঁকছে কামদক্ষ উলঙ্গ নগর।'[১৫] 'নিজের গলার স্বর শুনবো, ঐ যন্ত্র বলবে, 'ভালোবাসি' / আর কাউকে বলেনি, আমি কাউকে বলিনি। / আয়নার ভিতর দিয়ে চুরি করে গেছি বহুবার স্বর্গের পোষ্ট অফিসে সন্ধ্যাবেলা / কেউ কিছু লেখেনি ; যন্ত্র, তুমি বলো 'ভালোবাসি' / মানুষ হয়েছে আজ নিষ্ঠুর না বিষম লাজুক? / কেউ কারুর মুখের দিকে চোখ তুলে চায় না কথা বলে না'[১৬] 'এ সত্য জেনেও তবু আমরা তো সাগর আকাশে / সঞ্চারিত হতে চাই, চিরকাল হতে অভিলাষি, / সকল প্রকার জ্বরে মাথা ধোয়া আমাদের ভালোলাগে বলে। তবুও কেন যে, হায় হাসি, হায় দেবদারু, / মানুষ নিকটে গেলে প্রকৃত সারস উড়ে যায়।'[১৭] 'অতএব দুঃখ নেই, গ্রাহ্যই করিনা আমরা—কারা গেল / কারা কথা দিয়েও এলো না'[১৮] 'প্রতিটি ঋতুতে / কলরব শোনা যায়

৭। নীহারিকা, আলো অন্ধকার—তরুণ সান্যাল ৮। সত্তা—শঙ্খ ঘোষ ৯। গ্রহণ—সিদ্ধেশ্বর সেন ১০। সে কোন চরিত্র—শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় ১১। হাসপাতালের মাঠে—শংকর চট্টোপাধ্যায় ১২। জ্যোতিঃপাত—শক্তি চট্টোপাধ্যায় ১৩। পৃথিবী—মোহিত চট্টোপাধ্যায় ১৪। বুকের কাছে কাকাতুয়া—দীপক মজুমদার ১৫। আত্মবিলাপ—আনন্দ বাগচী ১৬। মূক ব্যবহার—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১৭। আমার ঈশ্বরীকে—বিনয় মজুমদার ১৮। প্রতিদ্বন্দ্বী—শরৎ কুমার মুখোপাধ্যায়

বণিকের, প্রেমিকের এমন কি সেনা- / বাহিনীর কুচকাওয়াজ নিরর্থক শব্দ করে পাথরে ধাতুতে.'[১৯] 'শব্দ ধ্বনি অন্ধ মধ্যরাতে বেইমান হাওয়া, কেন যে চিৎকার করে, সমুদ্র বিস্তার করে, কেন যে কেন যে, কেন / হাজার হাজার লুব্ধ মৃত্যুহীন মশা স্পর্শের দস্যুতা নিয়ে / বারবার স্মরণ করায় এ শহর কোল-কাতা'[২০]—যার নায়কের অসার আত্মসমীক্ষা : 'দাঁতাল শুকর নিয়ে খেলা করা / একমাত্র তোমাকেই তোমাকে মানায় / মুখোমুখি বন্ধ ঘরে চকচকে আয়নায় / নিজের ছায়ার সামনে পরিতৃপ্ত তারাপদ রায়।'[২১]

যন্ত্রসর্বস্ব শাহরিকের জীবনে মৌলিক সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে একটা ফাঁপাপনা : 'স্বাধীনতা ! অকস্মাৎ তোমাকেও মনে হয় নির্নিমেষ করুণ অঙ্গার / সভ্যতার নাভীর ভিতরে—/ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন আছো, ক্রেমলিনে যুক্তরাষ্ট্রে / হয়তো বা বৈকুণ্ঠের যৌন মখমলে ; / হিন্দুর জিজ্ঞাসা নয়। শুধু ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের / কেবলই মঙ্গল করো। তুমি আপেক্ষিক / অন্য সকলের প্রতি—যেহেতু বিভেদ / 'আন্তর্জাতিক' বলে উদ্যত মুষল—যেহেতু মানুষ / রেডিওর মতো এক অর্বাচীন বক্তার সম্মানে / পরিবার সহ শ্রোতা। যেহেতু কাগজে / নিত্যই সম্পাদক ছাপার কালির সঙ্গে কি ভাবে সঙ্গম করে—/ তারই বিবরণ ধুরন্ধর লিখেছে বিশদ।'[২২] আর জীবন মানে 'ঠোঁটে কড়া চুরুট, গলায় মদ, স্টমাকে খাবার, উরুতে মেয়েছেলে।'[২৩] এ পেতেই জেনে গেছে 'কিছুটা বাবার প্রতি হতে হবে, কিছুটা পল্লীর প্রতি হতে হবে / কিছুটা পাঠশালার প্রতি হতে হবে / কিছুটা কংগ্রেসের প্রতি হতে হবে / কিছুটা কম্যুনিষ্টের প্রতি হতে হবে / এ ভাবে অনেক হওয়া যোগ করে তার থেকে সুদে / আমানতী কারবার ফাঁদা হবে।'[২৪] পরম সুবিধাবাদী পার্টির সভ্যদের কাছে আজ মূল্যবোধের সংকট চূড়ান্ত, 'জীবন যাপনে সুখ নেই, কোনো / ভ্রম বা কৌতুক আর অবশিষ্ট নেই / টাকার বিক্রয় মূল্য নেই—সব জানা হয়ে গেছে, / কেবল আহার আর দাস্ত পরিষ্কার করে স্বাস্থ্য ভালো রাখা / অসম্ভব অসম্ভব।'[২৫] সব কিছুই হয়ে উঠেছে স্বভাবজ ঠাট্টার বস্তু, 'আমি পুলিশের বোকামি দেখে প্রকাশ্যে হাসাহাসি করবো / আমি নেহেরুর উইল সম্পর্কে শুনবো ট্রামের লোকের ইয়ার্কি / কম্যুনিষ্টদের শ্লোগানের শবযাত্রা দেখে আমাদের দয়াও হবে না ; / আমি ভয়ের মধ্যে ঘুমিয়ে

১৯। বীক্ষণ—মানস রায়চৌধুরী ২০। ভিক্ষুক নাগরিক—সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ২১। আত্মসমীক্ষা—তারাপদ রায় ২২। ফেরীঘাট—উৎপলকুমার বসু ২৩। সমুদ্রের ওপরে ঘর—অমিতাভ দাশগুপ্ত ২৪। বিদায়—শক্তি চট্টোপাধ্যায় ২৫। হাওয়াবদল—শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

পড়ে জেগে উঠবো মমতায় / আমি মেয়েটির কাছে গিয়ে নিঃশব্দে মুখ চুম্বন করবো / সশরীরে বিছানায় শুয়ে দুজনে কাঁদবো নানা ধরনে / পরদিন ঠিকঠাক বেঁচে উঠতে হবে, এই জেনে। / আমার গলা পরিষ্কার, আমি স্পষ্ট করে কথা বলবো / সমস্ত পৃথিবীর মেঘলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে / একজন মানুষ'[২৬] 'একটি মানুষ জোড়া একটি আঁধার কৃত্রিম নাসিকানলে কৃত্রিম অক্সিজেন টানা'[২৭] 'যেকোনো শরীর / পাশের শরীরটিকে শবদেহ বলে ভাবে, ভেবে / যথাসাধ্য অত্যাচার করে কিম্বা পদাঘাতে আলিঙ্গনে করে জ্বালাতন'[২৮] 'শানিত সিনেমাগুলি আড়াই ঘণ্টার ক্লীব অন্ধকার আনাচে কানাচে / দৈনিক তিনবার করে খুলে ধরে ভৌতিক পাতাল— / একযোগে দশ কোটি বিনোদ অনিল সহ পাঁচ কোটি ললিতা পারুল / যৌথধর্মাচার ভুলে কুয়াশায় ক্রমাগত নিম্নে নেমে যায় / রিরংসার তরল নরকে তালতাল, / কলকাতা বাধ্যত ব্যভি-চারে শুয়ে থাকে মুদ্রানাগরের বিছানায়'[২৯]। আর মানুষ মাত্রেই স্বয়ংক্রিয় এক একটি বোতাম, নারী-পুরুষযন্ত্রর পরস্পর পরস্পরকে উপভোগ 'যেমন বিকল্প ঘাসে কীটেরা থাকে না/যেমন বিকল্প প্রেমে বিচ্ছেদ হবে না / যেমন বিকল্প মদে লিভার পচে না/একশ চুম্বন পাবে এই লাল সুইচ জ্বালালে/চারশত তোষামোদ, কবিতার উদ্ধৃতি সমেত আলিঙ্গন যৌনক্রিয়া...এই সব বোতামে'[৩০]।

সাম্প্রতিক মানুষের তাই স্বাভাবিক ভাবেই অসহায় হওয়া ছাড়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য কিছু নেই। 'ফলে, হাতের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে হাত / পায়ের মধ্যে পা —/দাঁড়িয়ে থাকবো মশাই / তেমন জোর অব্দি ফুসফুসে পাচ্ছি না'[৩১] বলে দিশাহারাত্ব 'কোন দিকে ? আমার নির্বিকার হেঁটে যাওয়া সেই সকালের থেকে সন্ধ্যা অব্দি / আমার দিক প্রদক্ষিণের ভুল সম্পদের দিকে চেয়ে আমার ক্ষুধাদৃষ্টি / দিনে দিনে আমার মন্থর পায়ের শিরার সমস্ত রক্ত সরে আসছে হাতের রেখায়'[৩২] 'এ কোন প্রান্তরে আজ অভিশপ্ত অন্ধকারে কোথায় এলাম ? /...এ কোন দিগন্তে তবে নির্বাসিত ? এ কোন তিমিরে / সর্বাঙ্গে নিষ্ঠুর ক্ষত চিহ্নিত আমার'[৩৩] 'নির্বোধ ট্রাফিক ওড়ে, প্রচণ্ড চীৎকার করে / অনন্তের দিকে যেতে চায়, / আমি অন্তহীনতায় শূন্যের ভিতরে / হাওয়ার মতন হাঁটি'[৩৪]

২৬। সাবধান—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ২৭। ঘরের ভিতর ঘর—সবোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮। এক দৃশ্য—সুধেন্দু মল্লিক ২৯। বলাৎকার—অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় ৩০। স্বয়ংক্রিয়—কবিতা সিংহ ৩১। মাঝ রাতে জেগে উঠে—তুলসী মুখোপাধ্যায় ৩২। আমার দিক প্রদক্ষিণ—শংকর দে ৩৩। এত দীর্ঘ পরিশ্রমে—আশিস সান্যাল ৩৪। নির্বাসন—ত্রিদিবরঞ্জন মালাকার

'প্রতিদিন / একা বড় একা'[৩৫] 'এখন কী করব আমি, কী করতে পারি। / অবিরাম গোঙানির মধ্যে আর্তনাদ চীৎকারে / রক্তের ভিতরে হাত ঢুকে যায়'[৩৬]। আর তাই 'সকল প্রয়োজন মেটাতে মেটাতে ইচ্ছে হয় না আজ ঘরখানি রাতভর সাজিয়ে রাখি / ইচ্ছে হয় না মধ্যরাত্রে প্রতিদিন সর্বার্থসাধক কালিতে ছাপা এ অপ্রস্তুত মুখচ্ছবি ভালোবাসি / ইচ্ছে হয়না ঘুমকাতরতা ঘুমে জড়িয়ে পড়তে / ইচ্ছে হয় না প্রাণাধিক খামখানি বুক পকেটে তুলে নিতে—/ চুল চোখ পরিচর্যা করতে ইচ্ছে হয় না—/ মানুষের মত ইচ্ছে করতে অনিচ্ছুক '[৩৭]। কর্মতৎপরতা শুধু ধর্ষণে 'সাদা ঘোড়াদের পিঠে দুজনে দুজন / মেয়েদের বলিষ্ঠ জঙ্ঘায় পুরুষেরা / দীর্ঘ পুরাতন মদে উৎসবের আয়োজন করে—'[৩৮] 'বলাৎকারের কাছে কোন ঋণ নেই / জন্মের অথবা / ঘৃণার, অথবা / সৌন্দর্যের অথবা আমার এবং এই সালের—/ যে সালে আমি লিখছি—অথবা / অর্থাৎ ঝুলে আছি / ঝুল বারান্দায় / প্রতিটি চুমকি—আলোতে লুটোপুটি আক্রোশ / শান্টিং শব্দ-শান্টিং শব্দ-শান্টিং শব্দ-শান্টি চলছে'[৩৯] 'এখন আমার হিংস্র হৃৎপিণ্ড অসম্ভব মৃত্যুর দিকে যাচ্ছে / মাটি ফুড়ে জলের ঘূর্ণি আমার গলা অব্দি উঠে আসছে / আমি আমার হাতের চেটো খুঁজে পাচ্ছি না'[৪০] 'তখন চীৎকার তীব্র চীৎকার...হাত-দুটো অসার...অসার / পা-দুটো অনড় ..অনড়.../...মাথা...হাত...পা রক্তের ছোপ...রক্তের অথচ.../ ছোপ...মাথা ..হাত ..পা.../...আবার চীৎকার তীব্র চীৎকার ..'[৪১] 'জ্বলিয়ে দেয়, পুড়িয়ে দেয় আমার বুক ; / হিংস্র মুখ / বাঘিনী-দের থাবার নখে ভয়ঙ্কর / রক্ত ঝরে মনে আমার নিরন্তর '[৪২] 'আমার ব্রহ্মতালুতে এখন বন। / চৈতন্যে বেতাল জুড়েছে নির্জ্জান মচ্ছব, / চোখ নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে বেঢপ চামচিকি, / স্নায়ুর লতিকা খাচ্ছে সজীব খচ্চর '[৪৩] 'আমি যে বিচার প্রার্থী, মহারাজ, / পুনরায় / পাখী আর রদ্দুরের খেলা দেখবো বলে'[৪৪] 'বুকের ভেতর সব দেখ — /আমার বুকের ভেতর কোন দুঃখ আর নেই / গোপন ব্যাধি নিয়ে আমি ঘরের ভিতর শুয়ে থাকি / বাইরে শূন্য বাগান'[৪৫] 'জাহাজ ডুবির আগে আমাকে বাঁচিও তুমি মগ্ন এলাকায় / মানুষের নাম দিয়ে

৩৫। আনন্দ ধ্বনিত শংখে—মৃণাল বসুচৌধুরী ৩৬। সূর্য প্রদক্ষিণ—সমীর রায়চৌধুরী ৩৭। আমার মুখ—শৈলেশ্বর ঘোষ ৩৮। হাওয়া উঠলে—রত্নেশ্বর হাজরা ৩৯। ৩-১।৪"—প্রদীপ চৌধুরী ৪০। প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার—মলয় রায়চৌধুরী ৪১। চীৎকার—পুষ্কর দাশগুপ্ত ৪২। রক্ত ঝরে নিরন্তর—গণেশ বসু ৪৩। শিবম্—নিমাই চট্টোপাধ্যায় ৪৪। সম্রাটের সমীপে গৃহস্থের নিবেদন—গৌরাঙ্গ ভৌমিক ৪৫। সার্থকতা—৺অনাময় দত্ত

যাবো মৃত্যুপূর্ব শেষ প্রার্থনায়'[৪৬] 'আমাকে করুণা কর আমি এক নির্বোধ যুবক এখনো আমি বেঁচে আছি আমাকে করুণা কর / আমাকে করুণা কর আমাকে করুণা কর'[৪৭] 'কে কার রোদন শোনে ? ঈশ্বরের মুখে / মরীচি ঋষির হাত, ঈশ্বরের কিশোর চিবুকে / অঙ্গিরা অত্রির হাত, বুকে / পুলস্ত্য পুলহ ক্রতু বশিষ্ঠেরা আপন আপন / স্বার্থ নিয়ে সাত ঋষি ছিঁড়ে যায় একটি শিশুকে'[৪৮]। —স্বাধীনতার বয়সী কোলকাতার চিত্রচরিত্রআত্মার স্বরূপ আর 'সাম্প্রতিকতার আত্মবিলাপ' অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গেই তুলে ধরেছেন সাম্প্রতিক কবিরা। এবং জীবন চিবিয়ে খেয়ে এই সত্যভাষণের জন্যেই যত তুলকালাম। ক্রুদ্ধ রগচটা হলেও যেমন বিশ্বামিত্র-দুর্বাসার ঋষি হতে বাধে নি, ক্ষুৎকাতর যৌনচর ও নির্বিকারত্বনির্ভর হওয়াতেও তেমনি এঁদের কবিত্ব ন্যূন হয় নি বরং কবিতাকে জীবনানুগ বাস্তবজাত করে বাংলা কবিতাকে ম্যাসকুলিন অভিব্যক্তি উপস্থিত করবার যোগ্য করে তুলেছে। 'প্রতিপ্রাপকতা-নাম্নী শব্দ নিয়ে করে না তোলপাড় / এই সব লেখকেরা।'[৪৯] 'সূর্য-উপাসকের প্রথায় / বিধবা মা-কে আমি শুইয়ে এলাম / সাইলেন্স-টাওয়ারের ঠাণ্ডা টালির উপর / বন্ধুদের বেইমানি আমার মদ মাংস জর্ডনের জল / সহোদরের বুক থেকে রাত দশটা-পঞ্চাশে / আমি শিকড় সমেত উপড়ে ফেলেছি দয়া মমতা ভালোবাসা'[৫০]। একটা তাজা দেহের সার্বিক ক্রিয়াকলাপ এবং অভিজ্ঞতা, অন্বেষণ ও বিশ্বাসকে নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করে 'মা বদ সত্যমপ্রিয়ম' বাক্যের বিরোধিতা করেছে, 'কেননা লুব্ধতা-গুলি পরধর্মে চৌর্যবৃত্তি করে / কেননা ব্যর্থতাগুলি বহুকাল চিনেছে সন্ত্রাস / কেননা কৌশলগুলি সন্ধানে পেয়েছে সেঁকোবিষ'—কেননা সাম্প্রতিক কবিদের আন্দোলন মুখোশ খুলে ফেলার আন্দোলন। এবং এ আন্দোলন আন্তর্জাতিক অধুনা সময় খণ্ডে। এ যুগের কবিরা জেনেছে কায়দা করে শব্দ যোজনার ফ্যাসানে কোনো গভীরতা নেই—কবিতা এখন ফ্রি স্টাইল-এর। এই স্টাইল-এর দিক থেকেই একজন কবি আর একজন কবি থেকে স্বতন্ত্র।

এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত যে, উপরোক্ত কবিবাক্যগুলো কোথাও কোথাও ছিটেফোঁটা সাম্প্রতিকপূর্ব কবিদের কাছে ঋণগ্রহণ জাত বলে মনে হলেও চরিত্র-গত দিক থেকেই সম্পূর্ণ আলাদা। এ কথা ঠিকই যে, কবির ভূমিকা সমাজ

৪৬। মানুষ এবং আমি—৺মঞ্জুলিকা দাশ ৪৭। কলকাতাকে—বেলাল চৌধুরী ৪৮। সুযোগ সন্ধানীর মতো—অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ৪৯। ক্ষুৎকাতর, যৌনকাতর নয়—শক্তি চট্টোপাধ্যায় ৫০। দ্বৈরথ—অমিতাভ দাশগুপ্ত

সংস্কারকের ভূমিকা নয় আবার চমক সৃষ্টি করা বা কসরৎ করে শব্দ সংগ্রহ বা উদ্ভট চিত্রকল্পর মালা গাঁথা কি জ্বোরো রোগীর ভুল বকাবকিও নয়। মিল দেওয়া ছন্দবদ্ধ বাক্যমিছিল কবিতা হলে কবিরাজী গ্রন্থ পাঠেই তৃপ্ত হওয়া যেতো। সমাজ ও অর্থনৈতিক পরিবেশের অভিজ্ঞতায় আত্মনির্মাণ, অন্বেষণ এবং তার উপস্থাপনই সৎকবির লক্ষ্য। এক কথায় চতুষ্পার্শ্বস্থ বাস্তবের অঙ্গী কবিসত্তার আত্মপ্রকাশই কবিতা। এ দিক থেকে সাম্প্রতিক কবিদের আত্মউন্মোচন প্রণালী কাব্যপিপাসুর প্রশংসার দাবী রাখে। বহুক্ষেত্রেই তাঁরা দ্বিধাহীন কণ্ঠ। তবে প্রায়শ পরিণতির আগেই নাম ফাটানোর চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকায় প্রতিশ্রুতিবান বহু কবিই মূলত লোভী আখ্যা পেয়েছেন এবং কবিতার জগৎ থেকে বাধ্যত বিদায় নিয়েছেন। যা লিখছেন তা না লিখলেই সাহিত্যিক সততার পরিচয় দিতেন।

স্বাধীনতা উত্তরকাণ্ডের জীবনমানস গুণগত অবমূল্যমান পরিবেশে সুধীন দত্তর 'নিয়তি' এক 'নিশ্চিহ্ন অতীত' 'আগামী'র বিরক্ত বিশ্বে 'অগস্ত্য যাত্রা' করেছে। তার 'পঙ্গুপাখা' শুধু শব্দই ছড়িয়েছে মাত্র। সাম্প্রতিক কবি জানেন, নিপুণ শব্দ কবিতায় খুবই প্রয়োজনীয় হলেও তার মাত্রাতিরিক্ত প্রয়োগ কবিতার ক্ষতিই করে। সুধীন দত্তর পরিশ্রম তাই পণ্ডশ্রমেরই সাক্ষী হয়ে থেকেছে। জীবনানন্দ দাশ তাঁর ছায়াচ্ছন্ন জ্যোৎস্না-আমেজী-রৌদ্রের হৈমন্তিকের পরিবেশে রূপকথার নায়কনায়িকার ছায়ানির্জন তন্ময়তা কাটিয়ে বাস্তব মানুষের রণরক্ত সফলতা-বিফলতাগুলো দেখতে দেখতে 'সূর্যেসূর্যে হেঁটে, চলেছিলেন। কিন্তু 'মানুষের ভয়াবহ লৌকিক পৃথিবী / ভেদ করে অন্তঃশীলা করুণার হাতের মতন' মহাত্মাগান্ধীর প্রতি বিশ্বাসও প্রতারণা করাতেই সম্ভবত মুখ থুবরে পড়লেন ফুটপাথে। অমিয় চক্রবর্তী নিয়ত চলার যাত্রী; প্রসন্নতা পিয়াসী। ভীড়ের মধ্যে থেকেও গম্বুজে গাছের ডগায় দৃষ্টি রেখে যাচ্ছেন। 'বুকের পকেটে / তার শাদা কাগজে চিঠি আছে' জেনে তিনি প্রেমের যাত্রী। 'হারানো অর্কিড'-এর বিষাদ সাম্প্রতিক যন্ত্রায়িত মানুষকে স্পর্শ করে না। বিষ্ণু দে অক্লান্ত। জনতার প্রতি বিশ্বাস তাঁর কবিসত্তার আশ্রয় বলে অভ্রান্ত অন্বিষ্ট-যাত্রী। 'সেই অন্ধকার চাই'এ তাই মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করতে পারেন 'বাংলা থেকে আমাদের বিশ্বে আগমন / প্রচণ্ড প্রকাণ্ড ঘৃণা, ক্ষুদ্র বাসস্থান / আরম্ভেই আমাদের বিকলাঙ্গ করে বিপর্যয়। / মাতৃগর্ভ থেকে আমি করেছি বহন / একলব্য আমার হৃদয়।' বুদ্ধদেব বসু 'মরচে পড়া পেরেকের' গান এবং বার্ধক্যের বহুমুখী শ্রাবে আজীবনের নিষ্ঠার স্বীকৃতি চাইছেন। অভ্যাসের বসে কবিতা

লিখে, তরুণ কবিদের বিষয়-ভাবনা অনুকরণ করে যৌবনকালীন যৌনমশাল জ্বেলে যাচ্ছেন এখনো। প্রেমেন্দ্র মিত্র নিষ্প্রভ। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে দেখা গেছে একটা মুদ্রাদোষ এবং বিষাদাশ্রিত স্মৃতি—ক্লান্তির একটা সুর তাঁর সিঁড়ি ভাঙা শব্দের অনুরণনের মধ্যে থেকে আত্মপ্রকাশ করছে। 'কাল মধুমাস' তবু নতুন আবেদন নিয়ে সমুপস্থিত।

যে সব কবিদের প্রতিষ্ঠা রাজনৈতিক উচ্ছ্বাস আর স্বাধীনতার মোহনায়, তাঁদের মধ্যে অরুণকুমার সরকার, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, নরেশ গুহ, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, জগন্নাথ চক্রবর্তী, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, রাম বসু, চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, চিত্ত ঘোষ, কৃষ্ণ ধর, অরুণ ভট্টাচার্য, প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, সুনীল-কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, রামেন্দ্র দেশমুখ্য, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, সুশীল রায়, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ মিত্র, অশোকবিজয় রাহা, আসরফ সিদ্দিক, গোপাল ভৌমিক প্রমুখ কবিদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে যেমন সমাজবাস্তবতার দিকটা তীব্র হয়ে ধরা পড়ছে, যেমন রোমান্টিক জগৎ আক্রমণ করেছে ক্ষুব্ধ মানুষের চীৎকার, তাব বিপরীত প্রকাশও তেমনি সমান্তরাল। কিন্তু সবচেয়ে যেটা গুরুতর তা হচ্ছে, প্রায় সব কবিই—অন্তত ক্ষমতাবান কবিরা এ সময় পার্টিজান হয়ে পড়েছিলেন। কবিতা হয়েছে উচ্চকণ্ঠ, মানুষের দুর্ভোগ বিবৃতি আর 'কাস্তের বুকে হাতুড়ির ডাক লেনিন জিন্দাবাদ।' অন্যদিকে হৃদয়বেদনার রক্তহীন বিবশতা আর ক্লান্তি ছাড়া কিছুই বড় একটা জন্ম পায় নি। মোটা-মুটিভাবে রাজনৈতিক হল্লা আর প্রচার সাহিত্যের গরম গরম ভাষা বুনুনি চললেও ব্যক্তিমানসের নিটোল নিখাদ তীব্রতাপ এ সব কবিদের মধ্যে অনুপস্থিত। সুকান্ত ভট্টাচার্যের নির্মাণ বৈচিত্র্য, প্রত্যক্ষ পরিচিত মানুষ এবং শিল্পের হরিহর আত্মার সম্পর্ক সৃজনের নজির এঁদের কবিতাগুলোর মধ্যে নেই বললেই চলে। তাঁর আদর্শে শোষিত মানুষের কামনা বাসনা সাধ নিয়ে কবিতা রচনা করলেও তাঁর মতো সংগ্রাম এবং শিল্পের সংযুক্তি ঘটাতে না পেরে মূলত ব্যর্থ হয়েছেন। কবিতা হয়েছে চীৎকার সর্বস্ব। 'সে শান্তি ভাঙার তরে হাত যদি বাড়ায় ট্রুম্যান / ক্ষমা নাই তার / সে শান্তি ভাঙার তরে হাত যদি বাড়ায় ছদ্মবেশী ভদ্র শয়তান / ক্ষমা নাই তার / সে শান্তি ভাঙার তরে হাত যদি বাড়ান স্বয়ং ভগবান / ক্ষমা নাই তার'। কথাগুলো আর যাই হোক কবিতা নয়। তবে সমাজকে রাজনীতিকে প্রেরণা করে যাঁরা কবিতা রচনা করেছেন, সমাজ কাঠামো পালটানোর প্রেরণাই যাঁদের মুখ্য, তাঁদের মধ্যে বীরেন্দ্র

চট্টোপাধ্যায় অন্যতম। তীক্ষ্ণ শাণিত এবং পোড়খাওয়া জীবনের ইস্পাতকাঠিন্য তাঁর কবিতাকে তেজী করে তুলছে। মনুষ্যবোধে প্রদীপ্ত, মন্ত্রের মতো সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যানিরপেক্ষ ও সর্বজনীন অভিব্যক্তি নিয়ে কবিতাগুলোর উপস্থিতি সংগ্রামী জীবনের একটা বেদনা ও যন্ত্রণারই সাক্ষ্য বহন করে। তাঁর ইদানিংকার কবিতা যেন বার্ধক্য এবং কান্নাকেই একটু বেশী প্রশ্রয় দিচ্ছে। বিদ্রোহ ঘোষণা আছে, কিন্তু ক্রুশবিদ্ধ যিশুকে বারবার স্মরণ করে উদ্ধারাকাঙ্খা একটা পরাজিত মনোভাবই বহন করে। তাঁর সাম্প্রতিক কবিতাগুলোর মধ্যে থেকে একটা প্রজ্ঞাবোধের প্রশান্তি অনুভব করা যায়। 'শ্যামলী মেয়ের সারা অঙ্গ বেয়ে / বৃষ্টির অঝোর ধারা / কান্না ধোয়া গানের শীতল স্পর্শ / সারারাত শান্তির প্রার্থনা।'— বিদ্রোহ, অভিমান, আক্ষেপ আর রূপসী বাংলার মুখে রোদ ফুটিয়ে তোলার আগ্রহ তাঁর কবিতাগুলোকে জীবন্ত করে তুলেছে। এই একই চেতনায় উদ্দীপ্ত কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত দীর্ঘদিনের কাব্যসাধনার পর এখন যুগের এই যান্ত্রিকতার মধ্যেও একদিকে যেমন আনন্দাকাঙ্খী তেমনি আত্মজিজ্ঞাসু হয়ে উঠেছেন 'আর তুমি কতকাল ফোটাবে কুসুম! নাসাস্ফীত / বিকট কবন্ধ মূর্তি দিকে দিকে / ত্রাসের ইশারা প্রস্তরিত প্রণয়কে বিবরে পাতালে শুধু টানে।' এর পালটা টানের প্রেরণাতেই যে তিনি কবিতা লিখেছেন তার স্বাক্ষর পাওয়া যাচ্ছে।

মণীন্দ্র রায় অফুরন্ত লেখক। গোছা গোছা লিখেছেন—লিখেই যাচ্ছেন। কিন্তু একটা কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, তিনি বিভিন্ন বিষয়ে মনস্ক হলেও বিচিত্র বর্ণে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে নি তাঁর কবিতা। পথান্তর রূপান্তর তাঁর কবিতায় আছে, ক্ষুদ্র কবিতা তিনি রচনা করেছেন প্রচুর কিন্তু কৃষ্ণ ধর জগন্নাথ চক্রবর্তী প্রমুখ কবিদের কবিতার সঙ্গে মিশিয়ে দিলে, নাম লেখা না থাকলে বোঝা যায় না কোনটি কার কবিতা। বর্তমানে তিনি ঔপনিষদিক চিন্তায় সমর্পিত হয়ে ভারতীয় ঐতিহ্যে উত্তরণের সাধনা আনতে চাইছেন কবিতায়। মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক অনুভূতিতে কবি নিজেই নায়ক উপনায়ক হয়ে সমাধানে পৌঁছোনোর একটা বিশেষ কথা বলতে চাইছেন। সামাজিক জীবনের চলতা শক্তিকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন নানা দিক থেকেই। এই সামাজিক অনুভূতি এবং তার তীব্র নিগূঢ় প্রকাশ-ভঙ্গিটি মোটামুটি সুখগ্রাহ্য। আমরা পূর্ব অধ্যায়ে বলেছি যে মণীন্দ্র রায় বিষ্ণু দে'র অনুসারী। কিন্তু তাই বলে এ কথা নয় যে, তিনি বিষ্ণু দে'র সেই মানুষবোধের তাজা স্বাদ আত্মস্থ করে জীবনের বলিষ্ঠ প্রকাশ বা সমাজ মানসের উন্মোচন দেখাতে পেরেছেন। মানুষ মণীন্দ্র রায়ের চোখে

পড়ে নি। 'রাস্তায় ছড়ানো শুধু সব সাধ জীবনের / আজো পরবাসী' তিনি। অস্তিত্বের নৈকট্য অনুভব করতে পারেন নি মানুষের সঙ্গে। তাঁর তাই স্বাভাবিক ভাবে বেরিয়ে আসে 'এদিনে কোথায় ঘর, দাঁড়াবে বল তো কার পাশে?' তিক্ততা আর ক্লান্তিতে অবশেষে জলচল শান্তি পেয়ে যান রমণী শরীরের তাপে, 'দেখার অতীত / নয় তো, কিন্তু চোখের উপর / চোখ ফেলে যার অন্তরাত্মা প্রেম না হোক দারুণ ঘৃণায় / হয় না চেনা' মানবিক ভালো-বাসাকে। কিন্তু এ কথাগুলো অমন পেলব করে বলার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আজকের পাঠক মনে করেন না। এদিক থেকে ধনঞ্জয় দাশ, কৃষ্ণ ধর ও প্রমোদ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা বরং খুবই আন্তরিক এবং জীবনবোধের তাজা স্বাদবহ। ধনঞ্জয় দাশের কবিতায় একটা মরমী মনের স্পষ্ট ছাপ বিদ্যমান। প্রগতিশীল আখ্যাপ্রাপ্ত কবিদের মধ্যে সব চেয়ে ক্ষমতাবান কবি বলে যিনি চিহ্ন পেতে পারেন, তিনি সাম্যবাদী কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়। যদিও অত্যধিক প্রচারমুখীতার জন্যে তাঁর কবিতা শেষপর্যন্ত আত্মহত্যা করতেই বাধ্য হয়েছে। তবে বৈপরীত্য এখানেই যে, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের অস্তিত্বই কবিত্বের। রাজনীতিকে সাবলীল ভঙ্গীতে কবিতায় উপস্থিত করে, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন কবি কবিতার খাতিরেও কবিতার জন্যে কবিতা রচনা করেন নি। তাই কবিতা হিসেবে তাঁর রচনা ন্যূনশিল্প হয়েই সক্ষম শিল্পীর অর্ধসমাপ্ত প্রতিমার পরিচয় বহন করছে। স্বল্পবাক্যে, স্বল্পগ্রন্থে দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধোত্তর ভারতের সমস্ত আলোড়নকারী ঘটনাগুলোই তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু হয়েছে। 'অশান্তির সৈনিক' কোনো কোমলতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে সোচ্চার প্রচার দিয়েছেন আপন রাজনৈতিক মতবাদের। মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠায় আত্মোৎসর্গ করাকে শ্রেয় বোধ করেছেন তিনি। বেদনাবিধ্বস্ত যন্ত্রণা-কাতর হাহাকারময় প্রেমবিমুগ্ধতাও তাঁর কবিতার রসকে সমৃদ্ধ করেছে। দেশনদীপরগনার রসসম্পদে উদ্বেল মানুষের পরিচয়বহ উজ্জ্বল দেশজ শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি তাঁর কবিতার জীবন্ত শরীর সৃষ্টি করে চেয়েছেন। অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে কবি আজীবন সন্ধান করেছেন 'সূর্যের ঠিকানা'। আর শেষ পর্যন্ত সেই আলোকের আকাঙ্খাই তাঁর কবিতায় বদ্ধমূল থেকে গেছে। 'কখন বাতাস বন্ধ চোখ বন্ধ / কখন চিৎকার চিড়বে চরাচর ভাসবে / রক্তের থৈ থৈ ভাসবে / পূর্ব ও পশ্চিম ভাসবে / উত্তর দক্ষিণ / আসবে আলো আসবে আলো।' আলো আসা সুদূরপরাহত জেনেই সম্ভবত স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়েছে কবিকে। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের

যে সব কবিতায় হৃদয়াবেগের প্রাবল্য ঘটেছে, সে সব ক্ষেত্রে তিনি বাংলা কবিতার দীর্ঘ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারকেই বহন করেছেন। স্থায়ীভাব হিসেবে গ্রহণ করেছেন ভালবাসাকে। কবির তীব্র প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও যে প্রেম তাঁর কবি ভাবনায় এসেছে তাই-ই তাঁকে কবি হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বিমল চন্দ্র ঘোষ কবি হিসেবে মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক মতাদর্শের হলেও এবং কবিতায় 'ভুখাভারত' 'নানকিং'-এর দুর্দশা এবং সংগ্রামের জ্বলন্ত কথা বললেও সে তারস্বর মর্মস্পর্শ করে না। তা একটা ঐতিহাসিক অবস্থার ছন্দোবদ্ধ বর্ণনা মাত্র।

অরুণকুমার সরকারের মধ্যে ঐ সময়কার কবিদের একটা বিশিষ্ট মনোভঙ্গি আত্মপ্রকাশ করেছে। ঋজু বাঁধুনীতে একটু সপ্রতিভ কবিতা রচনা করেন তিনি। কিন্তু তাঁর কবিতার মধ্যে থেকে তেমন কোনো গভীর প্রেরণার অনুভব আসে না। গুরুগম্ভীর বিষয়হীন একটা আলতো আমেজে তিনি বিভিন্ন বিচিত্র বিষয়ের কবিতা রচনা করেছেন। কিন্তু এ সব কবিতার কোনো অনিবার্যতা নেই —লেখাটা তাঁর কাছে বুঝিবা বালকের মতো বালি, স্বপ্ন আর আকাশ নিয়ে খেলা। কবির পৃথিবী ও মানুষের প্রতি যে অ্যাটিচিউড তা নিতান্তই ভাসাভাসা —আপন মানসের গভীর কোনো রঙবক্ত নেই তাঁর কবিতাগুলোর আন্তর কাঠামোর মধ্যে। 'বিশ্রামটা আর একটু দীর্ঘ হলে ভালো হত / কেন যে আবার সেই এক দঙ্গল সোয়ারী মাঝপথে। / ফের সেই ছোটাছুটি, বোদ, ঘাম মুখের ফেনায় নোনা স্বাদ / লেজের উপরে মাছি, গায়ের উপরে ডাঁস, খুরেখুরে ব্যথা, জ্বালা, তাপ। / কিন্তু এই ফিরে আসা, শুকনো ঘাস, দিশিমদের দোকানে চিৎকার, / আধো অন্ধকারে পিঁয়াজি ভাজার গন্ধ এ সব ভালো লাগছে / তা শুধু কর্তব্য কর্ম ঠিকঠিক করা গেছে বলে'। পুঙ্খানুপুঙ্খ বাস্তবতার বর্ণনায় হাঁপিয়ে ওঠা ছাড়া উপায় থাকে না পাঠকের। কিন্তু কিছুই ছাপ রাখে না। ক্রীতদাসত্বের 'উপরি পাওনা হিসেবে' পাওয়া মালিকের 'পিঠে হাত বুলিয়ে' দেওয়াটা ছাড়া আরো কিছু আছে—আছে ক্রোধ প্রকাশ, আছে মুক্তির সংগ্রাম। আর এ চিহ্ন তাঁর কবিতায় নেই বলেই কিম্বা ঘোড়ার তীব্র গতি এবং বেগবান অস্থিরতা অনুপস্থিত বলেই তা অনেক ক্ষেত্রে পানসে মনে হয়। তবে তিনি খুব কমই লিখেছেন।

'নীলনির্জন'এর কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী যুদ্ধোত্তর বাংলা কবিতার জটিলতার মধ্যে নিজেকে ব্যতিক্রম করে রেখেছেন আজ পর্যন্ত। তাঁর কবিতার ছন্দ

রূপায়িত বেদনারঙিন স্বচ্ছতায় একটা স্নিগ্ধ পরিমণ্ডল রচনা করে। এখন সেই 'অন্ধকার বারান্দা'র কবি তাঁর নাগরিক বিষন্নতা ও লাবণ্যকে কৌশলেই উপস্থিত করছেন। কিন্তু এটা বলাই বাহুল্য যে, তা তাঁর মর্জি অনুযায়ী নিরক্ত এবং ম্লান। তিনি তাঁর কবিতাকে খুবই সুবিন্যস্ত করতে প্রয়াসী। ফলে তাঁর কবিতা পড়ার পর একটা কৃত্রিম সৌন্দর্যে ও অনুরণনে পাঠক সচেতন হয়ে পড়ে এবং বিরক্তি আসে। 'চারদিকে অন্ধকার / মা আমাকে কাছে টেনে নাও / শৈশবে যেমন বলতে, / আজ আবার তেমনি করে বলো, / আছে, কোন দিকে আছে / করুণার স্নিগ্ধ ছলোছলো আলোকের নদী'। কবি সাম্প্রতিক জীবন ধারার মধ্যে অস্বস্তি বোধ করছেন, দেখা দিয়েছে একটা আত্মিক যন্ত্রণা। সেই প্রথম যৌবন থেকে 'সন্ধ্যা সকাল' যে 'লেখা লেখা খেলা খেলতে' সুরু করেছিলেন আজ সেই এক ঘেয়ে খেলাতে তিনি পুরোপুরি ক্লান্ত—আর ক্লান্ত হওয়াটাই স্বাভাবিক কেননা তিনি লেখাটাকে খেলা হিসেবে নিয়েছেন, জীবন হিসেবে নয়। কিন্তু বলিষ্ঠ কবির কাছে লেখাটাই জীবন, তা তাঁর মতো ক্ষমতাবান লেখকের পক্ষে জানা উচিত ছিলো। মানুষ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে আশান্বিত করতে পারে নি। 'নিখিল শূন্যের দিকে উড়ে যাওয়া / এক ঝাঁক সুন্দর মানুষ'এর ছবি একটা আচ্ছন্নতা এনে দিয়েছে কবিচৈতন্যে। তাই জীবন হয়ে উঠেছে গল্প ; 'গল্পের সবটা আমি নাগাল পাবনা। / শুধু শুনে যাব। শুধু এখানে ওখানে, / জনারণ্যে বাসের ভিতরে হাটেমাঠে / অথবা ফুটপাথে কিম্বা ট্রেনের জানালায় / টুকরোটুকরো কথা শুনব, শুনেশুনে যাব। আর / হঠাৎ কখনও কোন ভুতুড়ে দুপুরে / কানে বাজবে : বাতাসী! বাতাসী!!' এবং সমগ্র কাব্য জীবনে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতা এই টুকরোটুকরো স্মৃতি মুহূর্তের কথা মাত্র—তা একটা গোটা হয়ে ওঠে নি। নরেশ গুহও এমনি নিভৃত বিলাপী কবি। তিনি সম্ভবত বুদ্ধদেব বসুর সার্থক উত্তরাধিকার বহন করে তাঁর আশীর্বাদের জোরেই কবিতা-ক্ষেত্র থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। কিন্তু একদা তিনি তাঁর কবিতার মধ্যে যে প্যাশানের অবতারণা করেছিলেন তা 'দুরন্ত দুপুরে'র পাঠককে মুগ্ধ করেছিলো। 'মার কোলে শিশু ঘুমে অচেতন চুলে বিলি দেয় হাওয়া / একটি চুমায় বিশ্বের সব বিত্তের স্বাদ পাওয়া' ভাগ্যের কথা এবং এর জন্যে 'শতবার ফিরে জন্ম নেওয়ার অভিলাষ'ও প্রাণে পোষণ করেছেন নরেশ গুহ ; কিন্তু নরেশ গুহর কবিতা পাঠকের কাছে সে অভিলাষকে নিছক একটা সৌখীনতা বলেই মনে হয়। নিরক্ত অবসাদে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে তাঁর কবিতাগুলো।

এ সময়ের ক্ষমতাবান জীবন-ঘনিষ্ট কবিদের মধ্যে রাম বসু অন্যতম। আবেগের তীব্রতায় স্পষ্ট উচ্চারণে তিনি আসন্ন পরিবর্তনের প্রত্যাশাকেই কবিতায় উপস্থিত করেছেন। 'যখন যন্ত্রণা'র দিকে তাঁর যে উদ্দাম উদ্যম দেখা গেছে, বর্তমানের কবিতায় স্বাভাবিক ভাবেই তার মরাকোটাল। প্রকৃতিকে তিনি আবেগ প্রকাশের জন্যে কবিতায় প্রয়োগ করে এক দুর্বার যৌবনের আবেদনকে উপস্থিত করেছেন। 'আখের পাতা তলোয়ার হয়ে ঝলসে ওঠে উদ্ধত গৌরবে / শিকড়ের ছায়ার জটিলে গুঁড়োগুঁড়ো হীরার বিভূতি / গর্ভবতী নারীর মতো নিসর্গ এখন সম্পূর্ণ ও আত্মমগ্ন / যা কিছু সৃষ্ট, লীন, সম্ভাবনা—সব, সপ্রতিভ নগ্ন আলোয়'। আর কবি জানেন, 'নীলিমা দেওয়াল মাত্র। তার ওপারেও আছে।' এবং 'একদিন পৃথিবীর অন্ধকার উর্বরতা হবে।' তবে অপরিচ্ছন্ন শব্দ ব্যবহার এবং অযথা আবেগ তাঁর বহু কবিতাকে ক্ষুণ্ণ করেছে। কিন্তু পূর্বপর্বের যে সব কবিরা এখনও পত্র পত্রিকায় কবিতা ছাপছেন, তাঁদের মধ্যে রাম বসুই ক্রম উত্তরণ লাভ করছেন। সুশীল রায়ের কবিতার মধ্যে নানা ধরণের অভিজ্ঞা এবং আত্মলীন মগ্ন ভাবনার সৌন্দর্য অন্বেষার পরিচয় দেখতে পাওয়া যায়। স্বাধীনতা প্রাক্কালের রাজনৈতিক বিস্ফোরণে আক্রান্ত না হয়ে দৈনন্দিন জীবন যন্ত্রণায় জ্বলে প্রাকৃতিক রূপপ্রতিমার সৌন্দর্য এবং যৌবন স্মৃতি রোমন্থনেই নিজেকে নিযুক্ত রেখেছেন সুশীল রায়। যন্ত্রণা কি হতাশায়— সামাজিক বিবর্ণদশার থেকে দূরে না থেকেও এর থেকে একটা মুক্তির পরিমণ্ডল খুঁজে পেয়েছেন তিনি। প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের মধ্যে থেকে মানুষের অজ্ঞাত মাধুর্যকে খুঁজে পেয়েছেন তিনি। বেদনা রক্তিম আনন্দ—একটা হঠাৎ খুশির লক্ষণ তাঁর কবিতায় আত্মমগ্ন প্রাণের মাধুর্য সৃষ্টি করেছে। 'আক্ষেপ কিসের? যদি জীবনটা ধুধু মরুভূমি—/ আনন্দ অপার—জানি আছে অঘটন, আছ তুমি।' এরই পাশে অরুণ ভট্টাচার্যের কবিতা পাঠে পাঠক আহত বোধ করে। অরুণ ভট্টাচার্যের কবিতায় জীবনের একটা স্বতস্ফূর্ত আবেগ আত্মপ্রকাশ করে সত্য—কিন্তু দীর্ঘদিন কবিতা চর্চার ফলেও তাঁর কবিতার কোনো নিজস্ব চরিত্র আসে নি। তাঁর কবিতাব হৃদয় ও মানসিক কোমলতা, নানা বর্ণ গন্ধ স্বাদ বৈচিত্র একটা মরমী পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে। প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিনিয়ত গঠন ভাঙনের দৃশ্য কবিকে বিষাদগ্রস্ত করেছে, এসেছে একটা রোমান্টিক যন্ত্রণার অনুভব। 'সরলরেখার মত যে সব দিনগুলি রাতগুলি / গভীর অন্ধকারের মধ্যে মুখ লুকিয়ে থাকছে অন্তরালে / হাত বাড়িয়ে যা পেতে চাই বুকের মধ্যে, তা /

আর পাব না।' একটা সারল্য ও স্নিগ্ধতা সরল নির্মাণ পদ্ধতির মধ্যে থেকে আত্মপ্রকাশ করলেও তাঁর কবিতা মূলত 'নির্জীব আলোর রেখা' মাত্র। আর একটা অভ্যাসের সুরই বজায় রেখে যাচ্ছেন তিনি।

উপরোক্ত কবি-সমাজ কবিতা 'নির্মাণ' ব্যাপারে অগ্রজ কবিদের ঐতিহ্যকেই সঠিকভাবে ব্যবহার করেছেন। বস্তুত এঁরা নতুন কবিসমাজের সামনে একেবারেই কোনো আদর্শ রাখতে পারেন নি। যে তীব্র বেগে তাঁরা শ্রেণী চেতনার নামে স্থূল বাস্তবতা এবং স্লোগান উপস্থিত করেছেন, তা তাঁদেরই পরাজয়মন্যতার মধ্যে থেকে উপহসিত হয়েছে। আবার যাঁরা ব্যক্তিগত স্বর শোনাতে গিয়ে আন্তর প্রেরণার আশ্রয় নিয়েছেন, নিজের ভেতরে নিমজ্জিত হয়েছেন এবং বানিয়ে গুছিয়ে কেঁদে ভাসিয়েছেন ও কৃত্রিম কাগজীফুলের সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন তাঁরা সাম্প্রতিক কবিদের কাছে কৃত্রিম বলেই অগ্রাহ্য হয়েছেন। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের পর এই দীর্ঘ কবি-প্লাবনের মধ্যেকার একটি ঢেউই সাম্প্রতিক কবিতায় জোর পলি ফেলতে পেরেছে এবং সে ঢেউটি জীবনানন্দ দাশ ; আর পরের ঢেউ-জোড় যুগপৎ সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

আগেই বলা হয়েছে 'এক্ষণ' খরস্রোত। কোনো একজনকে স্পষ্ট দেখতে না দেখতেই তিনি কোথায় হারিয়ে যান। কিন্তু ঐ স্বল্পক্ষণটুকুতেই যে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেন তা নির্ভুল শরক্ষেপ। আপন বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট। যেন মবিল চালিত বাসের এক ঝলক মুখ কি ট্রামের তলায় চকিতে থেঁতলে যাওয়া একটা তাজা যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যুর রক্ত পিচকিরি। এঁরা প্রায় সবাই নিজের কথা বলতে ব্যাকুল। হাডসন প্রুৎস নিয়ে মাথা ঘামান না—পিঁড়ি দেন না বিশ্বনাথ কোবরেজকে আর ইলিউশন এ্যাণ্ড রিয়ালিটির তত্ত্ব বুঝে কবিতা করতেও অনিচ্ছুক। সমস্ত নীতি নিয়মই জানা হয়ে গেছে—দেখা হয়ে গেছে সাংবিধানিক মুরোদ। যাত্রা-রোধী, স্বাধীনতাগ্রাসী প্রকাশের শত্রুরকে তছনচ করেই এঁদের আত্মপ্রকাশ। শুচিবাইগ্রস্ত সমাজমানসের কাপুরুষতাকে ঝাঁকানি দিয়েই—'গুগোবরের সামিল' উপমা দিয়েই মনোজগতের উদ্ধার আনছেন। কবিতা সুরু হয়েছে নতুন অবয়ব নিয়ে। কি হোলো তা ভাববার অবকাশ নেই—কি রইল তা জানতেও চান না। কিছু একটা হলেই নিজের দমবন্ধ অবস্থাটা একটু হাল্কা হয়, এমনি একটা বোধেই রচিত হচ্ছে ভূরিভূরি কবিতা। সব কবিতার কবিকে উপস্থিত করা এখানে যায় না, সম্পূর্ণতই অসম্ভব ; বুঝি সবার নাম করাও সম্ভব নয়। নানাদিক, নানাধরণ, বৈচিত্র ও স্বাদে আলাদা,

এই দেখতে পাওয়া গেলো—পরক্ষণেই নেই। ঠিক ডালহৌসী পাড়ার 'উইক ডে'গুলোর কনভয়। কার কতদূর স্থায়িত্ব কেউ বলতে পারে না। এরই মধ্যে ফুরিয়ে গেছেন শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, আলোক সরকার, যুগান্তর চক্রবর্তী—আনন্দ বাগচীরা তো পিকচারেই নেই। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার, তরুণ সান্যাল, সিদ্ধেশ্বর সেন, মানস রায়চৌধুরী, জ্যোতির্ময় দত্ত, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, তারাপদ রায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কবিদের অবস্থাও নিষ্প্রভ। তবু কবিতা হচ্ছে। অভিযোগ উড়ছে।

একথা অস্বীকারের কোনো কারণ নেই যে, 'সকলেই কবি নয় কেউ কেউ কবি।' প্রত্যেক সামাজিককেই প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে সামাজিক দায়িত্ব পালন করতেই হয়। কবিও করে থাকেন। কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রে কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্যের কথা প্রাথমিক বিষয় হয়ে ওঠে না; সেখানে এক সামাজিকের কাছে অন্য সামাজিকের ব্যক্তিগত অনুসন্ধানজাত মৌলিক মানবিক অনুভবের আবিষ্কার, তার বিশ্বাসযোগ্য উপস্থাপন এবং সুন্দর অবয়বগত রূপকর্মই বড় কথা। একজন কবির তাই পাঠকের কাছে আপন অনুভবের—আত্মস্থ বাস্তবের উপস্থাপনের জন্যে নিজেকেই একটা যোগাযোগের (কমিউনিকেশনের) ভাষাও তৈরী করে নিতে হয়। নতুন আবিষ্কৃত অনুভবসত্য প্রায়শই পুরোনো মাধ্যমে প্রকাশ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ব্যাপারটাকে বলা যায় অস্থিমজ্জারক্তমাংসমেধামনের—ব্যক্তির সামগ্রিক অস্তিত্ব ও সংবিতের অনুবাদ। এই অনুবাদকর্মে যাঁর যত দক্ষতা তাঁর কবি হিসেবে তত সার্থকতা। বাস্তব দিক থেকে রেনেসাঁস্ শব্দটির যেমন বাংলা অনুবাদ তার সামগ্রিক অর্থ এবং নিহিত সত্য বজায় রেখে প্রায় অসম্ভব —'ম্যাডোনা'কে যেমন 'ছেলেকোলে মা' বললে তা অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ে, তেমনি সাম্প্রতিক কবিভাবনায় এমন সব জটিলতা দেখা দিয়েছে যে, তার অনুবাদ বা ভাষাবয়ব দেওয়া কোনো জলবৎতরল পদ্ধতিতে অসম্ভব। সেখানে অন্বয় রাখা যায় না. যুক্তি পরম্পরায়ও সব কিছুর উপস্থাপন অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। এমন কি 'থট প্রসেস' অনেকখানিই পাঠকের কাছে অনাবিষ্কৃত থেকে যায়। তাই বলে, যে-কবিতার সবটা বোঝা গেলো না, তা কবিতা হয় নি, এমন কথা বলা যায় না।

বাংলা কবিতার রবীন্দ্রোত্তর পর্বের বিচার বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, স্থান-কালপাত্র প্রায় কোথাও অবর্তমান থাকে নি। কবিরা সামগ্রিক ভাবেই তার চিত্রচরিত্র তুলে ধরেছেন। আপন আপন অনুভূতি প্রকাশের জন্যে মেজর কবি

মাত্রেই আবিষ্কার করেছেন চরিত্রচিহ্নিত কমিউনিকেশনের ভাষা। এ ব্যাপারে জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, উৎপল কুমার বসু, শঙ্খ ঘোষ, বিনয় মজুমদার, অমিতাভ দাশগুপ্ত, তারপদ রায় ও তরুণ সান্যাল শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বাচনের দিক থেকে একটা ক্রমবিবর্তনের ধারায় বাংলা কবিতার ভাষা যেমন তীক্ষ্ণতা অর্জন করেছে, তেমনি রূপগত, পদ্ধতিপ্রকরণগত এবং দর্শনগত পরীক্ষানিরীক্ষাও চলে আসছে। প্রতীকতা, সাংকেতিকতা, চিত্র-কাল্পনিকতাকে আশ্রয় করে অনুভূতির মূর্তি দেবার চেষ্টা, চেতনার্ধচেতন অব-চেতন চৈতন্যস্রোতের প্রয়োগ, রোমান্টিসিজম রিয়ালিজম সুররিয়ালিজমের অনুসরণ যেমন ব্যাপকতা লাভ করেছে, তেমনি এসেছে ফ্যান্টাসি, স্বপ্ন ও অব্-সেশনের অভিপ্রকাশ। বাংলা কবিতায় দেখা দিয়েছে লৌকিক অতিলৌকিক জগতের লীলা। এ কথা অনস্বীকার্য যে, অবয়বগত দিক থেকে বাংলা কবিতা আন্তর্জাতিক ফ্যাশান প্যারেডে অবশ্যই ভারতের মুখোজ্জ্বল করতে পারে। বস্তুত আঙ্গিকগত, পদ্ধতি-প্রকরণ ও কাব্যদর্শনগত বিশ্বব্যাপী আন্দোলন থেকে বাংলা কবিতা বড় একটা দূরে থাকে নি। আর এক একটা আন্দোলন যখনই সুরু হয়েছে পাঠক সাধারণ প্রথমদিকে খানিকটা হকচকিয়ে গেলেও শেষাবধি সামলে নিয়েছে। 'চোখে তার অক্ষম পিচুটি' ওয়ালা 'মাসিক হাজার টাকা' মাইনের সমালোচকের বহু নিন্দা ভূষণ করে প্রতি নতুন কবিতা রসাস্বাদনযোগ্য হয়েছে। পরিবর্তিত সমাজের ও পরিবেশের জটিলতায় কবিতা কালক্রমে এমন একটা স্তরে উপস্থিত হয়েছে যে, পাঠক পুরোনো কাব্য ধারণানুযায়ী নতুন কবিতাকে আস্বাদন করতে গিয়ে আহত হচ্ছে এবং মনে করছে, এ সব কবিতা বাংলা হলেও হিব্রুর মতো কোনো অপরিচিত ভাষায় লেখা। কিন্তু এ জন্যে রচনাকে কোনো রকম দোষারোপ করার আছে বলে মনে হয় না। রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং মানবিক ধারণাগুলো এত খরপ্লাবনে পরিবর্তিত হচ্ছে যে, গুণ ছিঁড়ে নৌকো উড়ে যাবার মতো-ই দিকবিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে কবিচৈতন্য—জগত এবং জীবন ব্যাপারের মুল সুরের নাগাল পেতে চেষ্টা পেয়ে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হতে হয়েছে কবিকে। আর তাই বিচ্ছিন্নতাও এসেছে অপ্রতিরোধ্য আক্রমণের মতো কবি ও পাঠকের মধ্যে। কবি চেষ্টা করেছেন জগৎ ও জীবনের মূল স্পিরিটকে উদ্ধার করতে এবং মানুষের মানুষ হিসেবে যে স্পিরিট—সেই স্পিরিটের কাছে আবেদন রাখতে। এ স্পিরিট সেই মানুষিক

অস্তিত্ব, যা জলে ডুবে মরার প্রাগমুহূর্তে ব্যক্তির মধ্যে থেকে আত্মপ্রকাশ করে। মানুষের এই মৌলিক স্পিরিটেরই অনুসন্ধান ছিলো জীবনানন্দ দাশের ও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অন্বেষণ সমষ্টিগত মানুষের মৌলিক সামাজিক স্বরূপের। জীবনানন্দ দাশ তাঁর কুহক সৃজনী শক্তিতে বাধ্যতামূলক ভাবে পাঠককে যেমন তাঁর গহন দুর্জ্ঞেয়তায় টেনে নিয়েছেন এবং একা করে দিয়েছেন, বিষ্ণু দে ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় তেমনি সমষ্টিগত সংগ্রামী স্বরূপ আবিষ্কার করে পাঠককে তার একজন করে দিয়েছেন। বাংলা কবিতা তাই মানুষের স্পিরিটের কাছে এবং সমষ্টিগত স্বরূপের কাছে দুদিক থেকেই আবেদন রাখতে এগিয়ে এসেছে।

পরবর্তী কবিরা এই অগ্রজদের থেকে পাঠ নিয়ে, পূর্বোক্তদের সাফল্য ও সিদ্ধিতে উৎসাহিত হয়ে মানুষের স্পিরিটের কাছে আবেদন রাখতেই একটা নতুন সংযোজন আনতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু প্রায় সবাই-ই থেকে গেলেন অগ্রজ মুখাপেক্ষী। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সিদ্ধেশ্বর সেন, শঙ্খ ঘোষ, উৎপল কুমার বসু প্রমুখ শক্তিমান কবিরা স্থানকাল-পাত্রকে যেমন একদিকে সরাসরিভাবে পাঠকের কাছে উপস্থিত করেছেন, তেমনি পাঠকের মানবিক স্পিরিটের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন সামাজিক এবং আত্মিক অস্তিত্বের অভিব্যক্তি—একটা অ্যাটিচিউড। কিন্তু অতিমাত্রায় অগ্রজ-মুখাপেক্ষিতা ও স্থানকালপাত্রের প্রত্যক্ষ চিত্রচরিত্রের প্রতি অত্যধিক অসহিষ্ণুতায় —অর্থাৎ আবেগ এবং ক্রোধ সংযমের অক্ষমতায় বিষয়ের সঙ্গে নিজেদের একাকার করে ফেলার জন্যে স্বকীয় অ্যাটিচিউডকে সার্থক করে তুলতে পারেন নি। এখানেই কবি হিসেবে তাঁদের যে সামাজিক দায়িত্ব তা অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। কবিতা প্রায়শই ব্যক্তিগত স্বগতভাষণের স্তর অতিক্রম করতে পারে নি। চমকে, চটুলতায় ও আঙ্গিকগত রূপকর্মগুণে একটা বিচ্ছিন্ন পঙক্তি—কখনো বা একটা গোটা কবিতাই—ঔজ্জ্বল্য পেয়ে হয়তো সাময়িকভাবে পাঠককে অবাক করে দিয়েছে, কিন্তু মানুষ হিসেবে মানুষের যে স্পিরিট—যে মৌলিক শক্তি—তার উন্মোচন আনতে পারে নি। প্রায় সবাই হৈ চৈ তুলে ডামা-ডোলের মধ্যে হারিয়ে গেছেন। অপেক্ষাকৃত তরুণদের সংকট এবং দায়িত্ব তাই আরো তীব্র হতে বাধ্য হয়েছে। কেননা, নিকট অগ্রজরা 'পৃথিবীর শেষ কিছু কবিতা দ্রুত লিখে ফেলা হচ্ছে' বলে ঘোষণা দিয়ে 'সাপ্তাহিক কবিতা' 'দৈনিক কবিতা' 'কবিতা ঘন্টিকী' প্রভৃতিকে আশ্রয় করলেন—এবং কবিতা

হিসেবে নয় নিছক সাজসজ্জার জন্যে—ছাপা বাঁধাই অঙ্গ অলংকরণের জন্যে —রাষ্ট্রপতি পুরস্কার লাভ করলো 'দৈনিক কবিতা'। কবিতা ব্যাপারটা একটা ফ্যাশানের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছোলো—এবং আমরা জানি ফ্যাশানের কোনো গভীরতা নেই। তাই এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, তরুণ কবিতার সংকট চরিত্রের সংকট। ফ্যাশান সর্ব্বস্ব সমাজে স্টাইল, যা অর্জ্জন করে চরিত্র হয়ে ওঠে, সে স্টাইল আয়ত্ব করার বদলে দেখা দিয়েছে সস্তায় বাজীমাৎ করার প্রচেষ্টা। আর এরই ফলশ্রুতিতে ইদানিংকার কবিতা নির্জীব হয়ে পড়েছে অনেক ক্ষেত্রেই। এবং ফ্যাশানের পরিচালক যেহেতু এষ্টাব্লিশমেন্ট, মনোপলিষ্টিক সাহিত্য ব্যবসায়ীর মুনাফালাভের জন্যে সাহিত্যের বাজারও তাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে বিকিনি, মনোকিনি, চোস্তপাৎলুন-মার্কা সাহিত্য তথা গদ্য পদ্য আমদানী করে। চরিত্রবান লেখকদের মধ্যে তাই দেখা দিয়েছে সুগভীর বিষণ্ণতা এবং প্রতিদ্বন্দীতার অরাজক মনোভাব। ফলে, যাঁরা এষ্টাব্লিশমেন্টকে আঘাত করার জন্যে সরাসরি বিদ্রোহ ঘোষণা করে সাহিত্যক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন তাঁরা প্রত্যক্ষত সততার সঙ্গে বিদ্রোহ পরিচালনা করলেও পরোক্ষে এষ্টাব্লিশমেন্টেরই সহায়ক হয়ে উঠেছেন। এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না, যে, তথাকথিত হাংরি জেনারেশনের লেখক কবিরা সেই বিভ্রান্তিরই শিকার হয়ে পড়েছেন। অথচ এই সাহিত্য আন্দোলনের প্রথম সারির দু'চারজন লেখক-কবি তাঁদের সমগ্র রচনা কর্মের মধ্যে থেকে মানুষের অস্তিত্বের—সেই স্পিরিটের—কাছেই তাঁদের অনুভবের অ্যাটিচিউডটি উপস্থিত করতে চেয়েছেন। এঁদের ক্ষমতা প্রশংসনীয়। এ ছাড়া অন্যান্যরা সবাই বিষণ্ণ—নিজেকে নিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তবে চলতি পর্বের কবিদের সম্পর্কে এখনই জোর গলায় কিছু বলা সম্ভব নয়। নানামুখী পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে—আয়োজনও দেখা দিয়েছে অনেক। ইতস্তত পাঠযোগ্য কবিতাও হচ্ছে এবং এসব কবিতার কোনো চরিত্র না গড়ে ওঠাই স্বাভাবিক।

অতি-তরুণ কবিতার কোনো নির্দিষ্ট চরিত্র আমরা এক্ষুনি আশা করি না। কিন্তু তরুণ কবিদের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার এমন একটা হ্যাংলামি দেখা দিয়েছে, যা দেখে স্বনামধন্য কোনো লেখকের উক্তি মনে পড়ছে: কাঁচা বাঁশে বাঁশি হইতে পারে, লাঠি হইতে হইলে পাকা বাঁশের দরকার। আমরা সবাই ভাই বেটা হইয়া জন্ম গ্রহণ করি, কেহই জ্যাঠা হইয়া জন্মাই না। কিন্তু আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন যাঁহারা জন্মাইয়া জ্যাঠাইয়া যান। —আর এ রকমই একটা ব্যাপার এখনকার কবিতার জগতে চলছে বলে মনে হচ্ছে। কিছু একটা তৈরী হয়ে

ওঠার আগেই পাঠকসাধারণের সামনে কবি(?)কে উপস্থিত করে তার পেছনে মাদলধারী জুটিয়ে আসর জমানোর আপ্রাণ চেষ্টা চলছে—'বড় কবি', 'মহাকবি' আখ্যাও দাবী করছেন কেউ কেউ। কিন্তু যে পরিমাণ পরিশ্রম তাঁরা এ ব্যাপারে বিনিয়োগ করেন, তার একশ ভাগের দু'-চার ভাগও যদি 'কবিতা'র ব্যাপারে ব্যয় করতেন, তবে অধুনার কবিতা এমন কেলেঙ্কারী রকমের হাস্যকর হয়ে উঠতো না। অথচ এঁদের মধ্যে নিকট অগ্রজদের প্রভাব ভয়ানক ভাবে কাজ করলেও বাংলা কবিতাকে অনেকেরই কিছু দেবার ছিলো—এবং প্রত্যয়ের সঙ্গেই বলছি, দিতে পারেনও। আমরা এক সঙ্গেই কতকগুলো নাম উচ্চারণ করতে পারি যাঁরা সত্যিই ক্ষমতাবান ও দায়িত্বশীল। বাংলা কবিতা পাঠক এঁদের কাছে আশা করলে প্রতারিত হবেন না বলেই আমার বিশ্বাস।

এই প্রসঙ্গে এটা বলে নেওয়া দরকার যে, এ সময়কার কবিদের দিকে পাঠক আকৃষ্ট হয়েছে ১৯৬১ সালের শেষ দিকে এবং '৬২ সালের মুখে। পশ্চিমী জগতে এর আগেই নতুন কাব্য আন্দোলন সুরু হয়েছিলো—অ্যাংরী, বিট ইত্যাদি আন্দোলন। বাংলা দেশে তার স্পন্দন এসে পৌঁছোতে দেরী হয় নি। ভূমি প্রস্তুত করেছিলো 'সময়' নিজের হাতেই। ঘটনাচক্রে মার্কিন কবি অ্যালেন গিনস্‌বার্গ ভারতের মাটিতে—এই বাংলা দেশেই পা দিয়েছিলেন এ সময়ে, যেন পলতে উস্‌কে দিতে। আর তার ফলে 'ক্ষুধা সংক্রান্ত' কাব্যসাহিত্যশিল্প আন্দোলনটা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে। আন্দোলনকারীদের মুখপাত্র হয়ে শক্তি চট্টো-পাধ্যায় ঘোষণা দিলেন, 'বদহজমই হোলো শিল্প ; জীবন চিবিয়ে যতটুকু অখাদ্য তাই হোলো গদ্য পদ্য ছবি ইত্যাদি...।' এ আন্দোলনেরও হাত বদল হয় ১৯৬৩ সালে। প্রথম প্লাবনে যে জোর এসেছিলো তা এষ্টাব্লিশমেন্টের খপ্পরে পড়ে ঝিমিয়ে যায় ; কবিরা অনেকেই আন্দোলনের সমাপ্তি ঘোষণা দিয়ে আখের গুছিয়ে নিতে লাগেন। কিছু সংখ্যক অতি-তরুণ কবি সাহিত্যিক আন্দোলনের সেই ফেলে দেওয়া জ্যান্ত লাশটা তুলে নিয়েছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ের 'হাংরী জেনারেশন' আন্দোলনে হয়তো তিন চারজন ছাড়া জোরদার কবি গদ্যকার নেই, কিন্তু একটা আন্দোলন তাও যদি দিতে পেরে থাকে তাতে বাংলা সাহিত্য উপকৃতই হয়েছে বলতে হবে। সাম্প্রতিক গদ্য আলোচনা কালে আমরা দেখেছি এঁদের শক্তি পূর্বসূরীদের তুলনায় কম নয়। তবে পুলিশী কাণ্ড এবং হৈচৈ খুবই বেমানান ঠেকেছে। এত সব কিছুর প্রয়োজন ছিলো না। আদি চর্যাটি থেকে সুরু করে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-বিদ্যাসুন্দর পেরিয়ে বুদ্ধদেব বসুর কবিতার দেশে

—সামাজিক তথাকথিত শুচিতা ভেঙে তছনছ হয়ে যাওয়া সমাজে-সময়ে নাক সিঁটকোনোর কিছু আছে বলে মনে করি না, যেমন মনে করি না বহু নিষেধ ও প্রচার সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতে জন্মহার প্রতিদিন মাত্রছাড়া হতে দেখে। যৌনতা মাত্রেই অপাঙক্তেয় নয়। ঈশ্বর জুড়ে দিলেই যদি যৌনতা আবালবৃদ্ধ-বনিতাগ্রাহ্য পবিত্র কবিতা হয়, তবে তো সাম্প্রতিক প্রায় সব কবির কবিতাতেই যৌন ও ঈশ্বর সমতল রাস্তায় জেগে থাকা খোয়া-পাথরের মতোই বর্তমান। সাম্প্রতিক কবিরা ভিজে পাট দিয়ে পাঠককে ঠকাতে চান নি ; দিয়েছেন শুকনো খরখরে পাট—খুব চড়া গলাতেই আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছাটা ঘোষণা করেছেন। আর সাম্প্রতিক কবিতা আন্দোলনের প্রথম ঝক্কিটা পোহাতে হয়েছে 'কৃত্তিবাস' লেখকদেরই এবং মার এসেছে পাঠকদের তরফ থেকে। এঁদের কবিতায় যৌন প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে প্রকৃত সৃষ্টির উৎস হিসেবে এবং সংস্কারমুক্ত সচেতন কবিতা-পাঠকের কাছে স্থানকালপাত্রের সার্বিক অভিব্যক্তিই ধরা পড়ে সাম্প্রতিক কবিতায়। এখানে মোটামুটি কয়েকজন কবির পরিচয় উপস্থিত করা যাচ্ছে। সহস্রমুখী কবিতার পরিচয় নয়।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর কবিতায় স্নিগ্ধতা এবং পেলবতার প্রলেপ দেবার সাধনা আছে। কোথাও কিছুটা তীব্রতাও চোখে পড়ে। ঘরোয়া জীবন ও গ্রামীণ পরিমণ্ডলের ব্যবহারে এবং অনাগরিক বুলন মণ্ডলদের মতো মানুষকে কেন্দ্র করে কবিতায় তাঁর একটা চিরকালীন বেদনা ও সৌন্দর্যের দ্যোতনা আনার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। তিনি 'মুক্ত কালকেতু আজন্ম গ্রামীণ' বলে দাবী করেছেন। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত 'মৌলী পাহাড়' রবীন্দ্রনাথ-অমিয় চক্রবর্তীর প্রশান্তির পথযাত্রী। তাঁদের কবিতার প্রত্যক্ষ প্রভাবে প্রভাবিত। ঈশ্বর এ কবির আশ্রয়। কিন্তু সে ঈশ্বর তাঁর কেন্দ্রীয় প্রেরণা হতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। 'মস্ত খেলাঘরে' কবি মরে বেঁচে থাকছেন, দেখছেন 'কাঠুরের ছদ্মবেশে' ঈশ্বর চলে যাচ্ছেন। কিন্তু 'ঈশ্বরের ডাকনাম' যখন 'কাদায় লুটিয়ে' চলে যাচ্ছে যান্ত্রিক অবিশ্বাসী জগৎ, তখন অলোকরঞ্জনের 'ঈশ্বর ঈশ্বর' করে আর্তনাদে একটা কৃত্রিমতা বুঝেই সম্ভবত 'নিথর শূন্যে / মিলিয়ে গেলেন নশ্বর ঈশ্বর।' অথচ এখনও তিনি ঘোষণার মতে বলছেন 'ঈশ্বর আছেন, / মগডালে-বসে-থাকা পাপিয়াকে আর / পর্যবসিত বস্তু পৃথিবীকে স্নান করাচ্ছেন।' এমনি কথা শুনিয়েই সিল্কের গেরুয়াপরা ব্রহ্মচারীরা হিপীদের শিষ্য করে সুখে থাকছেন আর সাম্প্রতিকতম আণবিক বোমা পরীক্ষার শব্দ গোটা বোধটাকেই উপহাস

করে সমুদ্রসবুজ ও মাতৃগর্ভের ভ্রূণ ঝলসে দিচ্ছে। 'নিষিদ্ধ কোজাগরী'তে ঈশ্বর তাঁর রচনায় আরো অন্তর ঘনিষ্ট হয়ে পড়েছে। 'যৌবন বাউল' কালের কবি-চেতনা ক্রম বিশুদ্ধিতে এলেও তাঁর এখনকার কবিতায় একটা চতুরতা দেখা দিয়েছে। প্রচুর সংলাপ এবং শব্দ ব্যবহারের মধ্যে থেকে এ চতুরতা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। একে নগরমনস্ক হবার অযথা ঝোঁক বললে অত্যুক্তি হয় না। যেমন, 'তবে শোনো, এই নগরীর সন্তান / আমিও, অথচ যে রাখাল দূর দেশী, / আমি তার কাজে সঁপেছি মন প্রাণ / কেননা শহরে পাঠভেদ বড়ো বেশি।' সাধারণ বস্তুকে হঠাৎ দার্শনিক অভিব্যক্তি দেবার ব্যাপারটা অনেক ক্ষেত্রে প্রসাদগুণ লাভ করেছে। কবিতায় তিনি মাধুর্যেরই সাধনা করেন। গাছগাছালি পাখিপাখালি শহর মানুষের কাছে চকিত ভালোলাগার বিষয় হিসেবে উপাদেয় হলেও এই অশান্তির ডামাডোলে বস্তুতই তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে পারে না। তৎসম শব্দকে ভেঙে তিনি যেমন কবিতায় নতুন অর্থদ্যোতনা আনেন, তেমনি ব্যবহার করেন ব্রাত্য শব্দ। 'তিনটি নিয়তি দুই বেলা আসে ছন দিয়ে ছাওয়া ঘরে / বাঁকা চাতুরীর মরাল গ্রীবায় তবু সারাদিন ভাসি / যোগীর অবোধ চিত্তের মতো নির্মল সরোবরে।' একটা শুচিবাইগ্রস্ত ভাব তাঁর মধ্যে প্রায় বদ্ধমূল থাকায় অলোক-রঞ্জনের কবিতা ঝড়ঝাপটার সময়েও খুবই নিরাপদ দূরত্বে গা বাঁচিয়ে থেকেছে।

শঙ্খ ঘোষ এবং সিদ্ধেশ্বর সেন খুবই অল্প লেখেন, কবিতাও এঁদের খুব মৃদু স্বভাবের। মিষ্টি মধুর ছন্দবন্ধ মার্জিত শব্দ ব্যবহাবের মধ্যে থেকে সপ্রতিভ কণ্ঠে শঙ্খ ঘোষ তাঁর জীবনমনস্ক ভাবনাগুলো উপস্থিত করেন। নিয়ে আসেন একটা স্বচ্ছন্দ অনুরণন—'জনহীন টলটল শব্দ করে / দিগন্তের ঘরে / আমাদের নাম মুছে যায় চুপচাপ। খুব ক্ষীণ / টুপটুপ খুলে পড়ে ঘাসের মাথায় নীল, আর কোনো দিন / কোনো জোর কোরো না আমাকে'। সমকালীন রাগ ও ক্ষুধার আন্দোলনের হৈ হল্লোড়ের পরিবেশে থেকেও 'কিছু নিজস্বতা'র কামনা নিয়ে চিরকালের কথা বলতে ব্যগ্র শঙ্খ ঘোষ। 'একবার এরমুখে একবার অন্যমুখে / তাকাবার এই-সব প্রহসন / আমার ভালো লাগে না।' তাঁর কবিতায় আছে একটা সংলাপের ভঙ্গি—ভাষা একটু লাজুক। কিন্তু তার দ্যোতনা সুদূরের। কখনো তা প্রায় মন্ত্র হয়ে যায়—'যে প্রভাতে ছিলে তুমি ঘরে / তোমার মুখের চেয়ে শ্যামলতা ছিলো না / ভুবনে।'

রবীন্দ্রনাথকে আত্মসাৎ করে, সচেতন আঙ্গিকে, মণীষার ছাপময় শুদ্ধ শব্দে সুগঠিত কবিতা উপস্থিত করেন শঙ্খ ঘোষ। দুটি ক্ষীণ গ্রন্থে ছন্দবদ্ধ নাতিদীর্ঘ

কয়েকটি কবিতাই তাঁর উজ্জ্বল হৃদয়ের স্বাক্ষর বহন করে। আমরা শুনতে পাই এযুগেরই কান্না—চির যুগের মানস থেকে 'নষ্ট হয়ে যায় প্রভু, নষ্ট হয়ে যায়! / ছিল, নেই—মাত্র এই ; ইঁটের পাঁজায় / আগুন জ্বালায় রাত্রে দারুণ জ্বালায়। আর সব ধ্যান ধান নষ্ট হয়ে যায়।' আর সিদ্ধেশ্বর সেন জীবন সমাজ আর আপন হৃদয়ের ভাঙনের দিকটাকেই বুঝি তাঁর কবিতার অবয়ব নির্মিতির মধ্যে থেকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। বেদনাঘন যন্ত্রণার অভিব্যক্তি নিয়ে আসে তাঁর কবিতা—'স্বস্তি / ফিরুক তাঁর নিঃশ্বাস / ফিরুক, যা, মাতরিশ্বা / হাওয়া / স্বস্তি / নমো মধু / আব্রহ্মস্তম্ভ পর্যন্ত—মধু, মধু / ফিরুক, অন্নময় তাঁরই / প্রাণ—'। একটা বক্তব্যই সিদ্ধেশ্বর সেনের কবিতার প্রধান বস্তু। কমিউনিষ্ট ধারণা অনুযায়ী কবিতার প্রসঙ্গ-প্রকরণের সারল্যকে অস্বীকার করে আপন অস্তিত্বের দ্বান্দ্বিক যন্ত্রণাকে কবিতায় রূপান্তরিত করেছেন সিদ্ধেশ্বর সেন। সমষ্টি ভাবনায় ভাবিত হয়েও কালের প্রভাবে এবং রাজনৈতিক বিশ্বাসের আপাত অনিশ্চয়তার জন্যে তিনিও খানিকটা অন্তর্মুখী হয়ে পড়েছেন। বাইরে নিষ্ঠুর নগ্ন পরিবেশ, তবু ক্লান্তিকে প্রশ্রয় দেন নি তিনি। একটা সুস্থতা তাঁর কবি-বিশ্বাস থেকেই জন্ম নিয়েছে। ছন্দ তাঁর সেতারের টুংটাং। প্রতীক ঐতিহ্যাশ্রয়ী। একটা স্থির প্রত্যয়ে অবশ্যম্ভাবী অন্বিষ্টে এগিয়ে চলেছে তাঁর কবিতা। কিন্তু প্রকাশ কালে ভদ্রে অলক্ষ্যে অগোচরে দু'একটা। এবং খুবই জটিল আঙ্গিকে শব্দ ভেঙেচুরে তার উপস্থাপন। শব্দের অন্তর্নিহিত শক্তিকে তিনি তাঁর বোধের প্রতিমায় যুক্ত করে সুনির্দিষ্ট রসলোক উদঘাটন করেন। পত্রপত্রিকায় শঙ্খ ঘোষ সিদ্ধেশ্বর সেনের কিছু ভালো লেখা আজও চোখে পড়ে কচিৎ কখনো।

আলোক সরকারের কবিতাই একটা প্রতীক—প্রতীক কবিতার বিষয়বস্তু, প্রতীক কবিতার কাঠামো। অর্থাৎ তিনি যা কিছু কবিতা করার তা প্রতীকেই করে থাকেন। অমিয় চক্রবর্তী ধ্যানময়তার দিক থেকে তাঁকে প্রভাবিত করেছেন। কবিতার অন্তর্মুখীনতা, স্বগত নিপুণ উচ্চারণ, কবিতাকে বিশুদ্ধ করে তোলার প্রচেষ্টা এবং বিষয় ভাবনা সব দিক থেকেই তিনি একটা অকাল বার্ধক্যের পরিচয় তুলে ধরেছেন কবিতায়। আস্তিক্যবোধের কবি হলেও যন্ত্রণার নিঃসঙ্গতার বেদনাও তাঁর কবিতায় ধরা পড়েছে। নিসর্গের প্রতি সুগভীর আস্থা, ফুল-গাছ-পাখীদের বিচিত্র নাম ও ছবির মিছিল, ঘর-নদী-আকাশ ঘুরে ঘুরে এসেছে তাঁর কবিতা অত্যধিক প্রতীকাশ্রিত হবার জন্যে—সহজের আরাধনা করলেও, তাঁর কবিতা অযথা দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছে। এবং এটা তাঁর কবিতাতেই

উল্লেখিত হয়েছে, 'আমার দৃষ্টি অন্ধ পরিশ্রমে / বারেবারেই ফিরে আসে নিজের অন্তঃপুরে'—পাঠকের হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছোতে পারে না। তাঁর কোনো কবিতাই স্বতঃস্ফূর্ত নয় বলেই মনে হয়। কতকগুলো ভঙ্গীর মুদ্রাদোষ, বিদঘুটে শাব্দিক দ্বন্দ্বসৃষ্টি অনেক ক্ষেত্রে তাঁর কবিতাকে পঙ্গু করেছে। বিশেষ রঙ চিত্র পাখী গাছ ঘর নদী আকাশ শব্দ দিয়ে তৈরী একটা পরিমণ্ডলের বাইরে তিনি আসেন না —দেখেন না। বিশেষ বিশেষ মুহূর্তকেই তাঁর মধ্যে থেকে ফুটিয়ে তুলেছেন 'ঘোষিত দুপুরে স্মৃতিময়, পীত অনুষঙ্গের / প্রতিবিম্বিত অমা। / পোড়ো বাড়িটার অমল অন্ধকারের / ভিতরে প্রথম অনন্য আলো, অকলুষ কল্পনা / ক্রমবিকশিত গোলাপ— / অপেক্ষমান আয়োজন, সাদা বিশুদ্ধ বিবেচনা।'— বিশুদ্ধ বিবেচনা এই, এ ধরনের অযথা কসরৎ পাঠককে ক্লান্ত করে।

এই নতুন সাহিত্য আন্দোলনের শুরুতে বাংলা কবিতায় রাজার মেজাজে প্রবেশ করেছিলেন যুগান্তর চক্রবর্তী। শব্দ চয়নে, ভাবের গভীরতায়, ছন্দ নির্মিতিতে তিনি প্রথমেই বয়স্কর মনন নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিছু অসামান্য কবিতা লিখে জানিনা কোন অনিবার্য কারণে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তিনি একজন যোগ্য কবি বলেই তাঁর প্রস্থানে পাঠকের ক্লান্তি অফুরন্ত। এখনো পুরোনো আতরের গন্ধের মতো মনে পড়ে যায় 'দর্পণ বয়স বাড়ছে প্রতিবিম্ব কিছুই ধরছে না। / না প্রেম, না পরিণতি, আত্মা কিম্বা আত্মমগ্ন পাপ, / স্মৃতি শুধু ঝুলি ভরছে পোকাকাটা গ্রুপ ফটোগ্রাফ, / প্রাচীন তোরঙ্গে কিছু ছিন্নপত্র, ঊর্ণাজাল বোনা / কিছু আত্মপ্রতিকৃতি।' কিম্বা, 'বৃষ্টিপাত হয়ে গেলে রাত্রি এক মাঠের কাহিনী। / শিকড়ে আসক্ত জ্যোৎস্না সিক্ত চাঁদ নক্ষত্র নিকড়ে। / আচম্বিতে দুঃখ জাগে, দুঃখ ঘোর পায়ে পায়ে ঘোরে / জলের শিয়রে মৌন বৃক্ষ, তুমি কার কাছে ঋণী।'

বিনয় মজুমদারের কবিতা শক্তিমান কবিত্বের স্বাক্ষরবহ। জীবনানন্দকে আত্মস্থ করলেও বিনয় মজুমদার হেমন্ত নির্জীব কুয়াশায় লীন হন নি, তীব্র বেদনা এবং আঙ্গিক যন্ত্রণাকে মধুর আবেগে উপস্থিত করেছেন। প্রেমকে কেন্দ্রীয় সত্য করে একটা গাণিতিক দার্শনিকতায়, অলঙ্কার প্রয়োগের মুন্সীয়ানায় বজ্রকঠিন বাক্যবিন্যাসের মধ্য থেকে একটা মানবিক সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাকুলতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর কবিতায়। 'ফিরে এসো চাকা', 'ঈশ্বরীর' কিম্বা 'ঈশ্বরীর কবিতাবলী'র বহু কবিতা বিনয় মজুমদারের প্রজ্ঞাবোধের ফলন। রক্তমাংসের সাংঘাতিক আলোড়নের মধ্যে থেকেই প্রেমের অনুভব চেয়েছেন কবি। কেননা

'সকল ফুলের কাছে এত মোহময় মনে যাবার পরেও মানুষেরা মাংসরন্ধনকালীন ঘ্রাণ সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে।' একটা সুস্থ জীবনবোধ তাঁর কবিতাকে বিশিষ্ট চরিত্র দিয়েছে। সোচ্চারে যৌন ক্রিয়াকাণ্ডের বর্ণনা সৃষ্টি-উৎসের সেই দ্বান্দ্বিক সংঘর্ষের প্রতীক হয়েই তাঁর কবিতায় উপস্থিত হয়েছে। 'অতএব দেখা যায়, নিখিলের ধারাবাহিকতা রমনশিল্পেও বলে স্বতঃঘটনের রূপকথা।' বিনয় মজুমদার জীবনানন্দের শব্দ-ঐশ্বর্য্য ও সুধীন দত্তর ধ্রুপদী কাঠামো মিলিয়ে অর্জিত অভিজ্ঞতার প্রকাশকে প্রতিমা করে তুলেছেন। একটা বাক্যের ব্যবহারে তিনি বহুদূর পর্যন্ত পাঠকের চিন্তার ব্যাপ্তি আনতে পারেন অবলীলাক্রমে। 'হেঁটেছি সুদীর্ঘ পথ, শুধু কাঁটা, রক্তাক্ত দু-পায়ে, তোমার দুয়ারে এসে অনিশ্চিত, নির্বাক, চিন্তিত। তুমি কি আমাকে বক্ষে স্থান দিতে সক্ষম, মুকুর?' সমাজ রাষ্ট্র ইত্যাদি নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনো চেষ্টা না থাকলেও যুগের সার্বিক সংকটের ছোঁয়া তাঁর কবিতায় আছে। তবে যৌনক্রিয়াকাণ্ডের বর্ণনা নিয়ে একটা কেলেঙ্কারী রকম বাড়াবাড়ি সুরু করে দিয়েছেন বিনয় মজুমদার। একজন সত্যিকারের বলিষ্ঠ কবির এ ধরনের যৌন নিমজ্জন পাঠককে তিক্ত করে তোলে। তাঁর 'অধিকন্তু' এদিক থেকে কিছুটা ব্যতিক্রম। তা ছাড়াও বিনয় মজুমদারের ক্রমাগত প্রবাহের 'অঘ্রাণের অনুভূতিমালা' পাঠে বোঝা যায় বিনয় মজুমদার এসময়ের কত বড় কবি। চরণ থেকে চরণে উত্তরণ না এক জগত থেকে অন্য জগতে হারিয়ে যাওয়া মনে মনে! এবং, কবির নিজের সূত্র ধরে 'আকাশে চলতে হলে মানুষের মতো নয় কবিতার মতো হতে হয়।'

শক্তি চট্টোপাধ্যায় এ সময়ের এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত বহুজনপঠিত কবি। সাম্প্রতিক কবিতা আন্দোলনের সর্বপ্রাথমিক ঝুঁকি তিনিই বেপরোয়াভাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং পাঠকদের তিক্ত তীক্ষ্ণ তীর তাঁর ওপরেই বর্ষিত হয়েছে বেশী। বস্তুত কবিতার জগতে তাঁর ব্যক্তিগত চলাফেরা, কবিতা নিয়ে তুলকালাম ইত্যাদি প্রায় কিংবদন্তী হয়ে তাঁকেই একটা 'ইমেজ'এ পরিণত করেছে। বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথের পর এতখানি আর কেউ-ই হয়ে ওঠেন নি। 'শক্তির মাস্তুল' 'শক্তির চশমা' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারের মধ্যে থেকেই আমার এ উক্তি সমর্থিত হতে পারে। 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য' 'ধর্মে আছো জিরাফেও আছো' 'অনন্ত নক্ষত্র বীথি তুমি, অন্ধকারে' 'উড়ন্ত সিংহাসন' 'সোনার মাছি খুন করেছি' ও 'হেমন্তের অরণ্যে আমি পোষ্টম্যান' এই ছয় গ্রন্থ ছাড়াও অতিসংখ্যক কবিতা তাঁর ছড়ানো রয়েছে নানা মৌসুমী পত্রপত্রিকার পাতায়। এই ডামাডোলের বাজারে

সুখপাঠ্যতা ও সুখশ্রাব্যতার গুণে, নিপুণ ছন্দ ব্যবহারে এবং অব্যর্থ বক্তব্যের স্বরক্ষেপে, প্রবল আবেগে তিনি একটা মিষ্টি কবিমানসের পরিচয় দিচ্ছেন। কিন্তু সত্যিকারের শক্তি চট্টোপাধ্যায় সেখানেই যেখানে তিনি 'ভালোবাসা পেলে' সব 'লণ্ডভণ্ড' করে দিয়ে, 'পায়সান্ন' পায়ে ঠেলে 'যা খায় গরিবে তাই' ভাগ করে খেতে চেয়েছেন। 'প্রসন্নতা পিয়াসী ভিখারী' হয়তো তিনি নন, কিন্তু 'পপুলারিটি' বজায় রাখতে গিয়ে এবং এষ্টাব্লিশমেন্টের চৌহদ্দির মধ্যে পা দিয়ে খানিকটা কমার্শিয়াল হয়ে পড়েছেন। তবে যুগবিশৃঙ্খলায়—কবিতার ছন্দহীন স্বেচ্ছাচারী বাক্‌ব্যবহারের ভেতরে কবিমানসকে অস্থিমজ্জায় মিশিয়ে দিয়ে শক্তি চট্টোপাধ্যায় অভ্যন্তর থেকে যেমন বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন, তেমনি দু'ধাপ পেছনে সরে এক ধাপকে পুরোপুরি জিতে নিয়েছেন। সাধুছন্দ সাধুশব্দ প্রয়োগ করে, অসাধু বক্তব্যকে উপস্থিত করে তাকেই আবার ধ্বংস করে একটা সার্বজনীন আবেদন উপস্থিত করেছেন। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-'গীতবিতান'এ কান এবং প্রাণ তৈরী করা পাঠক শক্তিকে অভ্যস্ত জগতে পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে, যেন বাইবের তুলকালাম থেকে ফিরে এসে নিজের আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দেওয়া। 'লিঙ্গ প্রহার করে হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছোনো' যায় কিনা পরখ করার কথা বলে শক্তি চট্টোপাধ্যায় দেহকে নির্যাস করেই 'সুখ' আত্মস্থ করেছেন। চতুর্দিকে 'ধিঙ্গি শিবের লিঙ্গ খাখা করে' দেখেও তিনি দূর ভুবনের ছায়া পেয়েছেন নিজের চেতনায়। ঘাসে তাঁর লণ্ঠন ভেঙে গেলে দেখেছেন 'চিনা বাঁশ ভরে যায় ভল্লুকের চুলে।' এমনি সব চকিত উদ্ভট ছবিতে একটা রহস্যময়তা ফুটিয়ে তুলেছেন বহু কবিতায়।

শক্তির সর্ব অস্তিত্বেই হাহাকার। কিন্তু একটা আকাঙ্খা দুর্নিবার হয়েই দেখা দিয়েছিলো তাঁর মধ্যে। 'আশা ছিলো সন্তানের উৎপন্ন চুলের 'পরে হাত রাখা যাবে'—যায় নি, কেননা 'দেবতার নীরব সীমা-লঙ্ঘনের পাপ ছিল তোর!' তিনি প্রথম থেকেই জানেন যে, রমণী-সমস্যা নয়, 'অর্থকষ্ট অবন্ধুত্ব তোমাদের হোক। অনর্থসম্বন্ধে আজ সর্বনাশকে মাথায় জ্বালো?' আর দেহ সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট অভিমত 'আমরা দেহমাত্র নই, কিন্তু দেহ তো আমাদেরই'—আর এই দেহগত মানুষের সমগ্র অভিজ্ঞতাই তাঁর কবিতায় উজ্জ্বলভাবে উপস্থিত। 'ঘর' 'বাড়ি'র আগ্রহ আনন্দ পর্যটক শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জীবন কাব্য সাধনায় আছে। প্রকৃতির প্রগাঢ় স্নেহকে তিনি মাতৃত্ব উপভোগের তৃপ্তিতে আস্বাদন করেছেন। তার কাছ থেকে পেয়েছেন সেই চিরন্তনী আবেদন 'কিছুদিন

থাকো—আমার বারান্দা আছে বিষপিঁপড়ে নেই'। কিন্তু কবির ডাকপিওনের মতো প্রত্যেকের বুকের কাছে যেতেই আনন্দ—যান 'স্বর্গও বিস্তৃত ভাবে আছে যাতে' তাও দিতে পারেন এমন সন্ন্যাসীর কাছে। ইষ্টিশান, ব্রিজ, প্ল্যাটফর্ম সবই সংযুক্তির প্রতীক। আর এগুলো তাঁর কবিতায় দেখে মনে হয় যে, সমস্ত কিছুর হয়ে সব কিছুর সঙ্গে নিজেকে মেলাতে চেয়েছেন শক্তি। তাঁর মধ্যে একটা বাউল বোধ কাজ করেছে 'বৃষ্টি পড়লো ঘাসে / ও মন তোর সুদিন আসে' বলে চলতে চলতে বলেছেন 'জুতো হাঁটছে পা রয়েছে স্থির—আকাশ পাতাল এতোল বেতোল / মনে কর, শিশুর কাঁধে মড়ার পাল্কি ছুটছে নিমতলা—পরপারে / বুড়োদের লম্বালম্বি বাসবঘরী নাচ— / সে বড়ো সুখের সময় নয়, সে বড়ো আনন্দের সময় নয়।' তবু শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের যেতে যেতে পিছন ফিরে তাকাতে হয় নি—'ভয় কি ? / মুঠো ভরা রঙবেরঙ টিকিট—ঘাঁটলে কি একটাও সাচ্চা বেরুবে না ?' জীবনের জীবন্ত ও রক্তাক্ত অনেক অভিজ্ঞতাই তাঁর আছে। তার মধ্যে সাচ্চা জিনিসও বড় কমতি নেই। কিন্তু বর্তমানের লেখাগুলো তিনি কাদের মুখ চেয়ে লিখছেন বোঝা যাচ্ছে না। লিরিক তিনি ভালোই রচনা করেন—চকিত ভাবে সাম্প্রতিক মেজাজের শব্দ সেঁধিয়ে দিয়ে চমকও সৃষ্টি করেন ঠিকই কিন্তু তাঁর সে কবিতার চেয়ে রবীন্দ্রনাথের গীতবিতানের গানগুলো কি যথেষ্ট সাম্প্রতিক নয় ? এই শব্দ ট্যুইষ্ট করার ব্যাপারটা যার কাছে ধরা পড়ে, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের গীতি কবিতাগুলো তার কাছে ফাঁকি বলে মনে হয়। কিন্তু শক্তি চট্টোপাধ্যায় সামর্থ্যে অতুলনীয়—অভ্যন্তর জগতে একটা নির্দিষ্ট কিছুর প্রেরণা তাঁকে তোলপাড় করে। 'তুমি আছো—ভিতের ওপরে আছে দেয়াল' এ বিশ্বাস নিয়েই তিনি বলেছেন, 'পরিত্রাণহীন খাটা পায়খানা ভালোলাগে আমাদেরও— /আমাদের দেশের যা কিছু আছে--পেঁপে গাছ / আমাদের ভালো লাগে—আমরা সুখী।' কিন্তু এ কথা বলতেই হবে যে শক্তি 'হৃদয় মরে হৃদয়পুরে দেহের ঠাঁই' বললেও তাঁর মৌলিক কবিতাগুলোতে প্রায় কোথাও তিনি হৃদয়ের কাছে আশ্রয়প্রার্থী হন নি। তবে শক্তি চট্টোপাধ্যায় যে বিপুল উত্থান, চাঞ্চল্য, শৈল্পিক চেতনা আর উদ্দামতা নিয়ে এসেছিলেন, তা এখন স্তিমিত। যে যশ তিনি পেয়েছেন তাই-ই বজায় রাখতে চেষ্টা করছেন মাত্র। শক্তির বহুল রচনার দিকে তাকিয়ে তাঁকে স্বভাবকবিত্বের ক্রীতদাস বলা হবে কিনা, এ নিয়ে তর্ক উঠতে পারে। স্পর্শকাতর ও অভিমানী শক্তি চট্টোপাধ্যায় এ সব ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও আশ্চর্য শক্তিমান।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এ সময়কার শক্তি-সমান্তরাল কণ্ঠস্বর। শহর জীবনের সার্বিক অস্থিরতা এবং অটোমেটিকত্ব সুস্পষ্ট বুঝে ফেলে যুগ ও তার জীবনের মর্মান্তিক ট্র্যাজেডিটি নিখুঁত ভাবে তিনি নিয়ে এসেছেন কবিতার মধ্যে। বক্তব্যের ঋজুতা, ব্যক্তিত্বের কাঠিন্য, প্রকাশের তীক্ষ্ণতা, আঙ্গিকের জটিলতা, দুর্বার আবেগ, আচ্ছন্নতা এবং অন্তর্লীন বিশ্বাসের সমগ্র দিয়ে তৈরী হয়েছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা। ব্যষ্টি মানস এবং সামাজিক ব্যক্তির এমন উজ্জ্বল প্রতিকৃতি এমন শিল্পগুণান্বিত হয়ে তাঁর কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে যা এক কথায় অসাধারণ। আর্তনাদ ও রিরংসার জগতে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার যে প্রাণান্ত যান্ত্রিক অভ্যাসের সত্য-পরিচয় উদ্‌ঘাটন করেছেন তা তাঁর কবিতা পাঠককে অভিভূত করে। কালের পাঠক তাঁর কবিতায় দেখতে পায় 'আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি'। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মতো তিনি বহুজন গ্রাহ্য নন হয়তো –কেননা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতার আবেদন হৃদয়ে নয় মেধায়, কিন্তু মনে হয় তিনিই এ যুগের রাজসাক্ষী এবং সময়ের হাতে নিহত পেলব অনুভূতির শবসাধক। গতানুগতিকতা ভেঙে, নীতিবাগীশ দৃষ্টিভঙ্গীকে পদদলিত করে, প্রতারণা আর ভণ্ডামির মুখোশ ছিঁড়ে সমাজ জীবনের নগ্ন দিকটিকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর কবিতায় একটা সত্য ভাষণে উপস্থিত করেছেন! প্রতিদিনের চলাফেরাকে, পারিপার্শ্বিকের প্রখর ও পঙ্কিল বাস্তবকে চিত্রিত করে তিনি যুগের মর্ম সত্যটি উদ্ধার করেছেন কবিতার মধ্যে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও 'সূর্যের দোসর' হয়ে 'তিমির শিকারে / সপ্তাশ্বরথের রশি টেনে নিয়ে দীপ্ত অঙ্গীকারে' যুগের প্রাথমিক ইচ্ছাকেই ব্যক্ত করেছিলেন। ছিলো আশা, কিন্তু কাল তা পূর্ণ হতে দেয় নি—চুরমার করে দিয়েছে। কোনো মানুষিক দাবীকেই কাল কোনো মূল্য দেয় না, সেখানে এক ধরণের যান্ত্রিক জীবন স্বীকার করে নিতে হয়েছে মানুষকে। ধর্ষণ-করা আর সংবাদপত্র-পড়া ব্যক্তি মানুষের স্বীকারোক্তি হিসেবেই গ্রহণ করতে হবে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা। 'আমার না বেঁচে থাকা হৈ হৈ জগতে / দুরকম স্মৃতি ও বিস্মরণ, যেন স্বপ্ন কিম্বা স্বপ্ন বদলের / বীয়ার ও রামের নেশা, বন্ধুহীন, বন্ধু ও দলের / আড়ালে প্রেম ও প্রেমহীনতা, দুঃখ ও দুঃখের মতো অবিশ্বাস / জীবনের তীব্র চুপ, যেরকম মৃতের নিঃশ্বাস,— / লোভ ও শান্তির মুখোমুখি এসে আমার পূজা ও নারী হত্যা / তোর দিকে, রক্ত ও সৃষ্টির মধ্যে আমিও অগত্যা / প্রেমিকের দিকে যাবো, স্তনের ওপরে মুখ, মুখ নয়, ধ্যান ও অস্থিরতা / এক জীবনে, উরুর

সামনে উরু, উরু নয়, যোনির সামনে লিঙ্গ, অশরীরী, ঘৃণা ও মমতা... / শোকে পরাজয়ে, / সুখ, সুখ নয়, পাপ, পাপ নয়, দোলে, দোলে না, ভাঙে, ভাঙে না, মৃত্যু, স্রোতে / আমি, ও আমার মতো, আমার মতো, ও আমি, আমি নয়, এক জীবন দৌড়োতে দৌড়োতে।' সুনীল নিজেই 'জীবন আর জীবনী লেখক।' নিঃস্ব মনুষ্যত্বের হাহাকারকে আশ্চর্য রুক্ষ করেই উপস্থিত করেছেন তিনি। পৃথিবী সম্পর্কে ব্যক্তির মানসিকতাকে স্পষ্ট করেই তুলে ধরেছেন 'এ বাড়ি নিলাম হবে কাল / এই খাট আলনা, ঠোঁট, বুক, আলমারী যেন কাল থাকবে না-- এই ভেবে একি মারাত্মক ভাবে আঁকড়ে থাকা! / শরীরের নোনতা ঘাম এঁটো থুথু সারাক্ষণ স্বাস্থ্যকর নয়।' শহর মানুষের সমস্ত কিছুর সঙ্গে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মিশে জড়িয়ে থেকে অনুভব করেছেন শানশহর যন্ত্রজীবনমন। প্রেম সম্পর্কের মধ্যে তিনি যৌন জীবনকেই বাস্তব বলে গ্রহণ করেছেন। নারীর শরীরটাকেও মনে করেছেন মেট্রোপলিটন শহর। মন বস্তুটা বানানো উপহাসের কাহিনী বলেই মনে করেছেন। 'নীরা'কে তিনি প্রেম নিবেদন করেছেন শরীরের কাছে শরীর উপহারই এ যুগের শ্রেষ্ঠ উপহার জেনে। 'মানুষ গিয়েছে মরে, মানুষ রয়েছে আজো বেঁচে / ভুল স্বপ্নে; শিশিরে ধুয়েছো বুক, কোমল জ্যোৎস্নার মতো যোনি / তুমি কথা দিয়েছিলে উদাসীন সঙ্গম শেখাবে / এবার তোমার কাছে নিঃশেষে হয়েছি নতজানু। কথা রাখো! নয় রক্তে অশ্বখুর, স্তনে দাঁত, বাঘের আঁচড় কিম্বা উরুর শীৎকার / মোহমুদ্গারের মতো পাছা আর দুলিয়ো না, তুমি হৃদয় ও শরীরের ভাষ্য নও / বেশ্যা নও ..'। 'সুনী॰ঃ, কবিতায় ভুরি ভুরি যৌন প্রসঙ্গ থাকলেও তা বিপদসীমা অতিক্রম করে নি। যৌন অনুষঙ্গ তাঁর প্রকাশের প্রধান সহায়ক। নারীকে প্রতীক করেই তিনি সাম্প্রতিক যান্ত্রিক সৌন্দর্যের শহর সভ্যতাকে পরিস্ফুট করেছেন---দেখিয়েছেন প্রতিহিংসা পরায়ণতার দিকটি, মিলনে বাধ্য করার শ্রমিক মালিক সম্পর্কের দিকটিও। রাজনৈতিক কোনো পথকেই তিনি স্বীকৃতি দিতে পারেন নি। 'কোনদিকে কোনদিকে' বলে চিৎকার করে নিজের 'ব্যক্তিগত পথে পথে' ছুটে ফিরেছেন, 'ভয়ঙ্কর নেকড়েগুলো ছিঁড়েছুঁড়ে খেয়ে' ফেলেছে তাঁর 'শরীর, রক্ত দুচোখের মণি' এবং শেষ পর্যন্ত হাহাকার করলেন 'এ কি মানুষ জন্ম?০ আমি শোবার ঘরে নিজের দুই হাত পেরেকে / বিঁধে দেখতে চেয়েছিলাম যীশুর কষ্ট খুব বেশী ছিল কি না; / আমি ফুলের পাশে ফুল হয়ে ফুটে দেখেছি তাকে ভালোবাসতে পারি না / আমি কপাল থেকে ঘামের মত মুছে নিয়েছি পিতা-

মহের নাম, / আমি শ্মশানে গিয়ে মরে যাবার বদলে, মাইরি, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'—এ যুগের নায়ক আবার পরের দিন একই অবস্থায় জেগে উঠে 'এক পলক সত্যি চোখে' দেখে কোলকাতা—অথবা শহর। অনর্গল কনভয় অভ্যাসের ক্রীতদাসদের লেখুর। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতায় তারই বলিষ্ঠ প্রকাশ। কিন্তু কোনো বিশ্বাসকে আঁকড়ে না ধরতে পারায় ইদানিং তাঁর কবিতায় বিষয়ের অভাব দেখা দিয়েছে। এখনও ম্যামথ মানুষের জীবন সংগ্রামের দিকটি—যন্ত্র যুগের আস্থাশীল প্রত্যয়ের দিকটি সবিশেষ ধরতে না পারলে তাঁর কবিতা থেমে যেতে বাধ্য এবং পরবর্তী গ্রন্থ প্রকাশের সময় অবধারিত ভাবেই পরিপূর্ণ 'ব্যর্থতায় নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কেও সন্দেহ' জাগবে।

তরুণ সান্যাল কেন্দ্রীয় বিশ্বাসের দিক থেকেই সম্পূর্ণ আলাদা কণ্ঠস্বরের কবি। এঁর কবিতায় জনতার সংগ্রামের দিকটা, সমাজ কাঠামো পালটানোর কথাটাই মুখ্য। স্বদেশ সমাজ এবং আন্তর্জাতিক মানুষের সংগ্রামী ঐতিহ্যের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করে বৈজ্ঞানিক বিকাশ এবং জীবন যাপনের পাল্লার দিকটা লক্ষ্য করে জীবন বিকাশের প্রতিবন্ধকতাগুলো উত্তরণের জন্যে যে সংগ্রাম তার প্রতি পূর্ণ আস্থা স্থাপন করেই তাঁর কবিতা। বেদনা, দুঃখ হতাশা,—যুগের যা রোগ তাতে আক্রান্ত হয়েও তরুণ সান্যাল তাঁর লক্ষ্যে স্থির দৃষ্টি রেখে এগিয়ে চলেছেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের পর, তরুণ সান্যালই সম্ভবত কবিদের মধ্যে একা, যিনি এ সময়ের বলয়গ্রাসী ফ্রাস্ট্রেশনের মধ্যে আশার কথাটাও বলতে পেরেছেন এবং সংগ্রামী কবিতার ঐতিহ্যের মজা স্রোতে জীবনের আস্থার রেশ বজায় রেখেছেন। তরুণ সান্যালের চেতনালোক খুবই স্পষ্ট স্বচ্ছ। তাই তাঁর প্রার্থনা 'এক একটি দাস প্রীত হয় প্রপিতামহের স্মৃতি / হে অন্ন তুমি স্মৃতি করোটির ও ঘুম / এক একটি মুখ নারীর জানুতে উল্কী হবার স্বাদ / হে অন্ন ঘন শোণিত নীলাভ ধুম / দেখ এই মুখ কেমন গ্রানিট, বাকিটুকু কর্দ্দমে / অন্ন হে তুমি মুখে মৃত্তিকা রাখো / দেখি দিগন্তে অরণ্য পুড়ে হয় ছায়া পথ / তারা বাছাদের অন্ন হে যেতে দিয়ো।'

'মাটির বেহালা'তেই কবির বুকের নীল যন্ত্রণা করুণ হয়ে বেজেছিলো, 'এ জীবন কী যে যন্ত্রণা তারি প্রকাশে / কথায় কথায় কত এলোমেলো মাল্যে / ধুলোয় বকুলে অশ্রু শিশিরে আকাশে / ছুঁয়েছি মাধুরী স্বপ্ন মায়াবী বাল্যে।' তাঁর এ যন্ত্রণা রিন রিন করে বেজে বেজে 'রণক্ষেত্রে দীর্ঘ বেলা একা'র সময়ে

এসে রুদ্র সুর তুলছে। সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক জগতের সর্বত্রই তিনি দেখেন অস্থিরতা। প্রতিটি শব্দকে ওজন করে সাজিয়ে শিল্প ও যন্ত্রের পারিভাষিক শব্দ এবং মাটিমানুষের কাছাকাছি শব্দ ও অলঙ্কার একত্র করে কবিতাকে করেছেন বিপন্ন মানুষের সংগ্রামী সত্তার শরীক। তবে যা তাঁর স্বভাবে নেই সেই সব বিষয় ভাবনা বোধ নিছক নতুনত্ব সৃষ্টির জন্যে ব্যবহার করে রচনার মধ্যে একটা জট পাকিয়ে তুলে বহু কবিতাকে তিনি খর্ব করে ফেলেন। কিন্তু যেখানে কবিতা তাঁর আত্মচেতনার বিস্ফোরণ, সেখানে তা অনবদ্য : 'চৌমাথায় ঘোর সন্ধ্যা হেঁকে ওঠে পাঁচটার ট্রাফিকে অবেলায় / কোথা হাত, কোথায় তর্জনী নখ, হাতের কঙ্কাল এযে : নিহত বকুল / বিশাল কালান্তর হাত বিপুল—/ সমস্ত আকাশ মাটি মানুষের কাছে ঢের মানবতা প্রশ্ন করে / কলকাতা বোম্বাই দিল্লী পাটনায় কটকে পড়ে আছে / লক্ষ হাতে লক্ষ হাতে হা অন্ন হা অন্ন সর্বনাশ / ...... হায়রে সে কোন দেশ, কোন কেশবতী নগরের এ বকুল হতে পারে কেশগুচ্ছে অশেষ বিদ্যুৎ জ্বালা—নগরী আমার।'

উৎপলকুমার বসু এক নিজস্ব আঙ্গিকে কবিতা রচনা করেছেন। নতুন ধারা সৃষ্টি করতে গিয়ে তাঁকে খুবই ঝক্কি পোহাতে হয়েছে। 'চৈত্রে রচিত কবিতা' ও 'পুরীসিরীজ' বইয়ের লেখাগুলোয় দ্যোতনা আনতে পেরেছেন অনায়াসে। জীবনানন্দের চিত্রকল্প ও শব্দ তাঁর কবিতাকে গ্রাস করলেও তিনি তা থেকে নিজেকে মুক্তও করতে পেরেছেন। প্রেম-নিসর্গ উৎপলকুমার বসুর প্রিয় বিষয়। কিন্তু তিনি কখনোই ব্যক্তির নৈর্ব্যক্তিক চিন্তায় আস্থা[illegible]ল হন নি। ব্যক্তি-মানসের অসংলগ্ন চিন্তা ভাবনাকে জড়িয়ে মিশিয়ে শব্দের অন্বয় ভেঙে ওলট-পালট শব্দ ব্যবহার করে একটা বিশিষ্ট আঙ্গিকে তিনি তাঁর কবিতার অবয়ব তৈরী করেছেন এবং বক্তব্য উপস্থিত করেছেন। কবিত্ব ব্যাপারটিকে তিনি নির্মাণের মতো দেখেন বলেই ঝোড়ো বাক্যবিন্যাসের মধ্যেও কবিতার শিল্পত্ব নষ্ট হতে দেন নি। এ ব্যাপারে একটা সচেতন প্রয়াসের যা সুফল এবং কুফল দুই-ই সমানভাবে বর্তেছে তাঁর কবিতায়। 'হস্তচালিত প্রাণ তাঁত সেই আধো জাগ্রত মেশিনলুম আমাদের হৃদয়ে / বসন্তে এনেছি আমি হাবা যুবকের হাসি / ছিলো ভালোবাসা / ছিলো অনিশ্চিত রেল ডাক ছিল মেঘের তর্জন / ছিল আঠার-ঊনিশ মাইল টিকিট অথচ বেড়ালাম অনেক অনেক অভিজ্ঞতা হল।' এ অভিজ্ঞতাই তাঁকে জানিয়েছে কোলকাতা অর্থাৎ সভ্যতা 'মেশিনলুম'ই চায়—কবিতার অঙ্গীকার এখানে মর্মান্তিক প্রহসনেরই ব্যাপার। সমস্ত ব্যাপারটাই

হাস্যকর বলে মনে হয়েছে কবির —'সামুদ্রিক মফস্বলে ফিরে চলো। সস্তা ও কোমল / তরিতরকারিময় ঐ দেশে। গাছের ছায়ায় বসে ভাবো এই। / তোমার তর্জনি ধরে এরও বেশি যাওয়া যাবে, শিশুর তর্জনি / আরো দূরে টেনে নাও, এমন কি যে দেশে এবার / অনাবৃষ্টি, অসম্ভব মহামারি, বেকার বিপ্লব, / চাষীদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাদ্যরত রাজনীতিজ্ঞের দলে ভীড়ে যাই, .../ না হয় মফস্বলে সামুদ্রিক / মাছের সম্পাদনা তুমি করো।' প্রচলিত ছন্দরীতিকে অস্বীকার করে—লিরিকের অনুরণনকে উড়িয়ে দিয়েও তিনি সঙ্গীতের মেজাজটিকে স্পষ্টই বজায় রেখেছেন কবিতার মধ্যে। 'ঐ নভোরশ্মির শাদা জরিপোষাকের দিকে তাকিয়ে বুঝেছি আমি / দিন যায়, গ্রীষ্মের দিন যায়, স্যর্, যায় দুর্ঘটনা।' উৎপলকুমার বসুর অন্তর্জগতে একটা আধ্যাত্মিক প্রেরণা কাজ করে তাঁর কবিতাকে দূর প্রসারী করেছে। 'মানুষ হিসেবে কিছু স্বপ্ন থেকে গেল। যাবে কোন দেশে ? কোন দেশে ? নীলিমা বুঝিবা।' নানা দিক থেকেই তাঁর কবিতা সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার জগতে একটা নতুন সংযোজন। তবে সচেতন চমক সৃষ্টির প্রয়াস এবং অনর্থক কুয়াশা ও রহস্যের ধোঁয়া সৃষ্টির চেষ্টা ও শব্দের প্রতি মোহ অনেক সময় তাঁর কবিতাকে ক্ষুণ্ণ করেছে।

সাম্প্রতিক কবিতা গোষ্ঠিবদ্ধ কবিদের আন্দোলনের সৃষ্টি। এটাকে চর্যাপদের কালের গোষ্ঠিবদ্ধ তন্ত্র সাধনা বা বৈষ্ণব যুগের সমধর্ম চেতনার সঙ্গে তুলনা করা যায়। একই ভাব, একই চিত্রকল্প, একই আলম্বন বিভাব, একই ধরণের শব্দ-অলংকরণ—একই সময়ের আনন্দ দুঃখ সুখ বেদনা হতাশা যন্ত্রণা ক্লান্তি ও অসহায়তাকে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে একে অন্যের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। ফলে আন্তরিক কবিতা রচনা করতে চেষ্টা করলেও অনেকেরই কোনো স্বতন্ত্র স্বর নেই। আর একটা কথা এই প্রসঙ্গেই বলে নেওয়া প্রয়োজন যে, জীবনানন্দ দাশ এ সময়ের সব কবিকেই নেশার মতো জড়িয়ে আছেন। সাম্প্রতিক কবিদের সমস্যা জীবনানন্দকে ছাড়িয়ে (অস্বীকার করে নয়) যাবার—তাঁকে ব্যবহার করার মধ্যে থেকে তাঁর প্রভাব কাটিয়ে ওঠার। এদিক থেকে জনাচারেক কবি ছাড়া বিশেষ কেউই এগুতে পারেন নি ; তারাপদ রায়ের 'তোমার প্রতিমা'র দিকের কবিতা তো 'রূপসী বাংলা'র পক্ষপুটেই লালিত। তিনি প্রমথ চৌধুরী যতীন সেনগুপ্তর তেরচা দৃষ্টিকোণকে আশ্রয় করেই শেষ পর্যন্ত রেহাই পেয়ে গেছেন (যদিও গভীরতায় তাঁর কবিতা তাঁদের তুলনায় খুবই ন্যূন)। শংকর চট্টোপাধ্যায়ের 'জ্যোৎস্নায় মঙ্গল হোক বলে, কে যেন অমনি দ্রুত সরে গেলো। / তুমি কি

নিজের কাঁধে মুখ রেখে বলেছিলে, শান্তি চাই / মানুষের স্বাধীনতা চাই, বিদ্যুৎ তামাক ও হাতঘড়ি চাই / নতুবা অর্গলবিহীন দরজা খুলে রাখব কেন ? / কেন বলব, পূর্ণচ্ছেদ / কেন বলব, দয়া, আমাকে দান করলে না'—যেমন তাজা অনুভবের স্পর্শ নিয়ে আসে, তেমনি নাগরিক জীবনের যৌবন বিষণ্ণতার কবি শরৎ মুখোপাধ্যায় চটুল ছন্দের 'খুকি সিরিজে'র কবিতা ছড়ার মধ্যে কিছুটা স্বতন্ত্র স্বাদ ছাড়া আর কিছু দিতে না পারলেও বর্তমানের কবিতায় ক্রমশ গভীর দ্যোতনা আনতে পারছেন এবং আন্তরিকতার গুণেই তা পাঠকের তারিফ পাচ্ছে। 'এখানে / মানুষের মাংস মিষ্টি বেশি, / মানুষের রক্ত বেশ গাঢ়—প্রায় টম্যাটোর মতন সুস্বাদু। / আমরা ঠকাবো না মিথ্যে স্তোক দিয়ে, জনসন জনসন / একটা ছোট অল্পদামী বোমা ফেলে দেখুন না কোলকাতা শহরে !' এমনি এক একটা স্বরক্ষেপণে পৃথিবীর ভয়াবহ পরিস্থিতিকেও উপহাস করে মোকাবিলা করতে চেয়েছেন শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়। তবে, শংকর চট্টোপাধ্যায় ও শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের কবিতা নতুন চরিত্র পেতে গিয়েও কি যেন হয়ে গেলো। এবং তারাপদ রায় 'বিয়ে করে তারাপদ কি রকম আছো' জিজ্ঞাসা তুলে সমগ্র জীবনের তুলকালাম কাণ্ডকে ঠাট্টা করে, বক্র দৃষ্টিতে সমস্ত প্রেম সম্পর্ককে, মহৎ মনুষ্যত্বকে বিদ্রূপ করে, জীবনের কোনো কেন্দ্রীয় সত্য খুঁজে না পেয়ে তাঁর কবিতার তীক্ষ্ণ শাণিত তির্যকতাকে ভোঁতা করে ফেলেছেন। অথচ একদিন তারাপদ রায়ের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ চকিত চমক জাগিয়ে সবাইকে ভালোই লাগিয়েছিলো —একটা আন্তর বেদনা এবং জীবনের ট্র্যাজিক দিকটাকে হাসি দিয়ে ফুটিয়ে মর্মান্তিক চোখের জল টেনে আনতে পেরেছিলো। 'তুমি কি এখনো ভাবো আমি সেই ষোল বছরের / সবুজ পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে আছি, মাসে একদিন / চুলদাড়ি একসঙ্গে কামাই, ক্ষীণ গোঁফ দ্বিতীয়ার / বাঁকাচাঁদ তোমার ঠোঁটের কূলে কবে অস্ত গেছে।' কিম্বা 'এখন মনের মধ্যে কারা ঢোল দিচ্ছে / ডিঙ ডিঙ ডিঙ ডিঙ ডিঙ / এতদ্বারা জরুরী ঘোষণা, এতদ্বারা সর্বসাধারণ' প্রভৃতি কবিতার ঠাট্টা অনাবিল। কিন্তু সে ঠাট্টা এবং বক্রদৃষ্টি এখনকার কবিতায় ধারহীন বললেই চলে।

অমিতাভ দাশগুপ্তর কবিতায় প্রতিনিয়ত বিচিত্র বাঁক ও আকর্ষণীয় নতুনত্বের স্বাদ পাওয়া যায়। তাঁর কবিতার স্পষ্টতই দুটো পর্যায়। প্রথম পর্যায়ে যুগের ক্ষয় ও অবমূল্যায়নের হিম সংক্রমণ তাঁর কাব্য চেতনাকে তীব্রভাবে আক্রান্ত করেছে। কবিতায় তাঁর কড়ি ও কোমলের সমাহার। জটিল পদ্ধতিতে বক্তব্য

বিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে সপ্রতিভ ভাবে কবিতার মধ্যে তাঁর আত্মোন্মোচন লক্ষ্যণীয়। ভাবনার খুব একটা অস্থিরতার জন্যেই হোক কিম্বা নতুনত্ব দেখানোর জন্যেই হোক চমক সৃষ্টি করার দিকে তাঁর প্রচণ্ড ঝোঁক। বিভিন্ন কবিতার সঙ্গে তাঁর কবিমানসের কোনো অবিচ্ছিন্ন যোগ নেই। সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে একটা বিচ্ছিন্ন মানসিকতার ছাপ। ধীর শান্ত উদাত্ত অস্থির মন্থর আর সুতীব্র গতি দিয়ে গড়া খণ্ডখণ্ড অনুভূতির একটি একটি কবিতা। বেপরোয়া তাঁর শব্দ ব্যবহার, ইতর শুদ্ধ শব্দ চিন্তারহিত-যা-খুশি শব্দ তাঁর কবিতার প্রয়োজনে তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যবহার করেছেন। যুগমানসের নৈরাজ্য এবং একই যুগমানসের আস্থাশীল জীবন-চেতনা এ দুটোকে ককটেল করার একটা প্রচেষ্টা আছে তাঁর কবিতায়। বস্তুতই তিনি দ্বৈত ভাবনার ভাবুক। তাঁর কবিতার একদিকে আছে, 'সরুন তো / সবাই সরে যান— / পন্থ বেলেল্লা শহর গাছপালা সূর্য / সব্বাইকে বেমক্কা খুন করে / দুধ আর তামাক খেতে ফিরে আসছি আমি ; / আমার ভালোবাসায় গরম, পাজি মেয়েটা স্কার্ফের মতো জানালায় ঝুলছে।' আবার আছে পুরো টনটনে চেতনা, 'মরিয়াপনার ল্যাসো দিয়ে বেঁধে আনা বজ্জাত ঘোড়া / কদমের চকমকিতে ফুটছে লাল নীল ফুল / ডাইনে হেলো না বাঁয়ে ঝুকো না / ট্র্যাক সামাল রাখো'। আর আছে মর্মমূলের বেদনা 'শীতল সাপের মতো আমার রুগ্ন হাত ছড়িয়ে দিলাম, / নয়ন তুলে দেখলো কে, এখানেই তো নিখিল বিশ্ব, / লহনা নয় খুল্লনা নয়, হৃদয়ে কাকে ধরেছিলাম'। গীতি কবিতার স্বাচ্ছন্দ্য, সহজতা এবং গভীর সুরও দেখা গেছে তাঁর কবিতায়।

প্রাথমিক ওলোট পালোট ঝোড়ো হাওয়া কেটে গেলে অমিতাভ দাশগুপ্ত নতুন চেহারা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন। জীবনে এবং চৈতন্যে একান্ত ভাবে নাগরিক হয়েও তিনিই বাংলাদেশের একমাত্র কবি, যিনি দীর্ঘ ন'বছর উত্তর বাংলার জঙ্গী কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং সশস্ত্র কৃষকদের জমি-দখল আন্দোলনে মদৎ দিয়েছেন। তাঁর কবিতায় তাই নাগরিক প্রকরণের সঙ্গে যুক্ত হোলো দেশ মাটি মানুষ ও সংগ্রামের নবজায়মান বোধ—শুরু হোলো তাঁর নতুন কবিতার সিরিজ 'পাশপোর্ট বিহীন বাংলাদেশ'। পূর্ববাংলার উদ্দেশ্যে সীমান্ত পেরিয়ে ছুটেছে তাঁর 'স আমার সহোদর, / কুন্তী তাকে কোথায় রেখেছ ?' অবশ্য টানাপোড়েন তাঁর কবিতায় থামে নি। রক্তাক্ত অন্তর-বাহিরের সংঘাত তাই মর্মান্তিক বেদনায় আপ্লুত হয়ে ওঠে তাঁর অতিসাম্প্রতিক 'ভাসান ভাসান সারাবেলা' দীর্ঘ কবিতাটির অন্তিম পঙক্তিগুলিতে— 'কখন

গর্জন-তেল মাখা মুখে সমস্ত প্রতিমা / শোলার মুকুট খুলে ভেসে যায় গাঙুরের নীরে। / অলক্তে ফোটায় পদ্ম, সেই পদ্মে স্বতাশঙ্খসাপ / প্রবীণ খোলস ভেঙে উঠে আসে, / নষ্ট দড়ি-খড়ে ঢেউ আনে অতলতা / বারবার ডুবগলা তোলে ক্লান্ত চোখে / রবীন্দ্রনাথের সেই উপমা-বিখ্যাত রাজহাঁস ; / কখন গর্জন-তেল মাখা মুখে ভেসে গেছে পাথর প্রতিমা / জল আঁতি-পাঁতি ঢুঁড়ে কি করবে তাকে / ভাসান ভাসান সারাবেলা।'

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় ব্যক্তির আত্মজগৎ মুখ্য নয়, সমষ্টিই প্রধান। 'হাজার বছর ধরে। হাজার বছর আহ্। অলীক স্বর্গের দিকে / উর্দ্ধমুখী হঠাৎ হঠাৎ আমাদের রক্তের বোতলগুলি / আমাদের, ছলাৎ ছলাৎ / ঢেউয়ে, মিথ্যে ঢেউয়ে টানটান সদ্যজাত / ধমনী—শিরায়—' লক্ষ্য করে তাঁর কবিতা এগিয়ে এসেছে। যৌবনের আকাঙ্খা সাধ অভিমান বেদনা ও স্মৃতির রঙ মেশানো তাঁর কবিতা। নিসর্গ তাঁর লেখায় একটা উদাস মায়া রচনা করে। এক একটা মুড নিটোল হয়ে দেখা দেয়। 'এবং গোপনে আমার সকল দাবী / ফুটায় দুপুর সহজ শিথিল ফুলে।' শব্দের মধ্যে থেকে একটা সংগীত ফুটিয়ে তোলার চেষ্টায় অনেক ক্ষেত্রে তিনি সার্থক হলেও শব্দ ব্যবহারে তাঁর একটা আড়ম্বর আছে। চিত্রকল্প রচনায় বহুক্ষেত্রেই তিনি সার্থক হতে পারেন নি। তবে সমাজমনস্ক হয়ে তিনি যেখানে কবিতা রচনা করেছেন, দেখেছেন জীবনের চারদিকে ঘোরতর অন্ধকার, অনিশ্চিত, অবমূল্যায়ন ঘটা সমাজচিত্তের ক্ষয়, সেখানে তিনি বোধের দিক থেকে খাঁটি হলেও প্রয়োগের ক্ষেত্রে—ব্যঞ্জনার ক্ষেত্রে অনেকখানি দুর্বল। সামগ্রিক দৃষ্টিতে পারিপার্শ্বিকের সব কিছু দেখে সত্য উদ্ধার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় জীবনানন্দের সরাসরি উপস্থিতি কোথাও কোথাও বিঘ্ন ঘটিয়েছে। তবে তিনি তা ক্রমশই কাটিয়ে উঠছেন।

শান্তিকুমার ঘোষের কবিতা অন্তত একটি কারণে উল্লেখের দাবী রাখে। তিনি অতি মাত্রায় শহুরে সৌখীন কবি। তা ছাড়া হালকা পায়ে উচ্চবিত্ত ভ্রমণকারীর একটা মেজাজ তাঁর রচনায় দেখা যায়। কিন্তু সেই মেজাজে আবেগ অপেক্ষা রক্তাল্পতাই প্রধান। প্রসন্নতা মিতভাষিতা তাঁর কবিতার আয়ত্তে রয়েছে, যেমন 'শেষ সুগন্ধ উড়িয়ে আনে বসন্ত বাগান থেকে / মিষ্টি জ্বরভাব / ফাল্গুনে সমান দিন এবং রাত্রি / গানগুলি আনে উড়িয়ে বাগান থেকে।'

এ কবি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'গোলাপের বিরুদ্ধে

যুদ্ধ' ও 'শবাধারে জ্যোৎস্না'র বেশ কিছু কবিতা উজ্জ্বল হলেও তেমন চিহ্নিত স্বাতন্ত্র্য খুব চোখে পড়ে না। তাঁর কবিতার মধ্যে একটা সহজতা কাজ করে। শৈশব যৌবনের স্মৃতি বা ফেলে আসা দিনগুলোর প্রতি একটা বেদনা মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। 'এখন মিলতে হলে অতিরিক্ত ন্যাংটা হতে হয় / এখন মিলতে হলে পরস্পর এঁটো খেতে হয় / এখন মিলতে হলে হৃদয়ের পরিবর্তে মদ খেতে হয়।' যুগ জটিলতার এবং অসহায়ত্বের কথা বলতে গিয়েও মোহিত চট্টোপাধ্যায় জটিলতা হীন সরল বাক্যবিন্যাস করেন। 'এরকম দিন যাবে, এরকম দিন, হা ঈশ্বর, এরকম দিন / পায়ের তলায় বালি ভীষণ গরম লাগে, পায়ের তলায়/বন্ধুবা সবাই মিলে উট খুঁজি, বন্ধুবা সবাই/ক্রমশ অদৃশ্য হয়, বন্ধুবা সবাই। / রেস্তোরাঁ সিনেমা বার রাজপথ গলি ক্রমশ অদৃশ্য হয়, কেবল বয়স / নিকট নিকটতর হতে থাকে।' সাম্প্রতিককালে এক ধরনের নাটকীয়তা তাঁর কাব্যধর্মকে আচ্ছন্ন করেছে।

মানস রায়চৌধুরী, দীপক মজুমদার, শোভন সোম, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, জ্যোতির্ময় দত্ত, সুনীল বসু, সমীর রায়চৌধুরী, অরবিন্দ গুহ, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, তুষার চট্টোপাধ্যায়, শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, আনন্দ বাগচী, প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, সুধেন্দু মল্লিক এবং তৎসহ কবিতা সিংহর কিছু কিছু কবিতা কমবেশি পাঠকের চোখে পড়বার মতো। তবে তার বেশি কতোটা তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তুষার চট্টোপাধ্যায় এক সময়ে কিছু ভাল কবিতা লিখেছেন। বিশেষতঃ দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু এখন দুজনেই কেমন নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছেন। লৌকিক সংস্কারকে কবিতায় টেনে আনায় দেবীপ্রসাদের সহজাত দক্ষতা ছিলো। এখন অনাবশ্যকভাবে জটিল হয়ে পড়েছেন। ছাড়া ছাড়া কবিতা রচনায় তুষার চট্টোপাধ্যায় এখনো পারঙ্গম।

সুধেন্দু মল্লিক রোমান্টিক মানসতার কবি। নিজস্ব চিন্তা এবং ব্যক্তির প্রকাশকেই তিনি কবিতায় বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। বিষণ্ণ বেদনায় স্তিমিত বাক্য বিন্যাসের মধ্যে থেকেই কখনো কখনো চকিত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তাঁর কিছু কিছু কবিতা। শব্দ যোজনার ব্যাপারে তিনি খুবই সচেতন। অনুত্তেজক শব্দ সাজিয়েই একটা বিষাদাশ্রিত পরিমণ্ডল ফুটিয়ে গেলেন তিনি। 'যাবার সময় আমাকে বলোনি। / আমি ফিরতে গিয়ে দেখি তোমার ফেলে যাওয়া / ছায়ায় আমার ভীষণ অসুখ / ঝরা ফুলের মতো ভীষণ বেড়ে চলেছে। / আমার

কোথাও যাওয়া হলো না। / যে তোমাকে দেখেনি শুধু সে গান গাইতে গাইতে/ চলে গেলো যেন বাঁধের দিকে / এখন না রাত না অন্ধকার।' মানস রায় চৌধুরীর 'গৃহস্থের তুলসীচারা উপড়ে ফেলে চলে যাবো নিম ফুল, পুঁই মাচানের/ মাঝামাঝি ভস্ম এঁকে চলে যাবো, চির প্রস্থানের / জেটি থেকে জাহাজ নোঙর ছিঁড়ে চলে যাবো অচিন সুনের কাছে'—ধরনের স্বাভাবিক সৌন্দর্যের ও ভালোবাসার আমেজঘন কবিতাগুলো নিকট পরিবেশ রচনা কৌশলগুণে মনোরম হয়ে ওঠে আর পাঠকের মনেও এক ঈপ্সা জাগিয়ে দেয়। তাঁর আকাঙ্খা ভালোবাসারই প্রতি 'জলের সমাধি ছেড়ে হে বেদনা কত দূরে পাবো মৃত্তিকার / বাঞ্ছিত শুষ্কতা বালি, সুনের প্রহার?'—আঘাত সংঘাত আর ব্যভিচারী চরার ওপরে দাঁড়িয়েই তাঁর জীবন ও ভালবাসার সাধনা—কূল পাওয়ার তাগিদ, কেননা 'সংঘর্ষ, আগুন চিরনির্বাসনে আনন্দের শুনেছি আহ্বান।'

মেয়েছেলের মুখে খিস্তি নাকি বেশ ভালোই লাগে। আধুনিক মহিলা কবি কবিতা সিংহ নিশ্চিত ভাবেই আধুনিকা। পুরুষ কবিদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছন্দ ভঙ্গিতে শব্দে বোধে তথাকথিত মহিলাত্বের বাঁধন রাখেন নি। অকপট ভাষণে বক্তিগত জীবন যন্ত্রণা—সাময়িক পরিবেশের ভাসমান যন্ত্রণাবোধ দিয়ে তিনি তাঁর কবিতাকে ঔজ্জ্বল্য দেবার চেষ্টা করেন। 'চৌদ্দ আনা কিলো দরে বিক্রি হয় ভিয়েৎনামের যুদ্ধ / ভ্রূণহত্যা, প্লেন দুর্ঘটনা তারপর ক্রমাগত রাত্রি নিল মাইল পোস্টের থাম।' তাঁর কবিতা প্রায়ই প্রেমবোধ থেকে জাত—বলা যায় প্রেমই মৌলিক প্রেরণা। এ প্রেম যেমন খাঁটি দেহভোগ আর্তি তেমনি অন্তর প্রদাহী। ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ছন্দের গোলমাল এবং কবিতার শরীরের একটা যুক্তিক্রম নিয়েই কবিতা সিংহর কবিতা সুন্দরী, সহজও—'বলতে গেলেই মিথ্যা / ভাবতে গেলেই ভুল / হাত বাড়ালেই শূন্য / সাঁতরালে অকূল।' তবে চটুল ছন্দে কবিতা সিংহ এক ধরনের দক্ষতা অর্জন করেছেন—'দু ভুরুর মধ্যিখানে / ও বাবু খেলতে যাবে? / না তুমি ড্রেনের ধারে / রবারের বল কুড়াবে / এসো না ভুরুর আলোয় / দেখো গো চোখ ধাঁধেনা / কপালের মধ্যিখানে / বাবুগো টিপ হবে না?'

জ্যোতির্ময় দত্ত কম লিখলেও বহুদিন লিখছেন, কিন্তু তাঁর কবিতায় একটা আলট্রা-মডার্ণ আভিজাত্যময় ভাব৷ ছাড়া বড় কিছু পাওয়া যায় না। গভীর কোনো বোধের চর্চা তিনি করেন না। একটা ইমপোজড পাণ্ডিত্য তাঁর কবিতা থেকে উঁকি মারে। এ ছাড়া নিঃসঙ্গ চেতনা ও যুগ ভাবনার অন্য সমস্ত লক্ষণ তো আছেই—'যন্ত্রটিকে দেখতে অনেকটা একপদবিহীন / মনুষ্য কঙ্কালের মতো

যার শিরদাঁড়াই / অবশেষে পরিণত হয় লিঙ্গ দণ্ডে / যা ঘুরে ঘুরে শোলার মত নরম / কিন্তু নিষ্কাম বিশুষ্ক মাংসে প্রবিষ্ট হয়। তারপর বিস্তারিত বাহু দুটিতে একটু চাপ দিলেই / এক ঝটকায় / ছিপি শুদ্ধ নিষ্ক্রমণ / হয়তো এ জন্যই স্থানীয় কথ্য ভাষায় / সঙ্গমের অপর নাম ইস্ক্রুপ।' গোটাটাই বানানো বানানো প্রবন্ধ গন্ধী মনে হয়। হয়তো প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত একই ধারার—'অন্ধকার, দু চোখ ঘুরালে। / এই অযোনিজ প্রেম—এর কোন আছে কি নিয়তি! শরীর মেশে না কোন শরীরের সঙ্গে কাছাকাছি / বালকের-তৈরী-এক মাটির-পুতুল ভেঙে যায়।' বরং সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত একটা নিশ্চিত বোধ থেকে কবিতা রচনা করেন—কবিতার মধ্যে এখনো তাঁর ভেতরের সাড়া পাওয়া যায়: 'শ্মশানে / আজকাল সংকারের অগ্নি বড় অসফল জ্বলে; / মানুষের মূল অস্থি অবশিষ্ট থেকে যায় হিংসার মতন। / সে আগুনে শিশিরের মতো শরীরের শীত নিয়ে / উত্তাপ পোহাতে শুধু জেগে থাকে ডোম। / তার ভোলানাথ মুখে তাকিয়ে বোঝাই যায় না, আসলে সে-ই / ছদ্মবেশী কাপালিক কিনা! ঈশ্বরের শেষ ইচ্ছা / বাঁশ হাতে ঘনিষ্ঠ পাহারা দিতে দিতে / সেই তো সন্তানব্যর্থ সদ্য বিধবার দিকে সক্ষম লোভীর মতো চেয়ে থাকতে পারে।' এবং সমীর রায়চৌধুরী ক্রুদ্ধ। তিনি জেনে ফেলেছেন 'কবিতার দ্বারা মানুষকে আজীবন ঘেরাও করে রাখা হয়ে উঠলো না / আয়ু এবং পরমায়ু / যৌন নিবিড় ও অযৌন প্রহ্লাদ / ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে নির্বিবাদ সন্ধি করে স্রেফ গর্ভের কোটর ভাঙ্গা / অথচ পুরোনো চর্মরোগ চুলকেও এই শরীর বুঁদ হয়ে ওঠে / তবু গণতন্ত্র বুঝে উঠতে স্বাভাবিক মানুষ হিমসিম খেয়ে যায় / দিব্যি গেলে কতক্ষণ আর আটকানো যায় ভোরের ট্রেন / ইষ্টিশানটা না ঘুরে মনটা খুঁত খুঁত করবে।' সহজ স্বাভাবিক গলায় কথাগুলো বলে গিয়ে একটা অন্যতর কিছুর টান ধরিয়ে দেন সমীর রায়চৌধুরী। সত্যকে নির্মম ভাবেই প্রকাশ করেছেন তবু এ সময়ের কবিরা। সামান্য কয়েকজন ছাড়া প্রায় সবাই-ই আন্তরিক ভাবে উপলব্ধির কথা বলতে পেরেছেন।

শোভন সোম যে-কোনো হৈ হট্টগোল থেকে নিজেকে দূরে রেখে এক স্বকীয় নিভৃত কাব্য-মণ্ডল রচনা করেছেন। এক সময় যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল তাঁর কবিতায়। কিন্তু কোনো দুর্জ্ঞেয় কারণে তাঁর বিশেষ বিবর্তন ঘটে নি। এখন বুঝিবা নীরব প্রস্থানলোকে তলিয়ে যাচ্ছেন তিনি। নিসর্গ পরিমণ্ডলকে কাব্যময় করার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তাঁর, দক্ষতা ছিল এ জাতীয় গভীর আন্তরিক ও মর্মন্তুদ উচ্চারণে—'হঠাৎ কে বুকের মধ্যে ডেকে উঠলো 'শোভন' / ঝাপ্টা খেয়ে

প্রতিধ্বনি ফিরিয়ে দিলো, শোভন / অন্ধকারে পথ হারালে যেমন কণ্ঠ ডাকে, তেমন আমায় / ঝাপসা কণ্ঠে বালক কণ্ঠে কে ডাকলো ফের এমন মধ্য বেলায় ! / তীক্ষ্ণ ছুরির মতন আমার কানে বিঁধলো...শোভন... ।'

স্বতন্ত্র চিন্তায় বিশ্বাসী থেকে ইতর শব্দ বর্জন করে শিবশম্ভু পাল, শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কবিরা কবিতা রচনা করেছেন। শিবশম্ভু পাল অধুনা সময়ের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে তাঁর কবিতার বক্তব্য উপস্থিত করেন। বক্তব্যহীন কবিতায় তাঁর মানসিক সমর্থন নেই। তাঁর কবিতা খুবই সহজ আঙ্গিকে সাধারণ প্রতীকে সরল বক্তব্য নিয়ে উপস্থিত হয়। 'ওয়েটিং রুমে বসে ছবির বইয়ের পাতা ওলটাতে গিয়ে। একদিন জলজ্যান্ত সাদা হয়ে যাব ; / বহুতর শোভাযাত্রা, কৃশ পুত্তলিকা দাহনের / উষ্ণ বাষ্পে মাঝে মাঝে এদিক ওদিক নড়ে ওঠে জোর। / আমি শুধু প্রতীক্ষায় থাকি।' বক্তব্য উপস্থাপনের কায়দায় কিছু দুর্বলতা আছেই, নৈরাশ্যও আছে প্রচুর। শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়েরও নৈরাশ্যই কবিতার প্রেরণা হয়ে পড়েছে 'আমার বুকের ওপর রাজারাণী ঘুমিয়ে পড়েছে, / আমারই বিষাদ কিম্বা ব্যর্থতা নিবিড় / স্বকৃত পুতুল এক উপহার দিয়েছে আমায়।' কিছু কবিতা লিখেছেন বলেই এই সঙ্গে কবি হিসেবে ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়ের নাম করা যায়। খুবই অল্প লিখেছেন, দু' একটি অবশ্যই দাঁড়িয়েছে, কিন্তু তেমন টানতে পারে না।

এই কবিস্রোতের গাঁজিয়ে ওঠা বোধের মধ্যে থেকে ডাক ছেড়ে জেগে উঠলেন অতি তরুণ কবিরা—নিজেদের অসহায়তা নিয়ে নিজেদের মুখোমুখি দাঁড়ালেন তাঁরা।

অধুনা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত কবিতার এইসব কবিদের খুবই দায়িত্বশীল এবং সম্ভাবনাপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। বয়ঃজ্যেষ্ঠ হলেও সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং গৌরাঙ্গ ভৌমিকের কবিতা এই সময়েই প্রকাশিত হয়েছে এবং পরিণত মনের স্বাক্ষর রাখতে পেরেছে বলেই প্রথমে তাঁদের নাম করতে হচ্ছে। এ ছাড়া মণিভূষণ ভট্টাচার্য, আশিস সান্যাল, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, শিবেন চট্টোপাধ্যায়, রত্নেশ্বর হাজরা, গণেশ বসু, চিন্ময় গুহঠাকুরতা, পুষ্কর দাশগুপ্ত, শংকর দে, তুষার রায়, কালীকৃষ্ণ গুহ, পরেশ মণ্ডল, মৃণাল বসুচৌধুরী, শান্তি লাহিড়ী, মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত, বিনোদ বেরা, বেলাল চৌধুরী, মৃণাল দেব, মৃণাল দত্ত, কেতকী কুশারী ডাইসন, বাসুদেব দেব, নচিকেতা ভরদ্বাজ, সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বেশ্বর সামন্ত, তুলসী মুখোপাধ্যায়, গৌরীশঙ্কর দে, বঙ্কিম মাহাত, মুকুল গুহ, অনন্ত দাশ, মঞ্জুষ দাশগুপ্ত, সামসের আনোয়ার, সামসুল হক, ভাস্কর চক্রবর্তী,

দীপঙ্কর চক্রবর্তী, শৈলেন বসু, চন্দন মজুমদার, কবিরুল ইসলাম, অঞ্জন কর, বিজয়া দাশগুপ্ত, নবনীতা সেন, শান্তনু দাশ, প্রভাত চৌধুরী, দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, নীহার গুহ, অরুণাভ দাশগুপ্ত, শ্যামসুন্দর দে, তরুণ সেন, সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, রেবন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, রবীন সুর প্রমুখ কবিরা বাংলা কবিতার জগতে খুবই ক্রিয়াশীল। করুণাসিন্ধু দে ও ত্রিদিবরঞ্জন মালাকার দু'বছর আগে তরুণ কবিদের মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন কিন্তু বর্তমানে স্তব্ধ। আর ৺অনাময় দত্ত ও ৺মঞ্জুলিকা দাশ তাঁদের পরিণতি দেখাবার অবকাশ পান নি।

এঁদের কবিতার আলোচনা করতে গিয়ে একটা কথা অবশ্যই বলে নেওয়া দরকার যে এই কবি সম্প্রদায়ের প্রায় অর্ধেক কবিরই কবিতা সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলার নেই। আর এ কথাও অনস্বীকার্য যে, নিকট অগ্রজের প্রচণ্ড প্রকাণ্ড বিস্ফোরণের শেষে এইসব কবিদের কাছে অস্থির মনস্কতাও ব্যাকডেটেড হয়ে পড়েছে। অনেক কবিই স্থিরতায় পৌঁছোনোর জন্যে নানাদিক থেকে—নানা দৃষ্টিকোণ থেকে জীবন সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা শুরু করে দিয়েছেন। বস্তুত একটু নজর রাখলেই দেখা যায় যে, বর্তমান সময়ে সমাজ পরিবেশও স্থিরতর হবার জন্যে সংগ্রামী হয়ে নানামতপথের মধ্যে একটা সমঝোতা এনে জাতির মনোভাব গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়ে পড়েছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এর একটা সুস্পষ্ট ছাপ যেমন লক্ষ্য করা যাচ্ছে; সাহিত্য ক্ষেত্রেও তা দুর্লক্ষ্য নয়। বিচ্ছিন্নতার মর্মান্তিক অভিশাপের বাস্তব অভিজ্ঞতাই মিলের স্বপক্ষে মদৎ দিচ্ছে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর বৈপরীত্যগুলোকে। বাংলা কবিতার জগতেও এমনি একটা সুরসমন্বয়ের আয়োজন সচেতন পাঠক মাত্রের চোখেই ধরা পড়েছে বলে মনে হচ্ছে। সভ্যতার দুষ্টরক্ত এবং তাবৎ ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে সাঁজোয়া কথার লড়াই এখন খুবই সর্বজনীন। ধান থেকে সংবিধান যাঁদের হাতে তাঁদের চিত্রচরিত্র মানুষের বাঁচার জন্যে ও শান্তির জন্যে সংগ্রামে যে ব্যর্থতা এবং জয় তা প্রায় সব কবির মধ্যেই ধরা পড়েছে। উল্লিখিত কবিদের মধ্যে অনেকেই যেমন সমাজমনস্ক ও ঐতিহ্যবিশ্বাসী তেমনি অনেকেই কবিতা করে তুলতে আপন অ্যাটিচিউডটি উপস্থাপনের জন্যে সমস্ত নির্দিষ্ট নীতি নিয়মের পরিপন্থী কাব্যশরীর গঠনে প্রয়াসী। সব কিছুর প্রতি শ্রদ্ধা এবং সব কিছুর প্রতি অশ্রদ্ধা দিয়ে গঠিত হচ্ছে অধুনার কবিতা। তবে এখনো প্রেম এবং প্রেম বিষয়ক নিজের একান্ত অনুভূতির প্রকাশই খুব বেশী।

সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গৌরাঙ্গ ভৌমিকের কবিতায় একটা পরিণত মনের এবং অনুশীলনের ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। কবিতার ব্যাপারে দুজনেই সিরিয়াস—সিরিয়াস বক্তব্য উপস্থাপনে এবং কাব্যের শরীর নির্মাণে। সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নিজের সংগে সংলাপ' কাব্য গ্রন্থের অনেক কবিতাতেই একটা স্মার্টনেস ও নগর জীবনের তিতিবিরক্ত মনোভঙ্গীর ছাপ আছে, আর আছে রক্তিম বেদনার অনুভব, যা কিনা তিনি প্রকৃতির সবুজ দ্বীপ দেখিয়ে তুলে ধরেন, 'এখানে বৃহৎ এক দূরাগত পাখীর আওয়াজ শুনি কানে / মাংস ভোজন অন্তে মেঘলোকে উড়ে গিয়ে এই পাখী পান করে মেঘ / আমি আছি সীমাবৃত স্বীয় বর্ণ, স্বীয় গন্ধ নিয়ে।' তাঁর কোনো কোনো কবিতায় একটা তীক্ষ্ণ রুক্ষতা ফুটে ওঠে। অন্যদিকে গৌরাঙ্গ ভৌমিক পল্লীপ্রকৃতির ছোঁয়ায়—আপন সংসারের মধ্যে, পরিবেশের নিকট আত্মীয়তার মধ্যে নিজেকে পেলে স্বস্তি বোধ করেন। 'মাঠে মাঠে নদীর শরীরে / সূর্যের শরীর দেখবে। বিকেলেও / পর্বতে মিনারে / রৌদ্রেরই বিম্বিত দ্যুতি— / নারী কিংবা ঘরের গভীরে!' এঁদের দুজনেরই কবিতায় মরমী মনের ছাপ—একজনের তা অন্তঃশীল অন্যজনের সোচ্চার।

মণিভূষণ ভট্টাচার্যের আন্তরিকতা ও সামাজিক চৈতন্যের প্রতি নিষ্ঠা তাঁর কবিতাকে বক্তব্য প্রধান করে তুলেছে। তিনি দেখছেন 'ব্যাপক স্রোতে ধ্বসে যায় নৈসর্গিক অয়েল পেন্টিং / --সুদূর বল্লাল সেন, ক্ষিপ্র ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি / বাণিজ্যে অস্থির' আর 'লোমশ কবজির নিচে লুণ্ঠনের ঘোর।' ইতিহাসের ধারা ধরে এগিয়ে এসে তিনি যখন বলছেন 'এখন নির্ভীক জলে জোয়ারের সংগ্রাম জেগেছে / এবং সংগ্রাম হিঁড়ে বলবান খেয়া পারাপার, / এখন জলের নীচে বাঁকানো রৌদ্রের রেখাগুলি / কোলাহল করে' তখন প্রবহমানতার প্রতি বিশ্বাসে বলিষ্ঠ কবির প্রতি শ্রদ্ধা জাগে। 'রাজহাঁস' সেই উন্নত, গর্বিত ও স্বাধীন পারাপারের প্রতীক—পারাপার হৃদয় থেকে হৃদয়ে; ব্যক্তি থেকে সমষ্টিতে। আর তাঁর স্থানীয় সংবাদ—'সব গাড়ি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য। চোখের পলকে / পাঁচখানা প্ল্যাটফর্ম খুলে যায় হৃদপিণ্ডের কাছে।' যুগকে খুব স্পষ্ট চোখেই দেখছেন মণিভূষণ ভট্টাচার্য।

এদিক থেকেই আশিস সান্যাল সমাজমানসের নিকট প্রতিবেশী। তবে প্রেমই তাঁর কবিতায় মুখ্য স্থান দখল করেছে। কিন্তু প্রেমের এ জগতে তাঁর এক প্রকট নৈরাশ্য—'চতুর্দিক থেকে ভয়ানক অবসাদগুলি / আমাকে জড়িয়ে ধরলো। ...আমি চীৎকার করে উঠলাম। ..ভালোবাসার জন্যে নিজেকে

নিঃশেষ করে দিলাম / এক অপরিসীম শূন্যতার মাঝে।' প্রেমে তিনি কোনো ঝুঁকি নিতে রাজী নন। খুব গভীরতা দিয়েই প্রেমকে অনুভব করতে গিয়ে কবি 'যেতে যেতে এই অভিসারে / কেন যে সম্পূর্ণ ভুলে আন্দোলিত প্রবল আঁধারে / সব স্মৃতি নিভে যায়' জানতে না পেরে বেদনা অনুভব করেন এবং অন্যত্র একটা সর্ত আরোপ করে শূন্যতার প্রতি সংগ্রামী হয়ে ওঠেন 'অমোঘ আশ্বাসে / যদি স্পর্শ দাও তবে সমগ্র কান্তার / ভয়ানক প্রতিশব্দে চুরমার করে দেবো ভীষণ বিক্রমে।' নারীকে আশিস সান্যাল খুবই শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখতে চান। একটা গুরুত্বপূণ সমাজ শক্তি বলেই মনে করেন। সামাজিক অস্তিত্বের প্রতি তাঁর বিশ্বাসী অ্যাটিচিউড থাকাতেই তিনি খর নজর রেখেই দেখেছেন 'রক্তের ভেতরে হিংসা প্রতিহিংসা পাপ পরাজয় – / আততায়ী অন্ধকারে সন্ত্রস্ত মেদিনী / কান্নায় আহত শুধু' ; তিনি ভেবে পান না 'নির্মেঘ কোথায় / নতুন প্রাণের জন্যে, নতুন প্রেমের জন্যে, নতুন গানের জন্যে / জ্বালাব নতুন দীপ্তি প্রস্তুত শিখায় ?' আর তাই কামনা জানিয়েছেন তাঁর দিশারীর কাছে 'বিশ শতকের এই ক্লান্ত ঘৃণ্যতম অবসাদ থেকে / নিয়ে যাও নির্ধারিত নিকটে তোমার'। ভঙ্গীহীন স্পষ্ট উচ্চারণে বক্তব্য উপস্থাপনে যত্নশীল আশিস সান্যাল।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়কেও এই গোত্রের কবি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। অনেকগুলো কবিতার বই রচনা করেছেন পবিত্র মুখোপাধ্যায়। তাঁর সময়ে অনেক কবির থেকে ক্ষমতাবান হয়েও আশ্চর্যজনক ভাবে তিনি কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট উপস্থিত করতে পারেন নি। এখনো সেই পুরোনো আঙ্গিক পদ্ধতি, ভাষারীতি এবং ভাবনার দাসত্ব করে যাচ্ছেন। মণিভূষণ ভট্টাচার্য, আশিস সান্যালও এ থেকে ব্যতিক্রম নন। বক্তব্য প্রধান কবিতা তাঁরা যে ভাবে উপস্থিত করছেন তা পাঠককে খুব একটা আকর্ষণ করতে পারছে না—রকেটের যুগে যেন অতি মজবুত হলেও গরুর গাড়ী। পবিত্র মুখোপাধ্যায়ে বোদলেয়ারের প্রভাব কিছুটা কাজ করেছে বলে মনে হয়। কিন্তু বোদলেয়ারী পাপজকুসুমের পাপটুকু বাদ দিয়ে কুসুমটিকেই ফুটিয়ে তুলেছেন পবিত্র মুখোপাধ্যায় তাঁর কবিতায়। প্রেমকে আশ্রয় করেই সুডৌল হয়েছে তাঁর কবিতা। আর এই প্রেমকে আশ্রয় করেই তিনি প্রবেশ করেছেন সমাজের বাস্তব পরিবেশে আর সমগ্র অস্তিত্বে বোধ করেছেন একটা ভারাক্রান্ত হৃদয়ের জ্বালা। পবিত্র মুখোপাধ্যায় সুন্দরের অন্বেষার যাত্রী। এ অন্বেষণে লাভ হয়েছে কেবলই সুন্দর বিষাদ। ঋতু তাঁর হেমন্ত—জীবনানন্দের পর হেমন্ত পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের চিন্তার পূর্ণ আলম্বন হলেও

গভীরতার অভাবে পূর্ণ তাৎপর্য পায় নি। তবে এ কথা ঠিকই যে পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য স্পষ্ট। সময় সচেতনতা তাঁকে অতীত বর্তমানের ইতিহাসের গভীরে টেনে নিয়েছে। সুদূর প্রসারী দৃষ্টিতে তাকাতে পারছেন বলেই মানবিক গুণের ধুলিলুণ্ঠিত পরিণাম দেখে মানুষ হিসেবে তিনি নিজেই একটা বিবেকের দংশনে অনুভব করেন 'পুরোনো ভিটেয় চরবে ঘুঘু কাল হতে / সময় এসেছে, আমি নতুন পোষাক শিবস্ত্রাণ / রোমশ চেটোয় নিয়ে আগুনের ফুলকী পুরাতন / বাড়ীর অন্দরে দেবো ছুঁড়ে, মারবো মুহুর্মুহু লাথি / পিতৃপুরুষের জীর্ণমুখ নীড়, কড়ি বরগা / জানালা দরোজা / নীচে বমণ তৃপ্ত অম্লে খুসি জনতা নামক / খড়ের পুতুলগুলি তুলে নিক বালক আস্তানা / আমার নতুন বাড়ী প্রয়োজন'। একটা হাহাকার এবং বিষাদ পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় সুস্পষ্ট। তাঁর পরবর্তী কালে প্রকাশিত 'ইবলিসের আত্মদর্শন' কাব্যগ্রন্থে একই বেদনাময় অস্তিত্বের প্রাজ্ঞতর প্রকাশ ঘটেছে। এক ক্লাসিক আততি ও মহাকাব্যিক চৈতন্যকে আশ্রয় করে কিছু পরিমাণে তিনি সার্থকতাও দেখাতে পেরেছেন। এখন পর্যন্ত নষ্ট আত্মার ব্যথাহত আর্তনাদ তাঁর কাব্যের স্বরগ্রাম।

শাস্ত্রবিরোধী কবিতা সৃষ্টির তাগিদে সাম্প্রতিক কিছু কবি বেশি মাত্রায় ফরাসীয়ানা চর্চায় মগ্ন। প্রমথ চৌধুরী এবং পরে অরুণ মিত্রর কবিতায় আমরা ফরাসী কবিতার মেজাজ অনুভব করেছি। সাম্প্রতিকপূর্ব সময়ে র‍্যাবো-র অনুবাদক লোকনাথ ভট্টাচার্য যে কতখানি ফরাসী ভাষাভঙ্গী ভাব বৈদগ্ধ্যে নিজের কাব্যচেতনাকে জারিয়ে নিয়েছেন তা 'নরকে এক ঋতু' অনুবাদগ্রন্থটির পাঠকের আন্দাজ করতে কষ্ট হয় না। ফরাসী কবিতার ঐতিহ্যকে আত্মসাৎ করেই তিনি তাঁর কবিতার জন্যে একটা নিজস্ব অ্যাটিচিউড তৈরী করে নিয়েছেন। কবিতায় তিনি বক্তব্যকে উপেক্ষা করেন না এবং তাঁর জীবনবোধও তীক্ষ্ণ। শুধু ভঙ্গী দিয়ে চোখ ভোলাতে চান নি তিনি। কিন্তু অনুজরা বুঝি বহু পরিমাণেই ব্যতিক্রম। অনেকের ভঙ্গী সর্বস্বতার ঝোঁক খুবই পীড়াদায়ক। অথচ, সচেতন থাকলে এঁদের মধ্যে কেউ কেউ কিছু সাচ্চা কবিতার স্বাদ দিতে পারেন।

রত্নেশ্বর হাজরা ও পুষ্কর দাশগুপ্তকে এসময়ের রচনাকারদের মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কবি বলে মনে হয়েছে। আঙ্গিক প্রকরণের দিক থেকে এঁদের এবং সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, পরেশ মণ্ডল, মৃণাল বসু চৌধুরী প্রমুখ কবির কবিতায় অ্যাপোলীনেয়ার, কামিংস, সিদ্ধেশ্বর সেন প্রমুখ বিদেশী-দেশী কবির

বিশেষ গঠনের কবিতার সরাসরি ছাপ আছে বললে তাঁদের আপত্তির কিছু থাকবে না হয়ত। একটু তুলনামূলক উদাহরণ দিতে হচ্ছে। যেমন :—

অলিভার বারনার্ড অনূদিত	অ্যাপোলীনেয়ার	মৃণাল বসু চৌধুরী
O D	LONG LIVE FRANCE	এখনও তোমার
H E	HE SLEEPS IN HIS LI	দি
M A	TTLE SOLDIER'S BED	কে
YAR	MY RESUSCITATED	চে
NO RE	P O	য়ে...'
BILLY	E T	ইত্যাদি

আমাদের আলোচ্য কবিদের অনেকের যথাযথ উদ্ধৃতি দেওয়া এখানে খুবই অসম্ভব হলেও একটুখানি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা গেলো। মোটামুটি ভাবে বলা যায়, কোনো একটি মুহূর্তের মানসিক অবস্থার বা পরিবেশের অবস্থাগত অবয়বের যথাযথ চিত্রাভিব্যক্তির মধ্যে থেকেই সময় দূরত্ব স্বর মেজাজ প্রভৃতিকে একসঙ্গে উপস্থাপনের জন্যে এঁরা অল্পবিস্তর সবাই সচেষ্ট। অবশ্য নিজেকে উপস্থাপনের জন্যে এবং কবিতা গড়ে তোলবার জন্যে এ সব প্রভাবে কিছুই যায় আসে না। এঁরা যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গেই ইঙ্গিতবহ, সাংগীতিক, রহস্যময় অন্তরলোক প্রকাশ করেছেন সমস্ত কবিতার মধ্যে। আমি দেখেছি, যে কথা তাঁরা বলতে চান,—যার দিকে ইঙ্গিত করতে চান, যতই সে ভাবে বলার প্রতি বিরোধী হওয়া যাক না কেন, তাঁদের কবিতা পাঠকালে তাৎক্ষণিকের জন্যেও অন্ততঃ সেই অনুভূতির সঙ্গে একান্ত হয়ে যেতে হয়। সূক্ষ্ম অনুভূতির যে কাজ তাঁরা দেখান তাকে তারিফ না করে উপায় থাকে না।

রত্নেশ্বর হাজরার ইতিহাসচেতনা ও একটা দার্শনিকতা তাঁর কবিতাকে গভীর করে তুলেছে। বহু ঐতিহ্য অসমর্থিত ও পরিচিত অভিজ্ঞতার বাইরেকার চিত্রসজ্জায় তিনি তাঁর কাব্যগত বিষয়ের উপস্থাপন করেন। শব্দের গাঁথুনী সুদৃঢ় এবং আকর্ষণীয়। ছাড়া ছাড়া শব্দ ব্যবহারেও অভিব্যক্তি শ্লথ হয় না। 'দরজা খুলে দিই / শহর / পাহাড়/ ওদিকের দরজা / খুলে দিই / পাহাড় / সামনে মরুভূমি / আঙুর লতার বন / ক্যাকটাস ঝোপ / জনারণ্য জনারণ্য জনারণ্য— তুমি / দুয়ার পেরিয়ে একলা হেঁটে যাও। তোমার মুখ / ক্লান্ত স্থপতির। তোমার মুখ / বৃদ্ধ নিষাদের।' রত্নেশ্বর হাজরার রচনায় অনেক শব্দ এবং চিত্র একটা মুদ্রাদোষ সৃষ্টি করেছে। তবে তাঁর যে মনোভঙ্গী গড়ে উঠেছে তাতে এ হওয়াটাই

স্বাভাবিক। বিভিন্ন সুচিন্তিত চিত্রকল্পের মধ্যে থেকে রত্নেশ্বর হাজরা তাঁর স্বতন্ত্রচিহ্নে চিহ্নিত অভিব্যক্তি উপস্থাপন করেন। তাঁর বহু কবিতায় যৌন প্রতীকের ব্যবহার আছে। বহু ক্ষেত্রেই সে ব্যবহার না থাকলে কিছু বড় একটা ক্ষতি হোত না। মনে হয় একটা বৌদ্ধ তান্ত্রিক দার্শনিকতা রত্নেশ্বর হাজরার মননভূমি দখল করার জন্যই যৌন প্রতীক চর্যাপদের উৎস থেকে এসে যাচ্ছে তাঁর কবিতায়। রত্নেশ্বর হাজরার কবিতা তাঁর সংবেদনশীল মনের পরিচয় বহন করে। সমাজের প্রতিও তাঁর তীক্ষ্ণ সংবেদনশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায়। 'এবং চিৎকার করে সময়ের পতনশীলতা ঠেকানো সম্ভব নয়। কেননা প্রত্যেক জন্ম মৃত্যুকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে জন্ম বিচলিত - / কেননা প্রত্যেক অস্তিনাস্তিতে বিশ্বাস রাখে বলেই চেতনা হতে পারে'—একটা বৌদ্ধ দার্শনিকতায় সিদ্ধ সাধু উক্তিতে অনিবার্যতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন রত্নেশ্বর হাজরা।

পুষ্কর দাশগুপ্তর রচনায় আত্মোম্মোচনের দিকটি স্পষ্ট। একটা রহস্যময় মগ্নতা তাঁর মধ্যে কাজ করে। পুষ্কর দাশগুপ্ত সাধারণত স্বগতভাষী। অন্তর্মুখী দৃষ্টিভঙ্গী থাকায় বিষণ্ণ একাকিত্বের একটা সুর তাঁর কবিতায় এবং তা তন্ময়তা এবং আচ্ছন্নতার ভাব নিয়ে আসে। অনুভূতিকে প্রাধান্য দিলেও সংহত আবেগ পরিশীলিত ইঙ্গিতবহ মার্জিত শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি মুহূর্তের অনুভূতিটিকে জীবন্ত করে তোলেন। একটা অন্তঃসলিল আবেগ পাঠকসত্তাকে অধিকার করে বসে। সমাজসংসারসংস্কৃতির তাবৎ কিছুর নির্যাস দিয়ে গড়া অনুভূতিটি পাঠকেরই সঙ্গে সম্পর্কান্বিত বলে মনে হয়। 'গাছের সান্দ্র স্তব্ধতার পাশ দিয়ে জলের কথা মেঘের কথা / হাওয়ার কথা ভাবতে ভাবতে / ওকি জলের শব্দ / ওকি মেঘের শব্দ / হাওয়ার / তখন না / অনুভব করে বনের ভিতর গাছ আর লতাগুল্মের নিবিড়তায় / আরো দূরে ঝর্ণার কথা ভাবতে ভাবতে / ওকি ঝর্ণার শব্দ / এবং না / এ কথা জেনে ঠাণ্ডা নীল আলোয় বনের গভীরে আরো দূরে একা'। একটা বোধ এবং ধ্বনি প্রবাহে একাকিত্বের অবসাদ এবং নির্মল বিষণ্ণতা পাঠক হৃদয়কেও আক্রান্ত করে। তাঁর বহু কবিতাতেই বিমর্ষ সঙ্গীতের একটা চাকা ঘুরে ঘুরে এসেছে, ছায়াছায়া স্বপ্নিল প্রতিচ্ছাপময় হৃদয়ের কিছু অস্পষ্ট বক্তব্য উপস্থিত হয়েছে—বক্তব্য সম্ভবত পুষ্কর দাশগুপ্তর অজান্তেই তাঁর ব্যক্তি মানুষটিকে উপস্থিত করেছে কবিতায়। কোথাও তাঁর কবিতা স্টিফ হয়েও পড়েছে—অচেনার ছবি গড়তেও চেয়েছেন কোথাও। তবে অনেক শব্দ ও চিত্র আর ক্রিয়াপদের বহুবার ব্যবহার শেষ পর্যন্ত পাঠককে প্রশ্ন করায় একি

আঙ্গিকেরই দুর্বলতার জন্যে ? এবং চকিতে সিদ্ধেশ্বর সেনকে মনে পড়ে।

মৃণাল বসু চৌধুরী, পরেশ মণ্ডল এবং সজল বন্দ্যোপাধ্যায় রত্নেশ্বর হাজরা ও পুষ্কর দাশগুপ্তর আঙ্গিকরীতি বিশ্বাসে বিশ্বাসী হলেও রত্নেশ্বর-পুষ্করের আঙ্গিক ভাবনায় যে সিদ্ধি এসেছে বা যে গভীরতা অনুভব করা যায়, তা এখনো এঁদের অনায়ত্ব। মৃণাল বসু চৌধুরী ও পরেশ মণ্ডলের কবিতায়ও ক্লান্তি যন্ত্রণা ও অবসাদগ্রস্ত মানুষের নির্জন অন্তরের অনুরণন। অন্তর্মুখীনতাই এঁদের কবি-স্বভাব—প্রাকৃতিক যদি বা কিছু থাকে সামাজিক প্রসঙ্গ এঁদের কবিতায় একেবারেই অনুপস্থিত। সজল বন্দ্যোপাধ্যায় যেন গভীর অন্ধকারের মধ্যে বসে নিজেকেও নিজের কাছে গোপন করে টুংটাং একতারায় টোকা দেন। তবে তাঁর তুলনায় পরেশ মণ্ডল ও মৃণাল বসু চৌধুরীকে অনেকটা বেশি সিরিয়াস বলে মনে হয়। পরেশ মণ্ডল যখন বলেন, 'পুনর্বার বৃষ্টি এলে / পুনর্বার অসুস্থ উত্তাপে / মুগ্ধ হতে পারি' তখন তাপতপ্ত পরিবেশের একটা ঐকান্তিক কামনাই ব্যক্ত হয়। আর মৃণাল বসু চৌধুরীর কবিতায় সেই বৃষ্টির শব্দ হয় 'দীপ্তিময় ছায়ার বিস্তারে / মন্ত্রমুগ্ধকৌতূহল সারি সারি। বৃষ্টির তরঙ্গ বেয়ে ঝমঝম ঝমঝম মন্দিরের ভেতরে বাইরে'। মৃণাল বসু চৌধুরীর কাব্য ভাবনায় গেড়ে বসেছে '...কিছুতেই কিছু নয় / খুঁজে খুঁজে এতকাল ভালমন্দ যা কিছু পেয়েছো / কোনোদিন ভোরবেলা তার সব সঠিক মেলে না'।

গণেশ বসু স্বাধীনতা পূর্ব সময়ের বাংলা কবিতার ভাব মণ্ডলকেই আবার ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, চিত্ত ঘোষ, রাম বসু, মণীন্দ্র রায়ের ভাবাকাশের ছায়ায় ঘুরে অবশেষে 'নিজের মুখোমুখি' দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা তুলে দেখেছেন 'রক্তের ভিতরে রৌদ্র'। অবশ্য চিত্ত ঘোষের কবিতার মধ্যে যে আন্তরিকতা, লিরিকাল আর্তি এবং অন্তরমুখী সমাজচেতনা নিবিড়ভাবে ব্যাপ্ত [শুদ্ধ সীমায় যেতে' উল্লেখ্য] তাকে আত্মসাৎ করা একজন তরুণ কবির পক্ষে সম্ভব নয়। 'বনানীকে কাব্যগুচ্ছ'র রোমান্টিক গণেশ বসু ক্রমশ নিষ্ঠুর বাস্তবে নেমে এসে মিছিলে ও সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েছেন ঠিকই, কিন্তু রোমান্টিক ভিত্তি তাঁর এখনো অটুট। গভীরতাকে তিনি অর্জন করে নিতে চাইছেন। প্রেমের কবিতাগুলোয় বস্তুতই তিনি আন্তরিক ; কবিতার রীতি এবং বক্তব্যের মধ্যে থেকে তিনি যে মোটামুটি আত্মসচেতন তা বুঝতে পারা যায়। সমাজ ঘনিষ্ঠতার ছাপ বহন করে তাঁর অনেক কবিতাই। 'অথচ তাকালে দেখি জলে নিষিদ্ধ পৃথিবী / রৌদ্রের পাহাড়ে প্রতিশ্রুতি, ঘুম ভাঙে আকাশের,

চারিদিকে / ঝাড় লণ্ঠনের স্বপ্ন, ঢেউয়ে / কাদের নিবিড় কণ্ঠ ঝলকে ওঠে, সোনালী আলোয় / বিষদাঁত ভাঙে চোরে, ফুল ফোটে লবণ রক্তের।' সূর্য আর রক্ত জীবনের দুই প্রতীককে তিনি একসঙ্গে অবিচ্ছেদ্য করে দেখেছেন। তাঁর বহু কবিতাতেই এর উল্লেখ আছে। কিছুতেই তিনি বিশ্বাস হারাতে পারেন না। বহু অত্যাচারের উপদ্রুত অঞ্চলে যুগ যৌবন যখন নৈরাজ্যে তলিয়ে চলেছে—স্থবির মরণের জন্যে একা নিজের মনের মধ্যে সেঁধিয়ে পড়েছে, গণেশ বসু তখন বলেন, 'এখনো সময় আছে ব্যাধিমুক্ত বিশুদ্ধ হবার / ফুল ফোটানোর স্বপ্নে এখনো বিভোর / হবার দু চোখ আছে।' তবে ভাষা বিন্যাস ও উপস্থাপনের দুর্বলতা সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। কষ্ট কল্পনাও আছে বহু স্থানে। কিন্তু সংগ্রামী সচেতন ভাবটি তাঁর নিখাদ 'ধানের স্বাদে / তপ্ত বুকের / বর্ণ তুলি / টুকরো দেশের পাঁজর থেকে।' বস্তুতই তিনি সাম্যবাদী রাজনীতিতে কমিটেড কবি। 'তাহলে এবার মুঠি তুলে ধরা যাক / পুরুষ ছিলায়,.../ অহল্যা অনড় স্মৃতি বিস্ফোরণ / সূর্যের দাপটে।' অনতিদূরেই কবির আপাত অন্বিষ্ট প্রতীক্ষিত। তবে গণেশ বসুর সবচেয়ে বড়ো ত্রুটি, তিনি কারণে অকারণে প্রচণ্ড চিৎকার করে কথা বলেন। কবিতাকে ঝাড়ে বংশে ধ্বংস করার পক্ষে এমন বিপজ্জনক অভ্যাস আর নেই। ফলে, মাঝে মাঝে তাঁর কবিতা অনাবশ্যক ভাবে স্থূল ও পরুষ হয়ে পড়ে।

গণেশ বসুর কবি চরিত্রের প্রায় সমান্তরালে শ্যামসুন্দর দে ও কমলেশ সেন। শ্যামসুন্দর দে কম লেখেন। মানুষ ও জীবন সম্পর্কে অসামান্য প্রত্যয় তাঁর। সাম্যবাদী ধারায় উল্লেখযোগ্য সংযোজনের সম্ভাবনা তাঁর কবিতায় আছে। তবে প্রকরণ ও শিল্পগুণের সিদ্ধি পেতে তাঁকে আরও দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে। কমলেশ সেনের সাম্প্রতিক 'সজ্জিত মানুষ' কাব্যগ্রন্থে মৌলিক কাব্যময়তার ঔজ্জ্বল্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

নীহার গুহ সাম্প্রতিক কালে তাঁর কবিতায় একটা ভিন্ন স্বাদের পরিচয় নিয়ে এসেছেন। কিছুটা আত্মকেন্দ্রিক এবং কিছুটা উদাসীন ভাবে এক অতি-নিজস্ব দার্শনিকতায় তিনি তাঁর কবিতার জগৎ তৈরী করে নিয়েছেন। তাঁর কবিতা একেবারে নতুন এক ধাতের, যন্ত্রণায় হিম অস্তিত্বের মগ্ন কণ্ঠস্বর—"তবু আমি এখানে থাকতে পারিনি / তিমি মাছের পিঠের ওপর বৃষ্টির সমুদ্রের / আমি চোখ বুজে আছি এবং গেছি যেখানে জাগ্রত / স্বপ্নের ঘোরে সর্বদাই সব কিছু আছে। কিন্তু / কি করে সেখানে সেই অন্তহীন সহ্যশক্তি হয়'।

বাসুদেব দেব, করুণাসিন্ধু দে ও তুলসী মুখোপাধ্যায়ের কবিতার মধ্যে যে গুণটি সবচেয়ে আকর্ষণীয় তা হচ্ছে এঁদের যুগ ও জীবন ঘনিষ্ঠ স্পষ্টোচ্চারণ। কবিতার বক্তব্যের দিক থেকে এঁরা খুবই জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করলেও প্রকাশের দিক থেকে কোনো বৈশিষ্ট স্থাপন করতে পারেন নি। বাসুদেব প্রত্যক্ষ উক্তির পক্ষপাতী, অত্যন্ত নিরলঙ্কার ভাবে বলবার কথাগুলো তিনি সরাসরি উপস্থিত করেন। 'কেঁপে ওঠে দূর গ্রামে ছায়াময় দীঘির নিরালা—আমি জানি ত্রিশূলের মত ঐ অন্তিম মিনার / অবিশ্বাসী নয়, তাই বাজি ধরি না, কারণ / তিনটে মিনার গেছে ইতিমধ্যে তিন লক্ষ পোষা কবুতর—/ তবু আমি ধৃতরাষ্ট্র আছি।' জীবন সম্পর্কে বাসুদেব দেব আশাবাদী এবং আস্থাশীল। করুণাসিন্ধু দে'র কলম হঠাৎ কেন যে স্তব্ধ হয়ে গেছে তা তিনিই জানেন। কিন্তু একদিন খুব অল্প লিখেই কবিতায় একটা বৈশিষ্ট আনতে পেরেছিলেন। মানুষের প্রতি গভীর মমত্ব এবং ঋজুতা তাঁকে প্রতিশ্রুতিবান করে তুলেছিলো। 'গভীর আশ্রয় ভেঙে পড়ে / মানুষ কি কেন্দ্রচ্যুত হবে না কখনো অকস্মাৎ সর্বসমন্বয় হারা ; না শুধু ঘোরাবে স্বীয় চাকা / প্রবৃত্তির পরস্পর দায়শূন্য বেঁচে থাকা।' তুলসী মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় নীরেন চক্রবর্তী যেমন ঢেউ দিয়েছেন তেমনি তরুণ সমসাময়িকরাও। এইসব মিলিয়ে জড়িয়েই তিনি একটা সমন্বিত নতুন গড়ে তুলেছেন ধীরে ধীরে। তবে সিরিয়াস কথাবার্তা বলতে গিয়ে তিনি তাঁর অনেক কবিতাকে ব্যর্থ করলেও যে সব কবিতায় একটা স্যাটায়ারিকাল স্বর আনতে চেষ্টা করেছেন সেখানে তাঁর কবিতা মোটামুটি চরিত্র পাচ্ছে বলেই মনে হয়। যেমন, 'তোমাকে তো চিনি, যাদুমনি, হাড়ে হাড়ে চিনি চাঁদে পুরো মজে আছ—তাই দেওয়াল সাজাবে বলে ট্রাম চুরি করো / চাঁদে পুরো মজে আছ—তাই / প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সুদে অভিলাষ খুব। তোমাকে তো চিনি চাঁদু—।' এরকম ঠাট্টা-বেদনাবহ ইয়ার্কির ছুরি তাঁর অনেক কবিতাতেই দেখতে পাওয়া যায়। বিশ্বাস ভঙ্গ ও মূল্যবোধহীনতা তাঁকে খুবই পীড়িত করে। 'তবুও যে প্রত্যহ নতুন উদ্যমে / হাটে হাটে তাঁবুর খুঁটোতে দড়ি বাঁধি, সে কেবল—/ কোনো কোনো মানুষের মুখ জলাশয় বলে—/ কোনো কোনো মানুষের মুখে নিটোল দীঘির মতো / জলাশয় পাওয়া যায় বলে।' কবির এ চেতনা অনেকেরই আদর্শ হতে পারে। কিন্তু তুলসী মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় সহযাত্রী কবিদের কারুর কারুর ভাষাভঙ্গির প্রভাব তাঁর স্বকীয়ত্বকে আহত করে। বোধের দিক থেকেও তাঁর ওপর ওপর ছুঁয়ে যাবার ঝোঁক তাঁকে বহু কবিতা রচনার পরও

কোনো উত্তরণ এনে দিতে পারে নি। তাছাড়া, সংলাপ ভরে দিয়ে তিনি অনেক কবিতাকে ক্ষুণ্ণ করে ফেলেছেন।

এখন দেখা যাচ্ছে এই যে, স্পষ্টতা যদি কবিতার গুণ হয় উপরোক্ত কবি পঞ্চকের প্রত্যেকের কবিতাতেই সেই গুণ বর্তমান। কিন্তু তবু বলতে হয়, যাঁরা জনগণের সাহিত্য রচনা করতে চান তাঁদের মধ্যে জনজীবনাভিজ্ঞতা না থাকলে অন্তত নাজিম হিকমত, সুভাষ মুখোপাধ্যায় কি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জাতের কবি হওয়া যায় না। সমাজমনস্ক এইসব কবিদের সৌভাগ্য, যে-জনগণকে নিয়ে এঁরা কবিতা লিখছেন, সেই জনগণের কেউ তা পড়তে পারে না, পড়লে কবিদের কিছু দুর্ভোগ দেখা দিত—এ কথা বলা বাহুল্য। এরপর চন্দন মজুমদারের নাম করতে পারা যায়। বস্তুতই তিনি কবি মানসের অধিকারী হয়েও বড় একটা সার্থকতা দেখাতে পারেন নি। লিখতে সুরু করে প্রায় নীরব হয়ে গেছেন। দু' একটা কবিতা কালেভদ্রে বেরোয়, তাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়।

শংকর দে, বেলাল চৌধুরী, তুষার রায়, সামসের আনোয়ারের কবিতায় নগর জীবনের যন্ত্রণা জটিলতা জটিলভাবেই উপস্থিত। শংকর দে যতখানি না সমর্থ তার বেশী চতুরতা দেখিয়েই তাঁর কবিতাকে ন্যূনতম কবিতা করে ফেলেছেন। কবিতা হয়ে পড়েছে কৃত্রিম। একটা সন্ধ্যাভাষা ব্যবহার করে শেষ পর্যন্ত কবিতার তাল রাখা শংকর দে'র পক্ষে সম্ভব হয় নি। 'তুমি প্রিয় আলিঙ্গন চেয়েছো বসুধা / কেন রক্তচক্ষুর দূষিত ভালবাসা—কেন জন্মআঁধাবের অন্ধতা জাগে না / আমি ছায়া অভিশপ্ত নৈরাজ্যে এসেছি মহাকাল / আমি ক্রুদ্ধ ক্রুশে পাই অভুক্ত আত্মার সর্বনাশ / আমি ঘৃণা করে তোমাকে ছুঁয়েছি তুমি নারী; তুমি ঘোর বিসম্বাদ / ধাতব মৃত্যুর মতো ছুটে আসে নীল রক্ত জ্বলন্ত প্রকৃতি / ঘুমের আচ্ছন্ন চোখ বিস্তীর্ণ থেকেছে ঘোলা জলে / আমি কার বজ্র ও অশনি / ভাঙা পথে, ঘুরেছি উদাস-তিক্ত শূন্যজ্ঞানে সমস্ত অক্ষরে।' শঙ্কর দে এখন সম্পূর্ণ নীরব। অন্যদিকে বেলাল চৌধুরী বিপুল অভিজ্ঞতা নিয়ে এলোপাথারি শব্দ প্রয়োগে অধাতস্থ পাণ্ডিত্যে বক্তব্যকে গুহ্য রেখে বেঘোরে নিজেকেই নিজে হাতড়ে মরছেন বলে বোধ হয়। তবে এরই মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে বলবেয়ারিং-এর মতো নাগরিক মানসের একটা এফেক্ট। 'ভুয়া রেশন কার্ডের আধিদৈবিক ভুতুড়ে শহর কোলকাতায় বেঁধেছি বাসা / কৃত্তিকা মঘা অশ্লেষার নির্ঘণ্ট যাত্রা ছিল বুঝি অশুভ / ধর্ম অধর্মের সংশয়ে / নীল নক্ষত্রপুঞ্জের রূপালী আগুনে রেখেছি হাত / আকাশ প্রদীপ উড়িয়েছি পিঙ্গল বিবর্ণ প্রান্তরে ভিখারীদের নিরানন্দ

বিষণ্ন উৎসবে / অহিংসা পরম ধর্ম কোন নির্দ্বিধায় কেটেছি তীক্ষ্ণ দাঁতে শুয়োর ও গরুর চর্বি মেশানো টোটা / চরথ ভিক্ষবে বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় অলোকিতেশ্বরের আরাধনায় / হৃৎপিণ্ড কুরেকুরে কেটেছে ইঁদুর'—সাম্প্রতিক সময়ের বেসামাল জীবনযাত্রার ছবিটি স্পষ্ট হয়েই ফুটে ওঠে তাঁর কবিতায় কিন্তু কোনো গভীরতার ছাপ পাওয়া যায় না। তুষার রায় খুবই ক্ষিপ্ত ভঙ্গীতে, রাগী শব্দে সমসময় ও জীবনের দ্যোতনা দিতে চেষ্টা করেন কবিতার মধ্যে। 'কেন কেন কেন এত বিষণ্নতা ভয় কেন কাকে / একবার দয়া করে বলুন আমাকে / আমি সামনে থাকব আমি বোম বাঁধতে জানি / আমি লাঠি গুলি ছুরি নিয়ে / বুকের ঢাল দিয়ে রুখতে পারব জানবেন প্রথম আঘাত' —একটা ক্ষয় হয়ে যাওয়া বুকের বোধ তুষার রায়ের মধ্যে কাজ করে এবং তা অপকট ভাষায় তিনি প্রকাশ করেন। কবিতাকে জীবন চর্যার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে একটা তাজা অভিব্যক্তি দেবার তাগিদও তাঁর মধ্যে অনুভব করা যায়। 'রাগ ক্ষোভ ও ব্যর্থতার ব্যথাগুলি এভাবেই মরে গেছে ঝরে গেছে কবে কোন ঝরা পাতা হয়ে / নতুন ফুলের দেশে সে কথা তোলার কোনো দাম নেই / তবুও অলক্ষ্য থেকে ক্রমাগত দূরের বয়স হেঁটে আসে।' ভেতরের প্যাথোজটা রিন্‌রিন্‌ করে পাঠকের মধ্যেও ছড়িয়ে যায়। বিদেশী শব্দকে বেপরোয়াভাবে প্রয়োগ করার কৌশল তিনি আয়ত্ত করেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও সমসাময়িক কবিদের কাছ থেকে। সার্কাস, ক্লাউন, ব্যাণ্ডমাষ্টার, ব্যালেরিনা, জাজবাদক, প্রবীণ নাবিক—এসব শ্রাব্য বিষয় ভীড় করে আসে তাঁর কাব্য পরিমণ্ডলে। খুব হঠকারী ভাবে গভীর বেদনার আঁত ছুঁয়েছেন তিনি—'এক উজ্জ্বল সকালে আজ দাড়ি কামাতে অন্য-মনস্ক— / রেডিওয় তখন কি জানি কার বেহালা বাজছিল / হাতের ক্ষুরকে কোনো সময় বেহালার ছড় ভাবলে / রক্তের কাঁপন লোনা স্বাদ তারপর খেয়াল নেই...।' সামসের আনোয়ারের কবিতা সৎ এবং আন্তরিকতার অভিব্যক্তি। এই শাহরিক সভ্যতায় মানুষের বিপন্নতাকেই তিনি ফোটাতে চেষ্টা করেছেন। প্রেমের ফাঁপাপনার দিকটাতেই তাঁর দৃষ্টি সন্নিবদ্ধ। সমাজ সময়ের ফাঁপা দিকটা উপলব্ধি করেছেন কিন্তু কখনো তাকে যথার্থ আত্মীকরণ করে উঠতে পারেন নি। 'আমি মাথা নিচু করে হেঁটে যাই / গুলি না খেয়েও আমার বুক এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গিয়েছে / ফেঁসে যাওয়া হৃৎপিণ্ড দুহাতে চেপে ধরে আমার / রোজ রাতে বাড়ী ফেরা / প্রতিধ্বনি মৃত্যুর মতন অতি গম্ভীর বেজে ওঠে ও দূরের ফুটপাতের দিকে চলে যায় / নিঃসঙ্গতার কাছে এ রকম ফিরে আসার নামই

যদি ইতিহাস তবে নিশ্চিত আমি ইতিহাস মানি / বীতশোক অশোক বা টায়ার সমুদ্র পাড়ে কোন প্রাসাদের খবর আমার জানা নেই / আমার বিছানার পাশে বনলতা সেন নয় কোন এক জলজ্যান্ত / পাপড়ি বসুর মণ্ডুকের মতো দুই স্তন ওঁৎ পেতে থাকে...'। প্রতিশ্রুতিবান সামসের আনোয়ার এখন স্তব্ধ।

শান্তি লাহিড়ী, মঞ্জুষ দাশগুপ্ত, মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত ও চিন্ময় গুহঠাকুরতার কবিতায় প্রেমই মুখ্যত মূলভাব হিসেবে কাজ করেছে। দেহ বর্ণনা খুব একটা বড় স্থান পায় নি এঁদের কবিতায়। একটা রোমান্টিক পরিচ্ছন্ন এবং শান্ত মেজাজের কবি এঁরা। শান্তি লাহিড়ীর কবিতায় যতটা কবিত্ব তার বেশী ভড়ং পাঠকের দৃষ্টিকটু লাগে। কবিতার বিচ্ছিন্ন দু'একটি চরণ ভালো লাগলেও গোটা একটা কবিতা শান্তি লাহিড়ীর কবিতা-পাঠক পান না বলেই মনে হয়। এবং অসুবিধে ঘটায় একধরনের গদ্যপদ্যর সংকর ভাষা যা তাঁর কবিতার মেজাজের পক্ষে একান্তই বেখাপ। 'সাদা অস্থিগুলি নড়ে, নির্বাপিত পিরামিডে চক্ষুষ্মান পাহাড়ের ঝাঁক / যত ধাক্কা দিয়ে ঠেলি, বুকের উপরে চলে আসে— / যত জানালা খুলে দিই, শবাধার থেকে কর্কশ আকাশ নেমে যায়, গৃহহীন / মানুষের আরব পারস্য থেকে সংজ্ঞাহীন তোমাকে আমাকে নিয়ে যায় / আবিষ্কৃত শবাধারে পাশাপাশি শুয়ে থাকি আরও দশলক্ষ সৌরমাস।' মঞ্জুষ দাশগুপ্তর রচনার মধ্যে একটা আন্তরিকতার স্পর্শ অনুভব করা যায়। বাক্যবন্ধের দিক থেকে তিনিও খুব দুর্বল। লিরিক রচনার ক্ষেত্রে তিনি কিছুটা সার্থকতা দেখাতে পারছেন। তবে প্রচলিত কাব্যবৃত্তের মধ্যেই তিনি এখনো আবদ্ধ। 'করেছি ভুল আমি করেছি বহুবার / তবুও ভালোবাসা তোমাকে দেখাবার / এখনো অভিলাষ—কারো কি তনুতেই / তোমার কোমলতা হয় নি একাকার।' একটা মিষ্টি স্বাদ খেলে তাঁর লিরিকগুলোতে। মলয়শঙ্কর দাশগুপ্তর একটা শৈল্পিক অন্তর্দৃষ্টি যেমন কবিতাকে সুন্দর করে এবং গভীর করে তোলে তেমনি সমাজ বাস্তবতা এবং অনুভবের তীক্ষ্ণতা কবিতাকেই সক্রিয় করে তোলে। ইঙ্গিতে এবং রঙে কবিতা তাঁর দূরব্যাপ্ত 'ঘরে, কিন্তু বাইরে নয় অথচ ভাবনা ছড়িয়ে পড়েছে দূরান্তে ; / অন্তরায় প্রবাসের দেওয়ালে বাধাহীন দৃষ্টিতে আজ ভাঙছে, ধ্বসে পড়ছে ; মুছে যাচ্ছে।' তবে তাঁর কবিতার কুণ্ঠিত প্রকাশ মাঝে মধ্যে গতিশীলতা নষ্ট করে বেশ। চিন্ময় গুহঠাকুরতার কবিতার গড়ন খুবই মজবুত। একটা প্রত্যক্ষ ভাষণ তাঁর কবিতায় দানা বেঁধে উঠতে না উঠতেই তিনি নির্ভুল ছন্দ মিল উপমা উৎপ্রেক্ষার ডাকে—বিষ্ণু দে-র কাব্যবৃত্ত থেকে নিজেকে ছুটিয়ে

নিয়ে জীবনানন্দকে আশ্রয় করেছেন। কিন্তু এখনও বিষ্ণু দে-র কবি মেজাজই তাঁর কবিতায় কখনও কখনও ধরা পড়ে। 'দূরের আলো কাঁপছে অনেক সম্ভাবনা নিয়ে / অন্ধকার শীতল এই জল / এই তো আছে চিরকালের জমানো সম্বল /কোনখানে আর যাবি পালিয়ে ?'

শিবেন চট্টোপাধ্যায়, শৈলেন বসু, ভাস্কর চক্রবর্তী—এঁদের কবিতায় পরিশীলিত মার্জিত শব্দ ব্যবহার এবং মিষ্টি আস্বাদ লক্ষণীয়। শিবেন চট্টোপাধ্যায় গভীর সমাজ বোধে উদ্দীপ্ত। কবিতার শুদ্ধতার দিকেই তাঁর লক্ষ্য এবং কবিতাকে প্রতিমা করে তুলতে অপরিসীম যত্ন নিয়ে নিটোল কবিতা পরিবেশন করছেন তিনি। সময়ের ডামাডোলকে স্বীকার করেও কবিতার মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রশ্রয় দেন নি। 'অন্তিম রাতের কণ্ঠে তাই জাগে মন্ত্রগূঢ় প্রার্থনার ভাষা / বিশালাক্ষী মন্দিরের আকাশ চূড়ায় / আলোকের প্রতিশ্রুতি / নিলীম নক্ষত্র ঝরা—মানুষের বোধ থেকে সুগভীর বোধির ভিতরে / অন্ধকার ইতিহাস—সুড়ঙ্গে—আঁধারে / দুরন্ত অশ্বের খুরে বেগবান সুপ্ত জনপদ।' শৈলেন বসু সাম্প্রতিক হৈ চৈ বাধানো শব্দগুলো সযত্নে পরিহার করে থাকেন। যদিও তারই মধ্যে তিনি কিছুটা বেপরোয়া—'সংসারের গম্ভীর পাথুরে জেঠামি, / প্রেমকে রাংতা বলা শূন্যবাদী চেতনার সমুদ্র—লবণতা, / দেরাজঢাকা কঠিন অন্ধকার ঐতিহ্যই বুঝি হরবোলা পাখি'। ভাস্কব চক্রবর্তী কবিতায় একটা নতুন মেজাজ আনবার চেষ্টা করছেন। যুগ ও পরিবেশের বেঢপ অস্থিরতার মধ্যে থেকেই খুঁজে নেন আপন কাব্য প্রত্যয়। ভালো লাগে না সুপর্ণা, আমি / মানুষের মতো না, আলো না স্বপ্ন না, পায়ের পাতা / আমার চওড়া হয়ে আসছে ক্রমশ, / ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনলেই বুক কাঁপে / তরিঘড়ি নিঃশ্বাস ফেলি, ঘড়ির কাঁটা আঙুল দিয়ে এগিয়ে দিই প্রতিদিন / আমার ভালো লাগেনা —শীতকাল / কবে আসবে সুপর্ণা আমি তিনমাস ঘুমিয়ে থাকব।'

রেবন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, মুকুল গুহ, মৃণাল দত্ত, দুর্গাদাস সরকার, কানন কুমার ভৌমিক, শান্তনু দাস প্রভৃতির কবিতার মধ্যে প্রচুর মাল মশলা থাকলেও এঁরা এখনো সঠিক কোনো নিজস্ব ভূমি আবিষ্কার করতে পারেন নি। রেবন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় ছন্দযতিমিল নয়, সুরে গাঁথা কবিতা রচনা করলেও যে প্রত্যয় থেকে কবিতা অবয়ব পায় তার প্রকাণ্ড অভাব দেখা যায় তাঁর মধ্যে। ফলে পাঠকের প্রত্যাশা অপূর্ণ থেকে যায়। শব্দে তাঁর দক্ষতা থাকলেও প্রয়োগ কৌশল অনায়ত্ত। অন্যদিকে মুকুল গুহ বক্তব্য প্রস্তুত করলেও শিথিল ছন্দ, অসতর্ক শব্দ

ব্যবহার ও আঙ্গিকগত ত্রুটির জন্যে যথেষ্ট লিখেও কোনো নিশ্চিত বৈশিষ্ট্য আনতে পারেন নি। তবে তাঁর 'সময় ও আলোকবর্তিকা বিষয়ক' কবিতাবলীতে কিছু একটা নতুন মেজাজ আনবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তার অনেকগুলোই সামান্য কবিতা। একটু সচেতন হলেই তাঁর কবিতা আশ্চর্যজনকভাবে সফল হতে পারতো। চিত্রকল্প এবং বোধের মিল ঘটাতে তিনি পারছেন না বলেই কবিতাগুলো ত্রুটিপূর্ণ থাকছে। মৃণাল দত্তর কবিতায় স্বকীয়ত্বের অভাব নেই, কিন্তু একই বৃত্তবন্দী -অবিরাম ঘুরে আসার ক্লান্তি অনুভব করেন তিনি। যেন পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে তলিয়ে চলেছে জীবন। 'পা থেকে শিয়র অব্দি উল্কি লেখা টানি / প্রথা মত / একই নির্দেশ ঘিরে যতিহীন ঘুরিফিরি ইতস্তত'—এটাই যেন নিয়তি। তবু তিনি বলেন, 'দৌড় দি অনুদ্দেশ গতি আমি যেদিকে ছুটিনা কেন, জানি / কোথাও নিশ্চিত ক্ষান্ত হবে দু-চরণ'। এবং দুর্গাদাস সরকার জানেন 'সামান্য সৈনিক মাত্র' তিনি। আর এও জানেন দেশহিতে প্রাণ দিলেও কেউ তাঁকে মনে রাখবে না। কিন্তু এটা স্পষ্টই বুঝেছেন, 'আজ নোতুন দায়িত্ব, বেশি ঝুঁকি'। কাননকুমার ভৌমিক আত্মমগ্ন অবস্থার মধ্যে থেকে কবিতার উন্মোচন আনতে সচেষ্ট। প্রচলিত রীতির বিরোধিতাও তাঁর মধ্যে দুর্লক্ষ্য নয়। শান্তনু দাস প্রচুর লিখেও কোনো বৈশিষ্ট্য দেখাতে পারেন নি। রীতির দিক থেকে এখনো তিনি পুরোনো পথই আঁকড়ে থাকছেন।

গৌরীশঙ্কর দে, পার্থ রাহা বিনোদ বেরা, বঙ্কিম মাহাত, নচিকেতা ভরদ্বাজ— এঁদের কবিতায় একটা পরিচ্ছন্ন মেজাজ লক্ষ্য করা যায়। গৌরীশঙ্কর দে তাঁর বাল্যস্মৃতি এবং জীবনানন্দ দাশের পরিবেশের মধ্যে ডুবে থাকছেন। বেদনা ও ক্লান্তি জমে জমে ভারী হয়ে গেছে তাঁর কবি মানসিকতা। পার্থ রাহার কবিতায় ধরা পড়েছে অবসন্ন রক্তিম আবেগ। আর বিনোদ বেরা ও বঙ্কিম মাহাত সহজ প্রাণোচ্ছ্বাসে যুগ ও পারিপার্শ্বিকের মর্মপীড়াটি উপলব্ধি করে সম্প্রকাশ করছেন। এবং বহু কবিতার ভীড়ে এঁদের স্বর ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। নচিকেতা ভরদ্বাজ মূলত রোমান্টিক কবি। তাঁর কবিতার শরীরে একটা স্নিগ্ধ লাবণ্য প্রতিভাসিত। অনুবাদ-কবিতা রচনায় তাঁর সহজ দক্ষতা চোখে পড়ার মতো।

অনন্ত দাশ, রঞ্জিত রায়চৌধুরী, রবীন সুর, রণজিৎ দেব ও তরুণ সেনের কবিতার মধ্যে একটা সামাজিক দায়িত্ববোধ কাজ করে। তবে বিষণ্নতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, বক্তব্যের অস্পষ্টতা প্রভৃতি সময়ের যোগ, প্রত্যেকের কবিতাতেই অল্পবিস্তর থাকতে বাধ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও এরই মধ্যে থেকে সম্পূর্ণ ভাবে

সময়ের হাত নিজেকে সঁপে না দিয়েই অনন্ত দাশ নিজের সুনির্দিষ্ট পরিমণ্ডলে থেকে আপন কবিস্বভাবানুযায়ী শান্ত ধীর অথচ সিদ্ধবোধ দিয়ে উচ্চারণ করেন, 'এখন ঘরের মধ্যে মানুষ প্রেতাত্মা হয়ে কাঁদে / প্রলুব্ধ সঙ্গীরা ভাসে বিপরীত স্রোতের অতলে / প্রান্তরে দাঁড়ালে আজ মিলিয়ন মানুষের মুখ।' তাঁর আছে বন্দরের—নতুন বন্দরের আকাঙ্খা। রঞ্জিত রায়চৌধুরী সেই একখানা চটি বই বের করেই নীরব। অথচ সেই বইতেই সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে নিজ কবিতার শরীর থেকে ঝেড়ে ফেলার মতো তাঁর মানসিকতা গড়ে উঠেছিলো। তাঁর 'অরুণাংশু / তবু তো হাওয়ায় ছিল / রুগ্ন দিনের কাছে / লতানো সমর্থ নিয়ে / আশ্বাসের এক মাচা পুঁই।' আশ্বাস যে এখনো আছে, তা তাঁর ইতস্তত দু একটি কবিতায় ধরা পড়ে। রবীন সুর বেশ দৃপ্ত স্বরেই বলেন 'সকলেই পলাতক প্রথাসিদ্ধ আংকিক নিয়মে / অনিকেত অন্ধকারে একা তুমি বিধ্বংসী কর্দমে'। তরুণ সেন বহুদিন কবিতার জগত থেকে দূরে থেকে আবার নিয়তির টানে ফিরে এসেছেন। কেননা জটিল সমস্যা সহজ অথচ মেলে না। তিনি দেখলেন, যা 'এক, দুই, তিন বা আরো অনেক সংখ্যার হিসেবে কিছুতেই মেলানো যাচ্ছে না' তা মেলানোর ব্যর্থ পরিশ্রমে 'রক্তে আমেজ এলো / বিষটুকু রেখে আমরা সবাই হলাম নির্বিকার নীলকণ্ঠ।' দীর্ঘদিন বাদেও কিন্তু সমস্যা সমাধান-সম্ভব বুঝেছেন তিনি : 'পাখী সব করে রব ত্রাহি ডাক অঙ্কের খাঁচায় / মেলানো সহজ অঙ্ক দ্বিঘাতের প্লাস বা মাইনাসে।'

পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল, অমিতাভ গুপ্ত, অরুণেশ ঘোষ, গৌতম মুখোপাধ্যায় অরুণ বসু, ও অরণি বসু কবিতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। যদিও এখনই এঁদের সম্পর্কে কোনো বিশেষ বক্তব্যই উপস্থিত করা যাচ্ছে না, তবু কিছু কবিতায় এঁরা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছেন। এঁদের মধ্যে পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল নিঃসন্দেহে শক্তি প্রচেষ্টায় অগ্রণী। তাঁর কাম্য ধ্বনি—না, ধ্বনি নয় সিঁড়ি, 'আরো কোনো বৃহত্তম সিঁড়ি, আর কোনো শুদ্ধতম আলো, মোমবাতি / যিশু কিম্বা শয়তান / আমাকে যা হোক কেউ দাও / আমি বহুক্ষণ অন্ধকারে বসে আছি।' অমিতাভ গুপ্ত অত্যন্ত সিরিয়াস। ছন্দ এবং প্রকরণের দিক থেকে তিনি ক্লাসিক রীতির ভক্ত। বক্তব্যের বৈশিষ্ট্যের জন্যে অল্প কয়েকটি কবিতা লিখেও তিনি চিহ্নিত। তাঁর কাছে আমাদের দাবী অনেক। অরুণ বসু ও অরুণেশ ঘোষ ভাব প্রকাশে তুমুল আলোড়নকারী এবং মৌলিক আবেগ তাড়িত। 'পোষাক ছেড়ে ধীর পায়ে নেমে যাবো জলে / আমি খড়্গ তুলে নেব / আমি দুঃখ তুলে নেব বুকে' বলেন অরুণেশ। গৌতম কমিটমেণ্ট বিশ্বাসী। অরণির লেখা খুলছে।

সুদর্শন সাহা, স্বদেশরঞ্জন দত্ত, সুনীথ মজুমদার, রথীন্দ্র মজুমদার, সামসুল হক, অতীন্দ্রিয় পাঠক বহু নামের ভিড়েও নজর এড়িয়ে যান না। সুদর্শন সাহা বলেন, 'গাড়ি বারান্দার অন্ধকারে শায়িত অনভিজ্ঞাত দুঃখরাশি / মুহূর্তে পরিবর্তনশীল বিশ্বাসের আনুগত্যে অতিদ্রুত মুছে ফেলব / আমি ভোরবেলাকার মত শীর্ণ দুই হাতে মুদ্রা করে করুণা ছড়াব ' স্বদেশরঞ্জন দত্তর সব দেখে শুনে অনুভূতিহীন জড় হয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই উপায় থাকে নি, 'এখন যা কিছু সব বুকের মধ্যেই চাপা থাকে / সবই বুক দিয়ে বুক ঢাকে / এখন সকল ঝড় শব্দহীন, নীরব তোলপাড় / দগ্ধ করে স্মৃতির পাহাড়'। একটা অস্বাভাবিক চাপা উত্তেজনাময় গুমোটে ভরে উঠেছে তাঁর কবি সত্তা। ঠিক একই রকম একটা চাপা অভিমান আর হতাশায় নিজেকে ধ্বংস করার সাধ জেগেছে সুনীথ মজুমদারের মধ্যে, 'যতদিন আছি, / ভেঙে যেতে পারি, নিঃস্ব হয়ে রিক্ত হয়ে / নিজেরই শেষ তর্পণ করে, / ভেঙে যেতে পারি'। সামসুল হকের কবিতা জটিল—ও জটিলতা তাঁর স্বভাবজ। সব কিছুর সঙ্গে এখন তাঁর 'সন্ধিহীন' সম্পর্ক। প্রেম নেই, পেলে মন্দ হয় না এমন একটা ভঙ্গি আছে তাঁর মধ্যে। এবং তাঁর শেষ কথা : 'আকাশ দেখার, বৃক্ষ দেখার রীতি / নিজস্ব হয় ; আয়ু / নিজস্ব হয়, আমি / স্পষ্ট উচ্চারণে ব্যক্তিগামী।' অতীন্দ্রিয় পাঠকের কবিতা তাঁর গদ্যের মতো অ্যাবসট্রাক্ট বা অ্যাবসার্ড নয়—অর্থ পাওয়া যায়, বস্তুও।

কালীকৃষ্ণ গুহ, অঞ্জন কর, প্রভাত চৌধুরী, কবিরুল ইসলাম, বুদ্ধদেব দাশ-গুপ্ত, প্রলয় শূর, যোগব্রত চক্রবর্তী, অশোক দত্তচৌধুরী, শুভাশিষ গোস্বামী সুব্রত চক্রবর্তীর কবিতার স্বতন্ত্র দিক নির্ণয় সম্ভব নয়। অনেকে ক্বচিৎ কখনো দু' একটা ঝাঁঝালো কবিতা লিখে ফেলেন, আবার কখনো লিরিকে মশগুল হয়ে পড়েন। অভিব্যক্তিতে অনেকের গোষ্ঠিগত চিন্তা কাজ করে। কালীকৃষ্ণ গুহ প্রাথমিক স্তরে পূর্বসূরী কবি আলোক সরকারের ভাবনায় ভাবিত থেকে বর্তমানে তাঁর নিজের কণ্ঠস্বর আবিষ্কার করতে পেরেছেন। তাঁর কবিতায় এক ধরনের শুচিশুভ্র সংযম কাজ করে। মাটির ও বাড়ির প্রতি তাঁর চূড়ান্ত বিতৃষ্ণা —আত্মহননঈপ্সা : 'রক্তের ভেতরের বাড়িঘর ভেঙে দিতে হবে / সিঁড়িগুলো ভেঙে দিতে হবে।' এবং তাঁর ইচ্ছা 'চিৎকার করে বলি—আমি এই পৃথিবীর / কেউ নই, আমি এই বাড়িঘর চুরমার করে / একদিন ফিরে চলে যাবো'। অঞ্জন কর প্রচণ্ড স্মার্ট এবং পদবিন্যাসে কিছুটা স্বৈরাচারী। সক্ষমভাবে ফর্ম ভাঙার দিকে তাঁর প্রবণতা দেখা যায়। তাঁর কবিতার সর্বত্র একটি দুর্লভ পৌরুষ ছড়িয়ে

আছে। 'আমাদের মিহিজাম গচ্ছিত শরীর কেঁপে ওঠে—/ পর্দার আড়ালে নৃত্যোৎসব, তোলপাড়—/ জ্যোৎস্নায় ছিটোনো শব ভেসে যায়'। অঞ্জনের এই স্বৈরাচার সমকালীন কবি প্রভাত চৌধুরীর কবিতা আঙ্গিকের একটি প্রধান আলম্বন। বিক্ষোভে ফেটে ছত্রখান হয়ে যাওয়া তাঁর মানসিকতার পরিচায়ক। 'বিস্ফোরণে জ্বলন্ত নগরে তুমি রজনী / তুমি হৃৎপিণ্ডে তাজা রক্তস্রোত ভাসমান লোহিত কণিকা'। কবিরুল ইসলাম মূলত নিসর্গের কবি—এখনো জীবনানন্দের বাংলাকে প্রত্যক্ষ করে উদ্দীপ্ত হতে চান। বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর কবিতায় খুব হালকাভাবে হলেও অ্যাপোলীনেয়ারের মেজাজ আছে। সংসারের খুঁটিনাটিকে কবিতা করে তোলায় তিনি সিদ্ধ। 'পাঠ সংকলন থেকে তুমি আমাকেই বাদ দাও/ ঘোড়ার জিনের পাশে মানুষেব মুঠি কাৎ করা / চিরদিন এই এক বৈপ্লবিক দৃশ্য / শানায় সাবান, বঁটি, নিস্তব্ধ কপির ঝোল'। আর সুব্রত চক্রবর্তী 'বিবিজান' নিয়ে মশগুল। প্রলয় শূরের মধ্যে একটা হতাশার বোধ কাজ করে গভীর ভাবে, কিছু অতীতচারণাও। এবং তা সুন্দর কবিতা হয়ে ওঠে। 'পুরোনো দিনের উঠোন নেই, / অথচ এতদিন ছিলো ঘরের সামনে উঠোন / এবং উঠোন অর্থাৎ আমার বুকে লুকোনো একটা / ফুলঝুরির আলোর মতো গন্ধ-রাজের গাছ।' শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অসার্থক অনুস্মৃতি যোগব্রত চক্রবর্তীর কবিতায় দেখা যায়। কিন্তু অশোক দত্তচৌধুরী ও শুভাশিষ গোস্বামী রচনার ক্ষেত্রে সৎ ও আন্তরিক। নগর সভ্যতার বিপন্নতা অশোকের বোধে নিহিত বিষাদের গাম্ভীর্যে লীন। ছড়া রচনায় শুভাশিষ গোস্বামীর দক্ষতা লক্ষণীয়।

এ সময়ে অনিবার্য ভাবে উল্লেখ করতে হয় দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ও অরুণাভ দাশগুপ্তর নাম। কবিতায় দেবাশিস অনন্যসদৃশতা আনতে চান এবং সেই সঙ্গেই আছে তার একটা লিরিক মূর্ছনা। জীবনবোধের দিক থেকে তিনি গভীরে পৌঁছুতে চান। কিন্তু রচনা ভঙ্গিতে একটা স্মার্টনেস আসে অবধারিত ভাবে। যেমন, 'আমি যখন ভীষণভাবে চিঠির আশায় থাকি / নির্মম রসিকতা করে ডাকপিওন / আসে মেডিকেল লিটারেচার, ওষুধের বিজ্ঞাপন...অথচ চিঠি আসে না।' আর অরুণাভ দাশগুপ্তর কবিতায় চোখে পড়ে আর্তির গভীরতা। যেমন, 'হাসি শেষে এলো চৈত্রে / তারপর আমার বাগানে / ফোটে না কিছুই / কাকে যে মানানসই / এমন প্রাঙ্গণে নিয়ে আসে, জানালা ঠেকেছে বাষ্পে / সে আজ কোথায় ক্রীতদাসী।'

দূর ও নিকট অগ্রজা রাজলক্ষ্মী দেবী ও কবিতা সিংহর সমর্থ রচনা-পথ ধরে

অধুনা কেতকী কুশারী ডাইসন, নবনীতা সেন, বিজয়া (দাশগুপ্ত) মুখোপাধ্যায়, মঞ্জু মিত্র. কুমকুম দে, কাজল ঘোষ, জয়ন্তী সেন, মণিদীপা বিশ্বাস, দেবারতি মিত্র ও সাধনা মুখোপাধ্যায় নিজেদের আধুনিক বোধ থেকে কামনা বাসনা শারীরিক চাহিদার কথা কাম প্রেম ভালোবাসা ও নিষ্কাম উদাসীন প্রেমের আর্তি দ্বিধাহীন ভাবে ব্যক্ত করছেন। কখনো কখনো চকিত চমক এবং মিষ্টি আমেজও এঁদের কবিতায় দেখা যায়। কেতকী কুশারী ডাইসনের জিজ্ঞাসা 'মর্মর ওঠে বর্ত্তমানের, / কঠিন প্রাণের, কীর্ণ ভ্রাণের। / বীজে অঙ্কুরে কীটে পতঙ্গে উচ্ছ্বাস, অপচয় / কাদের জন্য কবিতা লিখবো ?' নবনীতা সেনের দীর্ঘশ্বাস 'চিত্ত মাংস পোড়ে না তেমন / আগের মতো যন্ত্রণায় প্রলাপী বাতাস / আছড়িয়ে মরে না এসে কলকাতার আর তো অলিতে গলিতে।' বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে পাওয়া গেছে সাংঘাতিক প্রার্থনা ঃ ঈশ্বর, আমাকে অগ্নি দাও / আমি ক্রন্দন হন্তারক পুত্র চাই, / কিন্তু ঈশ্বর হাসলেন, / তারপর তাঁর চোখ থেকে বিশাল অশ্রু ঝরে পড়লো।' আর 'মিস্তিরি নেই / একটা এমন চালু মেশিন সারিয়ে নেবার / সস্তা দামে' জেনেই বুঝি দ্বিতীয় কবিতা সিংহ মঞ্জু মিত্র আজ স্তব্ধ। দেবারতি মিত্র নিশ্চিত ভাবেই মহিলা কবিদের মধ্যে প্রতিশ্রুতিসম্পন্না এবং প্রকৃত কবি 'আমার স্পন্দিত চোখে শিহরিত চুলে / সমস্ত শরীর ঘিরে, বুকের গভীরে— / তারার অকূল, স্তব্ধ, অসার বিস্মৃতি, / কবোষ্ণ মোমের ঘন স্তর, / দু-তীরে জ্বলন্ত গাছ বিদ্যুৎ মন্দ্রিত ; / অটল জাহাজে জুড়ে জলের ভিতর / এত ভারী তাও আমি / জলজ গাছের মত সহজ নিথর।' জয়ন্তী সেন, কুমকুম দে, কাজল ঘোষ ও মণিদীপা বিশ্বাস মিষ্টি লিরিক কবিতা রচনার প্রয়াসী।

উত্তর বাংলা এবং আসামের দূরাঞ্চলে বহু বাধাবিঘ্নের মধ্যে কবিতা চর্চা করে যাঁরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়, শক্তিপদ ব্রহ্মচারী, রুচিরা শ্যাম, শান্তনু ঘোষ বা রণজিৎ দাশ ইতিমধ্যেই উল্লেখের দাবী রাখেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিবান শক্তিপদ ব্রহ্মচারী—ছন্দ এবং শব্দ ব্যবহারে তাঁর অনায়াস দক্ষতা। এই প্রসঙ্গে মেদিনীপুরের দূরাঞ্চল থেকে অমিতাভ দাশ ও বিপ্লব মাজির কবিতা ও তার কিছু কিছু সার্থক ফলশ্রুতি চোখ এড়িয়ে যায় না।

১৯৭০এ দাঁড়িয়ে কয়েকটি নাম স্ফুটনোন্মুখ—পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাজী গুপ্ত, মদন মোহন বিশ্বাস, নিশীথ ভড়, তপনলাল ধর, সনৎ দাশগুপ্ত, জয়ন্ত সাহা, রথীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পরেশ বন্দ্যোপাধ্যয়, সমীর দাশগুপ্ত, শুভ বসু, দীপেন রায়, শিশির সামন্ত, শোভন মিত্র, দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দেবীপদ মুখোপাধ্যায়, তুষার

চৌধুরী, সুকোমল রায় চৌধুরী, ফিরোজ চৌধুরী, মনীষীমোহন রায় প্রমুখ। অবশ্য এঁদের কবিতায় আত্মপ্রকাশের ব্যাকুলতা এখনো প্রাথমিক পর্যায় কাটাতে পারে নি।

৺অনাময় দত্ত ও ৺মঞ্জুলিকা দাশের যে কটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে তাতে প্রকৃত কবিত্বের এবং যুগ বোধের স্বাক্ষর ছিলো। কিন্তু মৃত্যু তাঁদের আর কবিতা লিখতে দেয় নি। যুগের রোগ নিজের শরীরে ধরে অনামায় বলেছেন, 'আমার বুকের মধ্যে হৃদয় নেই এখন / মাংস অথবা অস্থিও নেই / আমার পিঠের ফুটোয় চোখ লাগিয়ে মাটির পুতুলের মতন / বুকের ভেতর সব দেখা যায়।' একথা হলপ করে বলা যায় যে, মৃত অনাময় এবং অধুনা-স্তব্ধ তাঁর অগ্রজ তন্ময় দত্ত আজও লিখতে থাকলে বাংলা কাব্য সাহিত্য সত্যিকারের কিছু পেতে পারতো। আর, মঞ্জুলিকা দাশের ছিল কামনা, 'জাহাজ ডুবির আগে আমাকে বাঁচিও তুমি মগ্ন এলাকায়, / মানুষের নাম দিয়ে যাব মৃত্যুপূর্ব শেষ প্রার্থনায়।'

অধুনাগত-সদ্যাগত এক জোয়ার কবির প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হয়েছে বলে এ মনে করার কারণ নেই যে এঁরা সবাই-ই নিজেদের কবিতায় চরিত্র আনতে পেরেছেন। মোটামুটিভাবে প্রায় সকলেই শক্তি সুনীল উৎপল অমিতাভ তারাপদ বিনয়ের দ্বারা প্রভাবিত, তাঁদের অর্জিত উপাদান ব্যবহার করেছেন ব্যাপকভাবে। সেতুবন্ধনে ক্ষুদ্র ক্ষমতার দানও স্বীকার করতেই এখানে এঁদের উপস্থাপন। আর এও ঠিক যে, শক্তি-সুনীল-বিনয় থেকে মায় সুরজিৎ দাশগুপ্ত, ফণিভূষণ আচার্য অব্দি কবিরা কল্লোল-কবিতা-ময়ূখ-পরিচয় যুগের কবিদের বহু ব্যবহৃত শব্দ, চিত্র-কল্প, ছন্দ, পেলবতা, প্রতীক আর যন্ত্রণাচ্ছন্নতার ধরন ষোলোআনা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। তবে বাংলা কবিতার উল্লেখযোগ্য অনেক কিছুই স্বাধীনতা পরবর্তী কালের তরুণ অতি-তরুণ কবিরা তৈরী করেছেন। অনেক সংযোজন এঁরা করেছেন —নতুন কাব্য ভূমিও প্রস্তুত করেছেন, নতুন কবিতায় দিয়েছেন বিশিষ্টতা এবং পুরুষ চরিত্র—তবু সব নিয়ে বাংলা কবিতার জগতে এঁদের ক্ষমতার স্বাক্ষর পড়লেও তা শেষ পর্যন্ত থোড় বড়ি খাড়া খাড়া বড়ি থোড়ই হয়ে পড়েছে এবং এটা দুঃখজনক। আরও দুঃখজনক একারণে যে নিকট অগ্রজরা এই সময়েই এক অবাস্তব 'স্বাধীন সাহিত্য সমাজ'এর ধুয়ো তুলে পরোক্ষে এঁদের সমাজনিষ্ঠ সত্য-সাহিত্য করারই পথ করে দিয়েছিলেন—এঁরা সে সুযোগও নেন নি।

এই পর্বে আরেক দল তরুণ কবি আর এক তুলকালামী ব্যাপারে নেমেছেন। এঁদের উন্মার্গগামীতা কারুর কাছে বিরক্তির হলেও কবিতা সৃষ্টিতে সততা এবং যুগ উন্মোচনের দক্ষতায় নিঃসন্দেহে এঁরা প্রমাণ করেছেন যে, শক্তি সুনীল

বিনয়েরা যে ভূমি তৈরী করার চেষ্টা করেছিলেন, এঁরা তাকে সার্থক করেছেন। এসব কবিরা নিজেদের হাংরি কবি বলে দাবী করেন। এঁরা কবিতার একটা সম্পূর্ণ নতুন অবয়ব দিতে পেরেছেন। বস্তুতঃ গত সাত-আট বছর বাংলাসাহিত্যের নন্দন-শিল্পাঞ্চলে যে সব রচনা নিয়ে ভয়ঙ্কর বিতর্ক ঝড়, ওলটপালট ও পুলিশী নির্যাতন হয়ে গেল, তারই মধ্যে আছে এদের ক্ষমতার নিঃসন্দেহ প্রকাশ এবং তা আছে বলেই পাঠকের প্রতিক্রিয়া হয়েছে প্রচণ্ড। কৃত্তিবাস বা তৎসময়ের কবি-গোষ্ঠী যা পারেন নি, অর্থাৎ সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সমর সেন, জীবনানন্দ ও সুধীন দত্তর প্রভাবমুক্ত কবিতা সৃষ্টির যে কাজ তাঁরা হাতে নিয়েও ব্যর্থ হলেন, সেটা এঁরা পেরেছেন। এঁদের হাতে বাংলা কবিতা সম্পূর্ণ অন্য দিকে মোড় নিয়েছে। প্রচলিত কাব্য ধারণার মূলে এঁরা কুঠারাঘাত করেছেন। এঁদের কবিতা পড়লে মনে হয় প্রত্যেকের জীবন যেন কবিতার সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে পড়েছে। কবিতা এঁরা বানান নি। এর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে এক একজনের গোপন জীবন, ধর্ম অধর্ম, পাপ পুণ্য, ক্রোধ লালসা এবং তাই হয়েছে এঁদের কবিতা—উলঙ্গ জীবনেরই দিব্য প্রতিকৃতি।

হাংরি আন্দোলনই নিঃসন্দেহে বাংলাসাহিত্যে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন যা এই সব কবি লেখকদের জীবন থেকেই উৎপন্ন, কোনো উত্তরাধিকার থেকে নয়। এঁদের কবিতা তথাকথিত অশ্লীল সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আমার মনে হয়েছে ভাব ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে এঁদের ক্ষমাহীন আক্রমণ এটা। আজ প্রায় সকলেই যখন পার্থিব সুখের লালসায় এস্টাব্লিশমেণ্টের ক্রীতদাস, ভণ্ডের মুখোশ পরে ড্রয়িংরুমের কবি-লেখক, তখন এঁরাই জীবন ও রক্তের মূল্যে চৈতন্যের স্বাধীনতা ঘোষণা করে যাচ্ছেন। তবে এখানেও একটা প্রশ্ন, সবাই কি নোকর সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত? কোনো আহাম্মকেও সে কথা বলে না। বাইবেল থেকেই শয়তান মুখোশ পরে শুদ্ধতার শত্রু। মানুষ অভিশপ্ত। কিন্তু মর্তে নিক্ষিপ্ত মানুষ কবচ কুণ্ডলের মতোই পেয়েছে সংগ্রামী চেতনা। ক্রুশে উঠেও মানুষ বলেছে ভালোবাসা সব চেয়ে ভালো—ভালোবাসার জন্যে সে সংগ্রাম করছে আবহমান কাল। স্বাধীনতা এবং সুস্থ জীবন পরিবেশ না থাকলে ভালোবাসা সম্ভব নয়। না নারীকে না শিল্পকে—কোনো কিছুকেই ভালোবাসা যায় না। ভালোবাসাটা তো একটা রচনা—সে সৃষ্টি। পুরনো মূল্যবোধ ধ্বংস করে নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টির দায় যেমন অন্য আর পাঁচজনের তেমনি শিল্পীরও। এককে ধ্বংস করে অজস্রের ফলন সম্ভব করাই মানুষের সমগ্র কাজের মৌল তাগিদ। নোকর সম্প্রদায়ের

মতো হাংরিরাও নেতিটাকেই দেখেছেন ইতিটাকে দেখতে অনিচ্ছুক। ফলে সমস্ত সততা নিয়েও তাঁরা পরোক্ষে প্রতিক্রিয়াকেই—বুর্জোয়া এস্টাব্লিমেন্টকেই—সহায়তা করছেন। বুর্জোয়া ব্যবস্থার প্রতি—অন্যায়ের প্রতি—তাঁদের আক্রমণ যতই হোক, কম্যুনিষ্টদেরই বুর্জোয়া এস্টাব্লিশমেন্ট ভয় পায়, হাংরিদের নয়। এস্টাব্লিশমেন্ট এঁদের গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না শুধু প্রগতিশীল সংগ্রামকে ঘায়েল করার জন্যে মাঝে মধ্যে এঁদের জন্যে চড়া চেঁচানি হাঁকে। হাংরিদের পরিপ্রেক্ষিতে এস্টাব্লিশমেন্ট তুখোর যৌন ইতবামিব লেখাপত্র বাজারে ছাপিয়ে দেখাতে চেষ্টা করেছে, হাংরিরা কিছুই না। কিন্তু রটাতে পারে নি ফল আর জমির লড়াইয়ে জয়ী মানুষের সুখী সুন্দর স্বাধীন আত্মপ্রকাশেব বলিষ্ঠ সাহিত্য।

নিঃসন্দেহে হাংবিরা শক্তিশালী, কিন্তু ভ্রান্ত। নিঃসন্দেহে তাঁদের সংগ্রাম সততাপূর্ণ এবং নৈরাজ্যবাদী হাংরিদেব আক্রমণ অপ্রতিরোধ্য. কিন্তু আত্মঘাতী। অতএব একটা সম্ভাবনাপূর্ণ সাহিত্য আন্দোলন কয়েকটি শক্তিশালী হাত থেকে অক্ষমের হাতে চলে গিয়ে আগামী দিনে বিভ্রান্তি আনতে বাধ্য। গভীরতাহীন অক্ষম অনুকরণে অবশেষে শক্তিশালী সাহিত্য রচনাব এই আন্দোলন নিষ্ফল হয়ে গেলে বাসুদেব, শৈলেশ্বর, সুভাষ, সুবো, প্রদীপরা আগামী পাঠকের আদালতে অশ্লীলতার জন্যে নয় সামগ্রিক মানুষের শক্তিসামর্থ ও আকাঙ্খার প্রতি উদাসীনতার জন্যে অভিযুক্ত হবেন। হাংরি লেখকদের গল্প আলোচনায় দেখেছি কত গভীর মমত্ব ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিয়ে তাঁরা পবিত্রতার আকাঙ্খা এবং স্বাধীনতার বাসনা ব্যক্ত করেছেন এবং বুর্জোয়া সমাজ ও তার কৃত্রিমতাকে নির্মম ও ক্ষমাহীন আক্রমণে বিধ্বস্ত করতে চেয়েছেন। এখানে ঐ সম্প্রদায়ের কবিদের শিল্প ও জীবনের ক্ষুণ্ণ সম্পর্কিত আন্দোলনের ফলশ্রুতি তুলে ধরা যাচ্ছে।

এঁদের কবিতা পড়লে প্রথমেই যেটা মনে আসে তা হচ্ছে, এঁরা জীবনের সমগ্র ভালোবাসা ও সততা দিয়ে মানুষের পৃথিবীকে দানবীয় শক্তিতে শেষ বারের মতো আলিঙ্গন করতে প্রস্তুত। অথচ, ভালোবাসাহীন যান্ত্রিক সভ্যতার খপ্পরে পড়ে গিয়ে দেখে যাচ্ছেন পৃথিবীর রক্তহীন বিবর্ণ কঠিন কঙ্কাল, মুখ বেঁকে যাচ্ছে তার ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে। তাই এঁদের ক্রুদ্ধ চিৎকার, ক্ষোভ, কান্নাকাটি দীর্ঘশ্বাস ও ইয়ার্কি। সভ্যতার দূষিত রক্ত একবার শরীরে প্রবেশ করলে আমূল অস্তিত্ব পুড়িয়ে ছাড়বে এই ভয়ে তাঁরা দিশাহারা। একে মেনে নিতে তাই দৃপ্ত অস্বীকার আর কামনা মানুষের ভালোবাসাময় পবিত্র জীবন। চূড়ান্ত স্বাধীনতার জন্যে বারবার আক্রমণ চালিয়ে যাবার সংকল্পই প্রকাশিত হয়েছে এঁদের কবিতায়।

বহুক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়েছে একটা সংগ্রামী চেতনা। কোনো রকম ভালো নেই বলেই হয়তো এঁদের কবিতা তথাকথিত অশ্লীল, কিন্তু আমার কাছে তা উত্তেজক হুঙ্কার আনে নি, মনে হয়েছে ভান ও ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে এঁদের ক্ষমাহীন আক্রমণ, যেমন মনে হয়েছে সুনীল-শক্তি-বিনয়ের একই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলি।

এই ক্ষুধার্ত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রদীপ চৌধুরী, শৈলেশ্বর ঘোষ, মলয় রায় চৌধুরী ও সুবো আচার্যের নাম উল্লেখযোগ্য। অন্ধকার নৈঃশব্দের মধ্যে আত্মার গম্ভীর ঘোষণার মতো শৈলেশ্বর ঘোষের কবিতা। ভরাট এবং গম্ভীর কণ্ঠস্বরে তিনি জীবনের তিক্ত ভয়াবহ সত্যগুলোকে উন্মোচন করেন। তিনি দেখেছেন সভ্যতার জলিবোট আজ ফাঁকা 'আর রাজনীতি মানেই তো / মূল্য বৃদ্ধি যার ফলে বাজার থেকে দুধ উধাও হয়ে যায় আর / মূর্খদের সুখ বেড়ে যায়। জীবনের অন্তস্থল পর্যন্ত কবি হাতড়ে বেড়িয়েছেন, কোথাও কিছু নেই, সব ফাঁকা, দগদগে ঘায়ের মতো লাল—সেখানে পাপপুণ্য বলে কিছু নেই। তাই 'তিন বিধবা'র 'গর্ভ করে' কবি অনায়াসে 'শূন্যে বিছানায়' শুয়ে থাকতে পারেন। নীতি চরিত্র গৃহস্থের বাড়ী ঐ মেয়েছেলে যারা 'আইবুড়ো ঘুম জেগে সারারাত খিল তুলে দেয় / পুরাণ গীতা পড়ে কুলধর্ম রক্ষা শেখে, ঘোড়া তুমি / রেশম গুটিপোকায় প্রেম দিলে হৃদয় কোথায়'। বস্তুতই মানুষের হৃদয় নেই এবং হৃদয়হীন এই সভ্যতার পীড়ন মানুষের ভালোবাসা বোধ পর্যন্ত নষ্ট করে দিয়েছে। শুধু আছে মানুষের মত লোভ আর পাওয়া গেছে মানুষ জন্মের দূষিত রক্ত। তাই 'মানুষ বলে / এসেছি মানুষের দলে এনেছি কানট্রাসেপটিভস্ ও আত্মা।' আজকের পৃথিবীতে সবচেয়ে সহজ মরে যাওয়া কেননা 'মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকা কত শক্ত, স্বামী হিসেবে শক্ত / স্ত্রী হিসেবে শক্ত, সন্তান হিসেবে শক্ত নিজেদের নামের মতো বেঁচে থাকাও / শক্ত এমন কি সম্মোহন করে বেঁচে থাকা আরও শক্ত— শুধু কবিতা লিখে বেঁচে থাকার কোন মানেই হয় না'। শেষ পর্যন্ত অস্ত্রের নালীভবা ভালোবাসা নিয়ে আজ নির্বাসিতের মতো দূরে চলে যেতে হয় যেখানে 'ধর্মের গরাদ থেকে দেখব আমরা / গর্ভবতী স্ত্রীলোকের সাথে চলে যাবে পৃথিবীর পুরুষ / চলে যাবে গাধা—আমার ঘোড়ার পিঠে চলে যাবে / মানব শিশুরা—কিন্তু এ ঘরে আরেক আগামীকাল বেঁচে / থাকার মানে হল পুনরায় বিশ্বাসঘাতক হওয়া!' সম্প্রতি শৈলেশ্বরের কিছু কবিতা অতি রহস্যময় এবং অনাবশ্যক ভাবে জটিল হয়ে উঠছে বলে মনে হয়।

একই সঙ্গে ঠাণ্ডা, নিরাসক্ত, গরম ও উত্তেজক একটা দানবীয় ঝড়ের ঝাপটা

বলে মনে হয় মলয় রায়চৌধুরীর কবিতা। প্রথম ধাক্কায় ঠিকই 'কোন আবেদন' রাখে না, কিন্তু কবিতা পাঠ শেষ হলে থিতিয়ে আসার সময় মালুম হয় কি হয়ে গেলো। ঝটকরে শরীরের একটা অংশ উড়ে গেলে সেই স্থানের অবস্থার মতো —যেন 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' তাঁর গায়ের চামড়া ফালাফালা করে তুলে নিচ্ছে, প্রচণ্ড যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠতে উঠতে পরমুহূর্তেই তিনি তা যেন দাঁতে দাঁত চেপে গিলে ফেলছেন। মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে এগিয়ে যান মোকাবিলা করার জন্যে। প্রেমিকাকে ভালোবাসা দিয়ে ভুল ধরা পড়েছে নিজের কাছে তাই আর্তনাদ 'তোমার পোষা পুরুষদের মতন আমি মানুষ হতে পারলুম না শুভা'। পরক্ষণেই এগিয়ে গিয়ে তাঁকে বলতে শোনা যায় 'শুভা আমাকে এই পবিত্র রক্তে কুলকুচি কোরে মুখটা ধুয়ে ফেলতে দাও / আমাকে তোমার উচ্ছন্ন লীকার স্নান করে দুনিয়ার মুখোমুখি / হ'তে দাও আজ।' পৃথিবীকে তেমন সুবিধাজনক স্থান বলে মনে হয় নি তাঁর। কেননা সেখানে 'মানুষের দেয়া আইনানুগ মৃত্যু-দণ্ড পেয়ে কেবল মানুষই মরে যাচ্ছে।' আর 'বুদ্ধের ২৫১০ বছর পর গান্ধী ময়দানে পড়ে থাকে। পুলিশ ও অপুলিশ মার্পিটের ১৯৬৫ মডেলের জুতো ছাতা।' তীব্র সমাজ ও রাজনৈতিক সচেতনতা মলয়ের কবিতার অন্যতম গুণ। তবে বাংলা ভাষার পেলবতা নষ্ট করবার জন্যে তিনি যে সব ভারী ওজনের অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করেছেন সেগুলো কোনো কোনো অংশে কৃত্রিম বলে মনে হয়েছে। আর যৌনতাকে কেচ্ছা করতে গিয়ে তিনি যেমন একে প্রশ্রয় দিয়েছেন তেমনি অপ্রয়োজনেও অনেক ক্ষেত্রে যৌন নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছেন।

ক্রোধক্ষিপ্ত যুবকের উন্মাদ পাশব চিৎকার প্রকাশিত হয়েছে প্রদীপ চৌধুরীর কবিতায়। 'অন্যান্য তৎপরতা ও আমি' এবং 'চর্মরোগ'-এ তিনি দেখিয়েছেন যে সভ্যতা তাঁকে পায়ের চাপে পিষ্ট করে ফেলেছে। তার দিকে তর্জনী তুলে ধরে তিনি গর্জন করে উঠেছেন 'আমি বলছি, নষ্ট কর / নষ্ট কর নষ্ট কর আগুন জ্বলছে না তাই বর্বরের শেষ ক্রোধ / ...নষ্ট কর দালাল সভ্যতা, বুদ্ধি, সভ্যদের মূল সখ্যতাকে।' মায়ের অন্ধকার গর্ভের চিরশান্তি থেকে বেরিয়ে এ তিনি কোন পৃথিবীতে এসে পড়েছেন যেখানে 'গর্ভের চেয়ে সাংঘাতিক মনে হচ্ছে সভ্যতা ও ব্লাষ্ট'ফার্নেস, ১২ বর্গমাইল বালুর মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে আছি, সময় চেতনাহীন পরস্পরের শরীর থেকে শুষে নিচ্ছে সার পদার্থ কোন অভিযোগ নেই, শয়তান একদিন শয়তানের গলা টিপে ধরবে ..মা, এসো ৩নং দেশী মদ ও ফিনাইলের ককটেল গিলে আমরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি, তোমাকে এই অবস্থায়

চালান করে দেয়াই আমার একমাত্র প্রতিশোধ নেয়া পৃথিবীতে।' ভালোবাসায় বিশ্বাস নেই কবির, কারণ 'তোমার ডাঁসা বগলের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারি, প্রেম ছিল না তোমার ভেতর কোন কালেই।' তাই তাঁকে বলতে হয় 'ঈশ্বর আমার মুখ থেকে চোয়াল খুলে নাও / বিধবার রাত্রির মতো দীর্ঘ ও শূন্য করে দাও আমার আত্মা / চোখের জলের মতো তরল করো আমার শরীর / আমার শরীর বৃষ্টির মতো / ভিজিয়ে ভিজিয়ে নষ্ট করে দাও / ডিয়ার ডিয়ার।' অতি-মাত্রায় তেজী প্রদীপের কবিতায় নাগরিক শূন্য সভ্যতার আওয়াজ। খণ্ড বাক্য ও শব্দ পরস্পর বসিয়ে তিনি প্রচণ্ড উত্তেজনা সঞ্চার করেন কবিতার মধ্যে—এমন কি কখনো কখনো তাল সামলানোও তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে।

পৃথিবীর মৃত শ্মশানের বুকে দাঁড়িয়ে নিজের সঙ্গেই নিজে ইয়ার্কি ও কান্নাকাটি করে যাচ্ছেন সুবো আচার্য। জীবনের পথ থেকে দূরে সরে এসে তিনি আত্ম-হত্যার অপেক্ষায়, কেননা 'প্রকৃত পক্ষে সমস্ত জীবনই এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ / এবং সন্ধিহীন, অর্থাৎ পরাজয় /...আমাকে সম্পূর্ণ খেয়ে ফেলবার জন্যে জীবন চুপচাপ।' বিশ্বাসঘাতক প্রেম তাঁকে কোনো আশ্রয় দেয় নি এবং ভালোবাসতে গিয়ে বুঝেছেন যে, যেখানে বেশ্যারা কনট্রাসেপটিভ ফেলে সেখানে ভাল মেয়েদের কনট্রাসেপটিভস জমে ওঠে।' ক্ষুধায় গোটা পৃথিবীকে তিনি খেয়ে ফেলতে চেয়েছিলেন, লাটিমের মতো হাতের তালুতে ঘোরাতে চেয়েছিলেন পৃথিবীকে কিন্তু লাথি খেয়ে তাঁকেই হটে আসতে হয়েছে। জীবনের সমস্ত কিছু সার্থকতা ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন, কেননা 'মানুষ যাকে বলে জীবনে দাঁড়ানো সেটা ড্রেন পাইপ ইস্ত্রি করার মতো সহজ, অন্যরকম জীবনের কথা ভাবতে ভাবতে চুল ঝরে যাচ্ছে, হাড় দেখতে পাচ্ছি চারিদিকে।' 'বড়লোকের মেয়েদের মতো' বেড়ে যাওয়া পৃথিবী তাঁর বিনাশই ঘটিয়ে যাচ্ছে শুধু। তিনি বলেন, 'কিন্তু আমি মরে যাবো ও পৃথিবী বেঁচে থাকবে এ কি করে হয়।' শেষ পর্যন্ত কবিকে মৃত্যুর কথাই ভেবে যেতে হয় এবং তা খুবই অন্তরঙ্গ বলে মনে হয় আজকাল। গোটা সময়ের হাহাকার তাঁর কবিতায় ফুটে উঠলেও, তা বহুক্ষেত্রে পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট।

এ ছাড়াও এ গোষ্ঠীর আরো কয়েকজন তরুণ উপরোক্ত কবি চতুষ্টয়ের চর্বিতচর্বণ ঢেলেই কবিতা করার চেষ্টা করছেন। এঁদের মধ্যে সুবিমল বসাক, ত্রিদিব মিত্র দেবী রায়, শম্ভু রক্ষিত, তপন দাস, শংখপল্লব আদিত্য, ফাল্গুনি রায় প্রমুখ কবির নাম উল্লেখ করা যায়। এঁদের লেখালেখি সম্পর্কে আলাদা করে বলার বিশেষ কিছু নেই। তবে দেবী রায়, শম্ভু রক্ষিত, ফাল্গুনি রায় আরো সিরিয়াস হয়ে,

যে দর্শনকে অবলম্বন করে তাঁরা কবিতা করছেন, তাকে বিশ্বাস করে যদি সততার সঙ্গে লেখালেখি চালিয়ে যান, তবে খানিকটা দূর পর্যন্ত তাঁদের হাংরি সম্প্রদায়ের লক্ষ্যানুযায়ী এগোতে পারবেন বলে আশা করা যায়। লেখালেখিগুলোর চরিত্রই আসল কথা। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এঁদের কবিতার মধ্যে যে বিক্ষোভ প্রকাশিত হয়, তা ফ্যাসান ছাড়া অন্য কিছু নয়। এবং ফ্যাসানেরই চর্চা হচ্ছে, আর রামকৃষ্ণ মিশন থেকে হিপি কলোনী পর্যন্ত এটাই গলদ—রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে দলের অনুসারী কবি সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য।

স্থান কাল পাত্র পর্যালোচনার আলোকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন পর্যায়ের আন্দোলন এবং তার ফলশ্রুতির মোটামুটি একটা রেখাচিত্র উপস্থিত করার প্রয়াস পাওয়া গেলো। অবশ্যই সম্পূর্ণ নয়। সাহিত্যের আন্তরজট বহু ক্ষেত্রেই সম্ভবত খোলা সম্ভব হয় নি। বিভিন্ন কবি গদ্যকারের দৃষ্টিতে ধরা পড়া সাহিত্যের যা সত্য, শুধু তাই-ই সাধ্যমত তুলে ধরার চেষ্টা করা গেছে। প্রায় কারুর সম্পর্কেই পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সম্ভব হয় নি এবং পাকাপোক্ত রসশাস্ত্রানুগ বিচার করা যায় নি ; হয়ত কোনো কোনো সুযোগ থাকার কথা নয়—লেখকদের প্রতি অবিচার করার কোনো অসদিচ্ছা ছিলো না। মোটা ধারাতেই লেখালেখির পরিচয় দিয়ে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছে। কি হয়েছে, কি হয় নি অথচ হতে পারে ; যা হওয়ার কথা ছিলো, কিন্তু হোলো না, কেন হোলো না—বীজে বিষ, না, ভূমি মরু—এগুলো নিয়ে সামান্য বহু আলোচনাতেই গ্রন্থবিষয়কে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। তবে, আপাত দৃষ্টিতে আধুনিক বাংলা গদ্যপদ্যর যে সব ত্রুটিবিচ্যুতি এবং বিফলতাসফলতা ধরা পড়েছে সেগুলোকে স্পষ্ট করে নিশ্চিত ভাবে একটি কথাই বলার চেষ্টা হয়েছে যে, সাহিত্যিক ফসল যা সাম্প্রতিক সময়ের গোলায় উঠেছে, এর ঠিক এমনটি হওয়া ছাড়া উপায় ছিলো না। বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক অবস্থাটি ছিল অবধারিত—আধুনিক সময় এবং আধুনিকতার মুভমেণ্টের মধ্যেই ছিলো চোরা ফাটল। আর সেই ফাটল ক্রমশ বড় হতে হতে আজকের বিধ্বংসী চেহারা নিয়ে, তরুণ মানুষকে যেমন করেছে নিষ্ঠুর প্রতিশোধপ্রবণ, তেমনি সার্বিক শত্রুতার চিহ্ন কালো শিশার পরিপাটি অক্ষরের শব্দে ফুটিয়ে তুলেছে।

আমরা দেখেছি আদ্যন্ত এই আধুনিকতার পর্বে শুধু ভাঙনের জয়গান। কূপমণ্ডুকতা, কুসংস্কার, মধ্যযুগীয় আবহাওয়া ভেঙে মানুষকে উদ্ধার করে আনার

মধ্যে থেকে যে আধুনিকতার সূত্রপাত তাই-ই ক্রম উত্তরণের তাগিদে, চিন্তায় চেতনায় ব্যক্তির মুক্তির তাগিদে ক্রমাগত ভাঙচুর করেছে এবং সেখানে দক্ষতার অভাব ঘটে নি। ভাঙনকে সত্য হিসেবে নিয়ে অবশেষে সামাজিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হয়েছে অস্বীকৃত, সাহিত্য শরীর, আদর্শ ও ভাব সংস্কার হয়েছে চূর্ণবিচূর্ণ এবং মানবিক মূল্যবোধকে ধ্বসিয়ে দেয়া হয়েছে ধুলোয়। প্রাথমিক পর্যায়গুলোতে এ ভাঙনের ভিতরে একটা উদ্দেশ্য ছিলো এবং উত্তরণের একটা তাগিদ ছিলো এবং ছিলো ভবিষ্যতের আবছা নির্দেশ, যা দেখে কোনো কোনো লেখাকে মহৎ এবং কোনো কোনো লেখককে মহান বলে চিহ্নিত করতে অসুবিধে হয় নি। বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, মাণিক, জীবনানন্দ, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ বা বিষ্ণু দে নিজ নিজ কালসীমা উত্তীর্ণ হয়ে যাবার শিল্পশক্তিকে সমস্ত লেখালেখিতে আগাপাস্তলা নিয়োজিত করতে পেরেছেন বলেই, বাদ-ছাদ দিয়েও যা পাওয়া গেছে, বাংলা সাহিত্যের তা হীরামুক্তা। নিজ নিজ সময়ে গড়ে ওঠা জাতীয় লক্ষ্যকে এঁরা অল্পবিস্তর আত্মসাৎ করে আপন আপন অস্তিত্ব রচনা করতে পেরেছেন, সেখানে পৌঁছনোর জন্যে সক্রিয় তাগিদ অনুভব করেছেন এবং অকপট সংগ্রাম করে অবশেষে সিদ্ধিতে পৌঁছতে পেরেছেন বলেই এঁদের কোনো কোনো লেখা তুলে সাহিত্য ও জাতির 'ল্যাণ্ডমার্ক' নির্দেশ করা যেতে পারে। কিন্তু, স্বাধীনতার পরে এ কথা অপ্রিয় সত্য যে, গোটা জাতিরই কোনো লক্ষ্য নেই। ফলে, লক্ষ্যভ্রষ্ট দিশাহারা, মূল্যবোধহীন, অবক্ষয়িত একটা জাতির সাহিত্য যেমন হওয়া উচিত সাম্প্রতিক সাহিত্য ঠিক তেমনি হয়েছে—দেখা গেছে তুমুল শক্তিসামর্থের অপচয়ের ফলশ্রুতি। খুব গভীরে তলিয়ে দেখলে, বুঝতে কষ্ট হয় না, সাম্প্রতিক সাহিত্য মানুষ থেকে মানুষের বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার শঙ্কা, কান্না ও যন্ত্রণার প্রতিফলন। এবং ১৯৭০ অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর ঠিক ত্রিশ বছর বাদে যে সাহিত্য সৌধ রচিত হতে যাচ্ছে, তার ভিত্তিতে আছে 'আমরা স্বাধীনতার চেয়ে বেশি চাই, আমরা চাই স্বেচ্ছাচার'—

'হায় ও হোঃ হোঃ হোং, আমাদের কেউ পুনর্বিবেচনা করে দেখতে বলেনি। কে বলবে? বলা বাহুল্য, "তুমি তোমার বাবার ছেলে ও তোমার ছেলের বাবা, বাছা, তুমি তোমার সন্তানের জন্যে কিছু করে যাও," এ সব আমাদের বলা বৃথা, আমাদের কেউ বলে না। দেশরক্ষা, ভিয়েৎনামের মুক্তি, স্ত্রী, জওয়ান, প্রেমিকা, কারো জন্যে স্যাক্রিফাইস করতে আমাদের কেউ বলে না, এত বড় মিটিং হয়ে গেল বুদ্ধিজীবীদের, আমাদের ডাকে নি তো কেউ। আমাদের পোজিশান এই

যে আমরা কখনো ভুল করি নি, আমাদের, অতএব, কখনো ভুল ভেঙে যায় নি। কোনোরূপ স্যাক্রিফাইস আমরা করি নি। রবীন্দ্রনাথ আমরা আদৌ পড়ে উঠতে পারি নি, বুঝি একবার রবীন্দ্র সঙ্গীতে বিশ্বাস হয়েছিল, ভুল তখুনি ভেঙে গেল। আজ আধুনিক গান ও রবীন্দ্র সঙ্গীত আমাদের কাছে ৫২ ও ৫৩, বলা বাহুল্য যে আমরাও মনে করি যাঁহা-৫২ তাঁহা-৫৩, যাঁহা সত্যজিৎ রায় তাঁহা ত্রুফো। আমরা রূপকে কখনো রূপান্তরিত করে দেখি নি। রূপ আমরা মানি, রূপান্তর মানি না। যেমন, আবার, আমরা মৃত্যু মানি। আত্মা, অমরতা, ঈশ্বর, পরবর্তী জীবন, এগুলো রূপান্তর, এগুলো মানি না। এই জন্যেই আমাদের গল্পের সব চরিত্র শেষ কালে মরে যায় বা মাঝখানেও আমরা অনেক সময় তাদের ছেড়ে দিই এই বলে যে, "এই পর্যন্ত লিখলুম তারপর তারা যে-যার অসুখে মরে গেল।"[১]

আলোচনার বিভিন্ন অধ্যায়ে দেখা গেছে 'মাথা ভরা ময়দান', 'মিছিল ভরা রক্ত', 'অন্ধকার ছিঁড়ে সূর্যোদয়', 'মাঠে মাঠে চাষ', 'কলে চাকা বন্ধ' ধরনের প্রগতি ভাবনার তথাকথিত চিহ্নগুলো মুছে দিলে প্রায় সব লেখাই হয়ে ওঠে ক্রুদ্ধ যুবকের চিৎকার নতুবা একাকীত্বের স্বগত সংলাপ নয়তো ক্ষুধার্ত বিপ্লবের নির্বিচার শাব্দিক ধর্ষণ। প্রতিক্রিয়াশীল রচনা এবং প্রগতিশীল রচনার মাঝখানে অলীক মাকড়শার জালের ফারাক। এবং প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রগতিশীল নামে তথাকথিত ক্যাম্প দুটির মধ্যেও যে সব ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর লেখক কবি গদ্যপদ্য রচনা করেছেন তাঁদের একের লেখা থেকে অন্যের পার্থক্য মাইক্রোস্কোপ দিয়ে আবিষ্কার করতে হয় বললে অত্যুক্তি হয় না। রবীন্দ্রোত্তর কালের সাহিত্য আন্দোলন তেকোণা কাঁচের মতো। প্রথম, বুদ্ধদেব বসু পরিচালিত এবং 'কবিতা ভবনে' জাত শুদ্ধ স্বাধীন কলাকৈবল্যবাদী সাহিত্য আন্দোলন, যে সাহিত্য জীবন-বাদিতা সমাজমুখীতা বাস্তবতা-রাখার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে 'যে আঁধার আলোর অধিক' তাতে মজে থাকতে লেখক কবিদের হাওয়া দিয়েছে। মুষ্টি-মেয় কিছু কবি অত্যুৎসাহে 'কবিতা ভবনে'হিম নীল আলোর মদে স্বপ্নবিভোর থাকলেও সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা ও গদ্যে তেমন প্রশ্রয় পান নি। শুদ্ধ কবিতা বা শুদ্ধ গদ্য লিখতে গিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে যে তরুণ কবি লেখক সম্প্রদায় 'শাস্ত্র বিরোধী' লেখা ছাপাতে হিম আন্দোলন করছেন, তা বস্তুত বুদ্ধদেব বসু-মর্জি-অন্য রচনা—ব্যাকরণের বিরুদ্ধে উৎসর্গীত জেহাদ। দ্বিতীয়, বুর্জোয়া এষ্টাব্লিশমেন্টের

১। কাউন্টার প্রয়েন্ট—সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

পিরামিড-প্রমাণ মুনাফার জন্যে 'লাগানো' সাহিত্য। সাম্প্রদায়িকতা আর প্রাদেশিকতা উসকে যদি পয়সা হয়, যৌন বিকৃতির বোধ ইন্‌জেক্ট করে যদি পয়সা হয়, ইতিহাস ও যৌনতা, সমসাময়িক রাজনীতির হালচাল, চমকপ্রদজনক যৌনতা ও ধর্মের কক্‌টেল পার্টি ফেঁদে যদি কড়ি মেলে, তবে অবস্থা বুঝে সেগুলোকেই বয়স্ক ও তরুণদের দিয়ে লিখিয়ে নিতে বিভিন্ন সময়ে মদৎ দিয়েছে এষ্টাব্লিশমেণ্ট। তরুণরা যাঁরা স্বকাল পরিবেশের গরল পান করে এষ্টাব্লিশমেণ্টের কড়ি, প্রচার বা অন্য প্রলোভনের পরোয়া না-করে সাহিত্যের মোড় ফেরাতে চেষ্টা করেছেন, তাঁদের প্রায় সবাই-ই হেরে গিয়ে শেষ অব্দি এষ্টাব্লিশমেণ্টের পায়ের কাছে শৃঙ্খলিত করজোড়ে নতজানু হয়ে 'নকরি' প্রার্থনা করেছেন। এখন তাঁদের লেখাতেই বাংলা সাহিত্যের বাজার রমরম করছে। তৃতীয়, প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন। জীবনবাদী, সমাজমুখী বাস্তব-সতেজ উত্তরণের সাহিত্য আন্দোলন শুরু করে প্রগতি লেখক সংঘ বা ৪৬নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট বাংলা সাহিত্যে ভরাকোটাল ডেকে এনেছিলো। রবীন্দ্রোত্তর কালের প্রথম সারির প্রায় সমস্ত লেখক কবিই এর মধ্যে থেকে সংগ্রহ করেছিলেন নতুন কালের আবেগ এবং তৈরী হয়েছিলো সংঘবদ্ধ প্রেরণা। কিন্তু আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, সুযোগ সন্ধানীদের চারিত্রিক দুর্বলতা এবং সব শেষে রাজনৈতিক হঠকারিতা এ আন্দোলনকে ধ্বসিয়ে দেয়। তবুও স্বাধীনতা লাভের পরে পরে সাম্প্রতিক লেখকদের ক্ষমতাশীল অংশের প্রায় সবাই ছিলেন প্রগতিশীল মোর্চার মুখাপেক্ষী।

কিন্তু তাঁদের ধরে রাখবার মতো, মদৎ দেবার মতো পথনির্দেশ দেবার মতো কিম্বা আদর্শ হবার মতো কেউ ছিলেন না। যাঁরা সুদূরে স্বেচ্ছা নির্বাসনে পালিয়েছিলেন, তাঁরা একদা ভয়াবহ দৃশ্যের মধ্য অঙ্কে আঁৎকে উঠে দেখলেন একেবারে কমিউনিষ্ট কুলায় নিজের ডিমের প্রতি মমতাহীন (তাঁদের মতে) প্রগতিবিরোধী কবি ও লেখক আকাশ মাতিয়ে তুলেছেন। কিন্তু তখন তাঁদের কিছুই করার নেই। নতুন শক্তির কাছে হার মানতে হয়েছে। নতুন লেখা বলিষ্ঠ এবং বেপরোয়া। নতুনদের কেউ কেউ সমাজের প্রতি জীবনের প্রতি সংগ্রামের প্রতি আস্থা রাখতে পারলেন, কেউ পারলেন না। প্রায় বিশ বছর ধরে বাংলা সাহিত্যে চলেছে ঘোরতর বিপ্লব প্রতিবিপ্লব। এবং এই ১৯৭০-এর মোহনায় আগামী লেখকের বোধের ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে "মানুষেরই আহাম্মকি মানুষকে ভালুক নাচায়—/ এমন দেখেছি আমি বিবেচনা প্রসূত মণ্ডপে / সভাস্থলে, কোথা নয়? এমন কি, ময়দানের ধারে—/ যেখানে বক্তৃতা বলে,

এখনি শুদ্ধতা দিতে পারি / যদি তুমি ভক্ত থাকো—যদি শ্রুতি না মানে কবিতা / বাংলাদেশ গ্রাম থেকে উঠে আসে উজ্জ্বল দুপুরে / এবং সন্ধ্যায় ফেরে রিক্ত নিঃস্ব মুখ সারি সারি / যে মিছিল ভেঙে যায়, বাড়ি ফেরে—তার দুঃখ দেখে / অন্ধকারে কেঁদে ওঠে বেডরোড গঙ্গার ঢালা জলে ./ ..মানুষের খুব কাছে গিয়ে আমি প্রত্যক্ষ করেছি—' ভোলানো সহজ তাকে, তার মধ্যে স্বপ্নের করবী / তাকেও ফোটানো সোজা—শুধু তার বীজে শক্ত বিষ / এ সম্পর্কে কোনো কথা ভালো নয়, এড়ানোই ভালো / একদিন মিছিলের ডগা-মধ্য-লেজে বসে থেকে / অনেক ঘুরেছি আমি / কলকাতা বিপুল বাংলাদেশ ..।"[১]

নিঃসন্দেহে এ কথা ঠিক, জাতীয় জীবন পরিবেশের বাস্তব চরিত্রটিকে এ সময়ের লেখক কবিরা যথেষ্ট বলিষ্ঠতার সঙ্গে সাহিত্যিক মেজাজে রূপান্তরিত করতে পারলেও, জাতীয় ক্ষয়বোধ এবং প্রায় আশুন্ত অন্ধকারের আমূল স্বরূপকে প্রকাশ্যে হাজির করতে পারলেও বাংলা সাহিত্য জাতীয় জীবনের আন্তরিক অভীপ্সার বাণীমূর্তি হয়ে উঠতে পারে নি। জাতির আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা, রাজনৈতিক ব্যভিচার এবং অর্থনৈতিক পঙ্গুতা ও বৈষম্যের তলে-পড়া জন্তুর মতো কবি ও কথাসাহিত্যিকরা আন্তর্জাতিক সাহিত্যের সহযোগী সাহিত্য হিসেবে যা গড়ে তুলেছেন, নানা দিক থেকে তার অসীম গুরুত্ব থাকলেও, তা কেবল ভাষা-কাঠামো পরিবর্তন এবং প্রকরণগত কলাকৌশলের পরিচয়ই বহন করছে। এ কথা অস্বীকারের উপায় নেই যে, সাম্প্রতিকতম সাহিত্য জাতীয় ক্ষয়ের গর্ভে উচ্ছন্ন মস্তিষ্ক সময়ের ঔরসে জাত এবং উল্টো দিক থেকে হয়ে ওঠা জাতীয় সাহিত্য। এ সাহিত্য কালো রেনেসাঁস-এর ফসল, যা পূর্বপূর্ব লেখকদের লেখা-লেখা খেলা ঘুচিয়ে ও সংস্কার মুক্ত স্বাধীন মানসিকতার মর্জি ফুটিয়ে বাংলা গদ্যে-পদ্যে একটা নিজস্ব চরিত্র এনেছে। তা হলেও, এ সব লেখালেখি সমাজ-বিচ্ছিন্ন চেতনার ও জীবন সংগ্রামে পর্যুদস্ত ব্যক্তিত্বের একান্ত নির্জন সংলাপ হাহাকার এবং চিৎকারের যোগফল—ক্ষয় ও মূল্যবোধহীন মানসিকতাকে অভিনব, অদ্ভুত এবং উদ্ভট নতুন ভাষায় ও ভঙ্গিতে, চতুর এবং চটকদারী অ্যাটিচিউডে পরিবেশন করা হয়েছে মাত্র। একে মহৎ সাহিত্য বলতে দ্বিধা আছে, তবে যে মানুষ সমাজে জীবনে মহৎ বলে কিছু দেখে না, সে সময়ে মহৎ সৃষ্টি আশা করাও বৃথা। তাই যা হয়েছে তাকে সাধুবাদ জানিয়েও, আপন আক্ষেপকে গোপন রাখা অসম্ভব।

১। প্রতিক্রিয়াশীল—শক্তি চট্টোপাধ্যায়

সমস্ত লেখালেখির পর্যালোচনায় সম্ভবত অস্পষ্ট থাকে নি যে, কলকাতা-ভরা বাংলাদেশের সাহিত্যে, অর্থাৎ শহুরে কূপমণ্ডুক সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব এতাবৎ যা রচনা করেছেন, তাতে আশার ক্ষীণ আলোরেখাটুকু পর্যন্ত প্রায় সব ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত। অরাজকতা, অসহায়তা, নিরাপত্তাহীনতা, কান্না, দিশাহারাত্ব, যন্ত্রণা, জ্বালা, নপুংশকত্ব, ক্রোধ, উদ্দেশ্যহীন ধ্বংসলীলা নিয়ে যে দেশব্যাপী নৈরাজ্য তাকে সততার সঙ্গেই সাহিত্যে চিত্রিত করা হয়েছে। প্রায় সমস্ত লেখকই বাস্তব পরিবেশের এ দিকটিতে নিজেদের আমূল সেঁধিয়ে দিয়েছেন এবং সত্য উদ্ধার করে এনেছেন। কিন্তু বর্তমান সাহিত্যে, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বাস্তবের অন্যদিকটি নির্মমভাবে অবহেলিত। এর মধ্যে স্থান পায়নি স্রষ্টা মানুষের সৃষ্টির সংগ্রাম, সময় সমাজ জীবনের ইনার কনফ্লিক্ট -জেগে ওঠে নি শহর পরিমণ্ডলের বাইরেকার অস্তিত্বময় জীবনের দুর্মর অভিব্যক্তি, যা উৎপন্ন শস্যের ঐশ্বর্যের, আনন্দের আর শান্তিবাসনার তীব্রতায় সার্বিক প্রতি-কূলতার মধ্যেও এ সময়ে দাপিয়ে উঠতে চেয়েছে এবং কিছুটা ভুল পথে হলেও সিন্‌সিয়ারলি আবেগময় আত্মোৎসর্গে দ্বিধা করে নি। আমরা দেখেছি, প্রেম ও বিবাহহারা তরুণ লেখক কবি বেশ্যা এবং স্তন্যদানে অনিচ্ছুক, গর্ভপাতে বেলজ্জ, পোষাক পালটানোর মতো উরু, যোনি, স্তন ও ঠোঁটে নিত্য নতুন পুরুষ পালটে ব্যবহার করতে কুশলী মেয়েছেলের কড়চা উড়িয়েছেন জোর, ঘৃণা করে ভালোবেসে দেখেছেন 'মেয়েমানুষেরে', কিন্তু জননী-জায়া-কন্যার প্রতি — সাধারণ ভাবে মেয়েদের প্রতি—যে শ্রদ্ধা, সম্মান ও মমতার বোধ বাংলার গ্রাম-গুলোতে তো বটেই শহরেও প্রবাহিত তাকে সজ্ঞানেই সম্ভবত তাঁরা উপেক্ষা করেছেন। নারী মাংস কিমা করে খাওয়া বা যোনিলিঙ্গের বন্ধুতা ছাড়াও, ভালোবাসার যে হয়রং অনুভূতি, যা জীবনের অজস্র চাওয়া এবং সহস্রতর না পাওয়ার দুঃখ, জ্বালা ও যন্ত্রণার মধ্যে বেঁচে থাকার মানে সৃষ্টি করে, তা কচিৎ কথনো কারুর কারুর লেখায় প্রকাশ পেলেও, অনেকের মধ্যেই বেগবান প্রেরণা হয়ে ওঠে নি—দেখা যায় নি, নারীপুরুষের মৌলিক কনট্রাস্টের মধ্যে থেকে পরিবর্তিত সময় পরিবেশ অনুযায়ী অ্যাডজাষ্টমেন্টের সূত্র আবিষ্কারের প্রয়াস। সাম্প্রতিক সাহিত্য পাঠকের এটাও দৃষ্টিকটু মনে হয়েছে যে, সত্যের দিকে পিঠ দিয়ে সাম্প্রতিক কবি লেখকরা, জব চার্নকের কলকাতাতেও শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে, সুখীসুন্দর ভবিষ্যতের জন্যে যে মেধাগত, আবেগগত ও ক্রিয়াগত আলোড়ন উৎপন্ন হয়েছে তার মৌলিক শক্তিকে, স্বীকৃতি দেন নি। অনেকে

সন্ধান প্রয়াসেই এগুলোকে উহ্য রেখে বা ঠাট্টা করে কিম্বা অন্ধভাবে আক্রমণ করে তাৎক্ষণিকের লাভের জন্যে প্রতিক্রিয়ার শক্তিকেই বড়ো করে তুলেছেন। প্রগতিশীল বলে যাঁরা নিজেদের দাবী করেছেন, তাঁদের অক্ষমতা, সংঘশক্তির ভেতরকার দুর্বলতা এবং প্রগতিশীলতা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা অন্যপক্ষকে সুযোগ করে দিয়েছে কলতানি-সর্বস্ব কলকাতা (যা ৯৯'৯৯ শতাংশ হলেও সব নয় কিছুতেই)-কেই সাহিত্যের বিভাব অনুভাব সঞ্চারীভাব এবং আলম্বন বিভাব করে তুলে, পাঠকের কাছে একটা মিল হিসেবে পৌঁছে দিতে। এ সাহিত্যে অন্বিষ্ট সন্ধান করা হয় নি, নতুন মূল্য বোধ আবিষ্কারের চেষ্টা করা হয় নি— দেখানো হয় নি উত্তরণের পথ।

এই সব দেখে হয়তো মনে হতে পারে, বাংলাদেশে কেবল উষরতাই বিস্তার লাভ করেছে, মানুষের হাঁটু হাত হৃদয় ও মেধা খসে পড়েছে, 'মানুষের মৃত্যু ঘটে গেছে সভ্যতার গমগমে শূন্যতা।'[১] এটা সত্য, কিন্তু শেষ সত্য নয়। শুধু-মাত্র এটাই বাংলাদেশ তথা ভারতের বর্তমান সত্য, এ কথা কেউ বললে, তা অশ্রদ্ধেয়। কেননা, 'মানুষ, অগ্নিক্রান্ত মানুষ / বাতাসে, রক্তের বাতাসে। পেশীতে, গুরুগুরু চেতনা সংহাতে। সমুদ্র, লোনা সমুদ্র, জলোচ্ছ্বাস / ভাল-বাসার বিদ্যুৎ প্রণাম, ভালবাসার প্রণাম। / কথাগুলি কলিজার রঙে ডুবেডুবে / বিদ্যুৎ ইস্পাত।'[২] 'শিয়রে প্রলয়ের পাল নিয়েও সংরক্ষিত প্রাণী দুটি কিছুতেই নরনারী হয়ে উঠতে পারছেনা।'[৩] ঠিক, কিন্তু জীবনের প্রতি বিশ্বাসে, ভালোবাসার প্রতি আস্থায়, সংগ্রামের প্রতি শ্রদ্ধায় আর সৌন্দর্য-সত্য-শান্তির কামনায় ম্যামথ মানুষ যে ধীর কিন্তু অমোঘ পায়ে ব্যর্থতা এবং সফলতার মধ্যে থেকে ক্রম-অগ্রসর এবং তার চিহ্ন একটু একটু করে স্পষ্ট হয়ে উঠছে, তা দেখতে না পারা কালদ্রষ্টা ভাষা শিল্পীর পক্ষে অপরাধ বলাই সংগত।

১৯৭০ ভয়ঙ্কর। সমাজ-জীবন-সাহিত্য ভেতর দিকে যেমন অন্তঃসার শূন্য হয়ে পড়েছে, বাইরে থেকে বাজিয়েও দেখা যাচ্ছে তা অসার। ১৯৭০-এর বোধ :

****"সে উহা তুলিতেই উহার লম্বমান সুশ্রী গ্রীবা শিথিল নেতাইয়া ঝুলিতেছে, সুঘরাই দমিল না, পক্ষীগাত্র হইতে আগত ম্লান বিদেশী পারফিউমের গন্ধে কোনো মানসিকতা নাই, বরং তাহার চক্ষুদ্বয় কেমন যেমন বিকারগ্রস্ত, হঠাৎ তাহার হাতে পক্ষীর ক্ষতের রস যাহা আঠাল তাহা লাগিতেই সে এক পা

১। সুব্রত আচার্য—টেরিলিন টেবিকট / তিন ২। কমলেশ সেন—মানুষ শহর সমুদ্র

৩। দেবেশ রায়—বেঁচেবর্তে থাকা

সরিয়াছে মাত্র -যেখানে সরিয়াছে তাহা তাহার পলায়নের জগৎ—নিশ্চয়ই এবং যুগপৎ সে সেই আঠা প্রথমে সচকিতে এবং পরক্ষণেই গভীর ভাবে শুঁকিয়াছে ; ঐ গন্ধ বড় পরিচিত তাহাদের এবং হঠাৎ ইহাতে তিনবার বলিয়াছে যে আমরা ডোম—যে সে জানে নাই যে সে বলে এবং যে তদীয় হস্ত অস্থির ও সে ভূত-চালিতের প্রায় পাখীর বক্ষদেশ হইতে অজস্র পালক পৌরাণিক দুর্মতিতে উৎপাটিত করিতে কালে অচিরাৎ তাহার দেহের অভ্যন্তরে এক প্রলয়ঙ্কর হুঙ্কার ঘনিয়া উঠিল, অন্যপক্ষে পালক উৎপাটনে বেচারী পক্ষীটির অনেক ক্ষতই ওতপ্রোত—যেন সুঘরাই এর 'আমরা' বলাতে বিঘ্ন সৃষ্টি করিল--সত্রাসে ঐ সুঘরাই পক্ষী দূরে নিক্ষেপ করত—ঝটিতি যে সে উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিতে থাকিল, যাহা আতঙ্ক, যাহা বেদনা, যাহা আনন্দ, যাহা আহ্বান, যাহা জোর প্রত্যাশার ডাক, এমনও যে ইহা তাহা নহে। মনোরম খাঁচাটি সে অতীব ক্ষিপ্রতায় হাতে লইতেই চীৎকার যেন আরও দুর্মদ আরও ক্ষ্যাপাটে। উড়ন্ত পালকে সে আরও কুটিল। ইহা চমৎকার যে সে সুঘরাই এইরূপে মিথ্যারে স্মরণ করিতে চাহিয়াছিল .. অ-আধুনিকতা ! যে এবং শনৈঃ সে দৃঢ়তায়, হিরণার টিলায় যেখানে ডাড়ু পোকার নিবাস, দাঁড়াইয়া খাঁচাটির প্রতি লুব্ধ নয়নে চাহিয়া আপনার চীৎকারকে আপনা হইতেই ছন্দিত করিল, যেমন সে ছন্দোবিধি জানিয়াছে। যে এবং এখন কে যেমন বা গীত গাহিতে আছে। ****[পিঞ্জরে বসিয়া শুক—কমলকুমার মজুমদার]

ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। বলা যেতে পারে, জাতীয় অভীপ্সার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগে সাহিত্যচিন্তা গড়ে না উঠলে দীর্ঘ সম. এবং সক্ষম হাতে গড়া ভাষা ও শিল্পপ্রকরণ বা টেকনিক অসার্থক ব্যবহারের নজির হয়ে পড়তে বাধ্য। এক বছর ব্যবধানে নতুনদের কাছে বিগত সালের লেখকদের কোনো অবদানই নেই বলে মনে হয়। এমনটিই হয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে। দেখা গেছে, কিছুদিন আগেও যাঁদের 'মেজর' লেখক-কবি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে সেই শক্তি-সুনীল-বিনয়-উৎপল-তরুণ-দীপেন-দেবেশ-মতি-সন্দীপন প্রভৃতিরা যা করতে চেয়েছেন, তা অবশেষে ভূমিকা রচনা করেছে হাংরি অথবা রক্তহীন বিপ্লবী গল্পপত্তর। এঁরা অস্বীকার করেন 'পঞ্চাশের লেখকদের'- বলেন তাঁরা কিছু করেন নি। অথচ এঁদের লেখায় যে সেই 'পাঁচের দশক'ই ডমিনেট করেছে তা অন্ধেরও দৃষ্টিগোচর। আসলে শিকড়ের শক্তিতে জাতির মৌলিক মানস রস আহরণ করা হয় নি বলেই পঞ্চাশের লেখক কবিদের অনেকেই অচিরে ফুরিয়ে গেছেন --কি লিখবেন, কেন

লিখবেন, কার জন্যে—লিখবেন বা কেমন করে, কমিউনিকেশনের জন্যে কি রকম ভাষায় লিখবেন এসব প্রশ্নের সমাধান না পেয়ে সংকটাপন্ন হয়েও কেউ কেউ থেমে গেছেন। তাঁরা শুরুটাতে স্রষ্টার পেশীফোলান শক্তির প্রয়োগ দেখিয়েছেন কিন্তু পরিণামের প্রতি উদাসীনতায়, মানুষের প্রতি অবিশ্বাসে এবং ব্যক্তিগত সমস্যা পীড়নে আত্মহত্যাকেই মুক্তির উপায় মনে করে নিজেদের লেখালেখিকেই হত্যা করেছেন। সাহিত্যে দল-উপদল হোলো, ক্রোধ ও ক্ষুধার চীৎকারও হোলো কিন্তু লিটারেচার অব গ্রোথ হোলো না। অনেক ভাঙা হোলো, কিন্তু নতুন কোনো মূল্যবোধ সৃষ্টি হোলো না।

সামগ্রিক ভাবে আধুনিক সাহিত্য আলোচনায় দেখা গেছে, প্রথম পর্বে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদই চীৎকারের মতো বাংলা সাহিত্যে উপ্ত হয়েছে। সেই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদই চূড়ান্ত মূর্তি ধারণ করেছে শেষ পর্যায়ে হাংরি জেনারেশনের লেখায়। প্রথম থেকেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজ শক্তির মধ্যে বিবোধ ছিলো, তবে তা স্বাধীনতা বা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের আবেগের চাপে, ছিটেফোঁটা প্রকাশ পেলেও, মূলতঃ অন্তরাল বোধ হিসেবেই কাজ করেছে··দৃশ্যতঃ আধুনিক সাহিত্যকে চিহ্নিত করেছে 'আমরা'-বোধ। কিন্তু ১৯৪৭-এর পর স্বাধীনতার বোরখা পরা দূষিত ক্ষত শেষ পর্যন্ত বোরখাটাকেও পচিয়ে তুললে উৎকট ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যই স্ব-মূর্তিতে সাহিত্যে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে। হাংরি রিয়ালিষ্টদের কাছে সমাজ শক্তি শুধু নয় নিজেদের শরীরের সঙ্গেও বিরোধ ভয়াবহ। কাজে ভাবে ভাষায় ভঙ্গীতে এঁরা দূরের অচেনা, সাধারণ মানুষের জীবন যাপন প্রণালী সংস্কার সংস্কৃতি ঐতিহ্য ও সংগ্রাম শান্তি আনন্দ থেকে এঁরা বিচ্ছিন্ন। স্বপ্ন, পরীর দেশ, নয়ত বেশ্যার যোনিদেশ (যা স্বপ্নেরই সমান) কিম্বা নিজেদের মনের মধ্যেই এঁদের বসবাস। এই সাংঘাতিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং সমাজবিরোধী শুদ্ধ আত্মবাদ সমাজের আদ্যন্ত পরিধির মধ্যে কোথাও কোনো গুণ দেখতে পায় না—শুভ মনে করতে পারে না কিছুকেই। ফলে, হিটলারের উগ্র জাতীয়তা-বাদের হুঙ্কায় উদ্ভূত ফ্যাসিবাদের যে পরিণতি হয়েছে, উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিস্ফোরণ জাত ক্ষুৎকাতরবাদের পরিণতিও তাই হতে বাধ্য। বাংলা সাহিত্যে হাংরিদের আন্দোলন যতই অভিনব শক্তির পরিচয় দিক না কেন, যতই তাঁদের লেখা পবিত্রগ্রন্থের লেখার মতো নিস্পৃহবোধের প্রকাশ ঘটাক না কেন, তার সামাজিক মূল্য 'শূন্য'—ভারতে শূন্যতাবাদ প্রায় ভারতবর্ষের মতই প্রাচীন, কিন্তু তা প্রতিষ্ঠা পায় নি। নিরালম্ববোধকে জীবন ও সাহিত্যের উপাদেয় সত্য

হিসেবে গ্রহণ করে এঁরা সাহিত্য আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করে দিয়েছেন এবং নিজেরাও ফুরিয়ে গিয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়েছেন।

অবক্ষয়ের কথা আজ আর বলার কিছু বাকি নেই—বিমূর্ত সাহিত্যও পানসে হয়ে পড়েছে। এখন সর্বভারতীয় 'হাঙ্গার' জাতীয় পুনর্গঠন—জাতীয় আর্তি হয়ে ওঠার। এই হয়ে ওঠার ব্যাকুলতাই দেখা দিয়েছে বিপন্ন বাস্তবের মধ্যে। বিশ্বের সব দেশের মানুষের মধ্যেই যেমন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার আশংকা ও ভয় দেখা দিয়েছে, দেখা দিয়েছে একে অন্যের জীবন ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকার আন্তরিক ইচ্ছা ও ব্যগ্রতা, চলেছে সক্রিয় প্রয়াস ; তেমনি ভারতেও—বাঙলা দেশ তো ভারতের অন্য রাজ্যগুলোর থেকে সব কিছু আগে ভাবে এবং করে থাকেই। সাহিত্যেও বিচ্ছিন্নতার বেসাতি অচল বলে রায় পাওয়া যাচ্ছে। তাছাড়া, দিবালোকের মতো স্পষ্ট, কেউ চান বা না, পৃথিবীটা আজ সমাজতান্ত্রিক অরবিটের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। মহাকাশের গ্রহ তারা চাঁদ এখন মানুষের পৃথিবীর অঙ্গদেশ হয়ে উঠেছে, শারীরিক বিস্ময়গুলো বিজ্ঞানের কল্যাণে খোলা চোখে দেখা যাচ্ছে, জন্ম-মৃত্যু মানুষের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করছে। সব কিছুতেই আমূল পরিবর্তন এসেছে। সাহিত্য এ পরিবর্তন থেকে বাদ থাকবে তা ভাবা বাতুলতা। নতুন মূল্যবোধ গড়ে তুলতে হবে পুরোনো মূল্যবোধকে নিগেট করেই। পবিপূর্ণ পরিবর্তনের উত্তাল ঘন-ঘটায় ব্যক্তির যে বিপন্নতা তা চরিত্রের দিক থেকে আমাদের আলোচিত সাহিত্যে প্রতিফলিত বিপন্নতা থেকে আলাদা রকমের। আজকের লেখক-কবিকে খুবই সতর্কতার সঙ্গে মৌল কারণগুলো অনুসন্ধান করে, দ্বান্দ্বিক চরিত্র বিশ্লেষণ করে তাকে ঐতিহাসিক সূত্রে গ্রথিত করে গুণগত পরিবর্তনের স্বরূপ উপলব্ধি করতে হবে এবং সাহিত্যে সমাজ ভরা ব্যক্তির অস্তিত্বের অভিব্যক্তি দিয়ে বিশ্ব ব্যাপারের মধ্যে তার আইডেন্টিটি নির্দেশ করতে হবে। এবং তা খুবই কঠিন। কঠিন বলেই সে কাজ ন্যস্ত লেখক কবিদের ওপর।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর ত্রিশ বছর বাদে—অনেক ডামাডোল এবং কুপিত ও ক্ষুধার্ত সম্প্রদায়ের অন্ধ প্রতিশোধপরায়ণতার শেষে এটা আশার কথা যে, লিটল ম্যাগাজিনগুলো পড়লে দেখা যায়, অতি সাম্প্রতিক কবি ও গল্পকারদের মধ্যে—এমন কি বে-আব্রু হাংরিদের মধ্যেও জগৎ ও জীবন সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা শুরু হয়ে গেছে। আশা করা অলীক নয় যে, নিকট ভবিষ্যতেই অতি সাম্প্রতিক কবি ও লেখকদের হাতে পুনর্জাগরণের মূর্তি গড়ে উঠবে। বলা বাহুল্য এই নতুন সাহিত্যে দরকার হলে, চাঁদ মঙ্গল বা শুক্র গ্রহের অজানা ভাষাকেও নিজ ভাষায়

প্রবাহিত করে এনে, মহাকাশের মালমশলা টেনে এনে সময় মানুষ ও পরিবেশের উত্থানকে সঠিক ভাবে উপস্থিত করার জন্যে কবি ও লেখকরা পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাবেন। লেনিন বা হো চি মিন যদি জীবনে ও বোধে বিদেশী বিষয় না হন সাহিত্যেও নন, লুমুম্বা কাস্ত্রোকে নিয়ে যদি সাহিত্যিক ভাবনা আসে, আসুক। স্বভূমে সন্ত্রাসবাদী এবং অটোক্র্যাটিক ক্রিয়াকলাপ যদি কোনো চেতনা জাগায় তা জাগুক। আর এই সমস্ত নিয়ে সুবে বাঙলাদেশে নতুন মর্জি ফুটিয়ে তোলবার জন্যে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলতে পারবে না, এ সিদ্ধান্ত পরিত্যজ্য! এজন্যে নিন্দাবাদও নিন্দনীয়। সাম্প্রতিক কালে যে ভাষা প্রচলিত তা জটিল সময়ের জটিল বিষয় ও ভাব প্রকাশে অসমর্থ। তাই নতুন ভাষা আবিষ্কারের প্রাণান্ত প্রয়াস করতে হয়েছে কবি ও লেখকদের। এই ভাষাটাকেও হয়ত বিদেশী কোনো লেখকের কাছে শিক্ষানবীশ থেকে বাংলা সাহিত্যে নিয়ে আসার চেষ্টা হয়েছে অন্যান্য আধুনিক বস্তুর মতো। লেখক গোটা বাঙলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন বলেই তা পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছে—মনে হয়েছে অচেনা বস্তু বলে। কিন্তু লেখকের বিচ্ছিন্নতা রোগ না থাকলে 'কাট মেথডে' লেখা হোক আর 'চাঁদে পাওয়া' ভাষাতেই লেখা হোক--লেখক আর পাঠকের মধ্যে সংযোগ স্থাপনে সে ভাষা বাধা হবার কথা নয়। লিটল ম্যাগাজিনগুলো এই এক্সপেরিমেন্টের ঝুঁকি বহন করছে এবং তা তাকে করতেই হয় ও করে। একথা খুব জোরের সঙ্গেই বলা যায়, এসব ক্ষুদে পত্র-পত্রিকার শতকরা ৯৯.৯৯ ভাগ রচনা হয়ত বাজেই হবে, কিন্তু ০০.০১ ভাগ যা থাকে তা অস্তিত্বের অভিব্যক্তি প্রকাশের ব্যাকুলতায় তাজা, সে আগেও যেমন হয়েছে, এখন হচ্ছে, তেমনি আগামী দিনেও হবে।

সব শেষে বলার যে, সাম্প্রতিক লেখালেখি আস্বাদন করতে হলে পাঠককে অচল থাকলে চলে না। মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল থাকবে অথচ পদশব্দ বিশেষজ্ঞ হবে তা ভাবা যায় না। বেশির ভাগ পাঠকেরই অন্ন চিন্তা চমৎকার এবং প্রাইমারী ফাইনাল, স্কুল ফাইনাল, হায়ার সেকেণ্ডারী, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শেষ পরীক্ষা পাশের পর আর পড়ার অভ্যাস থাকে না। চকিতে যে নতুন লেখা পড়ে তার পক্ষে শরৎচন্দ্র সত্যেন্দ্রনাথের লেখাকেই এই ১৯৭০ সালেও অতুলনীয়, অনবদ্য চিরায়ত সাহিত্য মনে হবে তাতে আর আশ্চর্য কি, মনেই তো হবে আধুনিক লেখা হিং টিং ছট! এ অবস্থা থাকে না যদি নিয়মিত পাঠাভ্যাস বজায় রাখা যায়। আর, লেখককে উন্নাসিকতা মুক্ত হয়ে যতটা সম্ভব পাঠকের

বোধের কাছাকাছি পৌঁছোনো দরকার। সাম্প্রতিক সাহিত্যিকদের স্মরণ রাখা দরকার যে, স্বাধীন ভারতের বিপন্ন জনসাধারণ কেবল প্রতিশ্রুতি পেয়েই রক্ত আর লাশ দিয়ে আলপনা কাটা পথ ধরে ঘরে ফিরে আসে, সাহিত্য ব্যাপারেও প্রতিদিন —বছরের পর বছর ধরে পণ্য সাহিত্যের মার খেয়ে—বেষ্টসেলার মার্কা বইয়ের কড়িগুণে আহত হয়ে লিটল ম্যাগাজিনে মুখ গুঁজে প্রতিশ্রুতি—জাতীয় সাহিত্যের প্রতিশ্রুতি রক্ষার দাবী করেছে এবং সুদীর্ঘদিন প্রতীক্ষা করে এখনও অসহিষ্ণু হয় নি। অভিযোগ করেছে কিন্তু প্রত্যাখ্যান করে নি। এখন মানুষ, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি সব কিছুরই কাঠামো পাল্টাচ্ছে ; টাইম স্পেস এবং ব্যক্তির আই-ডেন্টিটি নষ্ট হয়ে এক নতুন বিশ্ববোধের উদ্ভব ঘটছে ; জন্ম নিচ্ছে নতুন বিস্ময়। ফলে, ব্যবহারিক জীবনে কালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যে পাঠক সচল, তাকে তার নিজস্ব বোধের অনুভূতির এবং জীবন অভিজ্ঞতার সঠিক সত্য উন্মোচিত করে দেখাতে পারলে, তা যতই কঠিন হোক না কেন, পাঠকের অনাস্বাদ্য হবে না। এই পরিবর্তিত জগৎ জীবনের মৌল প্রকৃতিকে উদ্ধার করে নিজেদের কাছে এবং অন্যদের কাছে প্রকাশের তাৎপর্যেই নতুনতর সাহিত্যের সত্য আবিষ্কারের আন্দোলন---জাতির কামনা বাসনা সাধ উত্থান পতন আনন্দ বেদনা শিক্ষা সংস্কৃতির সার্বিক শক্তি সৌন্দর্য পরিবেশন করতে সমর্থ হবেন আগামী দিনের গল্পকার ও কবিরা, এই আশা করা যাচ্ছে।

শেষ কথা এই, যুগের ফ্রাস্ট্রেশন, বিপন্নতা, যন্ত্রণা, বিকৃতি ও অসহায়তা দিয়ে রচিত এবং আধুনিকতার তিন পর্যায়ের আন্দোলনের সাহিত্যিক ফলশ্রুতি বীজে শক্ত বিষ নিয়েই সৎসাহিত্য এবং এরই গর্ভ থেকে আজ জন্ম নিতে উন্মুখ হয়েছে শুধু কোলকাতার নয়—বাংলাদেশের সাহিত্য। যা হয়েছে, তা কালো রেনেসাঁসের ফল, সম্ভাবনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে বাংলা সাহিত্য, নানা দিক থেকে —এর মধ্যে প্রতিফলন ঘটছে দেশব্যাপী কর্মকাণ্ডের, জাগরণের এবং জীবনের।

বেলা-অবেলা

(পরিশিষ্ট)

সব কথা বলার পরও আরো কিছু বাকি থেকে যায়। পরিসর এখানে অল্প, লেখকেরও সামর্থের টানাটানি। তবু, আগামী লেখালেখির আয়োজন নিয়ে সময়ের কি ভাবনা এবং সমস্যা, সে সম্পর্কে দু-এক কথা না বলে নিলে নয়।

১॥ আগেই বলা হয়েছে, বাংলা সাহিত্য মূলত রাজনৈতিক আবহাওয়া থেকে উৎসাহ পেয়েছে এতদিন। যেটুকু দেখা যাচ্ছে, আগামী লেখালেখির সূচনাও তারই লক্ষণাক্রান্ত। দেশ এখন একটা সন্ধিক্ষণে উপস্থিত। সব দিকেই ওলোট পালোট। যারা ছিলো পিলসুজের তলায় অপাঙক্তেয়, তারা ক্রমশ আলো হতে সক্রিয়। এটা সত্য। ইচ্ছা থাক বা না, সব মুখে 'বিপ্লব', 'শ্রেণীসংগ্রাম'—'সমাজতন্ত্র'। গান্ধীবাদীদেরও মার্কসবাদের সুতো দিয়ে খদ্দর বোনার প্রয়াস। ১৯৪৭-এর পর রাতারাতি গান্ধী টুপী মাথায় দিয়ে যেমন সবাই কংগ্রেসী হয়েছিলো, তেমনি ১৯৬৭-র পর গুণ্ডা এবং পুলিশেও মুখোশ পাল্টেছে। মোট কথা, যে মার্কসবাদ নিয়ে ১৯৩০-এর সময়ে তরুণ লেখকরা নতুন সাহিত্যের আন্দোলন শুরু করেছিলেন, এখন রাষ্ট্র রাজনীতিতে তা প্রধান শক্তি। সাধারণ মানুষের একটা বিরাট অংশ আজ মার্কসীয় দর্শনের অনুগামী।

কিন্তু মার্কসীয় শিবির আজ শতধা বিভক্ত। ব্যাঙের ছাতার মতো দেশময় দেখা দিয়েছে ঘোরতর বিপ্লবী পার্টি। যাদের অনেকগুলোই মধ্যযুগীয় ধর্ম আন্দোলনের কায়দায় বিপ্লবী রাজনীতি চালাতে গিয়ে, সুবিধাবাদ এবং সংকীর্ণতাবাদকেই মূলত গ্রহণ করেছে। এরা মুখ্য শত্রু হারিয়ে শ্রেণী সংগ্রামের নামে অন্ধভাবে খুনের মহড়া দিচ্ছে। এর ফলে, শুধু কলকাতা নয়, গহন গ্রামেও গলাকাটা, পেটফাঁড়া লাশ পড়ছে। নরহত্যা নিছক ব্যক্তিগত আক্রোশেই হোক বা গুণ্ডাবদমায়েসের হাতেই হোক, কোনো না কোনো পলিটিকাল পার্টির সাপোর্ট পাচ্ছে। বাংলাদেশ হতচকিত। তবু এক ধরনের অরাজক উত্তেজনার কুচকাওয়াজ। যা-হোক, একটা কিছু পরিবর্তন চাই-ই চাই ভেবে মানুষ বুঝে বা না-বুঝে কোনো না কোনো পার্টির পক্ষে যে-কোনো রকম ধ্বংসলীলায়

অত্যুৎসাহী। কি পোষাকে, কি চালচলনে, আচার ব্যবহারে আর কি রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাহীন উদ্ভটত্ব আমদানী করে মানুষ আজ ধ্বংস-প্রবণ। ফলে, কিছুই আজ আস্ত থাকছে না। অন্যদিকে, প্রতিক্রিয়ার শিবিরও বুঝেছে যে তার আখের গুছিয়ে নিতে হলে আজ সর্বসাধারণের মধ্যে যে বিপ্লবের রুচি তৈরী হয়েছে, তাকে বিপ্লবীদের থেকেও চড়া গলায় উৎসাহ দিয়ে প্রতিবিপ্লবের পটভূমি তৈরী করতে হবে। তাই এরা একদিকে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মত করে এক এক সময় এক এক মার্কসবাদী পার্টির পক্ষে গলা দিচ্ছে, অন্যদিকে আওয়াজ দিচ্ছে 'গেলো গেলো সব গেল, জনজীবন বিপন্ন, গান্ধী-আশুতোষ রবীন্দ্রনাথ-সুরেন্দ্রনাথও রেহাই পেলেন না'। অর্থাৎ তারা চোরকে বলছে চুরি করতে, গেরস্তকে বলছে সজাগ থাকতে। মোটকথা, বাংলাদেশের মানুষ অনতিবিলম্বে একটা বড়রকমের ধাক্কার সম্মুখীন হতে যাচ্ছে। সংঘাত এবং সমন্বয়ের মধ্যে থেকে গোটা ভাবেতেই স্পষ্ট দুটো জোট মুখোমুখী লড়াকু হয়ে উঠছে। হারজিৎ ভবিষ্যতে।

এই অবস্থায়, কলকাতার দেওয়াল যখন অ্যানার্কোসিণ্ডিকালিজমের শ্লোগানে মুখর এবং কলকাতার মলাটে বিকৃত যৌনতার দৃশ্যাবলী যখন বাস্তব, ফুটপাথের বুকস্টলে তারই প্রতিফলন স্বাভাবিক। রাইফেল বাগানো গেরিলার ছাপওয়ালা বিপ্লবী গোলাগুলির কয়েক রাউণ্ড শব্দ আর কদাকার যৌনতা চড়ানো মেয়েমানুষ ছাপা মলাটের পিন আঁটা কিসসার তলায় দমবন্ধ হয়ে মারা পড়ছে সাহিত্য পত্রিকাগুলো। শহরে মুখ্য হয়ে উঠেছে রক্তারক্তির আক্রোশ এবং তারই সঙ্গে জঘন্য যৌন বিকৃতি। এস্টাব্লিশমেণ্টের পত্রপত্রিকা একদিন এ দুটোকেই একযোগে চালিয়ে মুনাফা করেছে। কিন্তু 'অশ্লীল সাহিত্য শ্রেণীশত্রুকেই সহায়তা করে, সেগুলো পুড়িয়ে ফেলো' এই দেওয়াল-লেখা যেন হৃৎকম্প ধরিয়েছে এমন ভান করে, চড়া গলায় বিপ্লব ত্বরান্বিত হোলো জানিয়ে জনগনকে সজাগ করতে আদাজল খেয়ে লেগে পড়েছে এস্টাব্লিশমেণ্ট। গলা কাটার খবর, স্কুল কলেজে হামলার খবর, তথাকথিত বিপ্লবী তৎপরতা যেটুকু হয় তার চারগুণ বেশি করে ছাপিয়ে একসঙ্গে ধর্ম ও জিরাফকে খুশি করতে মেতেছে। আসলে, নিজ উদ্দেশ্য থেকে সে একচুল সরে নি, চরিত্র বদলায় নি, শুধু ভঙ্গী শুধরে নিয়েছে। 'মানুষ', 'মানুষ রতন' এই দৃষ্টিকোণ থেকেই লেখানো এবং ছাপানো —আর তা 'বিবর' 'পাতক' ইত্যাদির উল্টোপিঠ। বিপ্লবীরা বা প্রগতিবাদীরা না বুঝুন, এস্টাব্লিশমেণ্ট এবং তার পাইক বরকন্দাজরা পাকা বিশেষজ্ঞের মতোই

হাওয়া বুঝতে পারে এবং সেই মতো প্রোডাক্ট বাজারে সরবরাহ করে। কখন মাংসলুচি চলবে আর কখন দুধভাত তা সমরেশ বসুর থেকে ভালো আর কেউ বুঝেছেন কি? বামপন্থী সরকারের আমলে সোস্যালিজম প্রবণতার হালচালে তিনি তাই 'মানুষ' 'মানুষ রতন' হাঁকেন আর বছর না ঘুরতেই বুরোক্র্যাটিক-অটোক্র্যাটিক দিনকালে 'বিশ্বাস' (শারদীয় দেশ ১৯৭০) নামক রসাল পদার্থটি ভেট দেন। বলাবাহুল্য 'বিশ্বাস' আমাদের পূর্ব বিশ্বাসকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং এক্ষেত্রে তাঁর পুরোনো পুঁজিও দেউলের দৌলত বলেই মনে হয়। সেই একই ঢঙে এঁর এবং এঁদের আজও অতিবিপ্লবী তরুণদের অ্যাটিচিউড ভাঙিয়ে লেখা তৈরী করার প্রয়াস। কিন্তু সাহিত্যিক ক্ষমতায় রাজনৈতিক-ক্ষমতা শিকারী তরুণরা বিশেষ কোনো তাৎপর্য সৃষ্টি করতে পারেন নি এখনো। সম্ভবত, তাঁদের সেদিকে দৃষ্টি নেই, দৃষ্টি দেবার প্রয়োজনীয়তাও বোধ করেন না বুঝিবা।

সাহিত্যকে যাঁরা প্রাণ মনে করেন, তাঁদের এ ব্যাপারে উদাসীন থাকলে চলে না। এস্টাব্লিশমেন্টের বিরুদ্ধে লড়তে হলে সততা নিয়ে লেখা সাহিত্যকেই উপযুক্ত অস্ত্র করে লড়াই করা উচিত। নিজেদের শক্তিশালী রচনা সংঘবদ্ধ প্রয়াসে ব্যাপক পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে হবে, এবং তা যে যায়ও তার নজির বাংলাদেশেই আছে। লিটল ম্যাগাজিন যে, যেখানে কয়েকজন বাঙালী বাস করে সেই ভিন রাজ্যে বা ভিনদেশেও পৌঁছে দেওয়া যায়, তার প্রমাণ একটিমাত্র হলেও আছে। আর মনে রাখা ভালো, মানুষ কেবল মাত্র ডালভাতের সমস্যা মিটলেই সন্তুষ্ট হতে পারে না। সাহিত্যের ক্ষুধা মেটাতে লিটল ম্যাগাজিনগুলোই আন্দোলন করে এবং নিত্য নতুন তরুণদের লেখা সরবরাহ করে।

২॥ শক্তিসামর্থ্যের দিক থেকে অতি সাম্প্রতিক লিটল ম্যাগাজিনগুলো বহুঅংশেই দীন এবং প্রায় কোনোটিরই নির্দিষ্ট কোনো চরিত্র নেই। দু-একজনে মিলে শুধু নিজেদের লেখা এবং অন্য পত্রিকায় নিজেদের লেখা ছাপানোর সুযোগ পেতে বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদকদের লেখা ছাপতে চটিচটি সংকলন পত্রিকা প্রকাশ করে শিশুমৃত্যুর খতিয়ান বাড়াচ্ছে। লেখার হাত তৈরী না করে, —বক্তব্য, অভিজ্ঞতা এবং অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করার ক্ষমতা অর্জন না করেই তরুণ লেখকদের অনেকের এস্টাব্লিশমেন্টের কাগজে লেখা ছাপানোর জন্যে দৃষ্টিকটু তৎপরতা এবং উগ্র লোভ দেখা যাচ্ছে। কল্লোল বা কৃত্তিবাসের লেখকদের মতো সংঘশক্তি ও গোষ্ঠী নিষ্ঠাও এঁদের নেই। ফলে, এই এক্ষুনি যেসব লেখালেখি হচ্ছে তার বেশির ভাগই কিছু হয়ে উঠছে না। অনেক লিটল ম্যাগাজিন এবং তার

লেখকদের মূল উদ্দেশ্যই যেন বাজারে পত্রপত্রিকার 'বিশেষ স্নেহ' পাওয়া। এটা লিটল ম্যাগাজিনের ঐতিহ্য এবং চরিত্র বিরোধী। মনে রাখতে হবে, লিটল ম্যাগাজিন বেপরোয়া, সে লেখক তৈরী করে, পাঠকের রুচি তৈরী করে—সে এস্টাব্লিশমেন্টের লেজুড়বৃত্তি করে না। কিন্তু লোভ এবং অক্ষমতা নিয়েই অধিকাংশ লিটল ম্যাগাজিন ও তার লেখক এখন নির্লজ্জ।

৩॥ কথা হতে পারে, 'যস্মিন দেশে যদাচার'। চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে, চরিত্রভ্রষ্টতাই এখন জাতীয় চরিত্র। যেমন, প্রতিক্রিয়াশীল ও তথাকথিত প্রগতিশীলদের চারিত্রিক অবস্থাটা এখন যাহা-৫২ তাঁহা-৫৩—যাঁহা-মার্কিন-বিরোধিতা তাঁহা চীন-রাশিয়া বৈরীতা। একই সঙ্গে অ্যানার্কোসিণ্ডিকালিজমকে মদত দেওয়া এবং পররাষ্ট্রের এজেন্ট হিসেবে কাজ করা এস্টাব্লিশমেন্টকে বোঝা যায়। কেননা দীর্ঘদিন ধরে নানা কাজকর্মের মাধ্যমে সে বুঝিয়ে দিয়েছে, সে তাই। কিন্তু বিদেশী দূতাবাসের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে কবিতা গল্প পড়ে, নিয়মিত সাহিত্য আলোচনায় যোগ দিয়ে পয়সা পাওয়া এবং তার কড়িতে সুদৃশ্য ঝকঝকে বই ছাপানো ও মার্কিনী অথবা সোভিয়েত হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে তুমুল জেহাদ জানিয়ে যুগীয় সাহিত্য আন্দোলনের নেতৃত্ব একসঙ্গে করার প্রয়াস লেখকদের চরিত্র সম্পর্কে প্রশ্ন জাগায়—তার সমাজনিষ্ঠায় সন্দেহ আসে। আগেই বলা হয়েছে, মোটা দাগে এখন দুটো শিবিরই বর্তমান। ফলে, লিটল ম্যাগাজিন পরিচালকদের ও তার লেখকদের এই অবস্থার খপ্পরে পড়তে হবে, তাতে আর আশ্চর্য কি? তবে, আশার কথা কিছু কিছু তরুণ লেখকদের এ সম্পর্কে টনক নড়ছে।

৪॥ সিনেমা পত্রিকা এবং 'বিবাহিতদের জন্য' টিকমারা যৌন পত্রিকাগুলো সম্পর্কেও তরুণ লেখকদের সচেতন থাকা দরকার কয়েকটি টাকার জন্যে অনেক তরুণ লেখক হয়তো ঐসব পত্রপত্রিকায় লেখা ছাপাতে বাধ্য হন। ফলে, তাঁর লেখক চরিত্রকে খাটো করতেই হয়। বেগবান প্রেরণায় তিনি যা লেখেন বা লিখতে চান ঐসব পত্রিকা ব্যবসায়ী এবং তার পাঠকের কাছে সে লেখার বিশেষ কোনো মূল্য নেই। যৌন চেতনায় বিকৃতির সুড়সুড়ি দেয়া ছাড়া এবং আবোল-তাবোল যৌনক্রিয়াকাণ্ডকে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ হিসেবে চালানো ছাড়া যে উদ্দেশ্য ঐসব পত্রপত্রিকার মালিক-সম্পাদকের মধ্যে কাজ করে, তা জনসাধারণের দুর্বলতাকে দোহন করে 'অর্থ' আনা। ফলে, যদি তরুণ লেখক সাচ্চা জীবন সম্পর্কিত লেখাও তাতে ছাপান, যৌন পত্রিকার অর্বাচীন পাঠক তাতে ভুল করেও

চোখ দেয় না, কেননা, তার নেশা ধরানোর জন্যে অন্য বহু কিছুই তাতে অঢেল থাকে। আর একটা কথাও স্মরণীয় যে, তরুণ লেখক কিছুদিন পর্যায়ক্রমে ওসব কাগজে লিখলে, তার লেখার হাত পড়ে যেতে বাধ্য। এবং পরে সে লেখককে সত্যিকারের সাহিত্যকার হিসেবে গ্রহণ করতেও আপত্তি ওঠে। তাঁরই সৃষ্ট ভুসি ও আবর্জনায়, যদি কিছু ভালও লিখে থাকেন, তা চাপা পড়ে যায়।

৫ ॥ কোনো আদর্শে লেখক 'কমিটেড' থাকবেন কিনা এ সম্পর্কে সাংঘাতিক বিতর্ক আছে। কেউ কেউ বলেন, লেখক কোনো আদর্শের প্রতি কমিটেড থাকলে তিনি তাঁর স্বাধীনতা হারাতে বাধ্য। আবার কেউ কেউ তা অস্বীকার করেন। এ সম্পর্কে কোনো একটার পক্ষেই পাকা সিদ্ধান্ত দেওয়া যায় না। তবে দেখা গেছে, লেখককে কোনো না কোনো ধরনের আদর্শ বা দলীয় আদর্শের প্রতি কমিটেড থাকতেই হয়। এবং থাকেনও। তবে, কোনো আদর্শকেই সম্ভবত লেখকের পক্ষে 'ডগমা' হিসেবে গ্রহণ করার ফল শুভ হয় না। লেখকের মধ্যে এর ফলে ভয়ঙ্কর এক দ্বন্দ্ব উপস্থিত হতে বাধ্য এবং পরিণামে আদর্শটাকেই বড় করে নিয়ে লেখা ছেড়ে দিতে হয় তাঁকে। অন্যদিকে, আবার, 'অবাধ স্বাধীনতা' বলেও কিছু থাকতে পারে না সাহিত্যে, তা হয়ে ওঠে স্বেচ্ছাচার। স্বেচ্ছাচারিতা আর যাই পারুক না কেন, সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারে না। সাহিত্য মহত্তম শিল্প। স্বেচ্ছাচারিতার শিল্প কতদূর মহৎ, তা নিয়ে আলোচনা সমালোচনারও আবশ্যকতা আছে। তবে যাঁরা 'আমরা স্বাধীনতার চেয়ে বেশি চাই, আমরা চাই স্বেচ্ছাচার' বলে লেখালেখি করেছেন, তাদের কোনো না কোনো আদর্শের প্রতি কমিটমেন্ট না থাকলে, যা লিখেছেন এবং যা নিয়ে এই দলিল তাঁদের মেজর লেখক বলে সম্মান দেয়, তা সৃষ্টি হতে পারতো না। নতুন লেখকরা অবশ্যই এ সম্পর্কে নিজ নিজ সিদ্ধান্তে পৌঁছবেন, আশা করা যায়। সমস্ত দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে সব্যসাচীর মতো লেখার এই সময়। ১৯৭০ নতুন পদক্ষেপের ও পুরোনোর মাঝখানকার 'নো ম্যানস্ ল্যাণ্ড'।

পুনশ্চ

'পুনশ্চ' উত্থাপনের প্রয়োজন এমন অনিবার্য হয়ে উঠবে আগে তা বুঝতে পারা যায় নি। আমার অনবধানতার জন্যেই বাংলা গদ্যপদ্য আন্দোলনের এই দলিলে যথাক্ষেত্রে এখানে উল্লেখিত গল্পকার ও কবির নাম না থাকাটা দলিলকে অসম্পূর্ণতা দোষে দুষ্ট করতো—হয়তো এখনও করছে।

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশচন্দ্র গুপ্ত, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, ভবানী মুখোপাধ্যায়, রামপদ মুখোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় রায়, প্রশান্ত চৌধুরী, তরুণ কুমার ভাদুড়ী, সুরজিৎ বসু, বুদ্ধদেব গুহ প্রমুখ লেখককে একটা স্রোত ধরে এখানে উপস্থিত করা যাচ্ছে। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় যে, আধুনিক বাঙালী মানসিকতার দ্বিধাদ্বন্দ্ব সংঘর্ষ সমন্বয় ও সম্ভাবনার দর্পণ হিসেবে ১৮৭২-এ 'বঙ্গদর্শন'-এর আত্মপ্রকাশ যেমন একটা অবিস্মরণীয় ঘটনা, তেমনি, ঠিক একই বছরে বাঙালী মানসতার সার্থক প্রতিফলন হিসেবে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা'র আত্মপ্রকাশও। আধুনিক উপন্যাসের প্রথম যুগে প্রায় সব সামাজিক-পারিবারিক উপন্যাসই সবে গড়ে-ওঠা শহরের সমস্যাকে আশ্রয় করে দাঁড়িয়ে উঠতে চেয়েছে। কিন্তু, স্ফুটনোন্মুখ ধনিক সভ্যতার শাহরিক চরিত্রটি প্রায় কারুর কাছেই স্পষ্ট না থাকায়, ফিউডাল সমাজের চিত্রচরিত্র ও সমস্যার মধ্যে অস্পষ্ট শাহরিকতাকে উৎকটভাবে চাপিয়ে দিয়ে সমসাময়িক লেখকরা যে সব উপন্যাস রচনা করেছেন, তার কোনোটিই তেমন সার্থক হতে পারে নি। এদিক থেকে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ই প্রথম যিনি উনিশ শতকীয় মানস পরিমণ্ডলে ফিউডাল সমাজের পারিবারিক সমস্যাটিকেই মুখ্য বিষয় করে অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ ভাবে নীতিধর্মে আস্থাশীল থেকে বাঙালী সমাজের করুণ গার্হস্থ্য রূপটি 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন এবং সামাজিক উপন্যাসের পরি

স্বরকে সদ্ব্যবহার করে উপন্যাসটিকে একটি অম্লান চিহ্নে পরিণত করেছেন। পরবর্তী দিনগুলোতে রথী মহারথীরা উপন্যাসে ও ছোটগল্পে যুগান্তর আনলেও সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে যেমন তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তেমনি ছোট গল্পের জগতে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় একটি শ্রদ্ধেয় নাম। 'রত্নদীপ' 'সিঁদুর কৌটো'-র কথা মনে রেখেও বলা যায়, প্রভাতকুমার ছোট গল্পেই অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং হৃদয়-সমস্যাকে গভীর দরদ দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন এবং তা জটিলতাহীন ভাষায়। তাঁর উপন্যাস পাঠকের মনে হতে পারে যে, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলো এককেন্দ্রিক নয়, সেগুলো কতগুলো ছোটগল্পেরই সমাহার। একেবারে ভূমিকা বর্জিত পদ্ধতিতে সমস্যা উত্থাপন করে এবং গল্পের কাঠামোতে কঠিন পরিমিতি বোধের পরিচয় দিয়ে তিনি সাম্প্রতিক গল্পকারদের জন্যে ভূমি প্রস্তুত করতে পেরেছেন। কবিত্ব নেই, অতি-মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নেই তাঁর লেখালেখিতে ; কিন্তু গল্পের প্রাণ শক্তি হিসেবে আছে একটা নিগূঢ় কৌতুকবোধ। নানা দিক থেকেই প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে বাংলা ছোট গল্পের একটা অন্যতম প্রধান খুঁটি বলা যায়।

বাংলা উপন্যাসকে নতুন মর্জি ও রুচি অনুসারে অবয়ব দেবার ব্যাপারে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনেরও তিনি অন্যতম হোতা। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তর লেখালেখি বিচারে স্পষ্টতই দেখা যাবে যে, যৌনতা এবং অপরাধ পরায়নতার মনস্তত্ত্ব নিয়েই তিনি নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন। 'সংস্কার', 'বিপর্যয়' 'পাপের ছাপ' তাঁর তীব্র মননশীলতার পরিচায়ক। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা মূলত রবীন্দ্রনাথের লেখার গর্ভেই জাত –তাতে শুধু যুক্ত হয়েছে কিছু বৈদেশিক মশলা। 'রূপের ফাঁদ' 'পঙ্কতিলক' প্রভৃতি উপন্যাসে কিছু সার্থকতা হয়ত এসেছে, কিন্তু তাঁর ছোটগল্পগুলোর ব্যাপারে, 'হয়ত' শব্দটি ব্যবহারের কোনো সুযোগ নেই। 'পঞ্চদশী' 'বরণ ডালা' গ্রন্থের কিছু গল্পই তার প্রমাণ।

আধুনিকতার দ্বিতীয় পর্বে ফ্রয়েড ও মার্কস বাংলা গদ্যেপদ্যে তুমুল তোলপাড়-কারী 'ফুয়েল' হয়ে দেখা দিয়েছিলেন। আমরা দেখেছি, এ দুটিকে অস্ত্র করে এসেছে বুদ্ধদেব বসুর আত্মকেন্দ্রিক জেহাদ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর সমাজবহির্গত উৎকেন্দ্রিক স্বেচ্ছাচার, প্রেমেন্দ্র মিত্রর মধ্যবিত্ত নিয়ে পাঁচালী এবং যুবনাশ্বর (মণীশ ঘটক) নিচুতলার আঁধারের ক্লেদ-কলতানি নিয়ে আলোড়ন। এঁদের সঙ্গেই এসেছিলো অন্যতর আর একটা দিক এবং তা জগদীশচন্দ্র গুপ্তর আত্যন্তিক

নির্জন ও নিঃসঙ্গতার চর্চা। তাঁর জীবন ভঙ্গিতে এমন এক ধরনের বৈজ্ঞানিকতা এবং নিরাসক্তি কাজ করেছে যা তাঁর গল্পে বা অন্যান্য লেখার মধ্যে একটা মরবিড অ্যাটিচিউডের পরিচয় নিয়ে এসেছে। 'রতি ও বিরতি' 'শ্রীমতী' 'রোমন্থন' 'তাতল সৈকতে' প্রভৃতি জগদীশচন্দ্র গুপ্তের এই মানসিকতার পরিচয় বহন করে। এই যুগেরই আর কয়েকটি বিশিষ্ট নামের মধ্যে উচ্চার্য উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী (মহাস্থবির), মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় এবং সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় যাঁরা সম্পূর্ণ বাঙালীয়ানায় রসস্নিগ্ধ কাহিনী রচনার ধারাকে প্রশস্ততর এবং গভীরতর করেছেন। 'ভারতী' গোষ্ঠীর প্রচ্ছায়ায় থেকে এঁরা ছিলেন ইতিবাচক জীবন-বোধে জারিত এবং তারই প্রতিফলন দেখা যায় এঁদের রচনায়।

পরবর্তী অধ্যায়ের সূচনায় পূর্বপরিকল্পিত তত্ত্বভিত্তিক গল্প ও কাহিনী লিখিয়ে হিসেবে প্রবোধকুমার সান্যালের নাম উল্লেখযোগ্য। রচনা করতে বসে তিনি ভাল-মন্দ-পাপ-পুণ্য সত্যাসত্য সম্পর্কে নিজের মতো করে তত্ত্ব বানিয়ে সেটিকে নায়ক নায়িকার ওপর চাপিয়ে দিয়ে কাহিনী তৈরী করে পাঠকদের বিবাহের উপহার দেবার উপযোগী করে পরিবেশন করেছেন। লিখেছেনও প্রচুর। সুসংবদ্ধ আখ্যান এবং রচনা ভঙ্গিতে পরিচ্ছন্নতা দেখিয়ে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 'চুয়াচন্দন' 'মগ্নমৈনাক' 'রাজদ্রোহী' 'কানু কহে রাই' ইত্যাদির গল্প-কাহিনীতে পাঠকদের তৃপ্ত করেছেন যথেষ্ট এবং তা স্বাদে প্রবোধকুমার সান্যালের 'বনহংসী' 'নবীন যুবক' 'আঁকাবাঁকা' 'নিশিপদ্ম' 'প্রিয়মুখ চন্দ্রা' ইত্যাদির মতোই। প্রবোধ কুমারের হাত থেকে বাংলা সাহিত্য সম্ভবতঃ প্রথম সার্থক ভ্রমণোপন্যাস 'মহাপ্রস্থানের পথে' পেয়েছে; এবং শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাধারণ গল্প-উপন্যাস বা ডিটেকটিভ কাহিনী লোপ পেলেও তাঁর ইতিহাসাশ্রিত ছোটগল্পগুলি টিঁকে থাকবে বহুদিন। এঁদের সমসাময়িক আরেক প্রফিউস ঔপন্যাসিক সরোজকুমার রায়চৌধুরী 'কল্পনা করুন বাংলার একটি পল্লীগ্রাম' বলে উপন্যাস (হংসবলাকা) শুরু করলেও 'ময়ূরাক্ষী' 'গৃহকপোতী' প্রভৃতি উপন্যাসে গ্রাম বাংলাকে বলিষ্ঠ ভাবেই আনতে পেরেছেন। তেমনি নগর জীবনের (নাগরী) সমস্যাকে 'কালোটাকা'র চোখে দেখেছেন, দেখেছেন 'তিমির বলয়'। তবে বেশী লেখার যা দোষ, সেই ঢিলে ঢালা ব্যাপারটা এসে পড়েছে তাঁর লেখায় যদিও নরনারীর অভিনব সম্পর্কের 'অনুষ্টুপ ছন্দ' এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। এই প্রসংগে স্মরণীয় জ্যোতির্ময় রায় যিনি 'উদয়ের পথে'র মতো সিরিয়াস লেখা থেকে 'টাকা আনা

পাই' ও 'কাঁচা মিঠে'র স্বচ্ছ আস্বাদে সকৌতুকে প্রশ্ন তুলতে পারেন 'ছেলে কার ?' ভবানী মুখোপাধ্যায় ও রামপদ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন স্বল্প—এ সময়ে এটাই একটা গুণ—তবে এঁদের লেখার মান বিচার করবে কাল ; হয়তো কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

সাম্প্রতিক পূর্ব সময়ের জনমনোরঞ্জন লেখালেখির ক্ষেত্রে যাঁরা সিদ্ধহস্ততা দেখিয়েছেন, তাঁদের দলের ডগামধ্যলেজে বিচরণ করেন বেদুইন, ধনঞ্জয় বৈরাগী, প্রশান্ত চৌধুরী, তরুণ কুমার ভাদুড়ী, সুমথনাথ ঘোষ প্রমুখ লেখকরা। অনেকেই চটকদারী ভাষায় বিস্ময় রসের বস্তু আমদানী করে পাঠকদের প্রীত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। অন্যদিকে শিবরাম চক্রবর্তী ব্যঙ্গবিদ্রূপের চাবুক হেনে কখনো বা নিছক সুড়সুড়ি দিয়ে পাঠককে হাসতে বাধ্য করেছেন। অথচ এঁদের পাশাপাশি থেকেই সুধীর করণ বিষয়ে ভাবনায় কিছু নতুনত্বের স্বাদ দেবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর 'অন্য পুরুষ' মনে রাখবার মতো বই। আর, সোমনাথ লাহিড়ীর 'কলিযুগের গল্প'র গল্পগুলো চিন্তা চেহারা ও বিষয়ে অন্য দিগন্তের ইঙ্গিতবহ। পাণ্ডিত্যের সংগে সাহিত্যকে মেলাতে পেরেছিলেন শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

এর পরেই সম্ভবত এসে পড়েন অদ্রীশ বর্ধন, কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন মাইতি, মৃত্যুঞ্জয় মাইতি, সুনীল ঘোষ, অশোক গুহ, কুমারেশ ঘোষ এবং বুদ্ধদেব গুহ প্রমুখ লেখকরা। কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অদ্রীশ বর্ধন গোলগাল লেখার বিরোধী হলেও ঝাঁপিয়ে পড়ে টাটকা তাজা কিছু আবিষ্কার করতে পারেন নি। তৈরী হয়েছে কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ছায়া ছায়া রাতে' অদ্রীশ বর্ধনের 'রূপোর টাকা'। অনুবাদে মুন্সীয়ানা দেখালেও অশোক গুহর মৌলিক উপন্যাস বড়ো একটা দাগ কাটে না। সেদিক থেকে সুনীল ঘোষ বেশ খানিকটা ছাপ রাখতে পারেন। এঁদেরই উত্তর সাধক বুদ্ধদেব গুহ এবং আরো অনেকে। প্রবল উত্তেজনা এবং আবর্তের মধ্যে দুর্ধর্ষ ঝুঁকি নিয়ে লেখালেখি চালাবার দিনে, ভাষা ও আঙ্গিক নিয়ে তুলকালাম আন্দোলনের ভরাকোটালের ভেতরে থেকেও তিনি 'হলুদ বসন্ত'য় 'বন বাসর' রচনা করেছেন এবং জনতা পাঠকের জন্যে যাঁরা 'মোটা ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা' করে দিয়েছেন এতকাল, তাঁদের মধ্যে নিজেকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছেন। অথচ বীরেন্দ্র দত্ত ও সুরজিৎ বসু খুব নগন্য কিছু গদ্য লিখলেও নিজেদের তেজী কলম নিয়ে বাংলা গদ্যের মোড় ফেরানোর আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। সুরজিৎ বসু এক সময় পাঠককে খুবই ধাক্কা দিয়েছিলেন, পাঠক নিষ্ক্রিয় থাকলে তাঁর লেখার মধ্যে

প্রবেশ প্রায় অসম্ভব। এছাড়া সম্রাট সেন, সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীলকুমার ঘোষ, পুলকেশ দে সরকার, শচীন ভৌমিক, বিক্রমাদিত্য, কণাদ গুপ্ত, চিরঞ্জীব সেন, নিমাই ভট্টাচার্য, রণজিৎ সিকদার ও অগ্নিমিত্রকে নিছক গল্প ও কাহিনী-কারদের লেখা ভর্তি পত্রিকায় দেখা যায় মাত্র। এঁদের প্রায় কোনো লেখারই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা চোখে পড়ে না।

এই অবসরে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করতে হয় রাজশেখর বসুর নাম। বঙ্কিমচন্দ্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ নির্মল হাস্যরস স্রষ্টারা যে সমুন্নত ধারা সৃষ্টি করে মর্মস্পর্শী বেদনার তীব্রতাকে হাসির ঝর্ণাধারায় সিক্ত করে পরিবেশন করেছেন, সেই ধারাকেই আপন স্বভাব ধর্মানুযায়ী গাম্ভীর্য, পরিমিতি বোধ এবং মননের সূক্ষ্মতা দিয়ে বিষয়কে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ন্ত্রিত করে নতুন মানসতার আধুনিক পাঠকের কাছে পরিবেশন করেছেন পরশুরাম বা রাজশেখর বসু। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে অভিধান 'চলন্তিকা' এবং 'হনুমানের স্বপ্ন' ইত্যাদি একই জনের কীর্তি। তাঁর 'কজ্জলী' 'গড্ডলিকা' 'ধুস্তরী মায়া' 'কৃষ্ণকলি' ইত্যাদি গল্প আধুনিক কৌতুক-রসিক লেখকদের মৌলিক প্রেরণা জুগিয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ের তরুণ লেখকদের লেখায় হাস্যরসের যে তীক্ষ্ণতা এবং মননের তীব্রতা, তা রাজশেখর বসুরই উত্তরাধিকার। পরশুরামের দুই সার্থক উত্তর-সাধক পরিমল গোস্বামী এবং দীপেন্দ্রকুমার সান্যালকেও এই অবসরে মনে করতে হয়। সম্ভবতঃ হাল আমলে দীপেন সান্যালের মতো আর কেউই বিদ্রূপকে এমন চোখা এবং বিষাক্ত করে তুলতে পারেন নি—এদিক থেকে সত্যিই তিনি 'নীলকণ্ঠ'।

একটা কথা মানতেই হবে যে বাংলা সাহিত্যের স্থান বিশ্ব সাহিত্যে উঁচুর দিকে হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ এর বৈচিত্র্য। ইনডিভিজুয়াল লেখক কতটা কি দিয়েছেন তা তর্কসাপেক্ষ হলেও মানতে হবে যে দিলীপকুমার রায়ের 'বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলেনা' এমন বিষয়ে হাত দেওয়া বা আনন্দকিশোর মুন্সীর শুকনো ডাক্তারী ব্যাপারকেও রমনীয় পাঠ্যবস্তু করে তোলা, প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর স্মৃতিকথা 'মহাস্থবির জাতক-এর তুলনায় কিছুই-না হলেও ধীরাজ ভট্টাচার্যের পুলিশ বা চলচ্চিত্র নায়ক জীবনের স্মৃতিতে বিচরণ কিংবা জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তীর পুরাণকে রি-ক্রিয়েট করার প্রয়াস, আর সমসাময়িক বিশ্বের এক একটি দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে সৌরীন সেনের ভূ-পর্যটন অবশ্যই বাংলা সাহিত্যকে বৈচিত্র্যমণ্ডিত করেছে। (তবে শেষোক্ত বিষয়টি

বর্তমানে একটা সত্যাসত্যরহিত অস্থিতকর ফ্যাশানে দাঁড়াচ্ছে—এও বলতে হবে।) এসবের পাশাপাশি ঐতিহাসিক রচনা ও অনুবাদ কর্মের ধারাটিও চলেছে। দেবেশ দাশের 'রাজোয়ারা'র অপভ্রংশ হলেও মোগল আমল নিয়ে দিব্যি লিখে চলেছেন বারীন্দ্রনাথ দাশ এবং অমরেন্দ্র দাশ তাঁদের ভুরি ভুরি ঐতিহাসিক উপন্যাস। এ সব বই কাটছেও খুব, কোনো পাঠক কোনো প্রশ্ন তোলেন না ঐতিহাসিক যাথার্থ্য ব্যাপারে—এ যেন তাঁরা জেনে গেছেন যে ইতিহাসের ছিটেফোঁটাও এর মধ্যে নেই। কিন্তু ঐ জাতীয় কারবারই চলছে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম কালের দেশনেতাদের জীবন নিয়ে—এবং সেটা মারাত্মক। সুভাষ কি বলছেন তা আর যাচিয়ে দেখছে কে—বেশ রোমান্টিক গপ্পোর মত খানিকটা পড়া গেল, এইতেই খুশী হয়তো পাঠক। অনুবাদ সাহিত্যের দিকে লেখক-পাঠকের নজর অনেকটা 'এরাটিক'। হঠাৎ একটা ঢেউ উঠলো তো বেশ কিছু বিদেশী গল্পপদ্যর অনুবাদ করা হলো, পড়া হলো, আবার চুপ হয়ে গেলো। যাই হোক অনুবাদ ব্যাপারে এই দশকের প্রত্যাশা অনেকখানি তুলসী সেনগুপ্ত আর বাণীউৎপল মুখোপাধ্যায়ের কাছে।

গল্পবিভাগে পুনশ্চর প্রয়োজন শেষ হবে মহিলা ঔপন্যাসিকদের স্মরণ করে। ভবিষ্যতের মহিলা-কাহিনীকাররা ঐতিহাসিক সূত্রে গ্রথিত থাকবেন নিরুপমা দেবী, অনুরূপা দেবী, অমলা দেবী, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, সীতা দেবী, আশা দেবী, সুলেখা সান্যাল, নীলিমা দাশগুপ্তা এবং মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের সংগে। বাঙালী পাঠক মাত্রেই জানেন নিরুপমা দেবী বা অনুরূপা দেবীর ঘনিষ্ঠ পরিবার বা গ্রাম চিত্রণ থেকে আজকের মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য কতটা ব্যাপকতর পরিবেশে এগিয়ে এসেছেন।

আধুনিক বাংলা কবিতার বেলাতেও কালিদাস রায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী ও সজনীকান্ত দাসকে রবীন্দ্রচ্ছটার মধ্যে শহীদ হিসেবে ধরে নিয়ে এক্ষণের কবিতা আন্দোলনের স্বরূপ বুঝতে হয়। মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্র-ছায়াতে লালিত হয়েও তাঁরা কিছু কিছু রচনা দিয়ে পাঠকদের জয় করে নিয়েছেন। কালিদাস রায়ের কবিতায় ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের বহু সম্পদই আহৃত। কিন্তু কবিতা প্রায়ই ছন্দিত বাক্য। তবু তাঁর 'ছাত্রধারা' সর্বকালীন শিক্ষকদেরই বেদনাগাথা। তাঁর কবিতায় একটা মরমী মনের পরিচয় প্রায় সর্বত্রই বর্তমান। যতীন্দ্রমোহন বাগচীর কবিতায় গ্রাম গেরস্ত বাংলার যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা খুবই দুর্লভ। তিনি সাধারণ গার্হস্থ্য জীবনের স্নেহমায়ামমতা প্রেমভালবাসা-দরদ প্রভৃতি সুকোমল বৃত্তিগুলোকে তপ্ত আবেগ ও অনুভূতির অকৃত্রিমতায়

মধ্যে থেকে পরিবেশন করেছেন। এঁদের দুজনের কবিতারই মূলধন অকৃত্রিম হৃদয়স্পর্শী আবেগ। কিন্তু তা হলেও অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সময়ের কবি জসীমউদ্দিন যেমন করে পাঠকের 'কলিজা' ধরে টান বসিয়ে দেন—প্রেমভালোবাসা সুখদুঃখ আনন্দবেদনার মর্মস্পর্শী ও উজ্জ্বল সুরপ্রতিমা তৈরী করেন, তেমন আবেগ ও স্পর্শকাতরতা সেদিনের এবং এদিনের লেখালেখির জগতে একান্তই দুর্লভ। 'রাখালী' ও 'নক্সী কাঁথার মাঠ'-এ জলজলা ছায়াতরুময় পূববাংলাকে অপার সৌন্দর্যে ও সুরে প্রকাশ করেছেন কবি। শব্দে শব্দে ছবি মূর্ত হয়ে উঠেছে। 'বালুচর' নিয়ে এসেছে কৃষাণ-কৃষাণীর তাজা প্রেমের স্বাদ। এ যেন জলাবাংলার অনবদ্য 'ব্যালাড'। বাংলা কাব্যে জসীমউদ্দিনের কোনো উত্তরাধিকারী নেই। বিগতযুগের এস্টাব্লিশমেন্ট বিরোধী কাগজ 'শনিবারের চিঠি'র দুঁদে সম্পাদক ও মারমুখী সাহিত্য সমালোচক সজনীকান্ত দাশ 'পান্থপাদপ'-এর ছায়া খুঁজেছেন কবিতায়।

খুব তুলকালামী না হয়েও কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য কবিতা আধুনিকতার বিভিন্ন পর্বে কিছু অপেক্ষাকৃত অপরিচিত হাতে রচিত হয়েছে। ১৯৬৯-৭০-এ লেনিন শত-বার্ষিকীতে বাংলাদেশে যে লেনিন বিষয়ক কবিতার সাঁড়াসাড়ি বান ডেকে গেলো, সুদীর্ঘদিন আগে, যখন কেউ কল্পনাও করেননি লেনিনকে নিয়ে কবিতা রচনা করা যায়, তখন যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্যই একমাত্র কবি, যিনি লেনিন প্রশস্তি রচনা করেছিলেন আন্তরিক আবেগে। তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র অন্যান্য কবিতায় বাঁধন ছাড়া আবেগেরই প্রাধান্য। অন্য কোনো কারণে না হোক, এই একটি মাত্র কারণেই তিনি বাংলা কবিতার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া, নিশিকান্ত, কামাক্ষী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, শিবনারায়ণ রায়, চিত্ত ভট্টাচার্য, সুনীলকুমার নন্দী, মৃগাঙ্ক রায়, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবিন্দ চক্রবর্তী, মহিমরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, অরুণাচল বসু, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, বটকৃষ্ণ দে, বিতোষ আচার্য, রঞ্জিৎ সিংহ, অমরেন্দ্র চক্রবর্তী, বিজয়কুমার দত্ত, ক্ষিতীশ দেব সিকদার, দুর্গা মজুমদার, কল্যাণ দাশগুপ্ত, কুশল মিত্র, অসীম সোম, নিশিনাথ সেন, রমেন্দ্র আচার্য, অমৃততনয় গুপ্ত, বীরেন্দ্র রক্ষিত প্রমুখ কবিরা বাংলা কবিতার বিভিন্ন অধ্যায়ে নামোল্লেখ দাবী করতে পারেন। ৺দিলীপ সেনের নামও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচিত যুগলক্ষণ এঁদের কবিতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। নিশিকান্ত আবেদন জানিয়েছেন, 'জ্যোতির্ময়! দাও দীক্ষা, অপূর্ব রূপান্তর সাধনের মন্ত্র দাও আমায়; / সে

মন্ত্রের শক্তিতে সত্তায় / বিলুপ্ত হবে মেদিনীর / মাতঙ্গ প্রকৃতির / মদমত্ত অভিযান, রাক্ষসী কামনার /বুভুক্ষার / বিক্ষুব্ধ আসক্তি; / জীবনের অভিব্যক্তি / হবে মূর্ত, ঐ বিরাট তাল-বিটপীর নীলাম্বর চুম্বিত / আত্মার মতো, বর্তিকা / জ্বলবে অন্তরে ঐ ওজস্বান তৃণ-শিখার অক্ষরে।' কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টো-পাধ্যায়ের কবিতার এ উদাত্ত উচ্চারণ নেই, তার বিপরীত অভিব্যক্তিই তাঁর কবিতায়: 'এই গাছ শুধু দেখছে / নদীর ওপারের বন ছুঁয়ে চাঁদ উঠে এলো, / নটীর মতো নিটোল, চোখের নীচে ক্লান্তি. / প্রথমে লাল, পরে শাদা, হাস-পাতালের নার্সের মতো।' এ ছাড়া আছে একটা তীব্র ব্যঙ্গের কশাঘাত। সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের 'অতসী' 'অনুরাধা' 'জ্বলন্ত তলোয়ার' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের কিছু কিছু কবিতা পাঠককে তীব্রভাবে আলোড়িত করে। বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় যুগ নির্যাস হিসেবে যা পেয়েছেন, তাতে জেনেছেন, 'যে-তুমি পাঙ্কের সমাহার, / পৃথিবীর চোখে উদ্বেল ক'রে প্রপঞ্চ পারাবার / চলে যাবে তবু যাবে নাকো প্রকৃতই, / মরতা নিয়েই মরতাকে জয় ক'রে হবে অমৃতই।' এ বোধ প্রাপ্তিতে দুঃখ জ্বালা সোচ্চার হয়ে ওঠবার কথা নয়। দক্ষিণারঞ্জন বসু কিন্তু খুবই আশাবাদী এবং বলেন 'সেই সুন্দর আগামী দিনের স্বপ্নই শুধু আমি / দেখছি না আজ, বিজয় উৎসবের বাজনাও যেন / ক্রমশই আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি, আর / আপন মনে একান্তে গুনগুনিয়ে, সেই প্রত্যাশায় / আনন্দের গান গেয়ে চলেছি।' গীতিকার হিসেবেও খ্যাত গোবিন্দ চক্রবর্তীর কবিতাতেও শোনা যায় আশা ও প্রত্যয়: 'উঠেছে রৌদ্র খরতর...এখন আমার বনে সূর্যমুখী ফোটে'।

এই আশাবাদই ধ্বনিত হয়ে উঠেছে রামেন্দ্র দেশমুখ্যের মধ্যেও। নিজের 'আত্মার অন্ধকারে' বহুকাল দাঁড়িয়ে থেকেও তিনি শুধিয়েছেন 'নবজাতকের দেরী কত? / ভারতীয় মনোতরঙ্গ বাংলার সাগরে বিক্ষুব্ধ। / ওগো, রাত্রির শেষ কখন? / ওগো, সময় সমুদ্রের কখন জোয়ার? / আর কত দেরী?' এবং সময়ের উচ্চকণ্ঠ রাজনৈতিক আন্দোলনের চিন্তায় উদ্দীপ্ত হয়েই রামেন্দ্র দেশমুখ্যের পথের শরীক হয়েছেন মৃগাঙ্ক রায়—'মৃত্যু এসে হনন করেছে / প্রাণকে। চুপেচুপে তার মহোৎসব / এ ভীরু সন্ধ্যায়। / তখন ক্রোধের পতাকা হাতে / রক্ত লাঞ্ছন, রুদ্র বৈশাখের দিকে / যাত্রা; তখন দীপ্তমরুমন; তখন / একী বহ্নি করেছ বপন হে বাংলা, / হৃদয়ে আমার!' বাক্য সংক্ষেপে এবং শব্দ উদ্ভাবনে মৃগাঙ্ক রায় দক্ষ কারিগর। তাঁর কবিতায় 'ক্ষুধার কাব্য' প্রণেতা

বৈদ্যনাথ চক্রবর্তীর মতো উচ্চকণ্ঠ বা অসংযমী আবেগ প্রকাশের কথা হৃদয়ভরা ক্রোধ ও জ্বালা নিয়েও মৃগাঙ্ক রায় কল্পনা করতে পারেন না। তীব্র আশাবাদী হয়েও বেদনা ও রোমান্টিক আর্তিতে হৃদয় বাসনাকে আন্তরিক ভাবে প্রকাশ করেছেন সমকালীন কবি চিত্ত ভট্টাচার্য তাঁর 'পত্ররাগ' এবং 'ঝর্ণাতলার নির্জনে' কাব্যগ্রন্থে। তাঁর কবিতায় উত্তেজিত কণ্ঠ নেই, শব্দে ক্রোধ জড়িয়ে নেই। কবিতার মধ্যে সর্বত্রই একটা চাপা ক্ষোভ এবং বেদনা বয়ে চলে।

স্বাধীনতার মুহূর্তে হাউইয়ের মতো জ্বলে ওঠা বিপ্লব নিভে গেলে যে নিরক্ত জ্বালা সৃষ্টি হয়েছিলো এবং ক্রোধ ক্ষুধা আত্মিক হাহাকার ছড়িয়ে ব্যক্তির আইডেনটিটি রক্ষার যে সমস্যা বাংলা কবিতায় সোচ্চার হয়ে উঠেছিলো তাতেই উদ্‌ভ্রান্ত ও দিশাহীন হয়ে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন রামেন্দ্র দেশমুখ্য ও মৃগাঙ্ক রায় প্রমুখ কবিদের সমসাময়িক ও অপেক্ষাকৃত অনুজ কিছু কবিও। এঁদের কেউ কেউ কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য কবিতা লিখেছেন বটে কিন্তু নিজস্ব কোনো 'অ্যাটিচিউড দাঁড় করাতে না-পারার জন্যে অনেকেই নির্বাপিত দীপশিখার দলে ভিড়ে গেছেন। এঁদের মধ্যে গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় খুঁজে পেয়েছেন 'পরিচিত মুখগুলি', শিবনারায়ণ রায় জিজ্ঞাসা তুলেছেন 'কোথায় তোমার মন'। সুনীল কুমার নন্দী 'প্রকীর্ণ সবুজে নীলে' অবসিত যদিও তাঁর কবিতার গম্ভীরতা এবং সিরিয়াসনেস তাঁকে সমসাময়িক কবিদের মধ্যে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এছাড়া অসীম সোম খুঁজেছেন 'বিকল্প সরণী', গোপীনাথ দে জেনেছেন 'কেউ হয়নি কেরায়', রঞ্জিৎ সিংহকে সম্ভবত পীড়িত করেছে '[illegible]ন কাল পাত্র'। তিনি তাঁর নিজস্ব প্রথায় দেখেছেন, 'আমি প্রত্যেকের চলবার মত / একটিও উদার রাস্তা দেখতে পাচ্ছিনা। যত মেকি / স্তোকবাক্য স্তব্ধ করা অস্তিত্বের সিঁড়ি। পদানত / ম্লান অক্ষি। আমি বলি, প্রত্যেকে উন্মাদ কিম্বা কেউ / উন্মাদ নয়। আসলে যে তীরন্দাজ সে স্বাভাবিক, / যে যে তীরবিদ্ধ তারা সমুদ্রের মত্ততায় ঢেউ— / আমি এই বুঝি।' এই কেন্দ্র থেকেই হয়েছে অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর 'বিক্ষত অন্বেষণ' আর মনুজেশ মিত্র ঘোষণা করেছেন 'আমি অমল আঁধারে'। এসব কবিতায় মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়দের কালের একাকিত্বের জ্বালাই স্পষ্ট। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'একান্তর'এর কিছু কবিতার স্বাদ স্পষ্টতই নতুন। কিন্তু তিনি থেমে গেছেন। কবিতার ব্যাপারে অমরেন্দ্র চক্রবর্তীরও কবিতায় যখন একটা শুদ্ধ এবং পরিচ্ছন্ন মর্জি ফুটে উঠছিলো ঠিক সেই সময়েই কেন যে তিনি আত্মগোপন করেছেন, বুঝে ওঠা কষ্টকর। সমস্ত দিকে লক্ষ্য রেখে অল্প কিছু

কবির মতো দুর্গাদাস মজুমদার 'গাণ্ডীবে টঙ্কার দিন' বলে আবেদন জানালেও সময়ের সার্বজনীন রোগে আক্রান্ত হয়েই নিশিনাথ সেন বাধ্যতামূলক ভাবে চালিয়েছেন 'নির্জন সংলাপ' এবং ক্ষিতীশ দেব সিকদার 'আমি বাতায়নে বসে নিয়মিত ভাবি / ভালোবাসা হারিয়েছে সমুদ্রের ছায়া বরাবর / তাকে বুকে ফিরে পেতে হবে, স্বনির্মিত প্রতিটি প্রতীকে— / রক্ত, মাটি, শঙ্খ, সন্ধ্যা, বিষণ্ণতা একই কবিতায়' বলে স্নিগ্ধ মেজাজের কিছু কবিতা রচনা করেছেন মাত্র। অলোকেন্দু শেখর পত্রীর 'লীলা'য় কিছু ছিমছাম কবিতা লক্ষ্য করা যায়। এ ছাড়াও বহু নতুন মুখ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় উঁকিঝুঁকি মারছে।

বাংলা কাব্য কথায় পুনশ্চ-র যতি টানা যায় অবিস্মরণীয়া কামিনী রায়কে স্মরণ করে যাঁর কবিতার পংক্তি আজও লোকমুখে প্রবাদের মতো শোনা যায়। অন্যান্যদের মধ্যে পুরোনো কালের মহিলা কবি জীবনানন্দ-জননী কুসুমকুমারী দাশী এবং অধুনা-প্রবীণা উমা দেবীর নাম উল্লেখ্য।

পুনশ্চ প্রসঙ্গে এ কথাটা বলা দরকার যে এই পরিচ্ছেদে যে সমস্ত সাহিত্য-কারদের উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের সকলের সম্পর্কে আলোচনার অবকাশ বা প্রয়োজন হয়তো এ গ্রন্থে ছিল না। হাল আমলের লেখালেখি যে উটকো নয় এবং দেশকালপাত্রের কার্যকারণে তার যে অন্যতর কিছু হওয়া সম্ভব নয়, এটা দেখাই ছিলো এ গ্রন্থের মূল বিষয়। সেই প্রয়াসে ঐতিহাসিক পরম্পরা অনুসরণ করার ব্যাপারে সাধ্যমত নজর রাখা হয়েছে বলেই বিশ্বাস। কিন্তু দলিলের সম্মানে জ্ঞানত কোনো নামোল্লেখ বাদ রাখা যায় না বলেই এত দীর্ঘ পুনশ্চ-র উপস্থাপন। বলা বাহুল্য, যে নামাবলী উল্লেখ করাই গেছে মাত্র।

বাংলা গদ্যপদ্য আন্দোলনে শিশু সাহিত্যের প্রসঙ্গও হয়তো আলোচনায় আসে না। কিন্তু শিশু সাহিত্য করতে গিয়েও যাঁদের ভাষা নির্মাণ এবং বয়স্ক চিন্তা আধুনিকতার স্পষ্ট চিহ্নে চিহ্নিত, তাঁদের নাম দলিলে উহ্য থাকতে পারে না। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায়, লীলা মজুমদার, পুণ্যলতা চক্রবর্তী, সুখলতা রাও, সত্যজিৎ রায় অর্থাৎ উপেন্দ্রকিশোর পরিবার শিশু সাহিত্যে আধুনিকতার সার্থক প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। এঁদের লেখালেখির আবেদন শাশ্বত শিশুর চির আধুনিক পরিবারের কাছে। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী-পরিবার আধুনিক শিশুর অনুভূতি ও বোধ মিলিয়েই চিত্র-ভাষায় এবং ধ্বনি-লেখায় শিশুর জন্যে নতুনতর বাক্ শিল্পের জগৎ তৈরী করেছেন। জগৎ জোড়া খ্যাতির শিখরে উঠেও সত্যজিৎ রায় আপন পারিবারিক ঐতিহ্যকে অস্বীকার

করেননি বা পাশ কাটিয়ে যান নি। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায়, শান্তা দেবী ও সুনির্মল বসুর খাত ধরে শিশুসাহিত্যের ধারা বেগবান হয়ে আসতে আসতেও তা হয়ে উঠেছে এখন মরাগঙ্গা। 'মৌমাছি' 'স্বপন বুড়ো', জ্যোতির্ম্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলেন ঘোষ, সরলাবালা সরকার প্রমুখ শিশু সাহিত্যিকরা কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য লেখালেখি করলেও ঘরে ঘরে কাচ্চা-বাচ্চারা মুখ শুকনো করে আছে। এ জন্যে কোনো আন্দোলনও নেই।

ইতিমধ্যে ক্রমশ বাংলা সাহিত্য আন্দোলনের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটছে। উত্তরবঙ্গে গড়ে উঠেছে এক গোষ্ঠি তরুণ সাহিত্যিক। বার করছেন তাঁরা নানা পত্রপত্রিকা। 'আধুনিক সাহিত্য' নামের পত্রিকা জড়োও করেছে কিছু সম্ভাবনাপুর্ণ লেখককে। দুর্গাপুরে চলেছে 'নিম সাহিত্য' আন্দোলন—তাঁরাও চেষ্টা করছেন ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল মানসিকতায় বেড়ে ওঠা কিছু লেখককে একত্র করতে। নবদ্বীপের 'অজ্ঞাতবাস' ক্রমশঃ নিয়মিত হয়ে উঠছে ; কিন্তু বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের 'পারাবত' সম্ভবত ভগ্নপক্ষই হয়ে গেল। প্রবাসী বাঙালীও পিছিয়ে থাকছেন না। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে চলেছে বাংলা সাহিত্য চর্চা, পত্র পত্রিকাও প্রকাশিত হচ্ছে। আমেদাবাদ (রঞ্জন), জব্বলপুর (সাতপুরা), বিলাসপুর (পদক্ষেপ), ভাগলপুর (লেখা) এবং বিশেষ করে জামশেদপুরের 'কৌরব' আন্দোলনের কাছে প্রত্যাশা অনেক। আসামের শিলচর বা গৌহাটি তো আগাগোড়াই বাংলা সাহিত্যকে পুষ্ট করে এসেছে। উল্লেখযোগ্য যে অমৃতসরের পাঞ্জাবী তরুণ বাংলায় কবিতা লিখছেন। জয়পুরে এবং দিল্লীতে আরো দীর্ঘদিন থেকেও অসীম বসু বা বিকাশ দাশ বাংলাকে স্থায়ী কিছু দিয়ে যেতে পারেন কিনা দেখা যাক। তবে, দুঃখের ব্যাপার এই যে, কলকাতাই এ সবাইকার সাহিত্য ভাবনায় আমূল জেঁকে বসে আছে, ফলে বাংলা সাহিত্য সারা বাংলার বা ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রের স্বতন্ত্র চিহ্ন নিয়ে এখনো উপস্থিত হতে পারছে না। আর, যে সব লেখকরা বাংলার নিজস্ব প্রকৃতি গন্ধ ঐশ্বর্য এবং বাস্তব বিষয় ও প্রাচুর্য নিয়ে তাজা আর অকৃত্রিম ভাষায় সাহিত্য করছেন বা স্থানকাল-পাত্রকে আত্মস্থ করে সাহিত্যে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন, এবং যাঁদের ব্যাপারে বাংলাকে উদ্দেশ্য করে অমিতাভ দাশগুপ্তের ভাষায় প্রশ্ন করা যায় 'সে আমার সহোদর, কুন্তী, তাকে কোথায় রেখেছ ?'—পূব বাংলার সেই সব সহোদর কবি ও গল্পকারদের সম্পর্কে এ গ্রন্থে কিছুই বলা গেলো না।

গ্রন্থ তালিকা

[১৯৪১-এর পরে জীবিত ছিলেন বা আছেন অথবা জন্মেছেন এবং লিখছিলেন বা লিখছেন অথবা লিখতে শুরু করেছেন যাঁরা, তাঁদের ১৯৭০ অব্দি প্রকাশিত উপন্যাস গল্প ও কবিতার বইয়ের এই তালিকা আমরা নিখুঁত বা সম্পূর্ণ বলে মনে করি না—সে প্রত্যাশা রইলো ভবিষ্যতের কোনো সংকলকের কাছে।]

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—অমাবস্যা, আজন্ম সুরভি, নীল আকাশ, বেদে, ঊর্ণনাভ, আসমুদ্র, আকস্মিক, কাকজ্যোৎস্না, প্রচ্ছদপট, রূপসী রাত্রি, কাঠ খড় কেরোসিন, চন্দন মল্লিকা, রাঙাধূলা, অনিমিত্তা, রতি ও আরতি, আদিম লিপ্সা, দময়ন্তীর শাড়ি, এক অঙ্গে এত রূপ, অন্তরঙ্গ, হইস্‌ল, স্বাদু স্বাদু পদে পদে, প্রথম কদম ফুল, ইন্দ্রাণী, একটি প্রেমের কাহিনী, কাঁটা ও ফুল, কো এডুকেশন, ছিনিমিনি, জননী জন্মভূমিশ্চ, ঢল ঢল কাঁচা, তুমি আর আমি, তৃতীয় নয়ন, দিগন্ত, নবনীতা, নায়ক নায়িকা, পাখনা, বিবাহের চেয়ে বড়ো, মুখোমুখি, যায় যদি যাক, যে যাই বলুক, অকাল বসন্ত, অধিবাস, কালো রক্ত, টুটা ফুটা, ডবল ডেকার, দ্বৈপায়ন, প্রেমের গল্প, যতনবিবি, রুদ্রের আবির্ভাব, সংকেতময়ী, সঙ্গিনী রঙ্গিনী, শ্রেষ্ঠ গল্প

অজয় গুপ্ত—চন্দ্র সূর্যের আকাশ

অজয় দাশগুপ্ত—সূর্য তামসী, ত্রি-নায়িকা, স্বপ্নের মঞ্জিল, প্রেম রমণীর

অজিত দত্ত—কুসুমের মাস, পাতাল কন্যা, অজিত দত্তের কবিতা সংগ্রহ, জানালা, শ্রেষ্ঠ কবিতা, নষ্টচন্দ্র, পুনর্নবা, ছায়ার আলপনা, ছড়ার বই

অঞ্জন কর—আমি অন্ধকারে খেলে বেড়াচ্ছি

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদেশিনী, সমুদ্রে মানুষ, সমুদ্র পাখির কান্না, একটি জলের রেখা, শেষ দৃশ্য, নগ্ন ঈশ্বর, পুতুল

অতীন্দ্রিয় পাঠক—অক্ষর, স্থবিরের চোখ, শব্দস্পর্শদৃশ্য ইত্যাদি, মঞ্চ থেকে পৃথিবী

অদ্বৈত মল্লবর্মন—তিতাস একটি নদীর নাম

অদ্রীশ বর্ধন—রুপোর টাকা, কাঁচের জানালা, বোবা কাহিনী, ভয়ঙ্কর, রহস্য সন্ধানী কাদার ঘনশ্যাম

অনন্ত দাশ—গত সূর্যের আলো

অনুরূপা দেবী—বিচারপতি, বিবর্তন, বাগদত্তা, মা, মন্ত্রশক্তি, পথহারা, পোষ্যপুত্র, মহানিশা, চক্র

অন্নদাশঙ্কর রায়—কামনা পঞ্চবিংশতি, নূতন রাধা, উড়কি ধানের মুড়কি, আগুন

অশোক গুহ—গোরাকালার হাট, মধুর মিলন, প্রবাহ
অশোকবিজয় রাহা—ভানুমতীর মাঠ, উড়োচিঠির ঝাঁক
অসীম রায়—ফুটপাথে ফুলের গল্প, গোপালদেব, দ্বিতীয় জন্ম, শব্দের খাঁচায়, দেশদ্রোহী, রক্তের হাওয়া
অসীম সোম—বিকল্প তরণী
আনন্দ বাগচী—চকখড়ি, স্বকাল পুরুষ, প্রলাপ, স্বগত সন্ধ্যা, বিকালের রঙ, তেপান্তর
আনন্দকিশোর মুন্সী—পরম লগনে, রাঘব বোয়াল
আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত—উজ্জয়িনী, সেই আমি সাংবাদিক
আলোক সরকার—অন্ধকার উৎসব, বিশুদ্ধ অরণ্য, আলোকিত সমন্বয়
আশা দেবী—লোহার বাসর, মল্লিকা
আশাপূর্ণা দেবী—জল আর আগুন, প্রেম ও প্রয়োজন, অনির্বাণ, সাগর শুকায়ে যায়, মিত্তিরবাড়ি, বলয়গ্রাস, অন্তর বাহির, সময়ের স্তর, সেই দিন এই রাত্রি, দোলনা, রাতের পাখি, জালিকাটা রোদ, বিজয়ী বসন্ত, জীবন স্বাদ, নেপথ্য নায়িকা, নবনীড়, জনতার মুখ, গাছের পাতা নীল, যাহা চাই তাহা, প্রথম প্রতিশ্রুতি, অন্যমাটি অন্যরঙ, লঘু ত্রিপদী, শুধু তারা দুজন, যোগ-বিয়োগ, নির্জন পৃথিবী, অতিক্রান্ত, কণকদীপ, নবজন্ম, আলোর স্বাক্ষর, রঙের তাস, অতলান্তিক, মনোনয়ন, উড়ো পাখী, পল্লীমহল, ভাগ্যি যুদ্ধ বেধেছিল, স্বপ্ন শর্বরী, অগ্নিপরীক্ষা, অনবগুন্ঠিতা, আর এক ঝড়, উন্মোচন একটি সন্ধ্যা একটি সকাল, উত্তর লিপি, জলছবি, তিন ছন্দ, দুই নায়িকা, নীল পর্দা, ভোরের মল্লিকা, বৃত্তপথ, মুখর রাত্রি, মেঘ পাহাড়, রাণী শহরের কানাগলি, শশীবাবুর সংসার, শেষ রায়, আকাশ নীল সমুদ্র নীল, সুখের চাবি, সুবর্ণলতা, সোনার হরিণ, সোনালী সন্ধ্যা
আশিস ঘোষ—সময়
আশিস সান্যাল—শেষ অন্ধকার প্রথম আলো, মৃত্যুদিন জন্মদিন
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—চলাচল, পঞ্চতপা, দীপ জ্বেলে যাই, আর্তমানব, জীবনতৃষ্ণা, যার যেথা ঘর, প্রতিবিম্বিতা, সবরমতী, বকুল বাসর, স্বয়ংবৃতা, নাগ শৃঙ্গার, কাল তুমি আলেয়া, বাজীকর, দীপায়ন, সাত পাকে বাঁধা, অজানা ঘর, চল যাই জঙ্গলে, রাগশর, নগরপারে রূপনগর, উত্তর বসন্তে, শিলাপটে লেখা, রোশনাই, জানালার ধারে, দুজনার ঘর, নবনায়িকা, প্রতিহারিণী, মহুয়া কথা, আলোর ঠিকানা, অগ্নিমিতা, অলকা তিলকা, একজন মিসেস নন্দী, কালচক্র, চিত্তরঞ্জন উপন্যাস, নতুন তুলির টান, বলাকার মন, সমুদ্র সফেন
উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—শ্রেষ্ঠ গল্প, মাটির পথ, যদি জানতেম, আশাবরী বিদুষী ভার্যা, মুক্তার আলো, দিকশূল, অন্তরাগ, অভিজ্ঞান, সোনালী রঙ, ছদ্মবেশী, অমলা, রাজপথ, শশীনাথ, অমূল তরু, যৌতুক, কমিউনিস্ট প্রিয়া

উমা দেবী—অরণ্য মন
উৎপল চক্রবর্তী—আমার স্বপ্নের মুখ
উৎপল কুমার বসু—পুরী সিরিজ, নরখাদক, চৈত্রে রচিত কবিতা
কবিতা সিংহ—পাপ পুণ্য পেরিয়ে, সহজ সুন্দরী, সরমা, সোনা রূপোর কাঠি
কবিরুল ইসলাম—কুশল সংলাপ, তুমি রোদ্দুরের দিকে
কমলকুমার মজুমদার—নিম অন্নপূর্ণা, অন্তর্জলি যাত্রা, শ্যাম নৌকা, গোলাপ সুন্দরী, মল্লিকা বাহার, সুহাসিনী পমেটম, পিঞ্জরে বসিয়া শুক
কমলেশ সেন—সমুদ্র শহর মানুষ, প্রচ্ছন্ন স্বদেশ, সজ্জিত মানুষ
করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়—শতনরী
করুণাসিন্ধু দে—কণ্ঠে পারিপার্শ্বিকের মালা
কল্যাণ দাশগুপ্ত—একটি দিনের জন্মদিন
কল্যাণ সেন—দূরের আকাশ
কল্যাণ চক্রবর্তী—যদি জানতেম
কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—শিবির, রাজধানীর তন্দ্রা, মায়াবী সিঁড়ি, হলদি ঝর্ণা
কালিদাস রায়—বল্লরী, পর্ণপুট, ব্রজবেণু, হৈমন্তী, পূর্ণাহুতি, আহরণ, সন্ধ্যামণি
কালীকৃষ্ণ গুহ—রক্তাক্ত বেদীর পাশে, বুকের ভিতরে থাকে ঘনিষ্ঠ সংসার
কালীপদ কোঙার—এতো আলো অন্ধকার
কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত—দিনযাপন, স্বর ও অন্যান্য কবিতা
কুমকুম দে—অলৌকিক যে আঁধারে
কুমারেশ ঘোষ—কাঠের ঘোড়া, সাগর নগর, বিনোদিনী বোর্ডিং হাউস, কখনো মেঘ কখনো তারা, জল যৌবনা
কুমুদ রঞ্জন মল্লিক—কাব্য সম্ভার, অজয়, উজানী
কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়—ছায়া ছায়া রাতে, ভোর হলো বিভা[illegible], গোধূলির কুসুম, কালো চোখের তারা, কিন্নর কিংশুক, বাদশাহী মশনদ, লাশকাটা টেবিল, কুহেলী বিলীন, ঝিল্লীর কান্না, আবিল পঞ্চম
কৃষ্ণ ধর—এ জন্মের নায়ক, কালের নিসর্গ দৃশ্য, আমার হাতে রক্ত, যখন প্রথম ধরেছে কলি
গজেন্দ্রকুমার মিত্র—পুরুষ ও রমণী, চতুর্দোলা, রাত্রির তপস্যা, কমা ও সেমিকোলন, স্মরণীয় দিন, কঠিন মায়া, রক্তকমল, আমি কান পেতে রই, পৌষ ফাগুনের পালা, কলকাতার কাছেই, বাহির বিশ্ব, মনে ছিল আশা, রমণীর মন, এক প্রহরের খেলা, উপকণ্ঠে, আকাশলিপি, নারী ও নিয়তি, বহ্নিবন্যা, আবছায়া, কোলাহল, বিধিলিপি, সমারোহ, স্ত্রীয়াংশ্চরিত্রম্, ভাড়াটে বাড়ি, দহন ও দীপ্তি, জন্মেছি এই দেশে, সুপ্তি সাগর, নীলকণ্ঠী, তিন সঙ্গিনী, একদা কি করিয়া, জীবন স্বপ্ন, জ্যোতিষী, দেহ দেউল, প্রভাত সূর্য, রাত মোহনা, সোহাগপুরা, মহা সন্ধ্যা, কেতকী বন, চাঁদমালা, জীবন আরো বড়ো, দুর্ঘটনা, নববধূ, নব যৌবন প্রেরণা, মালা চন্দন, রূপ তরঙ্গিমা

জগদীশচন্দ্র গুপ্ত—পাইক শ্রী মিহির প্রামাণিক, গতিহারা জাহ্নবী, রোমন্থন, তাতল সৈকতে, শ্রীমতী, রূপের বাহিরে, সুতিনী, রতি ও বিরতি, মেঘাবৃত অশনি, যথাক্রমে, দুলালের দোলা, মহিষী, লঘু গুরু, অসাধু সিদ্ধার্থ, উদয়-লেখা, বিনোদিনী, শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী

জগন্নাথ চক্রবর্তী—নগর সন্ধ্যা, কারার প্রার্থনা, পার্কস্ট্রীটের ষ্ট্যাচু ও অন্যান্য কবিতা, মহাকাল, মহাদিগন্ত

জরাসন্ধ—লৌহকপাট ১-৪, শুভসংবাদ, জায়গা আছে, সপ্তবহ্নি, ন্যায়দণ্ড, বন্যা, পরশমণি, ছবি, ছায়াতীর, পসারিণী, অপর্ণা, নমিতা, মানস কন্যা, মসীরেখা, একুশ বছর, পাড়ি, তামসী, মহাশ্বেতার ডায়েরি, আবরণ, দেহশিল্পী

জসীম উদ্দিন—নকশী কাঁথার মাঠ, রাখালী, বালুচর, রূপবতী, সোজন বাদিয়ার ঘাট, ঠাকুরবাড়ির আঙিনায়, পূর্ণিমা

জয়ন্তী সেন—তুষারে রোদ

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী – স্বর্ণগঙ্গার মাঠ, কুমারীকন্যার কাহিনী, নীরঞ্জনা নদীর ঢেউ

জীবনানন্দ দাশ—ধূসর পাণ্ডুলিপি, মহাপৃথিবী, সাতটি তারার তিমির, বনলতা সেন, রূপসী বাংলা, বেলা অবেলা কালবেলা, শ্রেষ্ঠকবিতা

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী—বারো ঘর এক উঠান, মীরার দুপুর, স্বর্গোদ্যান, খেলনা, সূর্যমুখী, নীলরাত্রি, বসন্ত রঙীন, নিশ্চিন্তপুরের মানুষ, প্রেমের চেয়ে বড়ো, হৃদয়ের রং, সমুদ্র অনেক দূর, গ্রীষ্ম বাসর, হরিণ মন, ঝড়, শালিখ কি চড়ুই, আলোর ভুবন, বন্ধুপত্নী, খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর, ট্যাক্সি-ওয়ালা, প্রিয় অপ্রিয়, চন্দ্রমল্লিকা, দিনের গল্প রাত্রির গান, পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা, আকাশলীনা, নাগ কেশরের দিনগুলি, প্রণয় এক প্রাণ শিল্প, অবেলায়, গোলাপের নেশা, নিঃসঙ্গ যৌবন, পার্বতীপুরের বিকেল, শ্বাপদ শয়তান ও সোনালী মাছেরা

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র—মধুবংশীর গলি

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়—পিরামিডের মাথায় মানুষ, অন্তরমনা, এ পরবাসে

জ্যোতির্ময় রায়—উদয়ের পথে, ভেঙেছে দুয়ার, টাকা আনা পাই, কাঁচামিঠে, ছেলে কার

তরুণ সেন—বৃক্ষের কাছে কৈফিয়ৎ

তরুণ সান্যাল—মাটির বেহালা, অন্ধকার উদ্যানে যে নদী, রণক্ষেত্রে দীর্ঘবেলা একা, তোমার জন্যেই বাংলাদেশ

তরুণ কুমার ভাদুড়ী—সন্ধ্যাদীপের শিখা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—ধাত্রীদেবতা, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, রাইকমল, কালিন্দী, সন্দীপন পাঠশালা, হাঁসুলীবাঁকের উপকথা, নাগিনীকন্যার কাহিনী, কবি, আগুন, মন্বন্তর, চৈতালী ঘূর্ণি, অভিযান, যোগভ্রষ্ট, উপকথা, আরোগ্য নিকেতন, বিচারক, সপ্তপদী, রাধা, স্বর্গ মর্ত্ত, মাটি, তিন শূন্য, মহাশ্বেতা, মণি বৌদি, প্রেমের গল্প, শ্রেষ্ঠ গল্প, মঞ্জরী অপেরা, পঞ্চপুত্তলী, একটি চড়ুই

পাখি ও কালো মেয়ে, কান্না, জঙ্গলগড়, চিরন্তনী, কালবৈশাখী, মহানগরী, মানুষের মন, যাদুকরী, শুকসারী কথা, অরণ্যবহ্নি, ডাক হরকরা, বিপাশা, নতুনবৌদি, ইমারত, সংকেত, গন্নাবেগম, উত্তরায়ণ, না, প্রতিধ্বনি, স্থলপদ্ম, শিবানীর অদৃষ্ট, নারী রহস্যময়ী, বিষ পাথর, যতিভঙ্গ, গল্প পঞ্চাশৎ, কালান্তর, গুরুদক্ষিণা, চাঁপাডাঙার বউ, তামস তপস্যা, দুই পুরুষ, নিশিপদ্ম, নীলকণ্ঠ, পদচিহ্ন, ভুবনপুরের হাট, অ্যাকসিডেন্ট, আয়না, চিন্ময়ী, ছলনাময়ী, জলসাঘর, তমসা, দিল্লীকা লাড্ডু, বেদেনী, বিস্ফোরণ

তারাপদ রায়—তোমার প্রতিমা, ছিলাম ভালোবাসার নীল পতাকাতলে স্বাধীন, কোথায় যাচ্ছেন তারাপদবাবু

তুলসী মুখোপাধ্যায়—বিষুবে রৌদ্রের ডালপালা, আর সহ্য হচ্ছে না

তুষার চট্টোপাধ্যায়—ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনি, জানালা ও অন্যান্য কবিতা

তুষার রায়—ব্যাণ্ডমাস্টার

দক্ষিণারঞ্জন বসু—আরো সূর্যের কাছে, আলোয় আলো, অলক্ষ্যে বিকেল, এক আকাশে অনেক তারা, আশা যখন বৃষ্টি, রাত্রিকে দিনকে

দিনেশ দাশ—দিনেশ দাশের কবিতা, কাঁচের মানুষ, অহল্যা, ভুখ মিছিল

দিব্যেন্দু পালিত—রাজার বাড়ি অনেক দূরে, মধ্যরাত, সেদিন চৈত্রমাস, সিন্ধু বারোয়াঁ, শীত গ্রীষ্মের স্মৃতি, ভেবেছিলাম

দিলীপকুমার রায়—অঘটন আজও ঘটে, ভাবি এক হয় আর, অঘটনের ঘটা, অভাবনীয়, ধূসরে রঙিন

দিলীপকুমার সেন—উত্তর তরঙ্গের নায়ক

দীপক চৌধুরী—পাতালে এক ঋতু, শঙ্খবিষ, দাগ, মনের মধ্যে মন, ঘেরাও, ললিতা প্রসঙ্গ, রোটেপিং, আবৃত আকাশ, খড়িমাটির স্বর্গ, নীলে সোনায় বসতি, ফরিয়াদ, এক যে ছিল রাজা, কুমারী কন্যা, মধুঋতু, রোয়াক, মালদা থেকে মালাবার, তিন পাহাড়

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—তৃতীয় ভুবন, চর্যাপদের হরিণী, অশ্বমেধের ঘোড়া, কাছের মানুষ, আগামী

দুর্গাদাস মজুমদার—গাণ্ডীবে টঙ্কার দিন, আগুন খেলার জ্বালা

দুর্গাদাস সরকার—একটি গাছ একশ ফুল, দ্বিতীয় সন্ধি, অশোকের সময়ের গ্রাম

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়—কয়েকটি নায়ক, নীলাম্বরী, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা

দেবী রায়—শবযাত্রার প্রথম চীৎকারকারী, আমি ও কলকাতা

দেবেশ দাশ—রাজোয়ারা, রোম থেকে রমনা, সেই চিরকাল

দেবেশ রায়—দেবেশ রায়ের গল্প

ধনঞ্জয় দাশ—শর সন্ধান

ধনঞ্জয় বৈরাগী—দম্পতি, জয়জয়ন্তী, নুনের পুতুল সাগরে, কালো হরিণচোখ, ছিলেন বাবুর দেশে, বিদেহী, মঞ্চকন্যা, এক মুঠো আকাশ

ধীরাজ ভট্টাচার্য—যখন পুলিশ ছিলাম, যখন নায়ক ছিলাম, মহুয়া মিলন, মন নিয়ে খেলা
ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়—অন্তঃশীলা, আবর্ত, রিয়ালিষ্ট, মোহনা
নচিকেতা ভরদ্বাজ—ফরমান
নজরুল ইসলাম—সুর সাকী, অগ্নিবীণা, ফণিমনসা, বিষের বাঁশি, সঞ্চিতা, চন্দ্রবিন্দু, ভাঙার গান, প্রলয় শিখা, ঝিঙেফুল, নজরুলের কাব্যসঞ্চয়ন, ধূমকেতু, মরুভাস্বর, শেষ সওগাত, ঝড়
ননী ভৌমিক—ধানকানা, ধূলোমাটি, চৈত্রদিন
নরেন্দ্রনাথ মিত্র—তিন দিন তিন রাত্রি, অসমতল, হলদে বাড়ি, দ্বীপপুঞ্জ, উল্টোরথ, পতাকা, অক্ষরে অক্ষরে, রূপালী রেখা, সন্ধ্যারাগ, সূর্যসাক্ষী, সেতুবন্ধ, ময়ূরী, পতনে উত্থানে, পরম্পরা, চিলেকোঠা, চেনামহল, মিশ্ররাগ, মহানগর, সুধা হালদার ও সম্প্রদায়, অনমিতা, যাত্রাপথ, রূপ লাগি, মলাটের রঙ, অনুরাগিনী, শুক্লপক্ষ, উত্তরণ, পূর্বতনী, জলপ্রপাত, উপনগর, প্রজাপতির রঙ, বিবাহবাসর
নরেশ গুহ—দুরন্ত দুপুর
নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত—বিপর্যয়, শুভা, দ্বিতীয় পক্ষ, অগ্নিসংস্কার, পাপের ছাপ, বান্ধবী, সংস্কার, মেঘনাদ, অভয়ের বিয়ে, তারপর, মিলন পূর্ণিমা, সর্বহারা
নবনীতা সেন [দেব]—প্রথম প্রত্যয়
নবেন্দু ঘোষ—নায়ক ও লেখক, ডাক দিয়ে যাই, মানুষ, এই সীমান্তে, প্রান্তরের গান, আগুনের উক্তি, কান্না, আজব নগরের কাহিনী, যেন এক নদী, সুখ নামে পাখী, ভালোবাসার অনেক নাম, সিঁড়ি, পঞ্চম রাগ, পাপুই দ্বীপের কাহিনী, প্রথম বসন্ত, রাতের গাড়ি, একটি কান্নাহীনের কাহিনী
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (সুনন্দ)—উপনিবেশ ১-৩, তিমিরতীর্থ, ভাঙা বন্দর, বীতংস, দুঃশাসন, সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী, স্বর্ণসীতা, বনজ্যোৎস্না, বৈতালিক, শিলালিপি, মহানন্দা, কালাবদর, অমাবস্যার গান, শিলাবতী, শুধু সন্ত্রাস, নতুন তোরণ, শ্রেষ্ঠ গল্প, সন্ধ্যার সুর, নিশিযাপন, ভস্মপুতুল, জয়ন্তী, চাঁপার গন্ধ, বন বাংলো, তিন প্রহর, নির্জন শিখরে, পদ্মপাতায় দিন, মেঘের উপর প্রাসাদ, গন্ধরাজ, অসিধারা, ভাটিয়ালী, নীল দিগন্ত, বিদূষক, রূপমতী, পদসঞ্চার, রঞ্জনা, শুভক্ষণ, চোখের বাহিরে, পাতাল কন্যা, লাল মাটি, আলোকপর্ণা, কাঁচের দরজা
নারায়ণ সান্যাল—বকুলতলা পি এল ক্যাম্প, দণ্ডকশবরী, সত্যকাম, মহাকালের মন্দির, অলকনন্দা, মনামি, নাগচম্পা, তাজের স্বপ্ন, অন্তর্লীনা, বল্মীক
নিমাই ভট্টাচার্য—আকাশভরা সূর্য তারা, পার্লামেন্ট স্ট্রীট, মেমসাহেব
নিশিকান্ত—অলকানন্দা, দিগন্ত, দিনের সূর্য, বৈজয়ন্তী
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী—নীল নির্জন, নক্ষত্র জয়ের জন্য, নিরক্ত করবী, কলকাতার যীশু, অন্ধকার বারান্দা, শ্রেষ্ঠ কবিতা
নীরেন্দ্রনাথ রায়—দাবী

নীলকণ্ঠ (দীপেন্দ্র কুমার সান্যাল)—ননীগোপালের বিয়ে, ননীগোপালের বিয়ের পর, মধুচক্র, আজ কাল পরশু, নীলকণ্ঠের পাঁচালী, দ্বিতীয় প্রেম, নীলকণ্ঠ বিচিত্রা, ট্যাকসির মিটার উঠছে, ললিতা

নীলিমা দাশগুপ্ত—পাহাড়ী গাঁয়ের কথা, ইন্দ্রানীর প্রেম, উঁচু নীচু রাস্তা, তিন শাড়ি, মালবিকার মন

নীহার গুহ—তাৎক্ষণিক অনুভূতিগুলি, প্রতিফলিত গোলাপ, ভিয়েতনামী সৈনিকদের গান

নীহার রঞ্জন গুপ্ত—কন্যাকুমারী, রাত্রি নিশীথে, সূর্য তপস্যা, তালপাতার পুঁথি, ঝড়, অবণ্য, অপারেশন, অস্তি ভাগীরথী তীরে, ধূসর গোধূলি, উত্তর ফাল্গুনী, কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী, ছিন্নপত্র, বহুত মিনতি, মল্লার, নীলতারা, নূপুর, নিশিপদ্ম, মধুমিতা, রাতের রজনীগন্ধা, লালুভুলু, হাসপাতাল, হীরা চুনী পান্না, কাজললতা, সেই মরুপ্রান্তে, পিয়া মুখ চন্দা, রতিবিলাপ, মায়ামৃগ, শ্রাবণী, বাদশা, শঙ্খবলয়, কালোভ্রমর, মৃত্যুবাণ, কালকূট, ময়ূর মহল, বিষকুম্ভ, উল্কা, কাঁচঘর, বধূ, কালনাগ, গড় মান্দারন, হাড়ের পাশা, বৌরাণীর বিল, সুরের আকাশ, বকুল গন্ধে বন্যা এলো, রঙের টেক্কা, নিশি বিহঙ্গ, সকলি গরল ভেল, বহ্নিশিখা, মধুমিতা

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়—চলমান জীবন ১-৩

পবিত্র মুখোপাধ্যায়—হেমন্তের সনেট, শবযাত্রা, আগুনের বাসিন্দা, ইবলিসের আত্মদর্শন, দর্পণে অনেক মুখ, অস্তিত্ব অনস্তিত্ব সংক্রান্ত

পরশুরাম (রাজশেখর বসু)—চিকিৎসা সঙ্কট, হনুমানের স্বপ্ন, গড্ডলিকা, কজ্জলী, নীলতারা ইত্যাদি গল্প, আনন্দীবাঈ ইত্যাদি গল্প, চমৎকুমারী ইত্যাদি গল্প, কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প, পরশুরামের কবিতা

পরিমল গোস্বামী—ম্যাজিক লণ্ঠন, স্মৃতিচিত্রন

পরেশ মণ্ডল—মানমন্দির, প্রতিবিম্ব, অদূরে জলের শব্দ

পার্থ রাহা—অন্ধকারে আর্তনাদ

পুলকেশ দে সরকার—বালির প্রাসাদ

পুষ্কর দাশগুপ্ত—এখানে আমি

পূর্ণেন্দু পত্রী—দাঁড়ের ময়না, মানুষের মুখ, যৌবনকাল, একমুঠো রোদ

প্রতিভা বসু—সেতুবন্ধ, আলো আমার আলো, মেঘলা দুপুর, দ্বিতীয় দর্পণ, নীড়ের পাখী, মেঘের পরে মেঘ, রাঙাভাঙা চাঁদ, প্রথম বসন্ত, সমুদ্র হৃদয়, মনের ময়ূর, ঘুমের পাখীরা, মনোলীনা, প্রণয়ীর সংখ্যা পাঁচ, তিন তরঙ্গ, মধ্য রাতের তারা, বনে যদি ফুটল কুসুম, মাৎস্যমোতো

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়—অতলান্ত

প্রদীপ চৌধুরী—চর্মরোগ, আমি ও অন্যান্য তৎপরতা, ৬৪ ভূতের খেয়া

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত—সদর স্ট্রীটের বারান্দা

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী—সোনার প্রতিমা, তিমির রাত্রি, দানের মর্যাদা, বিয়ের

আগে, মহিয়সী নারী, মুক্তিস্নান, সহধর্মিনী, সোনার বাংলা, সুখের ঘর, বাংলার বৌ, সোনার চাঁদ

প্রফুল্ল রায়—অন্তরঙ্গ, অনন্ত ভুবন, সীমারেখার বাইরে, নোনা জল মিঠে মাটি, রাজা, এসো মৌসুমী, এখানে পিঞ্জর, কিন্নরী, পূর্বপার্বতী, সিন্ধুপারের পাখী, সন্ধ্যাকলি, সুধা পারাবার, ইন্দ্রধনুর রঙ, সোনালী রেখা, কেয়াপাতার নৌকা, তটিনী তরঙ্গে, নাগমতী, রূপসীর মন, মাটি আর নেই, প্রথম তারার আলো, মুক্তো

প্রবোধকুমার সান্যাল—মহাপ্রস্থানের পথে, আঁকাবাঁকা, প্রিয় বান্ধবী, হাসুবানু, নবীন যুবক, বন্যাসঙ্গিনী, জীবনমৃত্যু, পঞ্চতীর্থ, কল্লান্ত, অঙ্গার, কয়েকঘণ্টা, নিশিপদ্ম, প্রমীলার সংসার, জলকল্লোল, কাজললতা, দুই আর দুয়ে চার, পিয়া মুখ চন্দা, জনম জনম হম, এক চামচ গঙ্গা, কাঁচ কাটা হীরে, দুই পাখি, নিত্য পথের পাখি, বসন্ত বাহার, পুষ্পধনু, জুয়া, বনহংসী, গল্প সংগ্রহ, বেলোয়ারী, নওরঙ্গী, অগ্নিসাক্ষী, মনে রেখো, জনতা, বিবাগী ভ্রমর, ঝড়ের সংকেত

প্রবোধবন্ধু অধিকারী—দিবস রজনী, বিহঙ্গ বিলাস, ধলেশ্বরী, প্রজাপতির রং, উপকণ্ঠ, অতসী, নিশিরঙ্গ

প্রভাত দেব সরকার—অনেক দিন, মথুরা নগরে, এই দিন এই রাত, সায়াহ্নের সানাই, ওরা কাজ করে

প্রভাত চৌধুরী—শুধু প্রেমিকার জন্য, বিস্ফোরণে জ্বলন্ত নগরে, দিন বদলের পূর্বাভাব

প্রমথনাথ বিশী—অকুন্তলা ও অন্যান্য কবিতা, হংসমিথুন, প্রাচীন আসামী হইতে, প্রাচীন পারসিক হইতে, পদ্মা, জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার, ডাকিনী, কেরী সাহেবের মুন্সী, লালকেল্লা, বিপুল সুদূর, তুমি যে, চলনবিল, অনেক আগে অনেক দূরে, সিন্ধু নদের প্রহরী, নিকৃষ্ট গল্প, গল্প পঞ্চাশৎ, অ্যালার্জি, নীলমণির স্বর্গ, নীরস গল্প সঞ্চয়ন, কিংশুকবহ্নি, জো··দীঘির উদয়াস্ত

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়—এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা, আনন্দ ভৈরবী

প্রলয় সেন—তালপাতার বাঁশি

প্রশান্ত চৌধুরী—ঘণ্টা ফটক, মেঘ ডম্বর, স্বগতোক্তি, ডাকো নতুন নামে, নদী থেকে সাগরে, আলোকের বন্দরে, ফুলমতিয়া, মাঠ কোটা, সমান্তরাল, সেই মেয়ে সুজাতা, লাল পাথর

প্রাণতোষ ঘটক—তিন পুরুষ, মিলন মধুর রাতি, রূপালী তারার আলো, রাণী বৌ, মুক্তাভস্ম, মুঠো মুঠো কুয়াশা, রাজায় রাজায়, সুখের লাগিয়া

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী (মহাস্থবির)—স্বনির্বাচিত গল্প, প্রভাত সঙ্গীত, স্বর্গের চাবি, মহাস্থবির জাতক ১-৪

প্রেমেন্দ্র মিত্র—প্রথমা, সম্রাট, ফেরারী ফৌজ, সাগর থেকে ফেরা, হরিণ চিতা চিল, অথবা কিন্নর, কখনো মেঘ, পুতুল ও প্রতিমা, মৃত্তিকা, পাঁক, কুয়াশা, কালোছায়া, বাঁকালেখা, অরণ্যপথ, নিশীথ নগরী, মিছিল, পঞ্চশর, বেনামী বন্দর, দাবী, আহুতি, প্রতিধ্বনি ফেরে, স্তব্ধ প্রহর, সূর্য কাঁদলে সোনা, এলো অচেনা, অন্য এক নাম, সপ্তপদী, অমলতাস, প্রেম যুগে যুগে, ঘনাদার গল্প,

হানাবাড়ি, জলপায়রা, মৌসুমী, প্রেমই ধন্বন্তরী, কচিৎ কখনো, পা বাড়ালেই রাস্তা, মনুদ্বাদশ, শ্রাবণে ফাল্গুনে, ভাবীকাল
ফণিভূষণ আচার্য—ধূলিমুঠি সোনা, হলুদ পাখীর ডাক, পঙ্ককন্যা, পলাশের বনে গোধূলি
ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়—চিতা বহ্নিমান, ভাগীরথী বহে ধীরে, তুঁহু মম জীবন, ধরণীর ধূলিকণা, মধুরাতি জাগর, প্রিয়া ও পৃথিবী, চলে নীল শাড়ী, আশার ছলনে ভুলি, রাত জাগার রাত, চরণ দিলাম রাঙায়ে, সন্ধ্যারাগ, বনতুলসীর বন, উদয় ভানু, একটি শিশির বিন্দু, বহ্নি বন্যা, হে মোর দুর্ভাগা দেশ, কালরুদ্র, জীবন রুদ্র, রাত্রি জননী, মানব দেউল, ত্রিশঙ্কু, রাহু ও রবি, প্রজাপত ঋষি, মহারুদ্র, জলে জাগে ঢেউ, আকাশ বনানী জাগো, নীলালক্তক
বটকৃষ্ণ দে—মনোগন্ধা
বনফুল—তৃণখণ্ড, দ্বৈরথ, মানদণ্ড, জঙ্গম ১-৫, ডানা ১-২, স্থাবর, নির্মোক, নবদিগন্ত, ভীমপলশ্রী, সপ্তর্ষি, লক্ষ্মীর আগমন, মহারানী, কষ্টিপাথর, অসংলগ্না, বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প, বনফুলের গল্প, সে ও আমি, কিছুক্ষণ, মৃগয়া, রাত্রি, ভূয়োদর্শন, বৈতরণীর তীরে, বাহুল্য, বিন্দুবিসর্গ, নঞ তৎপুরুষ, অগ্নি, অদৃশ্য-লোক, স্বপ্ন সম্ভব, ত্রিবর্ণ, পক্ষীমিথুন, কন্যাস্থ, গোপালদেবের স্বপ্ন, প্রচ্ছন্ন মহিমা, পঞ্চপর্ব, তীর্থের কাক, মানসপুর, এক ঝাঁক খঞ্জন, পীতাম্বরের পুনর্জন্ম, ওরা সব পারে, ছিটমহল, তিন কাহিনী, হাটে বাজারে, ভুবন সোম, নীরঞ্জনা, গল্পসংগ্রহ, অনুগামিনী, ব্যঙ্গ কবিতা, জল তরঙ্গ, অগ্নীশ্বর, সপ্তমী, দুই পথিক, নতুন বাঁকে, দূরবীন, মণিহারী
বরেন গঙ্গোপাধ্যায়—পাখিরা পিঞ্জরে, নিশীথ ফেরী, কংস কবুতরী কথা
বরেন বসু—রঙরুট, প্রাক্তন
বলরাম বসাক—পিঁপড়ে হাতী
বাণী রায়—তনিমা জাতক, সাতটি রাত্রি, আরো কথা বলো, চক্ষে আমার তৃষ্ণা, প্রেম, সকাল সন্ধ্যা রাত্রি, বর্ষা বিজয়, জুপিটার, সাতটি তারা, প্রেম ও প্রহর, কনে দেখা আলো, পুনরাবৃত্তি, রঞ্জন রশ্মি, শূন্যের অঙ্ক, সুন্দরী মঞ্জুলেখা
বারীন্দ্রনাথ দাশ—চায়না টাউন, রাজা ও মালিনী, অনেক সন্ধ্যা একটি সন্ধ্যাতারা, ইমন বেহাগ বাহার, উপনায়িকা, অতনু ও জীবন দেবতা, এক বেগম এক সুলতান, কর্ণফুলী, গড় নাসিমপুর, দুলারী, বেগম বাহার লেন, বাহাদুর শার সমাধি, বিশাখার জন্মদিন, শাহজাদা
বাসুদেব দাশগুপ্ত—রন্ধনশালা
বাসুদেব দেব—একটি গুলির শব্দে, রৌদ্রের ভিতরে চিঠি
বিক্রমাদিত্য—আনোখীলাল পাখোটিয়া, প্রথম প্রণয়
বিজয় কুমার দত্ত—মুখশ্রী উন্মোচন
বিজয়া মুখোপাধ্যায় [দাশগুপ্ত]—আমার প্রভুর জন্য
বিনয় মজুমদার—নক্ষত্রের আলোয়, গায়ত্রীকে, ফিরে এসো চাকা, ঈশ্বরীর কবিতা-বলী, ঈশ্বরীর, অধিকন্তু

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—পথের পাঁচালী, অপরাজিত, দৃষ্টিপ্রদীপ, আরণ্যক, অনুবর্তন, ইছামতী, দুই বাড়ি, তৃণাঙ্কুর, দেবযান, হে অরণ্য কথা কও, মেঘমল্লার, অভিযাত্রিক, মুখোশ ও মুখশ্রী, আচার্য কৃপালনী কলোনী, শ্রেষ্ঠ গল্প, মৌরীফুল, যাত্রাবদল, আদর্শ হিন্দু হোটেল, বেনীগির ফুলবাড়ি, বিপিনের সংসার, স্মৃতির রেখা, জন্ম ও মৃত্যু, কিন্নরদল, তালনবমী, উর্মিমুখর, উপলখণ্ড, বিধু মাষ্টার, ক্ষণভঙ্গুর, উৎকর্ণ, অসাধারণ, কেদার রাজা, কুশল পাহাড়ী, অথৈ জল, নবজীবনের প্রান্তে, নবাগত, অরণ্য মর্মর, রূপ হলুদ, লবটুলিয়ার কাহিনী, অনুসন্ধান, অশনি সংকেত, দম্পতি

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়—রাণুর ১ম-৩য় ভাগ, রাণুর কথামালা, নীলাঙ্গুরীয়, স্বর্গাদপি গরীয়সী ১-৩, বরযাত্রী, সেরা গল্প, হৈমন্তী, বসন্তে, চৈতালী, অতঃ কিম, কায়কল্প, দৈনন্দিন, রূপান্তর, পঙ্কপল্বল, কবি ও অকবি, দোল-গোবিন্দের কড়চা, নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব, তুয়ার হতে অদূরে, বাসর, কন্যা সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী এবং, রিকশার গান, নয়ান বৌ, লঘুপাক, আনন্দ নট, তাল-বেতাল, কোকিল ডেকেছিল, রূপ হল অভিশাপ, পরিচয়, কেউ ততলাজুক নয়, পরিশোধ, উর্মি আহ্বান, সরস গল্প, কিছুক্ষণ, উত্তরায়ণ, জাপানী মুখোশ, নব সন্ন্যাস, হাসি ও অশ্রু, কুশী প্রাঙ্গনের চিঠি

বিমল কর—দেওয়াল ১-৩, ত্রিপদী, ফানুসের আয়ু, খোয়াই, গ্রহণ, খড়কুটো, বালিকা বধূ, যদুবংশ, পরস্পর, ঐশ্বর্য, পুর্ণ অপুর্ণ, পরিচয়, কুশীলব, আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন, সঙ্গিনী, ওই ছাযা, আকাশ কুসুম, মনোনয়ন, নির্বাসন, নতুন হাওয়া, স্বর্গখেলনা, মধ্যদিন, মল্লিকা, যাতুকর, আবর্তন, একদা কুয়াশায়, মুখোমুখি, পান্থশালা, সীমারেখা, বাড়ি বদল, জীবনায়ন, পরবাস, অবগুণ্ঠন, কাঁচঘর, জোনাকী, ময়ূরী, পিঙ্গলার প্রেম, দিবারাত্রি, সুধাময়, পলাতকা, জননী, অপরাহ্ন, এই দেহ অন্য মুখ, কেরাণী পাড়ার কাব্য, গ্যাস বার্ণার, দ্বন্দ্ব, নিশিগন্ধ, মধ্যদিন, সোনারূপার কাঠি, হঠাৎ আলো, হ্রদ, বরফ সাহেবের মেয়ে

বিমলচন্দ্র ঘোষ—দক্ষিণায়ন, বিপ্রহর, ভুখাভারত, উদাত্ত ভারত, মহাচীন, নানকিং, উত্তর আকাশের তারা, সাবিত্রী, রক্তগোলাপ, গাঙ্গেয় সৈকত

বিমল মিত্র—ছাই, দিনের পর দিন, সাহেব বিবি গোলাম, প্রেম পরিণয় ইত্যাদি, হাতে রইলো তিন, বেগম মেরী বিশ্বাস, চলো কলকাতা, নিবেদন ইতি, বাহার, কলকাতা থেকে বলছি, কড়ি দিয়ে কিনলাম ১-২, একক দশক শতক, শ্রেষ্ঠ গল্প, কথাচরিত মানস, সখী সমাচার, কেউ নায়ক কেউ নায়িকা, পুতুল দিদি, বেনারসী, কুমারীব্রত, মৃত্যুহীন প্রাণ, কন্যাপক্ষ, রাণীসাহেবা, টক ঝাল মিষ্টি, মিথুনলগ্ন, অন্যরূপ, সুয়োরাণী, কাহিনী সপ্তক, এক রাজা ছয় রাণী, মন কেমন করে, প্রথম পুরুষ, রাজপুতানী, সরস্বতীয়া, নিশিপালন, শনি রাজা রাহু মন্ত্রী

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়—কানীন ও ক্ষেত্রজা, দুই পৃথিবীর মাঝের দেশ•

বিষ্ণু দে—চোরাবালি, উর্বশী ও আর্টেমিস, সন্দীপের চর, পূর্বলেখ, সাত ভাই চম্পা, অন্বিষ্ট, নাম রেখেছি কোমল গান্ধার, আলেখ্য, একুশ বাইশ, স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ,

কেটে বসত, আমার ফাঁসি হলো, প্রেমিক, সেতুবন্ধ, রূপবতী, নরবাঁধ, দেবী কিশোরী, একদা নিশীথ কালে, দুঃখ নিশার শেষে, শত্রু পক্ষের মেয়ে, উলু, খদ্যোৎ, নবীন যাত্রা, দিল্লী অনেক দূর, নিশিকুটুম্ব ১-২, সবুজ চিঠি, কিংশুক, মানুষ গড়ার কাহিনী, মায়াকন্যা, স্বর্ণসজ্জা, ছবি আর ছবি, কল্পলতা

মনোরঞ্জন হাজরা—নোঙরহীন নৌকা, পলিমাটির ফসল, মহানগর ও দাবানল, নবজীবনের পথে, এ সভ্যতা

মলয় রায়চৌধুরী—জখম, শয়তানের মুখ, আমার অমীমাংসিত শুভা

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত—পাখি জানে

মহাশ্বেতা দেবী—নটী, এতটুকু আশা, মধুরে মধুর, সপ্তপর্ণা, তারার আঁধার, অমৃত সঞ্চয়, সন্ধ্যার কুয়াশা, বায়োস্কোপের বাক্স, মধ্যরাতের গান, অজানা, আঁধার মানিক, তীর্থ শেষের সন্ধ্যা, ঝাঁসির রাণী, তিমির লগন, পরম পিপাসা, প্রেমতারা, বিপন্ন আয়না, যমুনা কী তীর, সোনা নয় রুপো নয়, সুভগা বসন্ত

মহিমরঞ্জন মুখোপাধ্যায়—যে কোন ফাল্গুন

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়—জননী, পদ্মানদীর মাঝি, দিবারাত্রির কাব্য, পুতুল নাচের ইতিকথা, শহরতলী ১-২, বৌ, চতুষ্কোণ, অহিংসা, শহরবাসের ইতিকথা, চিহ্ন, জীয়ন্ত, সরীসৃপ, প্রাগৈতিহাসিক, ছোট বকুলপুরের যাত্রী, শ্রেষ্ঠ গল্প, অমৃতস্য পুত্রাঃ, ধরাবাঁধা জীবন, মিহি ও মোটা কাহিনী, আজ কাল পরশুর গল্প, পরিস্থিতি, চিন্তামনি, ভেজাল, দর্পণ, হলুদ পোড়া, সমুদ্রের স্বাদ, কে বাঁচায়, প্রতিবিম্ব, খতিয়ান, মাটির মাশুল, ছোট বড়, অতসী মামী, আদায়ের ইতিহাস, জীবনের জটিলতা, ইতিকথার পরের কথা, প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান, পরাধীন প্রেম, গল্পসংগ্রহ, পাশাপাশি, হরফ, উত্তরকালের গল্পসংগ্রহ, শান্তিলতা, হলুদ নদী সবুজ বন, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা

মানস রায়চৌধুরী—অনিদ্র গোলাপ, আবহ সময় শিখা

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—একান্তর

মিহির আচার্য—আলোর সহোদর, ধূসর পদাতিক, দ্বিরাগমন, আজ কাল পরশু, গল্প সংগ্রহ, জোনাকীর আলো, অনিকেত, এক নদী বহু তরঙ্গ

মিহির মুখোপাধ্যায়—কালপুরুষ

মিহির সেন—ঘরে ফেরা,

মুকুল গুহ—হে নীল পৃথিবী, একটি সূর্যের জন্যে, অনুক্ষণ স্বদেশ যাত্রা, কণ্ঠস্বর

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি—নিঃসঙ্গ মাইতি, নতুন জনপথ

মৃগাঙ্ক রায়—সমুদ্র কন্যা

মৃণাল দত্ত—মৌলিক নিষাদ

মৃণাল দেব—বোধিক্রমে শ্বেত পিপীলিকা

মৃণাল বসুচৌধুরী—মগ্ন বেলাভূমি, শহর কলকাতা

মোহিত চট্টোপাধ্যায়—গোলাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, অঙ্কন শিক্ষা, শবাধারে জ্যোৎস্না, আষাঢ়ে শ্রাবণে, জ্যোৎস্নায় নিদ্রিত ফুল

রেবন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—স্বরচিত দৃষ্টান্তর
লীলা মজুমদার— নেপোর বই, আর কোনো খানে, দিনে দুপুরে, শ্রীমতী, ঝাঁপতাল, মণিকুন্তলা, মণিমালা, চীনে লণ্ঠন, নাটঘর, আয়না, পদীপিসীর বর্মী বাক্স, হলদে পাখির পালথ
লোকনাথ ভট্টাচার্য—এ ফুলদানিতে ফুল ও অন্যান্য, মই ময়ূর মন, হাঁটুতে হাঁটুতে নহবৎ, ভোর, দু একটি ঘর দু একটি স্বর
শংকর— কত অজানারে, চৌরঙ্গী, বোধোদয়, নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবোরেটরি, যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ, মানচিত্র, এক দুই তিন, পাত্রপাত্রী, রূপতাপস, সার্থক জনম, এপার বাংলা ওপার বাংলা, যা বলো তাই বলো
শংকর দে—স্বপ্নের মধ্যে চিৎপুর ফায়ার এ্যালার্ম, তুমিই ভারতবর্ষ
শংকর চট্টোপাধ্যায় (জনমেজয়)—কেন জন্ম কেন নির্যাতন, কেন ভালবাসা, মায়াবী মোহিনী
শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়—অজ্ঞাতবাস, ঘর খুলে বারান্দায়, নিমডালের ফুল
শঙ্খ ঘোষ—এখন সময় নয়, নিহিত পাতাল ছায়া, দিনগুলি রাতগুলি, শ্রেষ্ঠ কবিতা
শক্তি চট্টোপাধ্যায় (রূপচাঁদ পক্ষী)—হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য, অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি অন্ধকারে, ধর্মেও আছো জিরাফেও আছো, সোনার মাছি খুন করেছি, হেমন্তের অরণ্যে আমি পোষ্টম্যান, পুরোনো সিঁড়ি, উড়ন্ত সিংহাসন, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, কুয়োতলা, লুসি আর্মানির হৃদয় রহস্য, হাই সোসাইটি, পরবাসী, কিন্নর কিন্নরী
শক্তিপদ রাজগুরু—দিনগুলি মোর রইলো না, হেথা নয়, পথ বয়ে যায়, সতী সীমন্তিনী, রঙ্গবল্লরী, গঙ্গাহৃদি, বনান্তর, নতুন সীমান্ত, পিয়াসী মন, সোমনাথ, সন্ধ্যা সাগর কূলে, সমুদ্র শঙ্খ, জনম অবধি, মেঘে ঢাকা তারা, কাজল গাঁয়ের কাহিনী, রূপ অপরূপ, গৌড়জনবধূ, জীবন কাহিনী, যন্ত্রণার অনুভব, বাসাংসি জীর্ণানি, কেউ ফেরে নাই, গহিন গাঙ গহন বন, তবু বিহঙ্গ, দেবাংশী, যদি জানতেম, বন মাধবী, মণি বেগম, মনের মানুষ, মহুয়া মিলন, রাতের পাখিরা, বর্ণান্তর, শাল পিয়ালের বন, শেষ নাগ, রায় মঙ্গল, রূপতরঙ্গ, সমুদ্র আর ঢেউ, মন মানে না, স্বপ্নময়ী, কুমারী মন, অনেক দিনের চেনা, অন্তরে অন্তরে, অবাক পৃথিবী, কাঁচ কাঞ্চন, পালাবদল
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সীমা স্বর্গ, সীমান্ত শিবির, মধ্যদিনের গান, তীরভূমি, নীলাঞ্জন ছায়া, ঢেউ ওঠে পড়ে, বিদিশার নিশা, দেবকন্যা, সিন্দুর টিপ, সাক্ষী বালুচর, দ্বিতীয় অন্তর, জনপদবধূ, সমুদ্রের গান, নীলসিন্ধু, এক আশ্চর্য মেয়ে, এই তীর্থ; স্বপ্ন সঞ্চার, তারুণ্যের কাল, কর্ণাট রাগ, পট ও মঞ্জরী, অভিমানী আন্দামান, নয়ানজুলি, কত আলো, অপরিচিতের নাম, আনন্দ ভৈরব, এ জন্মের ইতিহাস
শচীন ভৌমিক—পটের বিবি
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়—জাতিস্মর, ঝিন্দের বন্দী, বিষকন্যা, কাঁচামিঠে, চুয়া চন্দন, ছায়াপথিক, শ্রেষ্ঠ গল্প, পথ বেঁধে দিল, কালকূট, দন্তরুচি, গোপনকথা, বিজয় লক্ষ্মী, যুগে যুগে, শাদা পৃথিবী, ময় মৈনাক, কেন বাজাও কাঁকন, রাজদ্রোহী,

আদিম রিপু, বিষের ধোঁয়া, মন চোরা, কামিনী কাঞ্চন, কহেন কবি কালিদাস, বহু যুগের ওপার হতে, সজারুর কাঁটা, শরদিন্দু ওমনিবাস, কানু কহে রাই, বহ্নি পতঙ্গ, তুমি সন্ধ্যার মেঘ, সসেমিরা, হসন্তী, তুঙ্গভদ্রার তীরে, রঙীন নিমেষ মায়াকুরঙ্গী, বেণীসংহার, যুগে যুগে, দুর্গরহস্য, কানামাছি, কালের মন্দিরা, গৌড়মল্লার, চিড়িয়াখানা, ঝিমঝিম, ছায়াপথিক, কেন বাজাও কাঁকন, বুমেরাং, ব্যোমকেশের গল্প, ব্যোমকেশের ডায়েরী, শঙ্খ কঙ্কন, কুশ কুহেলী

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় (ত্রিশঙ্কু)—আহত ভ্রূবিলাস, কোথায় সেই দীর্ঘ চোখ, র‍্যাবো ভের্লেন এবং নিজস্ব, সোনার হরিণ

শশিভূষণ দাশগুপ্ত—জংলা মাঠের ফসল

শম্ভু রক্ষিত—সময়ের কাছে কেন আমি বা কেন মানুষ

শ্যামসুন্দর দে—মুখর মুহূর্ত, পদক্ষেপের ছন্দ

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়—অনিলের পুতুল, বৃহন্নলা, কুবেরের বিষয় আশয়

শান্তনু দাস—দীর্ঘশ্বাস মঞ্চে স্মৃতিময়

শান্তিকুমার ঘোষ—কবিতা এবং কবিতা, শুধু তো নিসর্গ নয়, থামো সুন্দর মুহূর্ত, অন্য এক সমুদ্র, মিতার জন্য রোমান্টিক কবিতা

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়—শুভ রাত্রি, জীবন যৌবন, মুখোমুখি, নিকষিত হেম, এসো নীপবনে, প্রেম ভালবাসা ইত্যাদি, সুসমাচার

শান্তি লাহিড়ী—অস্থি মজ্জা মাংস ইত্যাদি, প্রিয়তমা, নির্বাসিত কথামালা, কালিঘাটের পট, অহঙ্কার হে আমার

শিবশম্ভু পাল—ঘরে দূরে দিগন্ত রেখায়

শিবনারায়ণ রায়—কথারা তোমার মন

শিবরাম চক্রবর্তী—ইতুর থেকে ইত্যাদি, ঘরনীয় বিকল্প, হর্ষবর্ধন ও গোবর্ধন, ভালোবাসার অনেক নাম, হর্ষবর্ধন নিত্য নতুন, স্বামী মানেই আসামী, বিয়ের প্রুফ বউ, স্বনির্বাচিত গল্প, ভালোবাসার ইতিকথা, প্রিসিলার বিয়ে, স্ত্রী মানেই ই-স্ত্রী, বিবাহের পূর্বপাঠ, বিরাট ভোগ, দেবতার জন্ম, নাক নিয়ে নাকাল, প্রেমের বি-চিত্রগতি, প্রেমের পথ ঘোরালো, বাড়ি থেকে পালিয়ে, বর্মার মামা, পণ্ডিত বিদায়, চুম্বন

শিবেন চট্টোপাধ্যায়—ঢেউ কন্যা, দর্পিত প্রহরে, সূর্য পতনের দৃশ্যে

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়—ঘুণপোকা, পারাপার

শুদ্ধসত্ত্ব বসু—আড়াল

শেখর বসু—দশটি গল্প

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়—ঝোড়ো হাওয়া, পাতাল পুরী, কয়লাকুঠি, শোভাযাত্রা, জীবন নদীর তীরে, নারীমেধ, ভাসান, শৈলজানন্দের গল্প, সুবর্ণা, সারারাত, মনের মানুষ, প্রেমের গল্প, নীহারিকা ওয়াচ কোম্পানী, অতসী, বধূবরণ, অনিবার্য, বিজয়া, শুভদিন, ষোল আনা, সন্তানবতী, মিতেমিতিন, কেউ জানবে না কেউ শুনবে না, বিজয়িনী, হোমানল, রায়চৌধুরী, বন্ধুপ্রিয়া, নন্দিনী,

রূপবতী, অনাথ আশ্রম, ডাক্তার, খরস্রোতা, অরুণোদয়, পূর্ণচ্ছেদ, রক্তলেখা, মাটির রাজা, পৌষপার্বণ, লহ প্রণাম, অভিশাপ, আকাশ কুসুম, অনাহূতা, মারণ মন্ত্র, গঙ্গা যমুনা, প্রতিমা, ক্রৌঞ্চমিথুন, উদয়াস্ত, চাঁদ ও চকোর, শহর থেকে দূরে, নন্দিতা, সন্ধি, অভিনয় নয়, বাংলার মেয়ে, বন্দী, মানে না মানা, হে মরণ, গল্পসঞ্চয়ন, গ্রামকে গ্রাম, গোধূলির লগ্ন, অনামিকা, যুগের হাওয়া, রূপং দেহি ধনং দেহি, অপরূপা, আমি বড় হব, ঠিক ঠিকানা, মনের মত গল্প, কনে চন্দন, রজনী এখনো বাকি, তুমি তৃষ্ণার জল, নিবেদনমিদং, তোমার হল জয়

শৈলেশ্বর ঘোষ—জন্ম নিয়ন্ত্রণ

শৈলেন ঘোষ—মিতুল নামে পুতুলটি, ছোট্ট সোনার গল্প শোনো, অরুণ বরুণ কিরণমালা

শোভন সোম—স্বরবিদ্ধ

সজনীকান্ত দাস—পান্থপাদপ, অঙ্গুষ্ঠ, কেড়স ও স্যাণ্ডাল, পথ চলতে ঘাসের ফুল

সঞ্জয় ভট্টাচার্য—সংকলিতা, স্বনির্বাচিত কবিতা, উত্তর পঞ্চাশ, বৃত্ত, ফসল, মরামাটি, দিনান্ত, কস্মৈ দেবায়, রাত্রি, নতুন দিনের কাহিনী, কল্লোল, মৌচাক, আষাঢ় অনল, সৃষ্টি, প্রবেশ প্রস্থান, কাঁচ, ঘর, স্মৃতি, পিয়াললতা, ঋণ শোধ, প্রতিধ্বনি

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়—তৃষ্ণা আমার তরী, আত্মপ্রতিকৃতি

সতীনাথ ভাদুড়ী—জাগরী, গণ নায়ক, ঢোড়াই চরিত মানস, চিত্রগুপ্তের ফাইল, অপোক দৃষ্টি, দিগভ্রান্ত, সংকট, চকা-চকী, পত্রলেখার বাবা, জলভ্রমি, গল্পসমগ্র, সংকট

সতীন্দ্রনাথ মৈত্র- -আকাশের মুখ

সত্যপ্রিয় ঘোষ—চার দেয়াল, গান্ধর্ব

সত্যজিৎ রায়—বাদশাহী আংটি, প্রফেসর শঙ্কু, এক ডজন গপ্পো

সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রতিচ্ছবি

সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়- সুন্দরী কথাসাগর, কেয়াফুল

সন্তোষকুমার ঘোষ—কিনু গোয়ালার গলি, মোমের পুতুল, দুখের রেখা, জল দাও, বহে নদী, ত্রিনয়ন, স্বয়ং নায়ক, চিররূপা, বাইরে দূরে, পারাবত, সোজাসুজি, কড়ির ঝাঁপি, পরমায়ু, ছায়াহরিণ, জল দাও, ফুলের নামে নাম

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়—ক্রীতদাস ক্রীতদাসী, সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বী ও অন্যান্য, বিপ্লব ও রাজমোহন

সমর সেন—গ্রহণ, তিন পুরুষ, সমর সেনের কবিতা

সমরেশ বসু (কালকূট)—অমৃত কুম্ভের সন্ধানে, নির্জন সৈকতে, স্বর্ণ শিখর প্রাঙ্গণে, কোথায় পাবো তারে, উত্তরঙ্গ, বাঘিনী, শ্রীমতী কাফে, ভানুমতী, প্রজাপতি, বিবর, পাতক, বনলতা, উজান, গঙ্গা, বান্দা, জগদ্দল, শালঘেরির সীমানায়, দুরন্ত চড়াই, তৃষ্ণা, শেষ দরবার, মিছিমিছি, রূপকথা, তিন ভুবনের পারে, ভানুমতীর নবতরঙ্গ, সমরেশ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প, তিমির বিদার, সওদাগর, পুতুলের খেলা, অলিন্দ, অপরিচিত, অগ্নিবিন্দু, এপার ওপার, স্বীকারোক্তি, ফেরাই, দুই অরণ্য, সুচাঁদের স্বদেশ যাত্রা, জোয়ার ভাঁটা, এখানে সেখানে, নয়নপুরের মাটি, আলোর বৃত্তে, অচিনপুর, পাপপুণ্য, ছিন্ন বাঁধা, ছায়াচারিণী, যাত্রিক, মানুষ, পসারিনী, ষষ্ঠ

ঋতু, মনোমুকুর, ত্রিধারা, দেওয়াল লিপি, রাণীরবাজার, পাহাড়ী ঢল, ছোট ছোট ঢেউ, অয়নান্ত, বিকেলে সোনা, ধূসর আয়না, বি. টি. রোডের ধারে, বিষের স্বাদ

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত—ছায়ার সঙ্গে পা মিলিয়ে, যে কোন নিঃশ্বাসে, চারিদিকে পৃথিবী

সম্রাট সেন—যমুনাবতী সরস্বতী, সায়াহ্নে সপ্তদুর্গা, অধিবাস, অঙ্গীকার

সমীর রায়চৌধুরী—জানোয়ার, ঝর্ণার পাশে শুয়ে আছি, আমার ভিয়েৎনাম

সরলাবালা সরকার—পিন্‌কুর ডায়েরী, গল্পসংগ্রহ

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিকিকিনির হাট, তিন তাসের খেলা

সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—নিজের সঙ্গে সংলাপ

সরোজকুমার রায়চৌধুরী—ময়ূরাক্ষী, গৃহ কপোতী, সোমলতা, দেহ যমুনা, মনের গহনে, পান্থ নিবাস, রমণীর মন, সোম সমাধি, নাগরী, নীল আগুন, প্রজাপতির দংশন, নচিকেতা, অনুষ্টুপ ছন্দ, নীলাঞ্জন, শ্রেষ্ঠ গল্প, তিমির বলয় ১-২, মধুমিতা, শুক্ল সন্ধ্যা, বন্ধনী, আকাশ ও মৃত্তিকা, শৃঙ্খল, ঘরের ঠিকানা, ক্ষণবসন্ত, বসন্ত রজনী, মধুচক্র, কালো ঘোড়া

স্বদেশরঞ্জন দত্ত—ঈশ্বরের সঙ্গে দুদণ্ড, স্বর্গের পুতুল

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়—আজ রাজা কাল ফকির, আমার পৃথিবী, চন্দন ডাঙার হাট, দ্বিধা, পিপাসা, তৃতীয় নয়ন, আদি নেই অন্ত নেই, এক ছিল কন্যা, একান্ত আপন, জবাব, যখন বন্যা এলো, নাম নেই ঠিকানা নেই, সোনালী ধোঁয়া, মাথুর, গ্রীষ্ম বসন্ত, মুঠো মুঠো খুশী, দুপুর গড়িয়ে বিকেল, রঙ্গ রাগ, বেগম, একান্ত আপন, একটি নীড়ের আশা, পায়ে পায়ে, প্রহর, সকালের রোদ সোনা, রাজধানী, গোপী সংবাদ, রমণী, আঁধি, তিনবিন্দু, আলোর অরণ্য

সাগর চক্রবর্তী—নির্জনতার সঙ্গে সংলাপ

সাধনা মুখোপাধ্যায়—আকাশকন্যা, দোপাটির ইচ্ছে

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়—মনোমুকুর, মর্ডান কবিতা, অতসী, অনুরাধা, জলন্ত তলোয়ার

সামসুল হক—প্রটোপ্লাজম, নিজের বিপক্ষে

সুকান্ত ভট্টাচার্য—ছাড়পত্র, ঘুম নেই, মিঠে কড়া, পূর্বাভাস, সুকান্ত সমগ্র

সুকুমার রায়—আবোলতাবোল, হ-য-ব-র-ল, সেই কন্যাকে

সুখলতা রাও—গল্প আর গল্প, সোনার ময়ূর, নতুনতর গল্প, আরো গল্প

সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য—এবং কয়েকজন যুবক

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত—ক্রন্দসী, অর্কেষ্ট্রা, সংবর্ত, কাব্যসংগ্রহ, দশমী

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়—দূরের মিছিল, সূর্যোদয়, রাহু, সরোবর, এক জীবন অনেক জন্ম, কণকলতা, দময়ন্তী, প্রান্তর রঙ্গ, প্রদক্ষিণ, পূর্বপত্র, জন সম্রাট, ব্যালেরিনা, দুর্গ তোরণ, অন্তঃপুর, অন্দর মহল, স্মরণ চিহ্ন, শ্রীমতী, সুপ্রিয়ার বন্ধন, ইভনিং ইন প্যারিস, ছায়ামারীচ, নীলকণ্ঠী, পারাবার, কাঞ্চনময়ী, পরমাত্মীয়া, আলোছায়ার দিনগুলি, অন্য নগর, অপরাহ্নের নদী

সুধীর করণ—অন্য পুরুষ

সুনির্মল বসু—বরণডালা, হলুমুল, শ্রেষ্ঠ কবিতা, আমার ছড়া

সুধেন্দু মল্লিক—হিরন্ময় অন্ধকার, বৃষ্টিকে করেছো বৃষ্টি
সুনীথ মজুমদার—মৃত্যু কোকোনদ
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (নীললোহিত)—একা এবং কয়েকজন, আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি, বন্দী জেগে আছো, লাল রজনীগন্ধা, সুখ অসুখ, যুবক যুবতীরা, সোনালী দুঃখ, আত্মপ্রকাশ, জীবন যে রকম, অরণ্যের দিন রাত্রি, প্রতিদ্বন্দ্বী, রূপালী মানবী, সরল সত্য, হৃদয়ে প্রবাস, নদীর পারে খেলা, বসন্ত দিনের ডাক, উত্তরাধিকার, শ্রেষ্ঠ কবিতা, তুমি কে?
সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়—নীল কণ্ঠ পাখির সময়, নিকট দূর, নীল পদ্ম করতলে, পাপী
সুনীল ঘোষ—ছায়ামারীচ, জলতরঙ্গ
সুনীলকুমার ঘোষ—রেনী পার্ক
সুনীলকুমার নন্দী—প্রকীর্ণ সবুজে নীলে, ভিন্ন বৃক্ষ ভিন্ন ফুল
সুনীল বসু—সিন্ধু সারস, তিমির তরঙ্গ
সুবিমল বসাক—ছাতামাথা
সুবোধ ঘোষ (কালপুরুষ)—ফসিল, পরশুরামের কুঠার, পুতুলের চিঠি, গ্রাম যমুনা, শুক্লাভিসার, শতভিষা, জতুগৃহ, গঙ্গোত্রী, তিলাঞ্জলি, ত্রিযামা, সুজাতা, নাগলতা, ভিলা মাধবী, রূপনগর, ছায়াবৃতা, নবীন পাখী, একটি নমস্কারে, গল্প মণিঘর, বন উপবন, জিয়া ভরলি, বসন্ত তিলক, শ্রেষ্ঠ গল্প, শতকিয়া, ভারত প্রেমকথা, থির বিজুরী, পলাশের নেশা, শ্রেয়সী, গল্পলোক, সায়ন্তনী, জলকমল, চিত্ত চকোর, অর্কিড, কল্প লতিকা, কান্তিধারা, ভিতর দুয়ার, মীন পিয়াসী, রূপসাগর, বর্ণালী, শুন বরনারী, সীমান্ত সরণি, কিংবদন্তীর দেশে, নিত সিঁদুর, ভোরের মালতী, মন ভ্রমরা
সুবোধকুমার চক্রবর্তী—রম্যানি বীক্ষ্য ১-১০, মধুরাংশ, অয়ি অবন্তীনে, তুঙ্গভদ্রা, আরো আলো, মেঘ, রূপম, একটি আশ্বাস, কলিরুবাচ, মণিপদ্ম
সুভাষ ঘোষ—আমার চাবি, থু গাড়ির টিকিট, যুদ্ধে আমার তৃতীয় ফ্রন্ট
সুভাষ মুখোপাধ্যায়—পদাতিক, অগ্নিকোণ, চিরকুট, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা, যত দূরেই যাই, ফুল ফুটুক না ফুটুক, কাল মধুমাস, দিন আসবে, শ্রেষ্ঠ কবিতা, যখন যেখানে, এই ভাই
সুভাষ সিংহ—ধূসর আকাশ
সুমথনাথ ঘোষ—মাধুকরী, নীলাঞ্জনা, বহু মঞ্জরী, মেঘ ভাঙা রোদ, যখন পলাশ ফোটে, রাগলতা, সুদূরের পিয়াসী, রোশনাই, বনরাজিনীলা, জলধি তরঙ্গ, অহল্যার স্বর্গ, বাঁকা স্রোত, মহানদী
সুরজিৎ দাশগুপ্ত—দ্বিতীয় পৃথিবী, দিনরাত্রি
সুরজিৎ বসু—অবতামসী, দক্ষিণ দুয়ার
সুলেখা সান্যাল—দেয়াল পদ্ম
সুশীল রায়—শ্রীমতী, পঞ্চমী, সমীপেষু, ত্রিবেণী, অদ্বিতীয়া, সামান্য অসামান্য, ত্রিনয়না, শতরূ, মধু মাধবী, প্রণয়ী পঞ্চক, অনল-আয়তি, সুচরিতাসু, পঞ্চালী

সেবাব্রত চৌধুরী—সূত্রধার, অবিচ্ছিন্ন

সৈয়দ মুজতবা আলী—পঞ্চতন্ত্র, চাচা কাহিনী, শবনম্, দু'হারা, টুনি মেম, শ্রেষ্ঠ গল্প, পছন্দসই, ময়ূরকণ্ঠী, ভবঘুরে ও অন্যান্য, শহর ইয়ার, চতুরঙ্গ, ধূপছায়া, বড় বাবু, দেশে বিদেশে, অবিশ্বাস্য, রাজা উজীর

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ—কিংবদন্তীর নায়ক, বন্যা, নিশিলতা, হিজল কন্যা, প্রেমের প্রথম পাঠ, তৃণভূমি, নিশিমৃগয়া, নীলঘরের নটী, পিঞ্জর সোহাগিনী, আশমান তারা, জলতরঙ্গ, কালবীজ

সোমনাথ লাহিড়ী—কলিযুগের গল্প

সৌরীন সেন—অপরিচিতা, আখের স্বাদ নোনতা, ভিয়েৎনাম, কান্নাঘাম রক্ত, চে গুয়েভারা

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়—শেষ পর্যন্ত, মন বিহঙ্গ, সোনা ঝরা সন্ধ্যা, চক্রবাক, জীবন সাথী, যাত্রা হলো শুরু, অবাক পৃথিবী, বাবলা, ওগো বর ওগো বধূ, জীবন সঙ্গিনী, এই তো জীবন, মনের মিল

হরপ্রসাদ মিত্র—সাঁকো থেকে দেখা, আশ্বিনের ফেরীওলা, সাম্প্রতিক স্বনির্বাচিত কবিতা, ভ্রমণ, পৌত্তলিক, চন্দ্রমল্লিকা, তিমিরাভিসার

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়—আরাকান, ইরাবতী, বাসর লগ্ন, অন্য দিগন্ত, অভিসারের লগ্ন, মুক্তাসম্ভবা, অন্য দেশ অন্য দাহ, সন্ধ্যাতারা, চন্দন বাঈ, উপকূল, তরঙ্গের পর, সপ্তকন্যার কাহিনী, পূর্বাচল, অভিবেক, মেঘ ও মৃত্তিকা, বনকপোতী, নারী ও নগরী, সুববাহার, পূর্বরাগ, মৃগশিরা, দুস্তর মালঞ্চ, মরসুমী, শহরে বন্দরে, আলোকে তিমিরে, ক্লান্ত বিহঙ্গ, অভিসারিকা, এই ঘর এই মন, কশ্চিৎ কান্তা, প্রজাপতি মন, বধূ মল্লার, সতী অসতী, ধূসর দিগন্ত, মধু মালতী, শঙ্খলিপি

[এ তালিকার কিছু বই প্রকাশ সাপেক্ষে বিজ্ঞাপন দেখে দিয়ে ফেলা হয়েছে ; কয়েকজনের বইয়ের নাম অসম্ভব রকম কম দেওয়া হয়েছে। এ তালিকা সম্পর্কে—এমনকি সম্পূর্ণ গ্রন্থটি সম্পর্কেও—তথ্যগত ত্রুটি নির্দেশ সবিনয়ে আহ্বান করা যাচ্ছে পাঠকের কাছ থেকে।]